পরীজান

Ishita Rahman Sanjida

আব্বা যেদিন দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে ফিরল তখন আমার বয়স দশ বছর।

রুপার বয়স ছিল পাঁচ বছর আর পরীর বয়স মাত্র দেড় বছর। ছোট্ট পরীকে বুকে নিয়ে আম্মা সেদিন নিরবে চোখের জল ফেলেছিলেন। মুখে টু শব্দটি করেননি প্রতিবাদ তো দূরের কথা। আর আমি সেদিন দরজার আড়াল থেকে আব্বার দ্বিতীয় বউয়ের মুখ দেখেছিলাম। আব্বার দ্বিতীয় বউ আমার আম্মার নখের যোগ্য ও না। কালো একটা

মহিলাকে বিয়ে করেছেন আব্বা। যেখানে আমার আম্মা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি সুন্দরী। তারপরও আব্বা ওই মহিলাকেই বিয়ে করেছিলেন। কারণ একটাই,আব্বার একটা পুত্র সন্তান চাই। নাহলে তার এতো সব সম্পত্তি কে দেখবে?তার জমিদারি কে সামলাবে? যেদিন পরীর জন্ম হলো সেদিন আব্বা বাড়িতে ফেরেনি কিন্তু তার কাছে

ঠিকই খবর পৌঁছেছিল যে তার মেয়ে হয়েছে সেজন্যই আব্বা রাগ করে বাড়িতে আসেনি। তার ঠিক দু'দিন পর আব্বা বাড়িতে এসেছিল কিন্তু কারো সাথে কোন কথা বলেনি। পরপর তিনটা মেয়ে জন্ম দেওয়ার জন্য আম্মাকে অনেক কথা শোনায় দাদি। আম্মা নাকি ছেলে জন্ম দিতে পারবে না। তার সাথে আরো একটি কথা দাদি বলেছিল তা

হলো,’যেই মাইয়ার রূপ বেশি,হেয় পোলা পয়দা করতে পারে না কোনদিন।’ এই কথাটা শুনে সেদিন আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আম্মা কিছুই বলেনি চুপচাপ নিজের কাজ করছিল। পরীকে কোলে রাখতো রুপা আর আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে পরীকে কোলে নিতাম। ও যখন ছোট ছোট হাত পা গুলো নাড়াতো তখন আমার খুব ভালো

লাগতো। আম্মা বলে আমার আর রুপার থেকেও পরী বেশি সুন্দর। গালে একটু ছোঁয়া পড়তেই ওর গাল দুটো লাল হয়ে যেতো মনে হতো রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। সেই ভয়ে পরীকে বেশি কোলে নিতাম না। পাছে যদি ব্যথা পায়!! কিন্তু রুপা ছোট্ট পরীকে কোলে নেওয়ার জন্য সবসময় আঁকুপাঁকু করতো। পরীকে কোলে নিয়ে বারান্দার দাওয়ায় বসে

বৃষ্টি দেখতো। আর আমি তার পাশে মোড়া পেতে বই নিয়ে বসে থাকতাম। পরীর যখন ছোট ছোট পা ফেলে হাটতো তখন দেখতে বেশ লাগতো ঠিক মোমের পুতুলের মতো।আমাদের দ্বিতীয় আম্মাকে দেখে আমি মুখ ফিরিয়ে নেই কিন্তু রুপা আর পরী তো বোঝে না। ছোট তো,ওরা দুজনেই ওই মহিলার আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। পরীকে

যখন উনি কোলে নিতো আমিই দৌড়ে গিয়ে ওনার কোল থেকে ছিনিয়ে আনতাম পরীকে। কিছু না বললেও মনে মনে কষ্ট পেতেন উনি। এতে আমি খুব খুশি হতাম। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি যখন ওই মহিলার ও একটা মেয়ে হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত ওনার মেয়েটা মারা যায়। এরপর আরো

একটি মেয়ে জন্ম দেন কিন্তু সেটাও মারা যায়, তারপর যখন,,,,”

আর পড়তে পারলো না পরী তার আগেই ডাক পরলো আবেরজান বেগমের। সাথে সাথে বিষাদের ছায়া নেমে এলো পরীর মুখে। সবেমাত্র খাতাটা খুলে পড়তে বসেছিল সে। একটু পড়তে না পড়তেই ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। চোখ মুখ কুঁচকে

সে পড়ার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো। শব্দ করে ঠেলে চেয়ার টা কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দিলো। সিমেন্টের মলাটে আবরিত খাতাটা বন্ধ করে সযত্নে বইয়ের ভাঁজে রেখে দিয়ে ছুটলো দাদির ঘরে। সেখানে যেতেই চোখ গেল পালঙ্কের উপর বসে থাকা আবেরজান বেগমের দিকে। বিছানায় গা এলিয়ে

দিয়ে শুয়ে আছেন তিনি।পরী বড়বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। পালঙ্কের হাতল ধরে জোর গলায় বলে উঠলো,'কি হইছে?'

আবেরজান ঘাড় ঘুরিয়ে পরীর দিকে তাকালো তারপর বললেন,'মাইয়া মানুষ এতো ধুপধাপ শব্দ করে হাটোস ক্যান?আস্তে হাঁটতে পারস না?'

দাদির জ্ঞানমূলক কথাবার্তা কোনকালেই পছন্দ নয় পরীর। যখনই সামনে আসবে তখনই একটা না একটা জ্ঞানের সহিত কথা বলবেই। পরী দাদির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল,'তুমি কি কইবা তাড়াতাড়ি কও আমার মেলা কাম আছে!!'

আবেরজান হাতের ইশারায় নিজের পানদানি দেখিয়ে বললেন,’একখান পান দে।’আগের ন্যায় ধুপধাপ পা ফেলে জলচৌকির দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পান বানিয়ে এনে দাদির হাতে দিতেই তিনি পানটা মুখে পুরে নিলেন। পরী কৌটা থেকে কিছুটা চুন দাদির তর্জনী আঙ্গুল মেখে দিয়ে কৌটাটা

আগের স্থানে রেখে দিল। বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ফিরে তাকালো দাদির পানে। সেই লেখা গুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। পরী এগিয়ে গেল দাদির কাছে। তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো,দাদির গায়ের রং বেশ চাপা কিন্তু অতোটা কালো নয়। হাত পা ও মুখের চামড়া ঝুলে গিয়েছে।

বয়স হয়েছে তো!পরী হুট করেই বলে উঠলো,’যেই মাইয়ার রুপ বেশি,হেয় পোলা পয়দা করতে পারে না তাই না দাদি?’

পরীর কথা শুনে চমকে তাকালো আবেরজান বেগম। এই কথা পরী শুনলো কোথা থেকে?দাদিকে বলতে না দিয়ে পরী আবার বলে, ‘তোমার তো রুপ নাই। তাই তো দুইটা

পোলা পয়দা করছো। কিন্তু একটারেও তো মানুষ করতে পারো নাই। দুইটা অমানুষ পয়দা করছো। বুড়ি কোহানকার, আমার আম্মাজান তিনটা সোনা জন্ম দিছে আর তুমি কি করছো?এক পোলায় দুইডা বিয়া করছে আরেক পোলার বিয়ার খবর নাই। পরের মাইয়া দেইখা দেইখা দিন পার করে।’কথাগুলো বলে পরী

একদন্ড দেরি না করে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। আবেরজান বেগমকে কিছু বলতেই দিলো না। নিজের নাতনির উপর ক্ষুব্ধ হলেন আবেরজান। মেয়েটা বেশ চটপটে,আর উড়নচন্ডি স্বভাবের। মুখের বুলিতে সবসময় তেজ মিশ্রিত থাকে যা ওনার আর দুই নাতনি দের মধ্যে কোন ক্ষণেই দেখেননি।

পরীর এরকম কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত তাই বেশি না ভেবে তিনি পান খাওয়ায় মন দিলেন।দাদির ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াতেই আবার ডাক পড়লো। এবারের ডাকটা দিয়েছেন পরীর মা মালা বেগম। মায়ের ডাক শুনে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হলো পরীর। সোনালী

আপুর খাতাটা আজকে বোধহয় আর পড়া হবে না। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার টেবিলের দিকে তাকালো সে। বইয়ের সাজানো স্তুপের মধ্যে আসামির ন্যায় পড়ে আছে খাতাটা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন পরীকে কিন্তু সময়ের অভাবে পরী আসতে পারছে না। অসহায় নয়নে শুধু খাতাটা দেখতে লাগল সে। এরমধ্যে

দ্বিতীয় বারের মতো ডেকে উঠল মালা। পরী দৌড় লাগালো। পরনের ঘাগড়া টা দুহাতে হালকা উঁচু করে ধরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে দৌড় দিল রন্ধনশালার দিকে। সেখানে বসেই ডাকছিলেন মালা। পরী ওখানে গিয়ে দাড়াতেই জেসমিনের দিকে চোখ পড়লো সাথে সাথেই চোখ ফিরিয়ে নিল। বড় একটা গামলায় কুঁচো

চিংড়ি বোঝাই করা। সেগুলো বাছাই করছে দুজনে মিলে। মালা পরীকে খেয়াল করেনি,তিনি চিংড়ির হাত পা খোসা ছাড়াচ্ছেন আর কাশছেন। পরী দু'পা ভাঁজ করে মায়ের পাশে বসে হাত ধরে বলল, 'আম্মাজান আপনে অসুখ নিয়া কাম করতে আইছেন ক্যান। পানি ধরলে তো আপনার কাশি আরো বাড়বে।'

কথাটা শেষ করে পরী গরম চাহনিতে একবার জেসমিনের দিকে তাকালো তারপর আবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল,’ঘরের কেউ কি দেহে না যে আম্মার অসুখ?? তারপরেও আম্মারে কামে ডাকে কোন সাহসে? আমার আম্মার কিছু হইলে আমি কিন্তু কাউরে ছাইড়া দিমু না কইয়া দিলাম।’জেসমিন

এবার মুখ খুলল,’আমি আপারে মানা করছিলাম পরী কিন্তু সে শোনে নাই।’

পরী আবারো রাগমিশ্রিত কন্ঠে বলে উঠলো, ‘হইছে আপনারে আর অজুহাত দিতে হইবো না। যা করার,,,’

পরবর্তী শব্দ উচ্চারণ করার আগেই মালা কষে চড় মারেন পরীর গালে।

এতে পরীর কোন ভাবান্তর হলো না। প্রতিদিন দুচারটে চড় না খেলে তার পেটের ভাত হজম হয় না তাও মায়ের হাতের। মুখে আঁচল দিয়ে কাঁশতে কাঁশতে মালা বলল,'কতবার কইছি মুখে মুখে তর্ক করবি না। তোর ছোট আম্মা হয়।'

পরী মাথা নিচু করে নিলো তবে রাগ ওর মধ্যে এখনও বিদ্যমান। মাথা

নিচু করেই সে বলে, ‘ছোট আম্মা কিন্তু আম্মা না।’মালা ফের কিছু বলতে উদ্যত হলে জেসমিন থামিয়ে দিয়ে বলল,’থাক আপা পরীরে কিছু বইলেন না ছোট মানুষ।’ এরপর পরীর দিকে তাকিয়ে বলল,’পরী তুমি জুম্মানরে নিয়া শাপলা বিলে যাও। ঘরে একটা মানুষ ও নাই তাই তোমারে বলতাছি, কতগুলো

শাপলা নিয়া আসো। চিংড়ি দিয়া রান্না হইবো। আজকে ঘরে মেহমান আসবে।’

কপালে দৃঢ় ভাঁজ পড়লো পরীর। অবাক করা কণ্ঠে বলে,’এই বন্যার ভিতরে মেহমান আইবে কই থাইকা?’

পরমুহূর্তে কিছু ভেবেই পরীর মুখে হাসি ফুটে উঠল,’রুপা আপা আইবো??’

মালা দিলেন এক ধমক,’এতো কথা কস ক্যান তাড়াতাড়ি যা। আর শোন মুখটা ভালো করে ঢাইকা যাবি কেউ যানি না দেখে। নৌকার ছইয়ের মধ্যি থাইকা বাইর হবি না। জুম্মানরে নিয়া এহন যা। তোর

বাপে আর তার লোকজন থাকলে তোরে পাঠাইতাম না। এমন সময়ডাতে বাড়ি খালি।’

মৃদু রাগ দেখা গেল মালার মুখে। কিন্তু পরী বেজায় খুশি আজকে অনেক দিন পর বাইরে বের হবে সে। দৌড়ে নিজের কক্ষে চলে গেল। ওড়না দিয়ে নিজের মুখ ভালো করে বেঁধে নিলো। শুধু

চোখদুটো খোলা রাখলো। দাদির ঘরে পেরিয়ে আসার সময় উঁকি দিলো পরী। আবেরজান আয়েশ করে বসে বসে সুপারি কাটছে। পরী হাঁক ছাড়লো,’ও বুড়ি!!’সুপারি কাঁটা রেখে পরীর দিকে তাকালেন তিনি। পরীকে এই সাজে দেখে তিনি বুঝে ফেললেন যে আজকে পরী ঘরের

বাইরে বের হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,'কই যাস?'

পরী ভেংচি কেটে বলল,'তা দিয়া তোমার কাম নাই। আমি এহন যাই, আসমান থাইকা যদি তোমার স্বোয়ামি ডাক দেয় তাইলে ভুলেও যাইও না কিন্তু। দ্যাশ বন্যার পানিতে ভাইসা গেছে তোমারে কবর দেওয়ার যায়গা পামু কই?'

পরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে চলে গেল। আবারও রাগ হলো আবেরজানের। তার ভাষ্যমতে মেয়েদের জোরে হাসতে নেই কাশতে নেই এমনকি কাঁদতেও নেই। মেয়ে মানুষ থাকবে মোমের মতো। আগুনের স্পর্শ পেলে নিরবে গলে যাবে। জ্বলবে পুড়বে ছাই হবে তবে মুখ থেকে শব্দ বের হবে না।

কিন্তু পরীর স্বভাব তার ধারণার বাইরে। তাই তিনি ঠিক করলেন আজকে মালাকে বলে এই মেয়ের একটা ব্যবস্থা করবেই করবে।গ্রামের নাম নূরনগর। পদ্মানদীর ধার ঘেঁষেই এই গ্রামের অবস্থান। পদ্মা যেন নূরনগরে নূরের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি ঋতুতে এই গ্রাম নানান বাহারে সজ্জিত হয়ে উঠে।

কখনো গরমে উওপ্ত পথিকের আর্তনাদ, কখনো বর্ষার মেঘমালা থেকে সৃষ্টি বারিধারা, স্বচ্ছ নীলাম্বরে মেঘের ভেলা,ঘাসে জমে থাকা শিশির কণার রূপবত্তা তো কোকিলের মধুর কণ্ঠ। সব মিলিয়ে গ্রামের এই সৌন্দর্য সবার মন কাড়ে। কিন্তু এখন আর এই গ্রামে সেই সৌন্দর্য নেই। পাঁচদিন ধরে

এই রূপবান গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টানা বর্ষণের ফলে পদ্মা উপচে জলস্রোত দ্রুত তলিয়ে দিয়ে গেছে এই গ্রামের সাথে সাথে আরো অনেক গ্রাম। গরিব অসহায় মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয়কেন্দ্রে। কেউ কেউ নৌকা নিয়ে ভাসছে কিংবা কলা গাছের ভেলায়। দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দিয়েছে

সারাদেশে এই প্রলয়ংকারী সর্বনাশা বন্যা। ঠিক এইরকম বন্যা হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে ১৯৮৮ সালে। আর এখন ১৯৯৮ চলছে। এতগুলো বছর পর আবার সেই বন্যার মুখোমুখি সবাই। কেউই জানে না এই বন্যা কতদিন থাকবে? কতদিন মানুষ না খেয়ে অসহায় হয়ে পড়ে থাকবে? তারা কি বাঁচবে

নাকি অসুখে অনাহারে অকালে প্রাণ হারাবে?

নৌকার ছইয়ের ভেতরে বসে আছে পরী। দুপাশে পর্দা টেনে দিয়েছে। এটা মায়ের কড়া হুকুম। আর জুম্মান নৌকা বাইছে। পরী ছইয়ের ভেতরে থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো,'হ্যা রে জুম্মান আজকে নাকি মেহমান আইবো?কারা আইবো জানস?'বৈইঠা

হাতে নৌকা ঘুরাতে ঘুরাতে জুম্মান জবাব দিলো,’শহর থাইকা ডাক্তার আইবো আপা। বন্যার পানিতে ভিজে অনেকের অসুখ হইছে। হের লাইগা আব্বা শহর থাইকা ডাক্তার আনতাছে। তারাই আইবো।’

‘তোরে কইছে কেডা??’

জুম্মান অকপটে স্বীকার করে বলে,’বড় আম্মায় কইছে?’

পরী আর জবাব দিলো না। শাপলা বিলে নৌকা আসতেই পরীর মনটা খুশিতে নেচে উঠল। যদিও শাপলা বিল আর আগের মতো নেই। পানিতে ভরে টুইটম্বুর,কোনটা বিল আর কোনটা ক্ষেত বোঝা মুশকিল। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো নিজেকে এখন মুক্ত মনে হচ্ছে পরীর। আজকে তো সে বিলের পানিতে

সাঁতার কাটবে তাতে মা বকলে বকুক মারলে মারুক। কিন্তু তখনই বিপত্তি ঘটে গেল। পরীর ইচ্ছা ইচ্ছাই রয়ে গেল জুম্মানের কথায়,'আপা আমাগো আরেক খান নৌকা আইতাছে এইদিকে।'

কৌতূহল হয়ে পরী প্রশ্ন ছুড়ে দিলো,'নৌকায় কেডা দেখ তো?'

জুম্মান দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলল, ‘লতিফ কাকা আর দেলোয়ার কাকা আর লগে মাঝি।’

সাথে সাথে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল পরীর। এটা নিশ্চয়ই ওর মায়ের কাজ। কাজের লোকগুলো বাড়িতে আসতেই পাঠিয়ে দিয়েছে। পরীর আর ভালো লাগে না এইরকম খাঁচায় বন্দী পাখি হয়ে থাকতে।

একা খোলা আকাশে মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চায় সে। কিন্তু ওর মায়ের জন্য তা আদৌও কখনো সম্ভব হবে কি? কথায় কথায় কসম দিয়ে পরীকে চুপ করিয়ে দেয় তিনি। পরী জড়োসড়ো হয়ে বসেই রইলো ছইয়ের ভেতরে।সম্পান মাঝি দাঁড় বাইছে সাথে আরো দুজন মাঝিও আছে। বিশালাকৃতির নৌকা খানি

টেনে নেওয়া একটুখানি কথা না। তিন চারজন মাঝি তো লাগবেই। ঘাম ছুটে গেছে সবার। হঠাৎ করেই কেউ ডেকে উঠলো,'ও সম্পান মাঝি ওইদিকে কই যাও?খাড়াও দেহি একটুখানি।'

সম্পান বাঁশের সাহায্যে নৌকা থামিয়ে দিলো তৎক্ষণাৎ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকা থেকে বিন্দু

বের হয়ে এলো। পরনে অর্ধ নোংরা শাড়ির আঁচল কোমড়ে গুঁজে দিয়ে শুধালো, ‘ওই দিকে কই যাও??’

সম্পান নৌকার ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো বলল,’জমিদার বাড়ি যাই রে বিন্দু। ডাক্তার আনছি শহর থাইকা। হেগোরে দিতেই যাইতাছি।’

বিন্দু উঁকি দিলো নৌকার ছইয়ের ভেতর তারপর বলল,’ওইদিক দিয়া

যাইও না মাঝি। সখারে দিয়া আমারে খবর দিলো পরীবানু আইজ শাপলা বিলে আইছে। ওর লগে দুই খাটাইশ ও আইছে। গেলে ভালা হইবো না।’

সম্পানের মুখে চিন্তার ছাপ দেখা দিলো। সে আড়ষ্ঠ কন্ঠে বলল,’কস কি?পরী আহার সময় পাইলো না। অন্যদিক দিয়া গেলে অনেক ঘুরা

পড়বো। আমাগো তো জলদি যাইতে হইবো। এহন কি করি?’

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সম্পান আবার বলে উঠলো,’তুই লগে আয় বিন্দু তাইলে আমাগো কিছু কইবে না। তুই পরীরে কইলেই পরী শুনবো।’বিন্দু মৃদু রাগ নিয়ে বলল,’হ খালি তো আমারেই পাও। পরী খবর দিছে তাও যাইতে পারলাম না।

চুলায় শাক চড়াইছি। রান্ধা শ্যাষ না হইলে যাইতাম না।’

সম্পান অপেক্ষা করলো বিন্দুর রান্না শেষ হওয়া অবধি। অগত্যা যেতেই হলো বিন্দুকে। এবার বোধহয় পরী তাকে বিলের পানিতে চুবাবে। বিন্দু নৌকায় বসতেই মাঝিরা নৌকা ছাড়লো। নৌকায় বসা সবাই এতক্ষণ বিন্দু ও সম্পানের কথা

শুনছিল। কিন্তু কথাগুলো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। তাই একটি মেয়ে কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞেস করেই বসে,’পরী কে??’

বিন্দু ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো,’আমাগো গেরামের জমিদারের ছোড মাইয়া।’বিশাল ছই বাঁধানো নৌকাটি থামলো গাঁয়ের জমিদার আফতাব

উদ্দিন এর বাড়ির সামনে। গাঁয়ের সব ঘরবাড়ি বন্যায় তলিয়ে গেলেও জমিদার বাড়ির উঠোন ছুতেও পারেনি এই পানি কিন্তু যদি টানা আরো কয়েকদিন বৃষ্টি হয় তবে অনায়েসে এই বাড়ির উঠোনে পানি প্রবেশ করবে তা নিশ্চিত। বলা যায় উঁচু জায়গায় বাড়িটি হওয়ার দরুন বন্যার পানি স্পর্শ করেনি এই

বাড়িটি কে। মোঘল আমলের বাড়িটি। সামনের উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা পেরুলেই ডানে বামে দুটি বড় বড় পাকা ঘর। তারপর আরো একটি দরজা পেরুলেই বড় দোতলা দালানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাড়ির দেয়ালগুলো কেমন নিস্তেজ। রং উঠে গিয়ে কেমন সবুজাভ বর্ণ ধারণ করেছে। আফতাব চাইলে এই

বাড়ি নতুন করে রং করাতে পারে কিন্তু তা তিনি করেন না। কারণ তার পূর্ব পুরুষদের চিহ্ন এই বাড়ি। তাদের ছোঁয়া আছে এই বাড়ির প্রতিটি আনাচে কানাচে। অভিজাত্যের ছোঁয়া তাই এই বাড়িতে তিনি দিতে চাননা। বৃষ্টি বাদলে দেয়াল ভিজে কালচে হয়ে যাচ্ছে তবুও বাড়ির দিকে ফিরেও তাকান

না তিনি। এতে লোকে যা বলার বলুক তাতে তিনি কান দেন না।

নৌকা থেকে বের হয়ে এলো ছয়জন যুবক যুবতী। তাদের ব্যাগ গুলো মাঝিরা বের করছে। ছেলে তিনজন নৌকা থেকে নেমে আসলেও মেয়ে তিনজন আসতে পারলো না। কারণ সামনে কাদায় ভরা। এখানে নামলে নির্ঘাত আছাড় খাবে ওরা। তাই

সম্পান কাঠের তক্তাটা নৌকা থেকে মাটি বরাবর রাখল। সহজেই মেয়েগুলো নেমে পড়লো। সবাই নিজেদের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনে আসতেই অবাক হয়ে দেখতে লাগল বাড়িটি। সত্যিই বাড়িটি অনেক পুরোনো। সদর দরজার সম্মুখে আসতেই দুজন জোয়ান লোক লাঠি হাতে সামনে

দাঁড়ালো। গমগম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,’কারা আপনারা?কি চাই?’নাঈম নামের ছেলেটি লোকটির কথার জবাব দিলো,’আমরা শহর থেকে এসেছি। এই গ্রামের জমিদার এনেছেন আমাদের। বন্যায় অনেক মানুষ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই,’

কথা শেষ করতে পারলো না নাঈম তার আগেই পেছন থেকে সম্পান বলে উঠলো, ‘আরে দাদা ওনারা ডাক্তার। জমিদার বাবু শহর থাইকা আনাইছে।’

আর কথা বলতে হলো না সম্পানকে। লোক দুজন সবাইকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলো। সদর দরজা পেরিয়েই বৈঠকঘরে

আসলো সবাই। তৎক্ষণাৎ একটা মেয়ে দৌড়ে এসে বলল,’খারান বাবু পুরুষ মানুষ ভেতরে যাইতে পারবেন না। আপনেরা এইহানে বহেন আমি বড় মা’রে ডাইকা আনতাছি।’ওদের বসতে দিয়ে মেয়েটা ছুটে ভেতরে চলে গেল। নাঈম ইশারায় সবাইকে বসতে বলে নিজে একটা কাঠের চেয়ার টেনে বসলো। শহর থেকে

ছয়জন এসেছে ওরা। আরো কয়েকজন বড় বড় ডাক্তার আসবে তবে একটু সময় লাগবে। মেডিকেলের স্টুডেন্ট ওরা। নাঈম,আসিফ,শেখর, মিষ্টি,রুমি ও পালক। ওদের টিম প্রতিটি দলে ছয়জন করে ভাগ হয়ে একেক গ্রামে গিয়েছে। দেশের অবস্থা ভালো না। বন্যায় ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম।

সাথে সাথে অসুখ ও বাড়ছে। বিশেষ করে কলেরা,গ্রামের মানুষেরা সতর্ক থাকে না বিধায় এইসব রোগ বেশি হয় তাই ওরা এসেছে সবাইকে সতর্ক করতে এবং চিকিৎসা করতে। অবশ্য সব ধরনের ট্রেনিং করেই এসেছে। তবুও বড় ডাক্তার সামনের সপ্তাহে এসে দেখে যাবেন।

বড়সড় ঘোমটা টেনে বৈঠক ঘরে এলেন মালা। সাথে একটু আগে আসা মেয়েটি ও। মালা নিচু স্বরে বললেন,'কুসুম হেগোরে নাস্তা পানি দে।'সাথে সাথে কুসুম সবাইকে শরবত আর পিঠা দিলো। শরবত খেয়েই সবাই ক্ষ্যান্ত হলো আর খাবে না ওরা। মালা কুসুমকে দিয়ে ছেলেদের বৈঠক ঘরের পাশের ঘরে

থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। আর মেয়েদের নিয়ে ঢুকলেন মহিলা অন্দরমহলে। মালা ওদের নিয়ে পরীর ঘরেই বসালো। তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গেল কাজে।

পরী এখনও আসছে না দেখে চিন্তিত মালা। ঘরে তিনজন নতুন পুরুষ এসেছে না জানি মেয়েটা কোন অবস্থাতে ঘরে এসে ঢোকে।

তাই তিনি আগেভাগেই কুসুমকে পাঠিয়ে দিলেন নৌকা ঘাটে। কুসুম পানিতে পা ডুবিয়ে বসে রইল পরীর অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ পরেই দুইটা নৌকা ভিরল পারে। জুম্মান হাতে এক মুঠো শাপলা নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। লতিফ আর দেলোয়ার বাকি শাপলা নিয়ে ভেতরে ঢুকে

গেল। সবশেষে বের হলো পরী। ওর হাতে একগুচ্ছ শাপলা। শাপলা দিয়ে একটা মালা বানিয়ে গলায় জড়িয়েছে সে। কুসুম দৌড়ে গিয়ে পরীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল,’পরী আপা তাড়াতাড়ি ঘরে চলেন। বড় মা কইছে আপনের ঘরে যাইতে। আর বাইর হওয়া যাইবো না। ঘরে তিনজন নতুন পুরুষ আইছে।

আহেন আমার লগে।’পরী নিজের ঘাগড়া উঁচু করে ঝারছিল। কুসুমের কথায় হাত আপনাআপনি থেমে গেল তার। বুঝতে বাকি রইল না যে এই সেই মেহমান যার কথা সকালেই ওর আম্মা বলেছিলো। পরী বলল,’ক্যান??আম্মা ঘরে ঢুকতে দিলো??’

কুসুম গলা ঝেড়ে বলল,’ক্যান দিবো না। শহরের ডাক্তার তারা। রোগী দেখতে আইছে। থাকতে তো দিবোই।’

কুসুম আর কথা বলতে পারলো না। তার আগেই ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমে এসেছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোটা ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের। জুম্মান আগেই ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরী

আর কুসুম একসাথে দৌড় লাগালো। হাতের শাপলা গুলোর পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগলো মেঝেতে। বৈঠক ঘরের উঠোন পাকা করা। পরীর কর্দমাক্ত পা ফেলার দরুন পায়ের ছাপ সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাথে শাপলার পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। নাঈম নিজের ঘরের বারান্দায় বসে বসে নিজের জুতো

পরিস্কার করছিল। আসার সময় কাদা লেগে গেছে। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দে উঠোনের দিকে তাকালো। দুজন মেয়ে দৌড়ে চলে গেল।তারমধ্যে একজনকে নাঈম চেনে। সে হলো কুসুম এই বাড়ির কাজের মেয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় জনকে সে চিনলো না। ওড়নাটা বোরখার নেকাবের ন্যায় পড়ে আছে বিধায়

মুখটাও দেখতে পারলো না সে। মেঝেতে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতে পরীর পায়ের ছাপ আর শাপলার পাপড়িগুলো দেখতে লাগল। বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সে পায়ের ছাপ। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মুছে গেল। নাঈম বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিজ ঘরে চলে গেল।

বৈঠক ঘর পেরিয়ে মহিলা অন্দরে ঢুকতেই বৃষ্টির তোড় যেন বাড়ালো। বড় উঠোন পেরিয়ে খোলা বারান্দায় আসতে আসতেই ভিজে গেছে পরী। হাতের শাপলা গুলো মেঝেতে রেখে হাত পা ঝাড়লো সে। কুসুম ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গেছে। বাড়িতে মেহমান এসেছে রান্না করতে হবে তো! ভেজা জামাকাপড়

ছাড়বে বলে পরী আবার দৌড় দিলো। ধুপধাপ শব্দ এলো পরীর পায়ের। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল সে। নিজের ঘরে অচেনা গন্ধ পেয়ে। রুমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পালক আর মিষ্টি ব্যাগ খুলে কিছু খোজায় ব্যস্ত। কারো আগমনের আভাসে দু'জনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। পরীকে দেখে

চিনলো না ওরা। পরী নিজ কক্ষে প্রবেশ করতে করতে বলল,'কারা আপনারা আমার ঘরে কি করেন??'ওরা দুজনেই থতমত খেয়ে গেল। কার ঘরে মালা ওদের রেখে গিয়েছে তা ওরা জানে না। যেখানে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে ওরা সেখানেই থাকছে। পরী আরেকটু কাছে এসে দাঁড়িয়ে আবার একই

প্রশ্ন করতেই মিষ্টি জবাব দিলো,'আমরা শহর থেকে এসেছি। এই গ্রামের জমিদারের গিন্নি মানে মালা বেগম আমাদের এই ঘরে থাকতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে পরীর রাগ আসমান ছুঁয়ে গেল। যেখানে নিজের জিনিস পত্রে কারো হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে না সেখানে একই ঘরে এই মেয়েদের

নিয়ে সে থাকবে কিভাবে?সাথে সাথেই পরী গলা ফাটিয়ে মালাকে ডাকতে শুরু করে দিল,’আম্মা,আম্মা, আম্মাজান এট্টু এদিকে আহেন??’

কিন্তু মালার পরিবর্তে ঘরে এসে হাজির হলো আবেরজান বেগম। লাঠিতে ভর দিয়ে এসে তিনি বললেন,’মাইয়া মানুষ এতো গলা

বাজাস ক্যান তোরে না করছি না? এতো চিল্লাস ক্যান বারবার?’

পরী দ্রুত পদে দাদির নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল,’আমারে না জানাইয়া আমার ঘরে অন্য মানুষ ঢুকতে দিলা ক্যান?’

আবেরজান পান চিবুতে চিবুতে বলল,’অহনই তো আইলো ওরা। একটু জিরাইতে দে?তোর মায়ের

মেলা কাম এহন। পরে ওগোরে অন্য ঘরে দিয়া আইবো। তুই ভিইজা গেছস কাপড় বদলা।’লাঠির ভরে চলে গেল আবেরজান। মিষ্টি আর পালক লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলেছে। প্রথম দিনেই এতো বড় অপমান মেনে নিতে পারলো না ওরা। মেয়েটা কিভাবে সামনাসামনি কথাগুলো বলে ফেলল? রুমি

এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল,পরীর চিল্লানোর ফলে ধড়ফড়িয়ে ওঠে সে। পরবর্তী কথাগুলো ওর কানে যেতেই লজ্জাবোধে মাথা নিচু করে ফেলে। এখন ওদের মনে হচ্ছে এই গ্রামে আসাটাই ভুল হয়েছে ওদের।

পরী কথা না বলে সামনে পা বাড়ালো। কাঠের সাথে লাগানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অনেকটা দেখতে ড্রেসিং টেবিলের মতো। তার সামনে কয়েকটা কৌটা আর কতগুলো রং বেরঙের ফিতা। এতক্ষন ধরে মুখে ওড়না বাঁধা থাকলেও এখন সেটা এক টানে খুলে ফেলল পরী। তারপর চুল থেকে ফিতার বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হলো।

মিষ্টি আর পালক চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতে পারলো না। কিন্তু রুমির ধাক্কায় সেদিকে দু'জনে তাকালো। রাগ জড়ানো কণ্ঠে পালক বলল,'কি হয়েছে ধাক্কা দিচ্ছিস কেন?'

রুমি হা করে সামনের দিকে চোখ রেখে বলে উঠলো,'হ্যা রে এটা কি মেয়ে নাকি কোন মোমের পুতুল? একটু কি ছুঁয়ে দেখব?'রুমির কথার

মানে ওঁরা দুজনের বুঝতে পারলো না। রুমির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই ওদের দৃষ্টি স্থির হলো সামনের আয়নাতে। আয়নার প্রতিবিম্বে যেন একটা পরীর আগমন ঘটেছে। পুরো পুতুলের মতোই লাগছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে। গাঁয়ের রং টা উজ্জ্বল ফর্সা। তার উপর পানির ফোঁটাগুলো

চিকচিক করছে। এই প্রথম মেয়ে হয়ে কোন মেয়ের উপর চোখ আটকে গেছে ওদের। ঘোর থেকে কিছুতেই বের হতে পারছে না ওরা। চুল থেকে বেগুনি রঙের ফিতাদুটি খুলে রেখে ওড়না হাতে পিছনে ঘুরতেই তিনজন যুবতীকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরী কপাল কুচকালো। তবে কিছু বলল না।

কাঠের তৈরি আলমারি থেকে নিজের কাপড় বের করে ঘর থেকে বের হতে নিলে পালকের ডাকে থমকে দাঁড়ায় পরী। পালক জিজ্ঞেস করে বসে,’নাম কি তোমার?’

পরী পেছনে না ফিরেই উওর দিলো,’পরী।’অতঃপর ঘরে ছেড়ে বের হয়ে গেল। এবার ওদের কাছে সব পানির মতো পরিস্কার হয়ে

গেল। এই মেয়ের কথাই বিন্দু আর সম্পান বলাবলি করছিল। বিন্দুকে সাথে করে নিয়েই ওরা শাপলা বিলে আসে। কিন্তু তার আগেই লতিফ আর দেলোয়ার ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিছুতেই ওদের এদিক দিয়ে যেতে দিবে না ওরা। সম্পানের অনেক অনুরোধে ও লতিফের মন গলল না। কারণ

জমিদার কন্যা পরীর কড়া হুকুম সে থাকা কালীন শাপলা বিলে কোন পুরুষের আগমন ঘটতে পারবে না। শাপলা বিলে সাঁতার কাটার জন্য কথাটা পরী বলেছিল কিন্তু তবুও তার সাঁতার কাটা হলো না। শেষে বিন্দু পরীর নৌকায় গিয়ে ফিসফিসিয়ে শলা পরামর্শ করে অনুমতি নিলো। তারপর সম্পান

নৌকা নিয়ে অনায়াসে শাপলা বিলে বৈঠা ফেলল। পালক ভেবেছিল জমিদার কন্যা না জানি কেমন হবে? কিন্তু সামনাসামনি দেখল এতো একটা পুঁচকে মেয়ে। বয়স চৌদ্দ কি পনের হবে। এই মেয়ের রূপের যেমন তেজ মেজাজের তেমন ঝাঁঝ। সব মিলিয়ে আগুন বলা যায়।মিষ্টি বড় একটা দম ফেলে বলল,'এটা

মেয়ে নাকি বিছুটি পাতা? এভাবে কেউ কারো সাথে কথা বলে?শহর থেকে এসেছি মেহমান ই তো ওদের। সেজন্য এভাবে কথা বলবে?'

তবে মিষ্টির কথা কেউ কানে তুলল না। রুমি চোখ কচলে বলল,'এতো সুন্দর মেয়ে আমি এই প্রথম দেখলাম।'

‘হবেই তো। দেখলি না এই পরীর মা কত সুন্দর। যৌবন কালে ওই মহিলার ও তার মেয়ের মতো রূপ ছিল। মায়ের মতোই হয়েছে মেয়েটা।’

পালকের কথায় রুমি খাট থেকে নেমে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল,’ছেলে হলে এই মেয়েটাকে এখুনি বিয়ে করে ফেলতাম।’

হাসলো পালক,’তোর মতো সাধারণ মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে জমিদার তার মেয়ের বিয়ে দিতো বুঝি?’

‘জমিদার,রাজকুমার,রাজা হওয়ার একটা সুবিধা আছে জানিস? রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে।’পালক আর রুমির দুষ্টুমি পছন্দ হলো না মিষ্টির। মেয়েটার নাম মিষ্টি কিন্তু কথায় ঝাল

মেশানো থাকে সবসময়। মুল কথা হলো পরীর সৌন্দর্য ওর পছন্দ হয়নি। ওরাও সুন্দর,ফর্সা গায়ের রং কিন্তু পরীর মতো অতো নয়।

দুপুরে খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই একসাথে খেয়ে নিলো কিন্তু খাওয়ার সময় ওরা পরীকে দেখতে পেলো না। ছেলেদের আগে খেতে দেওয়া হলো এবং মেয়েদের পরে। খাওয়া

শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বের হলো ওরা। ঘাটে ওদের জন্য নৌকা বাধাই আছে। ব্যাগপত্র নিয়ে দ্রুত নৌকায় চেপে বসে সবাই। এখন ওরা গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে। সেখানে শতাধিক মানুষ আছে। অর্ধেকের বেশি অসুস্থ। সেখান থেকে ওরা জমিদারের বাগান বাড়িতে যাবে। সেটিও বর্তমানে

আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করেছে আফতাব। নৌকায় বসে পালক আর রুমি ফিসফিস করে কথা বলছে আর হাসছে। ওদের কান্ড দেখে নাঈম জিজ্ঞেস করল,'কি রে তোরা নিজেদের মধ্যে কি বলছিস? আমাদের কেও বল শুনি?'শেখর তাতে তাল মিলিয়ে বলল,'বোধহয়

বিয়ের পর হানিমুন বাচ্চা গাচ্চার প্ল্যান করছে।’

বলতে বলতে হাসলো শেখর। পালক শেখরের বাহুতে ধাক্কা দিয়ে বলল,’জ্বী না মশাই। আমরা জমিদারের মেয়ে পরীর কথা বলছি। জানিস মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর একদম পুতুলের মতো। নাম পরী আর দেখতেও পরীর থেকে কম

নয়। আমি কখনো রাজকন্যা দেখিনি। কিন্তু রাজকন্যারা বোধহয় এই পরীর মতোই দেখতে।’

কৌতূহল হয়ে পালকের কথা শুনতে লাগলো শেখর নাঈম আর আসিফ। তবে পুরোপুরি হয়তো কথাটা বিশ্বাস হলো না ওদের। আসিফ ব্যাঙ্গাত্বক সুরে বলল,’ফাজলামো করছিস?

গ্রামের এরকম নোংরা পরিবেশে এতো সুন্দর মেয়ে!!’

ধমকে উঠলো রুমি,’চুপ থাক। একটা মেয়ে কখনোই আরেকটা মেয়ের রূপের বর্ণনা দেয় না দিতে চায় না। কিন্তু আমি না দিয়েও পারছি না। আসলেই মেয়েটা খুব সুন্দর।’নাঈম ওদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তাহলে তো দেখতে

হচ্ছে মেয়েটাকে। দেখি কেমন সুন্দর?’

‘তা দেখবি কিভাবে? অন্দরমহলে তো পুরুষ ঢুকতে দেওয়া হয় না।’

রুমির দিকে তাকিয়ে কপাল কুচকালো নাঈম। সত্যি তো!! তাহলে কি পরীকে দেখা হবে না?

‘যদি পরী বাইরে আসে তাহলে দেখবো।’

পালক ভেংচি কাটলো নাঈমের দিকে তাকিয়ে বলল,’অতো সোজা না বাবু। ওই মেয়ে বাইরে বের হয় কিভাবে দেখোনি? আজকে শাপলা বিলে তো নৌকায় ওই পরীই ছিলো। বাবা কতো জোর করে আমরা আসতে পারলাম।’

নাঈমের মুখে চিন্তার রেশ দেখা গেলো। পালক আর রুমি যেভাবে

মেয়েটার বর্ণণা দিলো,একবার না দেখা পর্যন্ত ও ক্ষ্যান্ত হবে না। শেখর দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল,’তাহলে আমরা রাতে চুরি করে অন্দর মহলে ঢুকব কি বলিস তোরা?আমি কিন্তু পরীকে না দেখে শহরে ফিরছি না।’শেখরের কথায় সবাই হাসলো শুধু মিষ্টি বাদে। ও ছইয়ের বাইরে বের হয়ে চারপাশ দেখছে। নাঈম

শেখরের কথা ভেবে দেখল মন্দ না। সে বলল,’তাহলে আজ রাতেই মিশনে নেমে পড়া যাক? কি বল?’ এবার আসিফ ও সায় দিল। ও দেখতে চায় কেমন সুন্দর মেয়ে! পালক ওদের কথা শুনে মাথা নেড়ে বলল,’পাগল তোরা সব। ধরা খেলেই বুঝবি। জমিদার মশাই তোদের গর্দান নিবে দেখিস।

আহারে এসেছি ছ'জন যেতে হবে তিনজন।'কথাটা আফসোসের সুরে বলল পালক। নাঈম বলল,'আমারা ধরা খেলে তোদের নাম বলব। তোরাই তো লোভ দেখালি। মেয়েটা এতো সুন্দর!গর্দান গেলে সবার যাবে।'গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় কে আশ্রয় কেন্দ্র বানানো হয়েছে। এখানে সবাই তাদের মালপত্র নিয়ে

কোন এক স্থানে ঘাপটি মেরে থাকছে। গত পাঁচদিনে আফতাব উদ্দিন কিছু কিছু খাবার দিয়েছে সবাইকে তাছাড়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকেও সাহায্য করা হচ্ছে অসহায় মানুষদের। নৌকা থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে নামতেই নাঈম সহ সবাই হা হয়ে সবটা দেখতে লাগলো। এই গ্রামের সবকিছুই অদ্ভুত ধরনের।

এমনকি জমিদার বাড়িটাও। অদ্ভুত ধরনের জিনিসপত্রের ভরপুর বাড়িটি। ওরা যতক্ষণ ওবাড়িতে ছিল ততক্ষণ ধরে শুধু দেখেই যাচ্ছিল। সবাই ওদের দেখেই বুঝতে পারল যে ওরা শহুরে ডাক্তার। গায়ে সাদা রঙের এপ্রোন জড়ানো বিধায় চিনতে সুবিধা হয়েছে। খাটো মোটা করে একজন লোক এগিয়ে এলো ওদের

দিকে। ঘুরে ফিরে সবাইকে একপলক দেখে নিয়ে বলল,’আহেন আপনারা,ওদিক থেকে শুরু করেন।’নাঈম সায় জানিয়ে লোকটার পিছু পিছু গেল। একপাশে কাঠের টেবিল ও চেয়ার পাতা হয়েছে। মিষ্টি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো। এটুকু তেই হাঁপিয়ে গেছে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নাক সিটকে সে বলে

উঠলো,’এই নোংরা জায়গায় থাকতে হবে এখন। আমার তো বাবা বমি আসছে। ইচ্ছা করছে এখুনি ঢাকা ফিরে যাই।’

পালক নিজের চেয়ারটাতে বসতে বসতে বলল,’তা হচ্ছে না কন্যা। স্যার তো বলেই দিয়েছে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। এতে তোর বমি আসলে করে ফেল। তোকেও

রোগি বানিয়ে এখানে ভর্তি করিয়ে দিবো।’

নাঈম স্টেথোস্কোপটা গলায় ঝুলিয়ে ব্যাগ থেকে খাতা কলম বের করতে করতে বলল, ‘তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবি।’শেখর নিজের ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল,’হ্যা আর তাড়াতাড়ি পরীকে দেখতে পারবো।’

রুমি শেখরের মাথায় গাট্টা মেরে বলল,’পরীর চক্করে যেন ভুলভাল চিকিৎসা করিস না তাহলে তুই শেষ।’

ওরা ছয়জন কাজে লেগে পড়লো। লাইন ধরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। নাঈম চেয়ার পেতে বসে আছে আর একেকজনের সমস্যার কথা শুনছে আর ওষুধ লিখছে। শেখর আর

আসিফ ওষুধ দিচ্ছে। আর মেয়েদের চিকিৎসা করছে রুমি মিষ্টি আর পালক। কারণ এখানকার মেয়েরা পুরুষ ডাক্তারদের কাছে আসতে অস্বস্তি বোধ করে তাই এরকম ব্যবস্থা করা। তবে লোকসংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে আজকে রোগি দেখে শেষ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে বিকাল গড়িয়ে এসেছে।

হঠাৎ করেই নাঈমের চোখ গেল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পানের দিকে। কিছু একটা ভেবে নাঈম তার নিজের জায়গায় আসিফকে বসিয়ে উঠে গেল। সম্পানের সামনে গিয়ে দাড়াতেই এক গাল হাসলো সম্পান। বিনিময়ে নাঈম ও মুচকি হাসি উপহার দিলো সম্পানকে। বলে উঠলো,'কি

অবস্থা?? তুমিও কি এখানে থাকো??’

‘না বাবু!! আমার কি একখানে খাড়ানের সময় আছে। নাও নিয়াই পইড়া থাহি। মেলা কাম আমার। পুরা পদ্মাই আমার বুঝছেন।’সম্পানের কথায় হাসলো নাঈম। অদ্ভুত ভাবে সেই হাসি অবলোকন করে সম্পান। শহরের

লোক হওয়ায় অন্যরকম দেখতে নাঈম। চুলগুলো কি সুন্দর!!গায়ের রং ও ফর্সা। পরনের পোশাকআশাক বলে দেয় ছেলেটা বড় ঘরে জন্মেছে। সেখানে সম্পান নিতান্ত চুনোপুঁটি। আয়নায় নিজের চেহারা না দেখলেও প্রতিদিন নদীর পানিতে নিজের চেহারা দেখে সে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল শ্যামলা গায়ের

রং আর পরনের পোশাক তো সবসময় নোংরা থাকে। এভাবে কি তাকে সুন্দর দেখাবে? সুন্দর দেখাতে হলে আগে তাকে সুন্দর পোশাক পড়তে হবে। নাঈমের মতো চুলগুলোর যত্ন করতে হবে। কিন্তু ওসবের ক্ষমতা নেই সম্পানের। পরের নৌকা চালিয়ে যা পায় তাতে তো সংসার ঠিকমতো

চলে না। তার উপর এই সর্বনাশা বন্যা সব শেষ করে দিলো। ঘরবাড়ি সব ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন ওর পরিবারের ঠাঁই হয়েছে নিজের আধভাঙ্গা নৌকা খানিতে। ফুটো দিয়ে পানি ঢুকতেই থাকে অনবরত আর ওর মা পানি ফেলতে ফেলতে হয়রান হয়।

সম্পানকে ভাবতে দেখে নাঈম হাল্কা ধাক্কা দিলো সম্পানকে,'কি ভাবছো??'

সম্পান হেসে বলল,'না কিছু না!'

নাঈম এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কি না!সম্পানকে একপাশে টেনে নিয়ে আস্তে করে বলল,'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস

করব সত্যি সত্যি বলবে?’‘কি কথা??’

খানিকটা ইতস্তত করে নাঈম বলল, ‘জমিদারের মেয়ে পরীর সম্পর্কে বলতে পারবে??’

মুহূর্তেই সম্পানের চেহারায় আধার নেমে এলো। হাসি মুখখানি তে ভয়ের ছাপ দেখা দিলো। সে মাথায় হাত রেখে বলল,’ঠাকুরের দিব্যি বাবু

আমি পরীর কিছুই জানি না। আমারে এইসব জিগাবেন না। আমি কইতে পারুম না।’

কথা শেষ করে সম্পান চলে যেতে চাইলে নাঈম ওর হাত খপ করে ধরে ফেলে। অবাক চোখে তাকিয়ে বলে,’এতো ভয় পাচ্ছো কেন তুমি? কি আছে ওই পরীর মাঝে যে এতো ভয় পাও তুমি? আমাকে নির্ভয়ে

বলতে পারো। আমি কাউকে বলবো না।’

কিন্তু সম্পান বলতে নারাজ। নাঈম অনেক জোরাজুরি করতে লাগলো। শেষে সম্পানকে বলতেই হলো পরীর সম্পর্কে।

‘পরী আমাগো জমিদারের ছোট মাইয়া। আপনারা পরীগো বাড়িতেই গেছেন। পরীর মা বাপে অনেক

শাসন করে ওরে। সবসময় ঘরের ভিতরে বইসা থাকে বাড়ি থেকে বাইর হয় না একটুও।’

মনোযোগ দিয়ে সম্পানের কথাগুলো শুনলো নাঈম তারপর বলল,’কেমন দেখতে পরী? তুমি কি কখনো ওকে দেখেছো?’হাসলো সম্পান। হাত নাড়িয়ে বলল,’আমি ক্যান বাবু এই

গাঁয়ের কোন বেডা মাইনষেও পরীরে দেহে নাই। আমি দেখমু কেমনে?’

‘কারো কাছে শোননি পরী কেমন দেখতে?’

‘হ,বিন্দু কইছিলো পরী নাকি মেলা সুন্দর। এর বেশি তো জানি না।’

সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাঈম বলল,’ব্যাস এটুকুই? এটুকু বলতেই

এতো গলা কাঁপছে তোমার? আমার মনে হয় তুমি সব কথা বলো নি।’

এবার সম্পান আর দাঁড়ালো না। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল ঘাটে। দ্রুতপদে চেপে বসলো নৌকায়। নাঈম শান্ত চাহনিতে সম্পানের চলে যাওয়া দেখলো। নাঈমের মনে হচ্ছে সম্পান কিছু লুকাচ্ছে। কিন্তু কি?? জানতে হবে ওকে। তবে সবার

আগে পরীকে দেখার প্রয়োজন। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের কাজে মন দিলো সে।মাগরিবের আজান পড়েছে ঘন্টাও হয়নি। ওযু করে একসাথে নামাজ আদায় করলেন জেসমিন ও মালা। মোনাজাতে মন ভরে দু'জনে দোয়া করল এই গ্রামের সকল মানুষের জন্য। যে বন্যা দেখা দিয়েছে মনে হচ্ছে

গ্রামকে পুরোপুরি গ্রাস না করা পর্যন্ত থামবে না। জায়নামাজ ভাজ করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে বের হতেই মালা দেখলেন পরী বড়বড় পা ফেলে রান্না ঘরের দিকে এগোচ্ছে। কৌতূহল নিয়ে মালাও এগোলেন সেদিকে। রান্না ঘরে উঁকি দিতেই দেখলেন থালা ভর্তি ভাত নিয়ে খেতে বসেছে পরী। বড়বড় ভাতের

দলা মুখে পুরছে আর কাঁচা মরিচে কামড় বসাচ্ছে। ঝালে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে গেলেও পরী খেয়েই যাচ্ছে। সামনেই জ্বলছে হারিকেন। হলুদ আলোয় পরীর চেহারায় লাল আভা দেখা যাচ্ছে। মালা বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল মেয়েকে। এক পা ভাঁজ করে আরেক পা মেলে দিয়ে মেঝেতে বসে খাচ্ছে পরী।

গায়ের ওড়না অপরাধির ন্যায় পাশে পড়ে আছে। মালা হাজার চেষ্টা করেও পরীকে বোঝাতে পারে না যে সভ্যতা কাকে বলে। কিভাবে চলতে হয়,খেতে হয়,কথা বলতে হয়!এই নিয়ে দুঃখের শেষ নেই মালার। পরীর জন্য শ্বাশুড়ির কাছেও কথা শুনতে হয়। শ্বাশুড়ি পরীর সাথে পেরে ওঠে না বিধায় মালাকেই কথা

শোনায়। এই মেয়েকে নিয়ে মালা আর পারছে না।মালা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেই বলে উঠলো,'এই সাঁঝের বেলা খাইতে বইলি যে?'

মুখ তুলে একবার মা'কে দেখে নিলো পরী তারপর আবার খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দুপুরে কিছু খাই নাই। তাই খিদা লাগছে।'

‘তোরে কতবার কইছি এইরম ভাবে খাইতে বইবি না। ওড়না ঠিক কর তাড়াতাড়ি!’

মায়ের কড়া চাহনিতে পরী ওড়না তুলে গলায় ঝুলায়। তারপর গপাগপ খেতে খেতে বলে, ‘আমার ঘর খালি হইছে নাকি?হেরা গেছে?’

মালা গম্ভীর কণ্ঠে বলে,’হ গেছে। তুই তো থাকতে দিবি না।’

কিছু একটা ভেবে পরীর খাওয়া হঠাৎ থেমে গেল। চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল,'আমার সোনা আপার ঘরে থাকতে দিছেন?'

'তোর সোনা,রুপা আপার ঘরে থাকতে দেই নাই। এহন খা জন্মের মতো। পেট না ভরলে আমারে খা।'

মালা রাগে ফুস ফুস করতে করতে চলে গেলেন। পরী তা দেখে

হাসলো। দরজার দিকে উঁকি দিয়ে মায়ের যাওয়া নিশ্চিত করে গায়ের ওড়নাটা আবার ফেলে দিলো সে। শান্তি মতো বসে খেতে না পারলে পেট ভরে না পরীর।

নাঈমরা ফিরল সন্ধ্যার পর পরই। এসেই যার যার ঘরে চলে গেল। সন্ধ্যা থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। রাতে জোরে বৃষ্টি নামবে বোধহয়।

রুমিদের ঘর আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। পরীর যে মেজাজ তাতে ওদেরও মন সায় দিলো না দ্বিতীয় বার ওই ঘরে পা ফেলার।একটু রাত করেই বাড়িতে ফিরলেন আফতাব উদ্দিন। প্রায় তিনদিন পর বাড়িতে এসেছেন তিনি। সাথে ওনার ছোট ভাই আঁখির উদ্দিন ও এসেছেন। তবে সে অন্দরমহলে ঢুকতে

পারলেন না। কারণ আফতাব ছাড়া অন্দরমহলে কোন পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই প্রথা শুধুমাত্র পরীর জন্য নয়। এটা ছিল পরীর মা মালার জন্য। আফতাব যেদিন মালা কে বিয়ে করে ঘরে তোলেন সেদিনই সবাই মিলে নববধূ দেখার জন্য আসে। মালাকে দেখে সবাই সেদিন হা হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য পুরুষেরা

কুনজর দিয়েছিল মালার উপর। সুন্দরের দিকে সব মানুষের চোখ আটকে যায় কিন্তু সবাই সুন্দর নজরে তাকাতে পারে না কারো কারো নজরে নিকৃষ্টতা মেশানো থাকে। তবে মালার দিকে সর্বপ্রথম নোংরা নজরে দেখে আফতাবেরই ভাই আঁখির। সেটা কয়েকদিনের মাথায় ঠিকই বুঝতে পেরেছিল

আফতাব। সেজন্য মহিলা অন্দরমহলে তিনি ব্যতীত অন্য পুরুষের ঢোকা নিষেধ করে দিয়েছিলেন আফতাব। পরে যখন ওনার তিন মেয়ের দিকে তাকান একই ভাবনা আসে ওনার মাথায়। কেননা মালা একটি নয় তিন তিনটা পরী জন্ম দিয়েছে। ছেলেদের বদ নজর আর মেয়েদের নিরাপত্তার

কথা ভেবেই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আফতাব।যেই মালার জন্য এতকিছু করল আর সেই মালাকে ফেলেই আরেকজনকে বিয়ে করে ঘরে তুলল আফতাব সেটাই বুঝতে পারে না পরী। বেশি ভালোবাসায় মরিচা ধরে নষ্ট করে দেয় সেই ভালোবাসা। এই ভেবেই পরীর মনে আগুন জ্বলে সবসময়। শুধু পরী

কেন এজন্য সোনালী আর রুপালি ও বাবাকে অপছন্দ করে। তবে তা প্রকাশ করে না কেউই।

কাজ শেষে আফতাব আসতেই তার দুই বিবি এগিয়ে গেলেন। জেসমিন হাত মুখ ধোয়ার পানি এগিয়ে দিলেন আর মালা গেলেন খাবার আনতে।

তিমির নিশাকালে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছেয়ে আছে চারিদিকে। বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। গুমোট ভাবটা এতে কাটছে কিছুটা। কিন্তু এই সময়টাতে যেন চারিদিকে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টির তান্ডব যেন বাড়ছে বৈ কমছে না। কালকে সকালে না জানি কতটা পানি বাড়ে?এই জন্য

ঘুম আসছে না মালার। পাশেই জুম্মান বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। আফতাব আজকে জেসমিনের ঘরে ঘুমিয়েছে তাই জুম্মান আজকে বড় মায়ের সাথে ঘুমাচ্ছে। মালা অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করলো। চোখটা সবে লেগে এসেছে অমনি কারো গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়িঘড়ি করে মালা বাইরে এসে

বোঝার চেষ্টা করলো যে কে এমনভাবে চিল্লাচ্ছে। তবে বাইরে এসে বুঝতে পারলো এটা কুসুমের গলা।

নিচ তলার বারান্দায় সে এদিক ওদিক হারিকেন নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর জোরে জোরে বলছে,’কেডা কোথায় আছো গো ঘরে চোর আইছে চোর।’মালা ভীত হয়ে দৌড়ে

এলো নীচ তলায়। ততক্ষণে জেসমিন ও আফতাব বের হয়ে এসেছেন।

কুসুমের গলার স্বরে সবার আগে পালকের ঘুম ভাঙল। রুমি আর মিষ্টি কেও ডেকে তুলল। ঘটনা জানতে ওরা ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ওখান থেকে নীচ তলার উঠোন স্পষ্ট তবে

অন্ধকারে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আফতাব এগিয়ে এসে বললেন,’কি হয়েছে কুসুম?’

কুসুম হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,’কর্তাবাবু ঘরে চোর আইছে গো চোর।’

মালা ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসে বললেন,’কস কি?কি কি চুরি করছে?’

কুসুম হাল্কা হেসে বলল,’পরী আপা থাকতে চুরি করব কেমনে?বেডারে মাইরা ভর্তা বানাইয়া দিছে।’

মালার চোখ কপালে। অন্ধকারের মধ্যে পরীকে খুঁজতে লাগলো মালা। কুসুম ছাতা মালার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,’ওই যে উঠোনে পরী আপা। এতক্ষণে বেডারে বাইন্ধা ফালাইছে।’

বলেই মুখে হাত দিয়ে হাসলো কুসুম। হারিকেন হাতে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে আফতাব আর মালা এগিয়ে গেল উঠোনের কোনে। বড় পেয়ারা গাছের সাথে লোকটার হাত দুটো বাধছিলো পরী। লোকটার পুরো মুখে গামছা পেঁচানো এতে চেহারা দেখা যাচ্ছে না। পরী আর লোকটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। মোঠা

লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো পরী। আফতাবের দিকে তাকিয়ে বলল,’চোর ধরা শ্যাষ আর আপনে অহন আইলেন?যাক গে কাইল ওর বিচার কইরেন। আইজ রাইত ভর এইহানে বৃষ্টিতে ভিজুক।’আফতাব গোমড়া মুখে তাকালেন পরীর দিকে। অনেক কিছুই বলতে চাইছে তিনি কিন্তু রাত বেশি হওয়ায় আর

কথা বাড়ালেন না তিনি। পরীকে ঘরে যেতে বললেন।

উপরে দাঁড়িয়ে সবই শুনলো রুমি মিষ্টি ও পালক। এখন ওরা ভয় পাচ্ছে খুব। যদি নাঈম শেখর বা আসিফের মধ্যে কেউ একজন হয়? ভাবতেই গলা শুকিয়ে এসেছে তিনজনের। পালক ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, ‘কোন চোর ধরেছে পরী?নাঈম

তো বলেছিল আজকে পরীকে দেখতে অন্দরমহলে আসবে। তাহলে ওরা পরীর হাতে ধরা পড়ে গেল?’

রুমি নখ কামড়াতে কামড়াতে বলল,’এই মেয়েটা তো খুব ভয়ানক রে। অন্ধকার ওকে কাবু করতে পারে না বরং অন্ধকার ওকে দেখে কাবু হয়। নাহলে এই অন্ধকারে কি করে একটা মানুষকে মারতে

পারে?’এবার মিষ্টিও ভয় পেল খানিকটা। কোন বিপদ হবে না তো? তখনই পরীকে আসতে দেখা গেল। তবে হারিকেনের আলোয় পরীর হাতের লাঠির মাথায় রক্ত দেখল ওরা। এতে ওদের ভয় আরো বেড়ে গেল। পরী ওদের দিকে তাকিয়ে বলল,’আপনেরা ভয় পাবেন না। পরী থাকতে অন্দরমহলের কোন

মাইয়ার গায়ে কেউ হাত দিতে পারে নাই আর পারবেও না কোনদিন। আপনেরা অহন ঘুমাইতে যান। কাইল বিচার হবে তখন সব দেখতে পারবেন।'

বলেই পরী চলে গেল। কিন্তু ওদের ঘুম কি আদৌ আসবে?বড়সড় একটা চিন্তা ওদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন মতে নাঈমা বা শেখর

যদি হয় তাহলে ওদের মানসম্মান সব শেষ।“তারপর পুত্র সন্তান জন্ম দেন তিনি। শুক্রবার মানে জুমার দিন জন্মেছে তাই ছেলের নাম রাখা হলো জুম্মান। জুম্মান ওর মায়ের মতো কালো হয়নি। আব্বার গায়ের রং পেয়েছে। শ্যামবর্ণ,আমি প্রথমে জুম্মানকে কোলে নিতাম না। রুপাই রাখত বেশি তখন আমি পরীর

দেখাশোনা করতাম। পরীর বয়স পাঁচ বছর হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি পদে পদে আমি পরীকে দেখে অবাক হতাম। ছোট্ট পরী এতটা শক্ত তা কখনোই ভাবিনি আমি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নাকি পোকামাকড় পশু পাখি অনেক ভয় পেতাম আম্মা সবসময় বলত। রুপার ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু পরী

সম্পূর্ণ আলাদা। ওকে কখনো ভয় পেতে দেখিনি।আমাদের রগচটা গরুটার দিকেও সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতো ও। গরুটাও ছুটে আসতো পরীকে গুঁতো মারার জন্য কিন্তু পরী তৎক্ষণাৎ সরে যেতো। দড়িতে টান খেয়ে গরুটা আর এগোতে পারতো না। তখন ভয় পাওয়ার বদলে পরী খিলখিলিয়ে হাসতো। তা দেখে

সেদিন আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। আমারও তখনও সাহস হয়নি ওই গরুর সম্মুখে দাঁড়ানোর। তারপর একদিন পরীকে সাপে কাটলো। তখন ওর বয়স সাত বছর। ওঝা যখন পরীর পা থেকে বিষ নামাচ্ছিল চোখমুখ শক্ত করে বসেছিল পরী। এতটুকু শব্দ ওর মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। চোখদুটো লাল হয়ে

গেছে। পানি পড়ছে চোখ থেকে কিন্তু মুখে শব্দ নেই। অথচ দেলোয়ার কাকার মেয়েকে যখন সাপে কাটলো বিষ নামানোর সময় কি চিৎকার তার। তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর। কিন্তু ওইটুকু বয়সে পরী কিভাবে চুপ করে রইলো?কি ভাবছিস পরী তোকে এসব কথা বলার জন্য খাতাটা দিয়ে

গিয়েছি?নাহ পরী, তোকে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু এতো কথা বলার সময় আমার কাছে নেই তাই টানা একসপ্তাহ ধরে আমার মনের সব কথা এই খাতায় বন্দি করেছি। তুই বড্ড কঠিন মানুষ পরী। তোর মনে আমরা দুই বোন ও আম্মার জন্যই ভালোবাসা আছে। এছাড়া বাকি সবাইকে তুই ঘৃণা

করিস আমি তা বেশ বুঝতে পারতাম। সাত বছর বয়সে আব্বার জন্য যে ঘৃণা দেখেছি সে ঘৃণা আমিও আব্বাকে করতে পারি নাই। জানি না জুম্মানকে তুই আদৌ ভালোবাসিস কি না? তবে ছোট্ট ছেলেটাকে একটু ভালোবাসা দিস। ভালোবাসা ছাড়া কেউ কখনো বাঁচে না পরী। যেদিন তুই ভালোবাসতে

শিখবি সেদিন ই বুঝবি। তবে আজকে তোকে এক বিশেষ মানুষের কথা বলব। যার কথা শুনে তোর ইচ্ছা করবে ইশ তোর জীবনে যদি এরকম কেউ আসতো তাহলে মন্দ হতো না। অবশ্য তাকে এতদিন তুই চিনে ফেলেছিস, কিন্তু দেখেছিস কি না জানি না!সে হলো রাখাল। নামটা রাখাল হলেও সে রাখাল ছিলো না।

সে শুধুই আমার রাখাল, একান্তই আমার। স্কুলে পড়াকালীন বইতে কবিতা পড়তাম ‘রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা’ কিন্তু আমার রাখাল বাশি বাজাতে পারতো না,গরু ছাগল ও চড়াতো না। কিন্তু তবুও সে রাখাল, আমাদের গ্রামের রাখাল রাজা,,,,,,,,”তবে পরের টুকু আর পড়া হলো না পরীর। তার আগেই

কোন একটা শব্দে সেদিকে তাকালো সে। এখন রাত অনেক, শুধু বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। তবে পরী বেশ বুঝতে পারছে যে অন্দরমহলে কোন নতুন পুরুষের আগমন ঘটেছে। এবিষয়ে বরাবরই পরী সচেতন। ভেতরে কোন নতুন মানব আসামাত্রই পরী তা টের পেয়ে যায়। খাতাটা বন্ধ করে হারিকেনের

আঁচ কমিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। পালঙ্কের পেছন থেকে মোটা লম্বা লাঠিটা বের করলো। এই লাঠি দিয়েই ছোটবেলায় সে চর্চা করতো। এখনও করে,বলতে গেলে লাঠি চালনায় খুব পারদর্শী পরী। সময় পেলেই লাঠালাঠি শুরু করে দেয় সে। অন্ধকার থাকায় মুখটা ঢাকতে হলো না পরীর। কারণ সে জানে

এই মুহূর্তে ঘরে চোর ঢুকেছে এবং চোর অন্ধকারেই চুরি করে। পরী তাই লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লো। প্রথমেই গেল রান্নাঘরে,সেখানে গিয়ে সে চুপিচুপি কুসুমকে ডেকে তুলল। তারপর একটা গামছা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারে লাঠি চালিয়ে রক্তাক্ত করে দিলো চোরকে। পুরো মুখে গামছা

জড়িয়ে দিয়ে উঠোনের কোনের পেয়ারা গাছের সাথে বেঁধে দিলো। ঘটনাটা কেমন যেনো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও যেন শীত লাগছে না পরীর। শরীর আরো গরম হয়ে আসছে। সেটা কি রাগে!! বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে পোশাক বদলে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সকাল হতেই সারা গায়ে ঢোল পড়ে গেল। কাল রাতে জমিদার বাড়িতে চোর এসেছিল। এবং পরীই চোরকে ধরে ফেলে। আর আজকেই চোরের বিচার হবে। এই গুঞ্জনে কেউই ঘরে থাকতে পারলো না। নৌকা আর ভেলায় চড়ে সোজা জমিদার বাড়িতে হাজির হলো। সবার আগ্রহ চোরের বিচার দেখা। সবাই ভাবছে চোরের

এতো সাহস হলো কিভাবে যে জমিদারের বাড়িতে হানা দেয়।

সারারাত ঘুমাতে না পেরে মাথা ব্যথা হয়েছে পালকের। মিষ্টি আর রুমির ও একই অবস্থা। বাইরে লোকজনের আওয়াজ পেতেই ওরা বুঝলো যে বিচার আরম্ভ হতে চলেছে তাই ওরা ঘর ছেড়ে বের হলো। একটু এগোতেই মুখোমুখি

হলো আবেরজানের। তিনি বললেন,'কই যাও তোমরা বিচার দেখতে?'

রুমি মাথা নাড়িয়ে হ্যা বলতেই তিনি বাজখাঁই গলায় বললেন,'বেডাগো সামনে যাও তো মাথায় কাপড় কই? মাথায় কাপড় দেও তাড়াতাড়ি।'কোনরকমে তিনজন মাথায় কাপড় টেনে অন্দরমহল

থেকে বের হয়ে গেল। বাইরে এসে দেখলো অনেক মানুষ সেখানে। একপাশে মহিলারা আরেকপাশে পুরুষ। পালক ভিড়ের মধ্যে নাঈমকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু অতো মানুষদের মধ্যে খোঁজা কি সম্ভব?এর মধ্যেই আফতাব উদ্দিন এসে চেয়ারে বসলেন সাথে আঁখির ও। এছাড়া গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি ও

আছেন। চোরকে টেনে আনলো দুজন লোক। গামছা টা সরিয়ে মুখ দেখাতেই সবাই অবাক হয়ে গেছে। এ তো উত্তর পাড়ার কানাই। ওর এতো বড় সাহস হলো কিভাবে?

আফতাব উদ্দিন গোমড়া মুখে কানাইকে জিজ্ঞেস করল,'তুই আমার বাড়িতে চুরি করতে এলি কোন সাহসে। তাও আবার অন্দরমহলে

ঢুকেছিস।’কানাই কোন জবাব দিলো না। রাতভর বৃষ্টিতে ভেজায় এখন জ্বরে কাঁপছে। মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না। এরই মধ্যে আঁখির বলে উঠলো,’যাই হোক চুরি করেছে যখন শাস্তি পেতেই হবে। গ্রামের সবাই আমার ভাইকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে আর কানাই যা করেছে তা অন্যায়। এতে আমাদের জমিদারি

কে অপমান করেছে সে। তাই ওর কঠিন থেকে কঠিনতর সাজা হওয়া উচিত। বাকিটা গ্রামের মুরুব্বিরাই ভালো বুঝবেন।’

বলেই সবার দিকে দৃষ্টি মেলল আঁখির। পালক মিষ্টি আর রুমি যেন প্রাণ ফিরে পেলো। নাঈমরা তাহলে নিরাপদ। কিন্তু ওরা এখন কোথায়? পালক দৌড়ে ভেতরে চলে এলো।

ওর পিছু পিছু মিষ্টি রুমিও এলো। বৈঠকঘর পেরিয়ে ঢুকলো নাঈমের ঘরে। ওরা রেডি হচ্ছিল। পালক গিয়েই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো,'তোরা এখানে বাইরে কি হচ্ছে জানিস কিছু?'নাঈম জুতার ফিতা বাধছিলো। পালকের কথায় এক পলক সেদিকে তাকিয়ে আবার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বলল,'শুনলাম চোর ধরা পড়েছে

তাই আর বের হইনি। ভেবেছি একসাথে রেডি হয়ে বের হবো।’

রুমি পালককে ঠেলে ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল,’চোরটা কে ধরেছে জানিস পরী!’

পরীর নামটা শুনেই চমকে তাকালো নাঈম। শেখর শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে এগিয়ে এসে বলল,’পরী ধরেছে!!সর সর সর

গিয়ে দেখি কেমন চোর ধরেছে আমাদের পরী!’

মিষ্টি শেখরের কলার চেপে ধরে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে,’ছাগল কোথাকার আমরা কত ভয় পেয়েছি জানিস? ভেবেছিলাম তোরাই বুঝি ধরা খেলি।’

শেখর কলার ছাড়িয়ে শার্ট ঠিক করতে করতে বলল,’রাতে যে বৃষ্টি

হয়েছে বের হতাম কিভাবে?ঘুম পেয়ে গেলো তো তাড়াতাড়ি।’নাঈম উঠে সোজা বাইরে চলে গেছে। বাকি সবাই বিচারে গিয়ে উপস্থিত হলো।

পরী এখনো ঘুমে আচ্ছন্ন। রাতে ভেজার দরুন ওর গায়েও জ্বর নেমেছে। তাই তো ভোরের স্নিগ্ধ রশ্নি আখিপল্লবে পড়তেই কাথাটা দিয়ে মুখটা ঢেকে নেয়। এবং আবার

ঘুমিয়ে পরে। কিন্তু এই ঘুমটা আর ধরে রাখতে পারলো না পরী। কুসুম আর জুম্মান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে পরীর ঘরে ঢুকলো। ডেকে তুলল পরীকে, প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে জুম্মানের কথায় অবাক চাহনিতে তাকালো পরী। জুম্মান বলেছে,'পরী আপা আব্বা কইছে কানাই কাকার হাত কাইটা ফালাইতে। চুরির সাজা নাকি

এইডাই ভালো।’পরী ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেছে। একটানে গায়ের কাথাটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আলমারি খুলে নিজের বোরখাটা গায়ে জড়িয়ে নিল। নেকাবটা আটকে দিলো। চোখ দুটো ও খোলা রাখলো না। পাতলা কাপড়ে ঢেকে দিলো রক্তিম চোখদুটো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

অন্দরমহল থেকে বের হয়ে যেই না বৈঠক ঘর পেরুতে যাবে তখনই বাঁধ সাধে মালা। মেয়ের হাত টেনে ধরে বলে,’কই যাস?’

কম্পিত কণ্ঠে পরী বলে উঠলো,’আম্মা কানাই কাকার হাত কাটবো আব্বায়?’

মালা মাথাটা হালকা নিচু করে জবাব দিলো, ‘হ!’

পরী জোর গলায় বলে,’আব্বা অন্যায় করতাছে আম্মা। আমারে যাইতে হইবো। আমার হাত ছাড়েন।’

পরীর কথায় হাতটা আরো শক্ত করে ধরলেন মালা,’তুই যাবি না পরী। মনে আছে আমারে কি কথা দিছোস তুই?’

‘মনে আছে আম্মা। আপনেরে কথা দিছি আমার এই মুখ কোন পুরুষরে

দেখামু না। তার লাইগাই বোরখা পরছি। অহন হাত ছাড়েন আম্মা।’ কিন্তু মালা ছাড়লো না। সে মেয়েকে এতো লোকের সামনে যেতে দেবে না কিছুতেই। জোড়াজুড়ির এক পর্যায়ে জেসমিন এসে মালার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো,’পরীরে যাইতে দেন আপা। কিচ্ছু হইবো না। একটা মানুষের প্রাণ বাঁচবে।’অতঃপর

জেসমিন মাথা দুলিয়ে পরীকে যেতে বলল। এই প্রথম পরী কৃতজ্ঞতার সহিত তাকালো জেসমিনের দিকে তারপর ছুটে গেল বিচার সভায়। এদিক ওদিক না তাকিয়ে পরী এক দৌড়ে গিয়ে আফতাবের পাশে দাঁড়ালো। মেয়েকে এমন সময় কল্পনাও করেনি আফতাব। আড়চোখে সামনে বসা মুরব্বিদের

দিকে তাকিয়ে নিজের মেয়েকে বললেন,'তুমি এখানে?ঘরে যাও।'

পরী অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠ বলে,'এখানে অন্যায় হইতাছে আব্বা। আর যেইহানে অন্যায় হয় সেইহানে আমি থাকি তা আপনে জানেন।'

আফতাব উওর দিলেন না তবে আঁখির বলল, 'কি অন্যায় পরী?তুই

জানস না যে কানাই চুরি করছে?এই বিচার ই ঠিক হবে তুই ঘরে যা।’

ঘৃণা দৃষ্টিতে আঁখিরের দিকে তাকালো পরী কিন্তু চোখদুটো নেকাবের আড়ালে থাকায় তা আঁখির দেখতে পেলো না।

‘আব্বা কানাই কাকা চোর হইছে তো আপনাগো কারণেই। একবার ভাইবা দেখেন। বন্যায় সব ভাইসা

গেছে কাকার। অহন পোলাপাইন লইয়া কেমনে থাকব কাকায়? আপনারা যদি সাহায্য করতেন তাইলে তো কাকায় চুরি করতে আইতো না।’পরীর কথায় চুপ করে রইলো আফতাব সহ সব মুরুব্বিরা। কথাটা পরী ঠিকই বলছে। এই বন্যায় তো কারোরই কাজ নেই। ভরসা করার মতো তো ওদের

একজনই আছে সেটা হলো আফতাব। আফতাবের উচিত ছিল গ্রামের সবার খেয়াল রাখার। পরী আবার বলতে লাগলো,’পেটের খুদা কখনো ধর্ম মানে না। খুদা এমন একটা জিনিস যা সব ধর্মেই হার মানে। খুদার জ্বালা বড় জ্বালা তা একটু বুঝেন! কানাই কাকার হাত না কাইটা তারে একটা কাম দেন।

ওই হাত দিয়া খাইটা খাইবো উনি। ওনার হাত কাটলে বউ পোলাপান গো কি খাওয়াবো?হেয় তো মরবোই তার সাথে বউ পোলাপান ও মরব। কাকা চুরি কইরা অপরাধ করছে। তার সাজা সে রাতভর পাইছে। অহন তার হাত কাইটা আপনারা অন্যায় কইরেন না। এমন ও তো

হইতে পারে কাকার হাত দুইটাই আপনাগো একদিন কাজে লাগবো।’ কথাগুলো শেষ করেই পরী পা বাড়ায় অন্দরমহলে। তবে এতটুকু সময়ে বলা কথাগুলো শুনে সভার সবাই চুপ করে গেল। আফতাব ও কিছু বলল না। বিচারের বাকি কাজ তিনি মুরুব্বিদের হাতেই ছেড়ে দিলেন। কেউ কোন কথা বলতেছে

না দেখে গ্রামের সবচেয়ে বেশি বয়স্ক যিনি সে বলে উঠলো, ‘পরী তো হক কথাই কইছে। কানাইয়ের বউ পোলাপাইন গো কথাও তো ভাবতে হইবো।’তারপর তিনি আফতাবের দিকে তাকিয়ে বললেন,’তুমি কি কও আফতাব? কানাইরে কি করবা?’

আফতাব মাথা নিচু করে বলল,'আপনেরা যা ভালো বুঝেন তাইই করেন। কথা তো সব পরী বলেই দিছে।'

তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কানাইকে কাজ দেওয়া হলো সম্পানের সাথে। যাতে কটা টাকা রোজগার করে চলতে পারে। পেটের দায়ে সে এসেছিল জমিদার বাড়িতে

চুরি করতে। কারণ এই গাঁয়ে ধনী বলতে আফতাব। আরো কয়েকজন আছে তবে এই মুহূর্তে তাদের ঘরবাড়ি ও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে আছে। তাই সে জমিদার বাড়িতেই এসেছে চুরি করতে। কিন্তু কপাল খারাপ যে পরীর হাতেই ধরা পড়লো। যখন ওর হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন সে

হাউমাউ করে কেঁদেছিলো। বারবার ক্ষমা চেয়েছিল,তার হাত যেন না কাটা হয়। কিন্তু কেউ শোনেনি। এখন কানাই পরীর প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো কোন এক সময় পরীকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।

নাঈমের চোখদুটো খুশিতে চকচক করছে পরীকে দেখে। এতক্ষণ ধরে

মেয়েটার মধুর বানি শুনছিল সে। গলার স্বর টা সত্যি খুব সুন্দর। এখনও কানে বাজতেছে। কথা শুনে এখন পরীকে দেখার ইচ্ছা আরো প্রবল হচ্ছে। তবে পরীর কথাগুলো বেশি মুগ্ধ করেছে ওদের। শেখর নাঈমের কাঁধে হাত রেখে বলল,’এই মেয়েকে দেখা অতো সহজ হবে না নাঈম। আশা দেখছি এখানেই

ছাড়তে হবে। নাহলে আশার জালে আমরাই পেচাবো।’ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে নাঈম বলল,’উহু এখন মেয়েটাকে দেখার ইচ্ছা আরো গভীর হলো।’

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না গিয়ে আজকে ওরা জমিদারের বাগান বাড়িতে গেলো। সেখানেও অনেক মানুষের উপস্থিতি। তবে বেশ কয়েকজন

একটু বেশি অসুস্থ তাই তাদের স্থানীয় একটা হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল ওরা। এরইমধ্যে আরেকটা নৌকা এসে পাড়ে ভিড়লো। সেখান থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসলো। তারা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে এগিয়ে গেলো নাঈমের কাছে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে

নাঈম কিঞ্চিৎ হেসেই এগিয়ে গেলো। লোকটা সবিনয়ে হাত মিলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। বিপরীত দিক থেকে নাঈম ও হাত বাড়িয়ে দিলো এবং

বলল,'সেদিন আপনার নামটা জানা হয়নি আর নিজেরটাও বলা হয়নি। ব্যস্ততা দুজনেরই ছিল। যাই হোক,আমি নাঈম

আহমেদ।’বিপরীতমুখে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটাও হেসে জবাব দিল,’শায়ের।’

নামটা শুনে নাঈমের চোখ দুটো হালকা ছোট হয়ে এলো বলল,’শুধুই শায়ের?’

লোকটা আবারও হাসলো। অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো,’সেহরান শায়ের। আশাকরি এবার বুঝতে পেরেছেন।’মেঘাবৃত

সূর্যটা যেন কিছুতেই বের হওয়ার চেষ্টা করে না। সারাক্ষণ ওই মিশকালো মেঘের আড়ালে থাকে সে। একটু দেখা দিলে কি এমন ক্ষতি হয় তার?উল্টে দেখা না দিয়েই কত মানুষের ক্ষতি করে দিলো। এইসব ভাবনা আপন মনে ভেবে চলছে পরী। জানালার ধারে জলচৌকি পেতে বাইরের দৃশ্য

আপন মনে দেখছে পরী। হাতের উপর হাত রেখে তার উপর মাথা দিয়ে স্থিরচিত্তে দেখে যাচ্ছে আজকের মেঘমালা। এই গোমড়া মেঘের উপর একরাশ ঘৃণা এসে জন্মায় পরীর। তখনই মনে পড়লো সোনালীর বলা কথাগুলো। সত্যিই কি পরী সবাইকে শুধু ঘৃণা করে? ভালোবাসে না কাউকে? তাহলে

আজকে কেন কানাইকে বাঁচালো সে?সেটা কি ভালোবাসা নয়?তাহলে কি সেটা?মায়া!!হ্যা মায়াই হবে হয়তো। সোনালী এতো কঠোর বলে গেল কেন পরীকে? সোনালী যখন চলে যায় তখন পরীর বয়স তো মাত্র সাত ছিল। অতটুকু বয়সে পরীর মধ্যে কি এমন দেখেছিল সোনালী?সব প্রশ্নের উত্তর ওই

খাতাটায় পাবে সে। কিন্তু এখন আর পড়তে ইচ্ছে করছে না পরীর। কানাইয়ের জন্য খুব খারাপ লাগছে। যদিও কানাইকে সাজা দেওয়া হয়নি তবুও ভালো লাগছে না পরীর। বারবার সোনালীর কথাই মাথায় আসছে।

আফতাবের বড় মেয়ে সোনালী। যেদিন সোনালীর জন্ম হয় সেদিন

পুরো জমিদার বাড়ি খুশিতে মেতে উঠেছিল। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে সোনাকন্যা। দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি গাঁয়ের গড়ন। তাই এই সোনাকন্যার নাম রাখা হয় সোনালী। প্রথম মেয়ে বলে সবাই আহ্লাদী করে রাখতো সোনালীকে। বাড়ির বড় মেয়ে বলে কোন শখ অপূর্ণ রাখেনি সোনালীর। সবসময়

সবার কোলে কোলেই থাকতো। বড় হওয়ার পর সবার প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠে সোনালী। পদ্মআঁখি, প্রিয়ংবদা, প্রাণচঞ্চল যেন এই মেয়েটিকেই বলা যায়। সবসময় হাসিখুশি আর সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতো সে। গ্রামেরই একটা স্কুলে পড়তো। সব শিক্ষকদের পছন্দের তালিকায় সোনালী সবসময়ের জন্য জায়গা

করে নেয়। কিন্তু এই চঞ্চল মেয়েটার মুখে গাম্ভীর্য এনে দেয় সময়। সে যেন সোনালীর এই খুশিকে মানতে পারেনি। হিংসার তাড়নায় সে মেয়েটির মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিলো।সোনালীর পাঁচবছর বয়সে মালা জন্ম দেন রুপালীর। তখন থেকেই জমিদার বাড়িতে কেমন গুমোট ভাব নেমে

আসে। সবাই ভেবেছিল ছেলে হবে কিন্তু মালা মেয়ের জন্ম দিয়েছেন। আবেরজান এতে ক্ষুব্ধ হলেন সাথে আফতাবও। একটা পুত্র সন্তানের জন্য শেষ করে দিলেন মালার প্রতি তার ভালোবাসা। মায়ের প্রতি অবহেলা দেখে সোনালীর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠলো। বাবাকে আস্তে আস্তে ঘৃণা করতে শুরু করলো।

তবে সেই ঘৃণা কখনোই আফতাবের সামনে প্রকাশ করতো না সে। নিরবে নিভৃতে চোখের পানি ফেলতো। ভাবতো নিজে অভিশাপ দিতে পারেনি তো কি হয়েছে ওর চোখের পানি তো অভিশাপ হয়ে দাড়াতেই পারে। পরীর জন্ম যেন সবার কাল হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে একটা ছেলেই জন্ম দিতে পারেনি

মালা যেখানে রূপবতী মেয়ের জন্ম দিয়ে কি হবে?রূপ যেন অভিশাপ এনে দিয়েছে মালা ও তার মেয়েদের জীবনে।মেঘের গর্জনে পরীর ধ্যান ভেঙ্গে দেয়। ঝড়ো হাওয়া বইছে বাইরে। বাতাসে মেঝেতে লুটানো ঘাগড়াটা দুলছে। সামনের কোড়ানো চুলগুলো ও বাতাসের সাথে মেতে উঠেছে যেন। শীত লাগছে পরীর।

জ্বরটা এখনও কমেনি। তবে এই জ্বর কখনোই কাবু করতে পারেনি পরীকে। আজকেও তার ব্যতীক্রম হলো না। তবে জলচৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরের সব জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলো। হঠাৎই তার একটা কথা মনে পড়ল। মালা বলেছিলেন সোনালী নাকি শহরে চলে গেছে। সেখানেই

রাখালের সঙ্গে থাকে সে। আর ওই মেয়ে ডাক্তার গুলোও তো শহর থেকেই এসেছে। যদি ওরা সোনালীর কোন খোঁজ দিতে পারে? এসব ভেবে দ্রুত জানালা বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পরী। এক প্রকার ছুটেই চলে এলো মেহমানদের ঘরের দরজায়। কিন্তু ভেতরে যেতে ওর শরীর কাঁপছে।

জ্বরে নয়, একটু অস্বস্তি লাগছে ওর। যদি ওরা সোনালীর খবর দিতে না পারে!পরী আস্তে করে দরজায় হাত রাখতেই ঝণাৎ করে দরজা খুলে গেল।

দরজা খোলার শব্দে পালক পেছনে ঘুরে তাকিয়ে পরীকে দেখে অনেক অবাক হলো। রুমি আর মিষ্টি ঘুমাচ্ছে। পালক ও ঘুমানোর প্রস্তুতি

নিতে যাচ্ছিল। বাগান বাড়ি থেকে ওরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। কারণ আকাশের অবস্থা ভালো না,ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ওরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। দুপুরের খাবার খেয়ে একটু আগেই ঘরে এসেছে। রুমি মিষ্টি ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়েছে।পরী এগিয়ে এসে পালকের সামনে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে

ঘাম ছুটে গেছে পরীর। এমতাবস্থায় পরীকে দেখে পালক জিজ্ঞেস করে,’কোন সমস্যা পরী? মানে তুমি কিছু বলতে চাও?’

প্রশ্নটা ঝংকার তুলে দিলো পরীর সারা শরীরে। কথা বলতে ওর ঠোঁট কাঁপছে। আচ্ছা সোনালীর সম্পর্কে কি কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? কিন্তু সোনালীর জন্য বুকটা খুব

জ্বালা করে পরীর। তাই সে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল,’আপনেরা তো শহর থাইকা আইছেন?’

পালক পরীর অবস্থা দেখে এগিয়ে এলো। সামনের জলচৌকিতে বসে ইশারায় পরীকে বসতে বলে। দুহাতে নিজের ঘাগড়া খামচে ধরে এগিয়ে গিয়ে বসে পরী। পালক

মুচকি হেসে বলল,’হ্যা আমরা শহর থেকেই এসেছি।’

পালকের সুন্দর আচরণে পরী যেন সাহস পেল। সে চট করেই বলে উঠলো,’আপনেরা কি আমার সোনা আপার খবর আইনা দিতে পারবেন?’

কথাটা পালক বুঝলো না তাই পরীর প্রশ্নের বিপরীতে সে প্রশ্ন

করে,’সোনা আপা কে? চিনলাম না সব গুছিয়ে বলো তাহলে বুঝতে পারবো।’‘আমার বড় আপা,সোনা আপা। শহরে থাকে, আর আপনেরাও তো শহর থাইকাই আইছেন। আমার সোনা আপার একটু খবর আইনা দিবেন খুব ভালো হয় তাইলে। কতদিন আপারে দেখি না।’

পরীর মায়াবতী মুখখানি দেখে পালকের কষ্ট হলো। এই মুখটা দেখলে বোধহয় পুরুষ কেন কোন নারীও পরীকে ফেরাতে পারবে না। টসটসে জলে ভরা চোখদুটো সবাইকে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র।

‘তোমার আপা শহরে থাকে বুঝলাম। কিন্তু বাড়িতে আসে না? তোমার বাবাকে বললেই তো পারো।

তোমাকে শহরে নিয়ে যাবে তখন তুমি তোমার আপাকে দেখতে পারবে।’

পালকের কথায় পরী ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে, ‘নাহ আব্বা আমারে কোনদিনই শহরে নিয়া যাইবো না। আপার কথা কইলে তো নিবোই না।’

‘কেন?কি এমন করেছে তোমার আপা?’দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরী। নিচের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো,’আপা আমাগো গেরামের একটা পোলারে ভালোবাসতো অনেক। কিন্তু আমার আব্বা মাইনা নেয় নাই তার লাইগা আমার আপা হ্যারে নিয়া শহরে চইলা গেছে। আর আহে নাই। আব্বায় কইয়া দিছে এই বাড়িতে

যেন আমার সোনা আপার নাম কেউ না নেয়। আম্মা অনেক কান্দে আপার লাইগা। তাই আমি একবার আপার লগে দেহা করতে চাই।'

পরীর কথার মাঝে একরাশ কষ্ট দেখতে পেলো পালক। মেয়েটাকে প্রথম দেখে বদমেজাজি ভাবলেও এখন সে বেশ বুঝতে পারছে যে পরীর কঠোরতার পেছনে রয়েছে

এক সাগর কোমলতা। ঠিক নারকেলের মতো। উপরের শক্ত খোসা যে ভাঙতে পারবে একমাত্র সেই পারবে কোমলতা স্পর্শ করতে। পালক এবার বুঝতে পারছে যে এই বাড়ির বড় মেয়ের সাথে কারো কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মেজ মেয়ে??সে কোথায় এখন? উওর জানতে তাই সে জিজ্ঞেস

করে, ‘আর তোমার মেজ বোন এখন কোথায়?’পরী মাথা নিচু রেখেই জবাব দিলো,’রুপা আপার বিয়া হইয়া গেছে।’

‘বুঝলাম কিন্তু পরী শহরটা তো তোমাদের গ্রামের মতো ছোট না যে খুঁজলেই তোমার আপাকে পেয়ে যাবো। তাছাড়া তোমার আপাকে তো আমি কখনো দেখিনি। আর আমি

মেয়ে হয়ে কিভাবে তোমার আপাকে খুঁজবো? এভাবে খোঁজা তো সম্ভব নয় তবে চেষ্টা করে দেখবো।’

মনটা খারাপ হয়ে গেল পরীর। এটার ভয়ই পাচ্ছিল সে। হয়তো ওরা কেউই সোনালীর খবর দিতে পারবে না। গোমড়া মুখেই পরী বলল,’তাইলে কি কোনদিন আপার খোঁজ পামু না?’

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো পরী। ছোট ছোট পা ফেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্থির নয়নে তা দেখলো পালক। আজকে পরীর আচরণে বেশ অবাক হয়েছে পরী। দু'দিন আগেই তো ওদের থাকা নিয়ে কত কথা শুনালো আর আজকে এভাবে মিশে গেল। তবে পরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে বেশ ভালই

লাগল পালকের। মেয়েটা সুন্দর তবে কথাগুলো যেন আরো বেশি সুন্দর।বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে যেন ঝড়টা আরো বাড়লো। আফতাব আজকে বোধহয় বাড়িতে ফিরতে পারবে না। এই ঝড়ের মধ্যে কোন মাঝিই নৌকা চালাবে না। পুরো জমিদার বাড়িতে অচেনা তিন পুরুষ ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই।

নাঈম বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে আপন মনে। ঝড়ো হাওয়া গায়ে লাগছে শীতও করছে কিন্তু ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। উল্টে হাত বাড়িয়ে সে বৃষ্টির পানি ছুঁয়ে দেখছে। সকালের কথা ভাবছে নাঈম এখন। অল্প সময়ের ব্যবধানে কত কথাই বলে গেল পরী। অথচ ওই সময়টুকু বারবার চোখের

সামনে ভেসে উঠছে। পরীকে এক পলক দেখার ইচ্ছা যেন বাড়ছে নাঈমের। আজকে রাতে কি তাহলে ও ঘুমাতে পারবে?নাকি পরীকে দেখতে যাবে?নাঈম স্থির করলো আজকে যেভাবেই হোক অন্দরে সে ঢুকবেই। তার উপর আজকে কেউই নেই বাড়িতে।

আসিফ এসে নাঈমকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল,'এই ঠান্ডায় এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তুই?চল ভেতরে?'নাঈম দৃষ্টি বৃষ্টিতে স্থির রেখে বলল,'আজকে পরীকে দেখতে যাব।'

'এই ঝড়ের মধ্যে?পাগল হয়ে গেছিস তুই। সকালে কি হলো দেখলি না। পরী যেমন মেয়ে তোকে

বেঁধে ফেলবে আমি নিশ্চিত। এরকম করিস না। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিস না। চল ঘরে।’

কিন্তু নাঈম তা মানলো না। সে পরীকে দেখবেই দেখবে। এ নিয়ে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করল আসিফ আর নাঈম। আসিফ ভয় পেতে লাগলো আর নাঈম ওকে সাহস দিতে লাগল। কিন্তু ভাগ্য যেন

ওদের সহায় হলো না। তখনই সদর দরজা খোলার শব্দ এলো। অন্ধকারে একটা অবয়ব দেখতে পেলো দু'জনেই। তবে বুঝতে পারলো না সে কে?তাই ওরা পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো আগন্তুকের দিকে। বারান্দায় হারিকেন জ্বলছিল বিধায় আগন্তুক সেদিকেই আগে গেলো। সাথে সাথে ব্যক্তির মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

অস্ফুটস্বরে নাঈম বলে উঠলো, 'আপনি!!'ঠোঁটের কোণে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটে উঠল শায়েরের। বৃষ্টিতে ভিজে সে একাকার, হাসি মাখা ঠোঁট দুটো কাঁপছে তার। পরনের সাদা পাঞ্জাবি ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে। নাঈম অবাক হয়ে বলল,'এই বৃষ্টিতে ভিজে এলেন কেন আপনি? এই সময় ভেজা ভালো না জ্বর

আসতে পারে। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি বদলে ফেলুন।’শায়ের নাঈমের ঘরের মুখোমুখি ঘরটাতে প্রবেশ করে। পাঞ্জাবি খুলে আরেকটা পাঞ্জাবি পড়ে নেয়। দড়িতে ঝোলানো গামছাটা নিয়ে মাথার চুলগুলো মুছতে লাগলো সে। আফতাব বাড়িতে নেই বলেই শায়েরকে আসতে হলো। নাহলে

তার ঠেকা পড়েছে এই ঝড়ের মধ্যে আসতে। কোন মাঝি আসতে চায়নি বিধায় সে নিজে এসেছে নৌকা চালিয়ে। সাথে কাকভেজা ও হয়েছে। আফতাবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক হলো সেহরান শায়ের। বলতে গেলে ডান হাত। আঁখিরের থেকে সে শায়েরকে বেশি ভরসা করে। সব কাজের দায়িত্ব একমাত্র

শায়েরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন সে। কোন কাজে আজ পর্যন্ত দেরি করেনি শায়ের। তাছাড়া ওর কাজের হাত চমৎকার। বলতে গেলে যেখানে হাত দেয় সেখানেই সোনা পায়। এজন্য আফতাব একটু বেশি স্নেহ আর বিশ্বাস করে শায়েরকে। এমনকি শহর থেকে ডাক্তার আনার জন্যও শায়েরের হাত আছে।

শায়েরের পরামর্শেই আফতাব ডাক্তার এনেছেন। শায়ের বলেছে এতে নাকি আফতাবের নাম বাড়বে। সবাই আরো বেশি বেশি শ্রদ্ধা করবে তাকে। হয়েছেও তাই,সবার মুখে মুখে এখন আফতাবের গুনগান ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। নাঈমের সঙ্গে শায়েরের দেখা শহরেই হয়েছিল তবে তা ক্ষণিকের জন্য। এরপর

নাঈম আর শায়েরকে দেখেনি। সে অন্য শহরে গিয়েছিল। আজই গ্রামে ফিরেছে আর এসেই কাজে লেগে পড়েছে।এখন শায়েরের প্রধান কাজ হলো এই জমিদার বাড়ি রক্ষা করা। যেন বাইরের কেউ এই বাড়িতে ঢুকতে না পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে খুদায় পেট জ্বলছে ওর। কিছু না খাওয়া অবধি সে কিছুই করতে

পারবে না। তাই সে ছাতা হাতে বের হলো। অন্দরমহলের দরজায় কয়েকবার টোকা দিল কিন্তু কেউই সাড়া দিলো না। অতঃপর শায়ের কুসুমকে কয়েকবার ডাকতেই কেউ একজন দরজা খুলে দিল। মুখোমুখি হলো পালক আর শায়ের। পালককে শায়ের একদমই আশা করেনি। ভেবেছিল বুঝি কুসুম আসবে।

শায়ের নিজের বিষ্ময়তা বিনা প্রকাশে বলল, ‘কুসুমকে একটু ডেকে দিবেন?’

হারিকেনটা একটু উঁচু করে ধরে পালক। এতে শায়েরের মুখটা আরেকটু স্পষ্ট হয়। পালক বলে,’কুসুম তো নেই বোধহয় বাড়িতে গেছে।’

‘তাহলে বড় মা??’

পালক একবার পেছনে তাকিয়ে আবার শায়েরের দিকে তাকালো বলল,’ঘরে আছেন। কিছু লাগবে আপনার? আমাকে বলুন।’শায়ের অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে,’নাহ,বড় মা’কে বলুন শায়ের এসেছে তাহলেই তিনি আসবেন।’

মাথা নেড়ে হারিকেন হাতে নিয়ে চলে গেল পালক। মালার ঘরে

যেতেই দেখলো জেসমিন মালার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন আর থেমে থেমে কেশে উঠছে মালা। পালক এগিয়ে গিয়ে বলে,’কি হয়েছে ওনার?’

মুখ তুলে চকিতে তাকালো জেসমিন বললেন, ‘তুমি এঘরে এসেছো কেন?আর আপার বেশি কিছু হয়নি সামান্য জ্বর। সেরে যাবে তুমি

নিজের ঘরে যাও।’পালক শায়েরের কথা বলতেই জেসমিন ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তার সাথে পালককেও নিজের ঘরে যেতে বলে।

ঘরে এসেই পালঙ্কে গা লাগিয়ে শুয়ে পড়ে পালক। রুমি আর মিষ্টি খাতা কলম নিয়ে কিসব হিসাব কষছে। এসব ভালো লাগছিলো না বিধায়

পালক নিচতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্দেরের দরজা ধাক্কার শব্দে সে দরজা খুলল। কিন্তু চোখের সামনে কঙ্খিত পুরুষটিকে দেখে যেন মুগ্ধতা এসে ভেড়ে দুই নেত্রে। এই নিয়ে তৃতীয় বারের মতো শায়েরের সাথে দেখা তার। প্রথম দেখা হয়েছিল শহরে। অদ্ভুত এই পুরুষটির চোখে আটকে গিয়েছিল

পালকের নয়ন জোড়া। অন্যরকমের মাধুর্য আছে শায়েরের চোখে। সুরমা পড়ায় চোখদুটোর সৌন্দর্য বেশিই ছড়াচ্ছে। সেখানেই পালক কিছু পল আটকে গিয়েছিল। তারপর আর দেখা হয়নি। আজকে বাগানবাড়িতে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। তবে তা দূর থেকেই,আর এখন যে এইভাবে শায়েরের সাথে পালকের দেখা হবে

তা ভাবেই নি পালক।কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই তান্ডব চালিয়েছে কাল রাতের ঝড়। গাছের ছোট ছোট ডালপালাগুলো উড়ে এসে পড়েছে অন্দরমহল ও বৈঠকঘরের উঠোনে। গাছগাছালির পাতাতেও ভরপুর হয়ে আছে। ঠিক তেমনি ভাবেও এ ঝড় নদী নালায় তান্ডব চালিয়েছে। বিন্দুদের নৌকা খানি সারারাত

দুলেছে। ভাগ্য ভালো যে পুরোপুরি উল্টে যায়নি তাহলে ওদের থাকার জায়গা বলতে আশ্রয়কেন্দ্রই শেষ ঠিকানা হতো। কিন্তু নৌকায় দুটো ফুটো হয়ে গেছে। চুয়ে চুয়ে পানি ঢুকেছে সারারাত। বিন্দুর মা চন্দনা দেবী আর সখা নৌকার পানি ফেলেছে। রাতে দুচোখের পাতা আর এক করেনি তারা। কিন্তু ইন্দু বিন্দু

দুই বোন মরার মতো ঘুমিয়েছে। শত ডেকেও চন্দনা ওদের তুলতে পারেনি। ওদের এক কথা মরলে মরুক তবুও ঘুম ছাড়বে না। দরকার পড়লে ঘুমের ঘোরেই নৌকার তলে চাপা পড়ে মরবে।এজন্য সকাল হতেই চন্দনা দেবী বকাবকি শুরু করে দিয়েছে। চিল্লিয়ে বলতেছে,'তোগো মতো মাইয়া

লাগতো না আমার। ছোড পোলাডারে নিয়া সারা রাইত জল হেচলাম আর ছেমরি দুইটা গতরে তেল লাগাইয়া ঘুমাইলো। হারামজাদি,হতচ্ছাড়ি, তোর বাপের তো খবর নাই। আইজ খাইবি কি? গলায় ঢালনের মতো কিছু নাই। আমি মরি আমার জ্বালায় কেউ এট্টু দেহেও না। এতো মানুষ মরে আমি

মরি না ক্যান।’কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চন্দনা নৌকায় বসে বসে আধভাঙ্গা গামলা দিয়ে পানি ফেলছে। সাথে চোখের পানি ও ফেলছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আর পারছে না চন্দনা।বিয়ের পর থেকেই কষ্ট করে আসছে। স্বামী মহেশ মাছ বিক্রি করে কোনরকমে সংসার চালায়। তবুও কিসের যেন কমতি

থেকেই যায়। সব টাকাই যদি সংসারের পিছে খরচ হয়ে যায় তাহলে সঞ্চয় করবে কি?মেয়ে দুটোও তো বড় হয়েছে বিয়ে দিতে হবে তো! কিভাবে কি করবে তা ভেবে ভেবে চন্দনার দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু মহেশ অতো ভাবে না। কিভাবে দুটা টাকা সঞ্চয় করবে মেয়ে বিয়ের জন্য তাও ভাবে না।

তিন সন্তানকে মহেশ খুব ভালোবাসে বিশেষ করে বড় মেয়ে বিন্দুকে। কেননা বিন্দু নাকি দেখতে একদম মহেশের মতো। শ্যামলা গায়ের রং,চোখ,এমনকি স্বভাবটাও মহেশের মতোই। এজন্য মহেশ বাকি সন্তানদের থেকে বিন্দুকে একটু বেশি স্নেহ করে। এজন্য প্রায়ই মহেশের সাথে ঝগড়া হয় চন্দনার।

মেয়ে মানুষ বাড়ন্ত বয়স, কখন কি ভুল করে বসে কে জানে? তাছাড়া মেয়ে তো আরেকটা ও আছে ওকেও তো বিয়ে দিতে হবে। চন্দনার কথা যেমন আগেও কেউ কানে নেয়নি তেমনি আজকেও কেউ কানে নিলো না। ইন্দু গিয়ে মাটির চুলা জ্বালাতে বসে পড়ল আর সখা নিজের ছেঁড়া গামছায় করে আনা ফলপাকুড় বের

করতে বসলো। বিন্দু কলা গাছের ভেলাটা নিয়ে বের হয়ে গেল।ঝড় থামলেও মেঘ কমেনি তার সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও পড়তেছে কিন্তু এই বৃষ্টি বিন্দুকে ভেজাতে ব্যর্থ। ভেলা নিয়ে শাপলা বিলে এসেছে সে। হাতের বাশটা ভেলার উপর রেখে উবু হয়ে বসে কতগুলো শাপলা তুলল। আরো কিছু শাপলা

তুলতে হাত বাড়াতেই একটা নৌকা এসে ধাক্কা দিলো ভেলায়। কেঁপে উঠলো বিন্দু,পড়ে যেতে গিয়েও পড়ল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,'মাগো মা এমনে ঠেলা মারে কেউ?আরেকটু হইলেই পইড়া যাইতাম গা।'

নৌকা থেকে বেরিয়ে এলো সম্পান। এক লাফে ভেলায় উঠে দাঁড়ালো বলল,'এইহানে কি করস?'

‘এ্যাহ!মনে হয় বুঝো না কিছু! শাপলা না নিলে খাইতাম কি?’

‘ক্যান তোর বাপে কই গেছে?’বিন্দু আরো কিছু শাপলা তুলতে তুলতে জবাব দিলো,’গঞ্জের হাঁটে গেছে কাইল। ঝড়ের লাইগা আইবার পারে নাই।’

সম্পান কিছু বলল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে লোকজন দেখে

নিলো। নাহ কেউ নেই। সম্পান আরেকটু এগিয়ে এসে বলল,’জানস বিন্দু শহরের ডাক্তারবাবু আমার কাছে পরীর কথা জিগায়।’

বিন্দুর হাত থেমে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বলে,’তুমি কিছু কইছো মাঝি?’

‘পাগল নাকি কিছু কমু! আমার মনে হয় হেয় আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। পরীরে হেয় দেখতে চায়।’

‘কও কি?এই কথা তো পরীরে জানাইতে হইবো। পরী জানলে কি করব কে জানে?’

সম্পান বিন্দুকে আশ্বাস দিয়ে বলে,’কিচ্ছু হইবো না রে। আমাগো পরী সব সামাল দিতে পারব।

আইজ রাইতে যাবি তোরে পদ্মায় ঘুরামুনে।’বিন্দুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো বলল, ‘পরীবানুরেও কই!!ও যাইবো নে।’

‘বাইর হইতে পারবো তো পরী। তাইলে নিয়া যামুনে। তুই তৈয়ার হইয়া থাহিস তাইলে।’

সম্পান আর কথা না বাড়িয়ে নৌকা নিয়ে চলে গেল। অনেক কাজ তার।

আজকে ওষুধ আনতে শহরে যেতে হবে তার। সারাদিন কাজ করলেই রাতে ছুটি পাবে সে। শাপলাগুলো একসাথে জড়ো করে বেঁধে নিলো বিন্দু তারপর দাঁড়িয়ে বাশটা হাতে নিয়ে চলল নিজের গন্তব্যে। এর আগেও অনেকবার সে সম্পানের সাথে পদ্মায় ঘুরতে গিয়েছিল। তবে পরীর সাথে হাতে গোনা কয়েকবার

গিয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরী জমিদার বাড়ির সবাইকে ধোঁকা দিয়ে তো সবসময় আসতে পারে না তাই বিন্দু আর সম্পানই ঘুরতে যেতো। সম্পান মাঝি হলো পদ্মার রাজা আর বিন্দু হলো পদ্মারানী। এই উপাধি পরীই ওদের দিয়েছিলো। সম্পান বিন্দুর ভালোবাসার একমাত্র সাক্ষী হলো পরী। তবে বিন্দুর সাথে

পরীর বন্ধুত্ব যেন আচমকাই হয়ে গেছে। পরী তখন ছোট ছিল। গ্রামের কারো সাথেই সে বন্ধুত্ব করতে চাইতো না। অনেক ধনী পরিবারের সন্তান থাকতেও গরীব হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মেয়েটিকেই সে নিজের বন্ধু হিসেবে বেছে নেয়। দু'জন দু'জনের প্রাণের সখী। মুদি দোকান ছিল মহেশের তবে সেটা

ইন্দু আর বিন্দুই চালাতো বেশি। মহেশ ঘুরতো পরের নৌকায়। জাল ফেলতো নদীতে। ওই দোকানে এসেই বিন্দুর সাথে প্রথম পরিচিত হয় পরী। গজদন্তনীর হাসিতে সেদিন যে পরী কি মাধুর্য দেখেছিল তা একমাত্র পরীই জানে।বিন্দুর পরনের সুতি শাড়িটা সবসময় নোংরা ধুলোবালি মাখা থাকাতেও

পরী ওকে জড়িয়ে নিতো নিজ বক্ষে। বিন্দুর শত বাধাও সে মানতো না। পরীর নিরহংকারতা দেখে বরাবরই মুগ্ধ বিন্দু। না আছে রূপের অহংকার আর না আছে টাকা পয়সার অহংকার। এজন্য বিন্দুর প্রিয় পাত্রী পরী।

শাপলা গুলো মায়ের কাছে রেখে বিন্দু ভেলা ভিড়ালো জমিদার বাড়ির

ঘাটে। ভয়ে ভয়ে পা ফেলল জমিদার বাড়ির চৌকাঠে। দেলোয়ার আর লতিফ বাঁধা দিলো না বিন্দুকে কারণ তারা জানে বিন্দু পরীর সাথেই দেখা করতে এসেছে।

তবে বিন্দুর ভয়ের একমাত্র কারণ হলো আবেরজান। বিন্দু বিধর্মী হওয়ায় তাকে ঘরে আসতে দিতে চাননা আবেরজান। বিন্দুকে দেখলেই

দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। সেজন্যই বিন্দু লুকিয়ে আসে এই বাড়িতে। এখন বন্যা থাকায় আসতেই পারে না।জেসমিনকে বলে পরীর ঘরের দিকে পা বাড়ায় বিন্দু। যাওয়ার আগে আবেরজানের ঘরে উঁকি দিতে ভোলে না সে।

আচমকা বিন্দুর আগমনে হকচকিয়ে গেল পরী তবে নিজের সখীর প্রতি

তার অভিমান ও কম জমেনি! এতদিন কোথায় ছিলো?তাই সে অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে বলে,'তুই এইহানে আইছোস ক্যান?কেডা তুই?'

হাসলো বিন্দু,সাথে সাথেই ওর গজ দাঁতটা যেন উদয় হলো। পরী একধ্যানে শ্যামকন্যার হাসি দেখলো। যেন মুক্তো ঝরছে ওই হাসি থেকে।

বিন্দুর হাসি দেখে পরীর বলতে ইচ্ছে করছে এইভাবে হাসিস না আমার খুব হিংসে হয়। এই মেয়ে রূপ নয় হাসি দিয়ে পুরুষের মন ভোলাতে পারবে যেমন করে সম্পানের মন ভুলিয়েছে। পরী বলল,’থাক আর হাসতে হইবো না কি কইবি ক তাড়াতাড়ি।’বিন্দুর মুখে রাতে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে

আনন্দে নেচে উঠল পরীর মন। অনেক দিন বেরোনো হয় না। মুহূর্তেই বিন্দুর প্রতি সব অভিমান যেন বন্যার পানিতে ভেসে গেল। কাঠের আলমারি টি খুলে একখানা মখমলের শাড়ি বিন্দুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,’আইজ তুই এই কাপড়টা পরিস।’

শাড়িটাতে হাত বুলিয়ে বিন্দু পরীর দিকে তাকিয়ে বলে,’তুই তো কাপড় পরস না পরীবানু। তাইলে এতো সুন্দর কাপড় পাইলি কই?’পরী চটজলদি আয়নার সামনে থেকে দুটো ফিতা এনে বিন্দুর হাতে গুজে দিয়ে বলে, ‘সোনা আপার ঘরে পাইছি। এই কাপড় তো কেউ পরব না তাই তোরেই দিলাম। নিয়া যা

আইজ পরিস। তোরে খুব সুন্দর দেখাইবে।’

খুশি হলো বিন্দু। শাড়িটা নেতিয়ে পড়া আঁচলটা দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বের হলো সে। উঠোনে আসতেই দেখল মালা বারান্দায় বসে কাশছে। বিন্দু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘জেডি তোমার শরীরডা আইজও খারাপ। যেদিনই আহি হেদিনই দেহি

অসুখ তোমার। পরীর বাপরে কইয়া একটা ডাক্তার দেহাও। কবিরাজ রে তো কতই দেখাইলা।'

বিন্দুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মালা জিজ্ঞেস করে,'আইজ পরী কি দিলো তোরে? তাড়াতাড়ি বাড়ি যা পরীর দাদী দেখলে চিল্লাইবো।'

বিন্দু আর দেরি করলো না দৌড়ে চলে গেল। ঘাটে গিয়ে ভেলায়

চড়তেই দেখলো শহুরে ডাক্তারদের নৌকা ভিড়ছে। ওদের দেখেই বিন্দুর মনে পড়ে গেল সম্পানের কথা। ইশ!!পরীকে আসল কথা বলতেই ভুলে গেছে। রাতে বলে দেবে ভেবে বিন্দু ভেলা ভাসালো জলে।নিজ ঘরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে নাঈম,শেখর আর আসিফ। আজকে পালকের মুখে সবই শুনেছে ওরা। এমনকি

অবাকও হয়েছে। হয়তো অনেক গুলো বছর পেরিয়ে গেছে সোনালীর চলে যাওয়ার। এরমধ্যে একটিবার ও মেয়েকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবেনি!আশ্চার্যিত হয়ে শেখর বলে,'এই জমিদার মশাই অদ্ভুত রে!! মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনা তো দূরের কথা একবার খোঁজও নেয়নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত তাই না!!'

পালঙ্কের উপর দু’পা তুলে বসে আছে আসিফ আর নাঈম শুয়ে আছে। শেখরের কথা শুনে নাঈম উঠে বসে বলল,’মেয়ের থেকে নিজের আত্মসম্মানটাই বড় করে দেখেছেন জমিদার। এজন্যই মেয়ের কোন খোঁজ নেননি। তাছাড়া আমার মতে দোষটা তো একা জমিদারের নয় ওনার মেয়েরও আছে। সেও

চাইলে এখানে আসতে পারতো। জমিদার হয়ে কিভাবে তিনি তার মেয়েকে একটা নিচু পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দিবে?’

দুজনের কথার মধ্যে আসিফ বলে উঠলো, ‘ওটাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু ভালোবাসা তো বলে কয়ে আসে না। এরা হুটহাট করে এসে মনের মধ্যে গেঁথে যায়।’কথাটা বলে একটু

থামলো আসিফ তারপর নাঈমকে জিজ্ঞেস করে,’আচ্ছা নাঈম তুই যে পরীকে দেখতে চাইছিস মানে তোর দেখার ইচ্ছা এটা কি শুধুই ইচ্ছা না অন্যকিছু? ভালোবাসা নাকি আকর্ষণ?’

চটজলদি উওর দিতে পারল না নাঈম। সত্যি কথাই তো বলেছে আসিফ। সে কি শুধু ইচ্ছে পূরণ

করতেই পরীকে দেখতে চায় নাকি এরমধ্যে অন্যকিছু আছে? কিছুক্ষণ ভেবেই নাঈম বলল,’জানি না। কেন ওই মেয়েটাকে দেখার এতো ইচ্ছা করছে!যদি এটাকে আকর্ষণ বলে তাহলে তাই আর যদি ভালোবাসা বলে তাহলে,,,’দীর্ঘদিন পর মেঘের মুলুকে চাঁদ ভেসেছে আজ। পূর্ণচন্দ্র নয়,অর্ধচন্দ্র। কিন্তু এই অর্ধেক চাঁদ

টাই পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলেছে। নৌকাগুলো হাল্কা দূর থেকেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। চাঁদের আলো পড়ছে পানিতে, চিকচিক করে উঠছে পানি। ঢেউয়ের সাথে সাথে যেন চাঁদও নেচে উঠছে। নৌকার কোণায় বসে পানিতে পা ডুবিয়ে দিয়েছে পরী। মাথার ঘোমটা ফেলে বড় করে শ্বাস নিলো সে।

মুহূর্তেই যেন লুফে নিলো প্রকৃতির সব ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণটা খুব পরিচিত পরীর। এটা তো নূরনগরের ঘ্রাণ। মুক্তি পাওয়ার মজাই যেন আলাদা বেশ কয়েকবার বের হয়ে সে বুঝতে পেরেছে। নৌকার অপরপ্রান্তে সম্পান বসে আছে বৈঠা হাতে। আর ওর কোল ঘেঁষে বসেছে বিন্দু। পরনে পরীর দেওয়া মখমলের

কাপড়টা। বেণি করে তাতে ফিতাও গুজেছে। সম্পান আজকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে তার পদ্মারানীকে। আর বিন্দু বারবার লাজুক হাসছে। ছইয়ের কারণে ওপাসে বসে থাকা পরীকে ওরা দেখতে পারছে না। ওরা নিজেদের মতো সময় কাটাচ্ছে আর পরীকে একা ছেড়ে দিয়েছে।

একাধারে পানিতে পা ভিজিয়ে যাচ্ছে পরী। ইচ্ছা করছে শব্দ করে হাসতে কিন্তু ওর মা যে ওকে বারণ করে দিয়েছে জোরে হাসতে। সেজন্য হাসতেও পারছে না সে। তবে প্রকৃতি যেন আজ পরীর জন্যই সেজেছে। তাদের প্রধান কাজই যেন পরীকে খুশি করা।পরী পা ডোবাতে ডোবাতে হাক ছাড়লো,'ও সম্পান

মাঝি,ও পদ্মার রাজা তোমার রানীরে ঘরে তুলবা কবে?’

ওপাশ থেকে সম্পানও জোর গলায় বলল, ‘বন্যা যাক,তারপর শহরে যামু কামে। যদি কাম পাই তাইলে এই শীতের মধ্যেই ঘরে তুলমু বিন্দুরে।’

সম্পানের কথায় লাজুক হাসে বিন্দু। মুক্তঝরা সেই হাসিতে বরাবরের মতো এবারো মুগ্ধ নয়নে দেখে

সম্পান। পরী আরো কিছু বলতে নিলে দূর থেকে নৌকা আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ছইয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিন্দুও

পরীর দেখাদেখি ছইয়ের ভেতরে পরীর পাশে গিয়ে বসে। নৌকা কাছে আসতেই শায়েরের গলার আওয়াজ ভেসে আসে,'আরে সম্পান তুমি!যাক ভালোই হয়েছে। আমাকে

জমিদার বাড়িতে নিয়ে চলো।’শায়েরের কথায় একটু ভয় পেল সম্পান। পরী তো ছইয়ের ভেতরে। বিন্দুকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না কিন্তু পরীকে যদি শায়ের চিনে ফেলে?শায়ের আদৌ পরীকে কখনো দেখেছে কি না তা সম্পান জানে না তবুও ভেতরে ভেতরে একটু সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে

সম্পানের। শায়ের লাফিয়ে সম্পানের নৌকায় চড়ে বসে। বৈঠকঘর আর অন্দরমহলের মাঝে উঁচু দেওয়াল বাঁধানো। আসিফের ঘাড়ে পা রেখে দেওয়াল টপকে অন্দরমহলে ঢুকলো নাঈম। শেখরও নাঈমকে অনুসরণ করেই ঢুকলো। কিন্তু আসিফের সাহসে কুলায় না। পরীর হাতে ধরা খেয়ে সে উওম

মধ্যম খেতে চায় না। যদি ওরা ধরা পড়ে যায় তাহলে সাহায্য করার জন্য ওর শাস্তি কম হলেও হতে পারে। এই ভেবেই উপরওয়ালাকে একমনে ডেকে যাচ্ছে আসিফ। পরীর বুদ্ধিমত্তা দেখেই আসিফ বুঝে গেছে যে হয়তো আজকে কিছু একটা হবেই। ওরা হয়তো ধরা খাবেই। বন্যার পানিতে ভেসে আসা

কচুরিপানা গুলোর দিকে একমনে তাকিয়ে আছে শায়ের। গভীর চিন্তায় সে যেন ডুবে আছে। তার ভাবখানা আকাশের চাঁদ টাও যেন বুঝতে পারছে না। সম্পান নৌকা ঘুরিয়েছে জমিদার বাড়ির দিকে। ছইয়ের ভেতরে বিন্দুসহ আরেকজন কে দেখে শায়ের সেদিকে পা বাড়ায়নি। বাইরে এসে ছইয়ের সাথে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথাও সে নিজ ইচ্ছায় বলেনি। সম্পানের কথায় শুধু সে হু হা করছে। শায়ের আসাতে ওরা তিনজনই বিরক্ত। সুন্দর মুহূর্ত টাকে দিলো শেষ করে। কিন্তু মুখে কেউই কিছু বলল না। পরীর মাথাটা গরম হয়ে আছে। ইচ্ছা করছে এই ছেলেটাকে এখন ধাক্কা মেরে বন্যার পানিতে ভাসিয়ে

দিতে। অনেক দিন পর সে লোকচক্ষুর আড়ালে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। আর ওর সব আশা আকাঙ্ক্ষা শায়ের শেষ করে দিলো! পরীর এসব ভাবনার মাঝেই শায়ের বলে উঠলো,’তোমাদের বিরক্ত করলাম তাই না সম্পান?’চকিতে তাকালো সম্পান মুখে সামান্য হাসি

ঝুলিয়ে সে বলল,’না সাহেব। এইডাই তো আমার কাম।’

শায়ের শব্দ করে হেসে উঠলো। ঘাড় ঘুরিয়ে সম্পানের দিকে তাকিয়ে বলল,’মুখে না বললেও মনে মনে ঠিকই তুমি বিরক্ত হয়েছো। যাই হোক বিন্দুকে আর বাপের বাড়িতে না রেখে শ্বশুর বাড়ি নেওয়ার ব্যবস্থা করো তাহলে দেখবে আমার মতো

আর কেউ তোমাদের বিরক্ত করতে আসবে না আর তোমাদের ও লুকিয়ে ঘুরতে যেতে হবে না।’

সম্পান চুপ থাকলো। আপনমনে বৈঠার হাল ধরে সে। পানির কলকল শব্দে মুখরিত হচ্ছে চারিদিক। দুজন রমনি বসে আছে ছইয়ের ভেতর আর দুজন পুরুষ নৌকার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পানির শব্দ ছাড়া

কেউই কোন শব্দ শুনতে পারছে না। প্রকৃতির যেন এই গুমোট ভাবটা পছন্দ হলো না। তাই সে মেঘকে খানিকটা নাড়া দিতেই বাঘের মতো গর্জে ওঠে সে। এতে বিন্দু খানিকটা ভয় পেয়ে বলে,'মেঘের অবস্থা কিবা মাঝি? বৃষ্টি আইবো নি?ঝড় হইবো নি?'

‘এতো ডরাস ক্যান বিন্দু?আমি আছি,শায়ের দাদা আছে,পর,,’ থেমে গেল সে। পরীর নামটা আনতে চেয়েও আনলো না তারপর আমতা আমতা করেই সে বলল,’মাইয়া মাইনষের এতো ডরাইলে চলে?’বিন্দু জবাব না দিলেও শায়ের জবাব দিলো, ‘মেয়ে মানুষ হলো ফুলের মতো নিষ্পাপ। তাদের কোমলতা

প্রকাশ পায় তার সুবাসে। ওই পরিস্ফুটিত ফুলকে বিনা অনুমতিতে স্পর্শ করতে হয়না। বিশেষ অনুমতি পত্র নিয়েই তাদের স্পর্শ করতে হয়। যদি কেউ বিনা অনুমতিতে তাকে স্পর্শ করে তাহলে তার কঠোরতা দেখা যায়। বিষাক্ত কাঁটা। যেই কাটা পার করার সাধ্য কোন পুরুষের নেই। সেখানে প্রকৃতির এই

গর্জন নিছক অতি সাধারণ। মেয়ে নামক ফুলদের কাজ শুধু সুবাস ছড়ানো নয়। মাঝে মাঝে কাঁটার মতো বিষাক্ত ও হতে হয়।’

একটু চুপ থেকে শায়ের বলল,’কি বলো সম্পান?’

‘এক্কেবারে ঠিক কইছেন দাদা। আমিও বিন্দুরে সবসময় কই যে একটু শক্ত হ। খালি ভয় পায়। আমি

যহন না থাকমু তহন,,’বিন্দু হুড়মুড়িয়ে উঠে বাইরে এলো সম্পানকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জোরে বলল, ‘তোমারে না কইছি এমন কথা কইবা না? তারপরও ক্যান এমন কথা কও বারবার?আর মরার কথা কইবা না কইয়া দিলাম।’

বোকা বনে গেলো সম্পান। সে বলল কি আর মেয়েটা বুঝলো কি!! তবে সম্পানকে নিয়ে বিন্দু একটু বেশিই ভাবে। কতখানি ভালোবাসে সেটা যদি বিন্দু বোঝাতে পারতো তাহলে নিজেকে শান্ত করতে পারত। কিন্তু ভালোবাসার পরিমাপ আজ পর্যন্ত কেউই করতে পারেনি। সেখানে বিন্দুও ব্যর্থ। সম্পান বলে,'আমি

কইলাম কি আর তুই বুঝলি কি? অহন কথা কইস না কেউ দেখলে খারাপ ভাববো। যা ভিতরে গিয়া বস।’রাগে গজরাতে গজরাতে পরীর পাশে গিয়ে বসে। পরী অতো কিছু খেয়াল করল না। ওর মনে শায়েরের কথাগুলো ঘুরছে। মেয়েদের দুটো রূপের কথা সে ফুল দ্বারা বুঝিয়েছে। যা পরীর ভালো

লাগলো। তবে মুখ ফুটে কোন কথা বলল না। এরই মধ্যে সম্পান মাঝি গুনগুন করে গান ধরলো। নদী সম্পর্কিত গানগুলো খুবই সুন্দর হয়। সেরকমই একটা ভাটিয়ালি গান ধরেছে সে। চোখ বন্ধ করে তা অনুভব করছে পরী। পনের বছরের জীবনে সে এই গ্রামটাকে হাতেগোনা কয়েকবার দেখেছে। বাকি জীবনটা

বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে কেটে গেছে। কিন্তু ওর বড় দুবোনের জীবন ছিল আলাদা। ওরা হেসে খেলে পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতোই। কিন্তু পরীর জীবন কেন আলাদা করে দেখছে মালা তা জানে না সে। মা'কে অনেক প্রশ্ন করেও উওর মেলেনি।

পরীর ভাবনা ছেদ করে চড়চড় করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। গর্জে উঠলো মেঘ। ঝুমঝুম শব্দ তুলে পানিতে পড়তে লাগলো বারিধারা। বিন্দুর ডাকে সম্পান দ্রুত ছইয়ের ভেতরে এসে বসে। কিন্তু শায়ের এলো না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজতেছে দেখে সম্পান বলে,'ও দাদা ভেতরে আইয়া

বহেন। এমনে থাকলে পুরা ভিজা যাবেন তো!’

‘ভেতরে দু’জন নারী আছে সম্পান। তাদের অনুমতি ছাড়া ভেতরে যাই কিভাবে??’সম্পান ভারি অবাক হলো। মেয়েদেরকে শায়ের সম্মান করে সেটা জানে সম্পান। কিন্তু এতোটা সম্মান করে তা জানতো

না। সে বলল,’বিন্দু কিছু কইব না দাদা!!’

এবার শায়ের কিছু বলল না। তবে ভেতরেও ঢুকলো না। পরী ভারি অবাক হচ্ছে শায়েরের কাজে। তারমানে শায়ের এটা বোঝাতে চাইছে যে পরী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত শায়ের ভেতরে এসে বসবে না। তাই পরী বলল, ‘আপনে

ভেতরে আইয়া বহেন। আমাগো কোন সমস্যা হইবো না।’অনুমতি পেয়ে শায়ের ভেতরে এসে সম্পানের পাশে বসলো। এতটুকু সময়ে সে ভিজে একাকার। পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে মাথার চুল হাত দিয়ে ঝাড়তে লাগলো সে। পরী নিজের ঘোমটা ভালো করে টেনে দিলো। তারপর হারিকেনের কমানো

আচ বাড়িয়ে দিতেই আলোকিত হলো নৌকা। ওড়নার ফাক গলিয়ে আড়চোখে সে শায়েরকে দেখে নিলো একবার। এরপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

এরপর আবার নিরবতা পালন করছে নৌকা জুড়ে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে নৌকা। চারজন এমন ভাবে বসে আছে যেন এই নৌকায় তারা

সাত সমুদ্দুর তের নদী পার করবে। এগিয়ে যাবে নতুন দেশে। কিন্তু শুধু বিন্দু আর সম্পান হলে হতো। পরী আর শায়েরের পথটা তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা দুজন এসেই তালগোল পাকিয়ে দিলো। তা ভেবে মুখ চেপে হাসলো বিন্দু। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষন। ঢেউয়ের তালে নৌকা কোনদিকে যাচ্ছে তাও

বোঝা মুশকিল। তাই সম্পান ছইয়ের মধ্যে গোজা প্লাস্টিকের বস্তাটা নিয়ে লম্বা টুপি আকারে বানিয়ে পড়ে নিলো। তারপর আবার গিয়ে নৌকার হাল ধরলো।আজকে খুব সহজেই অন্দরমহলে ঢোকা গেছে। তবে ভয়ের বিষয়ে হচ্ছে আজকে আফতাব বাড়িতে না থাকলেও আঁখির আছে। আঁখির

বৈঠক ঘরের একপাশের ঘরে শুয়ে আছে। হয়তো তিনি কিছুই টের পাননি। কিন্তু পরীর ঘর কোনটা সেটা তো ওরা জানেই না। খোঁজা তো মুশকিল হয়ে যাবে। তবুও পা বাড়ায় দু'জনে। অন্দরমহলের বেশিরভাগ ঘরই তালাবদ্ধ। হয়তো কেউ থাকে না বিধায় তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে একবার

হোঁচট খাওয়া হয়ে গেছে শেখরের। নাঈম টেনে না ধরলে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়তো। যেতে যেতে সামনেই পড়লো মালার ঘরটি। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখল মালা শুয়ে আছে। একা নয় সাথে জেসমিন ও আছে। সে মালার সেবা করছে। মালার প্রতি জেসমিনের এতো ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল

না নাঈম। ওখানে সময় ব্যয় না করে দুজনে আবার সামনে এগোলো।এবারে ওরা পৌঁছালো সেই ঘরে যেখানে পালক মিষ্টি আর রুমি থাকে। নাঈম ওদের দেখে দ্রুত শেখরকে নিয়ে ঢুকে পড়লো। তারপর দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো। ওদের এসময় দেখে রিতিমত ভয়ে কাপছে

পালক,মিষ্টি,রুমি। এই মুহূর্তে যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে ওরা অনেক বড় সমস্যায় পড়বে।

রুমি দৌড়ে এসে বলে,'তোরা ভেতরে ঢুকলি কিভাবে?কেন এসেছিস এখানে?'

শেখর একটু ভাব নিয়ে বলে,'শান্ত হ একটু। আমরা দুজন তো সেই

পরীকে দেখতে এসেছি যার ডানা নেই।'

'তো যা না। তোর জন্য পরী লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদরে গ্রহন করবে বলে।'

পালক রুমিকে চুপ করিয়ে দিয়ে আস্তে করে বলল,'আস্তে কথা বল কেউ শুনতে পেলে আমাদের খবর হয়ে যাবে।'

এবার নাঈম একটু বিরক্ত হয়ে বলে,'তোদের কথা শেষ হলে বল পরীর ঘর কোনটা।'

পালক নাঈমকে থামানোর জন্য বলে,'তোর আসাটা কি খুব জরুরি ছিল নাঈম?এতো জেদ কেন করিস বলতো তুই? এখন যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি হবে? আমার কথা শোন আর ফিরে যা।'

কিন্তু নাঈম নাছোড়বান্দা। সে যখন এসেছে তখন পরীর ঘরে যাবেই। তাই ও বলল,’তুই না বললেও পরীর ঘর আমি পেয়ে যাব। চল শেখর।’শেখরের হাত টেনে নিয়ে বের হলো নাঈম। পালক চেয়েও কিছু বলতে পারলো না। এই ছেলেটা প্রতি মুহূর্তে ওদের চিন্তায় ফেলে দেয়। অথচ নিজের একটুও

চিন্তা হচ্ছে না। ধরা পড়লে যে কি হবে!!

আবেরজান নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। আর নিজের ঘর তো কাঁপিয়ে ফেলছে। দুহাতে কান চেপে ধরে শেখর বলল,'এই বুড়িটা দেখছি দেওয়াল ফাটিয়ে দেবে। নেহায়েৎ দেয়ালগুলো অনেক মজবুত তা না হলে জমিদার

মশাইকে প্রতিদিন দেওয়াল তৈরি করতে হতো।'

প্রত্যুত্তর না করে নাঈম পা বাড়ায় তার সামনের ঘরে। অন্ধকার সম্পূর্ণ অন্দরমহলের ফাঁক ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে। সেই আলোতে সাবধানে পা ফেলছে নাঈম আর শেখর। পরীর ঘরে ঢুকতেই ওরা চারিদিকে চোখ বুলায়। কিঞ্চিৎ

আলোকিত ঘরটাতে সবকিছু স্পষ্ট নয়। কিছুটা সন্দেহ নিয়েই ঘরে ঢুকলো নাঈম। কারণ সবগুলো ঘরই বন্ধ। আর এটাই শেষ ঘর। কিন্তু ঘরে ঢুকে চাঁদের আবছা আলোয় একটা অবয়ব দেখতে পেলো পালঙ্কের উপর। পা টিপে টিপে পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গেল নাঈম। বুকটা কেমন ধুকধুক করছে। শেখর

পেছন থেকে এসে ফিসফিস করে বলল,’এটাই কি পরী?’হাতের ইশারায় শেখরকে চুপ থাকত বলল সে। এখন কথা বলার সময় নয়। আশেপাশে তাকিয়ে নাঈম বুঝতে পারলো এটাই পরীর ঘর কেননা একজন কিশোরী মেয়ের ঘর যেমন হয় এই ঘরটাও ঠিক তেমনই। কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তিটি কি

আদৌ পরী? গাঁয়ের কাথাটা হাল্কা টেনে সরাতেই জুম্মানের মুখটা দেখতে পেলো সে। দু'জনেই চমকে তাকালো ছোট্ট জুম্মানের দিকে। তাহলে পরী কোথায়?? একটু দূরে সরে এলো নাঈম। শেখর একপলক জুম্মানের দিকে তাকিয়ে বলল,'এটাও কি পরীর ঘর নয়? তাহলে কোনটা?'

‘নাহ এটাই পরীর ঘর।’ শেখর বিষ্ময়কর কণ্ঠে বলে,’তাহলে পরী কোথায়??’

কিছুক্ষণ ভাবলো নাঈম তারপর বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে পরী বাড়িতে নেই। রাতের আঁধারে সে কোথাও গিয়েছে। কিন্তু কেন?’শেখর ও বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। সত্যি তো!পরী যদি অন্দরমহলে থাকতো

তাহলে এতক্ষণ টের পেয়ে যেতো। হয়তো ওদের ধরেও ফেলতো তারমানে সত্যি সত্যি পরী বাড়িতে নেই। তাহলে গেলো কোথায় পরী? নৌকা যখন জমিদার বাড়ির ঘাটে এসে ভিড়লো তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। শায়ের নেমে গিয়ে কোন দিকে না তাকিয়েই চলে গেল। এমনকি সম্পানের সাথে কথাও

বলল না। শায়ের চলে যাওয়ার কিছু সময় পর পরীও নামলো। বিন্দু ও সম্পানকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে গেল। সেখানে একটা বড় পেয়ারা গাছ উঠে গেছে দেওয়াল পর্যন্ত। গাছ বেয়ে উঠে দেওয়াল টপকালো পরী। তারপর বড় আমগাছটা বেয়ে উঠলো অন্দরমহলের ছাদে। আমগাছটায়

ছোট ছোট ডালপালা বেশি থাকায় উঠতে অসুবিধা হয়নি পরীর। তাছাড়া গাছে চড়ার অভ্যাস ওর ছোট থেকেই আছে। ছাদের দরজাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকলো। নিজের ঘরে আসতেই জুম্মানকে এলোমেলো হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো পরী। ছেলেটা বড্ড ঘুম কাতুরে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে দিন দুনিয়া ভুলে

যায়। কানের কাছে ঘন্টা বাজালেও সে টের পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যের আলো চোখে এসে পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙবে না। এজন্যই পরী যেদিন ঘর থেকে বের হয় সেদিন জুম্মানকে নিজের সাথে রাখে। পরীর বের হওয়ার কথা জুম্মানও জানে। সর্বদা সে তার বোনকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত

থাকে।কিন্তু ঘরে এসেই নতুনত্বের গন্ধ নাকে এলো পরীর। এটা যে কোন পুরুষের গায়ের গন্ধ সেটা বেশ বুঝতে পারছে সে। তাহলে কি তার অনুপস্থিতিতে কেউ এখানে এসেছিল?হ্যা তাই হবে। কিন্তু কার এতবড় সাহস যে পরীর ঘরে আসে!! হারিকেনের আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে চোখ বুলায় পরী।

মেঝেতে চোখ দিতেই কাদা মাখা পায়ের ছাপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন নয় দুইজন পুরুষ এসেছিল এই ঘরে। তবে তারা কারা? হারিকেন হাতে নিয়ে পুরো অন্দরমহল ঘুরে এলো পরী কিন্তু কাউকেই দেখলো না।তাই মাথায় ঘোমটা টেনে সে অন্দরমহলের দরজা খুলে বৈঠক ঘরে পা রাখতেই

সামনে শায়েরকে দেখতে পেলো। গায়ের পাঞ্জাবি টা খুলে সে মাথা মুছতেছে। এভাবে খালি গায়ে লোকটাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল পরী। দূর থেকে পরীকে দেখে তাড়াহুড়ো করেই আরেকটা পাঞ্জাবি গায়ে জড়ালো শায়ের।হারিকেনের আবছা আলোয় হঠাৎ এক রমনিকে দেখে ঘাবড়ে যায় শায়ের। আর

নিজেকে ওই অবস্থায় কোন নারী দেখে ফেলেছে বিধায় লজ্জিত সে। তড়িঘড়ি করে পাঞ্জাবি গায়ে দিতে গিয়ে উল্টো করে পরে ফেলেছে। চুলগুলো ঠিকমতো মুছতেও পারলো না। কোন দরকার ভেবে দ্রুত পায়ে পরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে দুহাত দূরে সরে দাঁড়িয়েছে শায়ের। সে ভেবেছিল কুসুম এসেছে কিন্তু

কাছে এসে বুঝতে পারলো এটা কুসুম নয় অন্যকেউ। কিন্তু জেসমিন বা মালা নয় এটাও সে বুঝতে পারলো। তাহলে কি এই মেয়েটা পরী?এই মুহূর্তে শায়েরের সামনে জমিদার কন্যা পরী দাঁড়িয়ে তা বুঝতে বেগ পেতে হলো না শায়েরের। তাই সে বলে উঠলো,'কোন সমস্যা হয়েছে?

আজকে হঠাৎ আপনি বাইরে এলেন যে?'কথাটা সে মাথা নিচু করেই বললো। তবে শায়েরের কথার ভাবে বোঝা গেলো সে পরীকে চিনেছে। কিন্তু কিভাবে?এর আগে কখনো শায়েরের মুখোমুখি হয়নি পরী। তাহলে চিনলো কিভাবে?পরী মাথা নাড়ে শুধু।

শায়ের বলল,'এতো রাতে ঘর থেকে বের হবেন না। যেকোনো সময় বিপদ আসতে পারে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে আপনি জানেন তা আমি জানি তবুও সাবধানের মার নেই। পেছন থেকে আঘাত আসলে নিজেকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। কোন সমস্যা হলে কুসুমকে পাঠিয়ে দিয়েন।'

পরী চুপ থেকে কথাগুলো শুনলো। ফিরে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালো বলল,’পাহারা বাড়ায়ে দেন। অন্দরে কেউ ঢুকেছিল। ভাগ্য ভালো আমার হাতে পড়ে নাই।’এটুকু বলে দরজা বন্ধ করে দিলো পরী। মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়াতে অপমান বোধ করে শায়ের। মুখে বিরক্তি নিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

পরীকে সে কখনো দেখেনি আর না দেখার ইচ্ছা আছে। কারো মুখ থেকে পরীর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছু শোনেওনি। সে সময় তার নেই। আফতাব সবসময় তাকে কাজের উপর রাখে। আজ এখানে কাল ওখানে তো পরশু সেখানে,দৌড়ের উপর থাকে সে। তবে এবার শায়ের ঠিক করেছে যে

আফতাব কে বলে কয়েকদিন বিশ্রাম নিবে। আর এতো কাজ করতে ভালো লাগে না।

তখনই মনে পড়লো পরীর বলা কথাটা। অন্দরমহলে নতুন কেউ ঢুকেছিল। কিন্তু সে কে হতে পারে? একথা আফতাবের কানে গেলে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটাবে। এর থেকে কালকে পাহারা বাড়িয়ে দিতে হবে।

দেশে বন্যা হচ্ছে বিধায় তেমন পাহারা দেওয়া হয় না। এই সুযোগে যে অন্য কেউ এসে ঢুকবে তা মাথায় ছিলো না শায়েরের। তবে আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে সে ঘুমাতে চলে গেল।কিন্তু সেই রাতে পরীর আর ঘুম হলো না। মাথায় একটা কথাই ঘুরঘুর করছে যে কে এসেছিল?পরী তো যাওয়ার সময়

বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল কিন্তু এসে দেখে দরজা হাট করে খোলা। সন্দেহ দমানোর জন্য কাঠের টেবিলের উপর হারিকেনটা রাখলো সে। তারপর চেয়ার টেনে বসে। বই খাতার ভাজ থেকে কঙ্খিত খাতাটা বের করে উলোট পালট করে দেখতে লাগলো পরী। যেদিন সোনালী রাখালের হাত

ধরে পালিয়ে যায় তার ঠিক আগের দিন এই খাতাটা সে পরীকে দিয়ে যায়। এবং কঠিন সুরে আদেশ দেয়,'শোন পরী তোর যেদিন পনের বছর বয়স হবে সেদিন এই খাতাটা খুলে পড়বি।' কিন্তু পরী কি আর অতো কিছু বোঝে!সে তখন বোকার মতো তাকিয়ে ছিল। খাতাটা নিতে না চাইলেও সোনালী জোর করে

দিয়ে গেছে। বড় বোনকে নিজের মায়ের থেকেও বেশি ভয় পেতো পরী। সারা বাড়িতে এই একটা মানুষের কথাই মান্য করতে দেখা যেতো পরীকে। আর খুব ভালোও বাসতো। তাই সোনালীর কথার অবাধ্য পরী হয়নি। পনের বছর বয়সে পা দিয়েই খাতাটা খুলে বসেছে। কিন্তু সোনালীর এরকম

শর্ত দেওয়ার মানে আজও বুঝে উঠতে পারেনি পরী। স্মৃতিচারণ করতে করতে পরবর্তী পাতা উল্টায় পরী। সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা,”পাতা উল্টে দেখো একটা গল্প লেখা। এই গল্পটি পরী ছাড়া অন্য কারো পড়া মানা।”আনমনে হাসলো পরী। তারপর পাতাটা উল্টে ফেলে।

“ভালোবাসা কি সেটা আমাকে রাখাল শিখিয়েছে। ভালোবাসা, ভালোলাগা,মায়া একটা মেয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝে না যতক্ষণ না সে প্রেম নিবেদন পায়!আর তার চোখে না কাউকে ভালো লাগে!এই দুটো জিনিস ছাড়া কারো পক্ষে ভালোবাসা বোঝা অসম্ভব। এসব আমাকে রাখালই বুঝিয়েছে। বুঝতাম

না যে ভালোবাসা কি? কাউকে কখনো ভালো ও লাগেনি। এমনকি বুঝতেও পারিনি যে আদৌ আমার কাউকে ভালো লাগে কি না? সেদিন ওই রাখালই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে আমার ভালো লাগা আমাকেই বুঝিয়েছে। অবাক করে দিয়েছে আমাকে।

স্কুল থেকে ফেরার সময়ে রাস্তায় দেখা হতো রাখালের সাথে। সে নাকি আমার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রথমে অতো কিছু ভাবতামই না। চৌদ্দ বছর বয়সে আর কতো বুঝবো?একটি সে কোথা থেকে এসে হাতে একটা চিঠি গুজে দিয়ে গেল। আমি আবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সানু আর দিপা

দুপাশে থেকে ঠেলা মেরে সেদিন অনেক রসিকতা করেছিল। বাড়িতে এসে চিঠিটা খুলে একরাশ মুগ্ধতা ঘিরে ধরেছিল আমাকে। এত সুন্দর করে কেউ চিঠি লিখতে পারে তা আমি কখনোই ভাবিনি।আমি জানি পরী তোর এখন চিঠিটা পড়তে খুব ইচ্ছে করছে। পড়বি? তাহলে পরের পাতা উল্টা!!”

সত্যি পরীর জানতে ইচ্ছে করছে তাই সে দ্রুত পাতা উল্টায়। ভাতের দানাকে আঠা বানিয়ে চিঠিটা আটকানো রয়েছে খাতার পৃষ্ঠার সাথে। পরী সেটা খুলে পড়তে লাগলো,

স্বর্ণকেশী কন্যা সোনালী,

পত্রের শুরুতে প্রিয় বলে সম্বোধন করিনি কেন জানো? কারণ কারো

প্রিয় হতে গেলে তার মন জয় করতে হয়,তার অনুমতি নিতে হয়। আমি জানি না আমি তোমার প্রিয় কি না? কিন্তু তুমি আমার প্রিয়,আমার প্রিয়তমা। আমি জানি না কিভাবে তোমার মন জয় করতে হবে। তবে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আর উঠতেই পারছি না। এখন তুমি যদি আমাকে একটু

ওঠাও তাহলে খুব ভালো হয়। যখন ধান ক্ষেতের আইল ধরে হেঁটে যাও ধানের শীষে তোমার শরীরের ছোঁয়া লাগে। ঘাসগুলো তোমার কোমল পায়ের স্পর্শ অনুভব করে। আমার খুব হিংসে হয় আমি কেন পারিনা? বইগুলোর উপর ও রাগ হয় কারণ ওদের সবসময় বুকে চেপে ধরো। মনে হয় ওদের মেরে ভুত বানিয়ে

দেই। কিন্তু ওরা তো আর ব্যথা পায় না মেরে কি লাভ?তবে শুনে রাখো গজদন্তিনী তোমার হাসিতে আমি রোজ মরি। এভাবে প্রতিদিন না মেরে একেবারে মেরে ফেলো না? তাহলে খুব ভালো হয়। মরে গিয়েও বেঁচে যেতাম। ভয়ংকর সুন্দর হাসির থেকে।

তবে আবার বাঁচতে ও ইচ্ছে করে খুব। তোমার হাসিতে বারবার মরতে চাই আমি। দয়া করে বাঁচাও আমাকে!!!

রাখাল,,,,অধর জোড়া প্রশ্বস্ত করে হাসলো পরী। হারিকেনের লাল আলোয় অসম্ভব সুন্দরী ওই রমণীর হাসি জড় বস্তু গুলো ছাড়া কোন জীব দেখতে পারলো না। যদি কোন

পাখিও সেই হাসি দেখতো তবে নির্ঘাত সেই হাসিতে মুগ্ধ হতো।

এই প্রথম কারো প্রেমপত্র পড়লো পরী। পৃথিবীতে কেউ এতো ভালোভাবে চিঠি লিখতে পারে পরী তা আজ জানলো। রাখালের চিঠিটা না পড়লে হয়তো বুঝতোও না কখনো। চিঠিতে গজদন্তিনীর প্রসংশা করেছে রাখাল। বিন্দুর মতো

সোনালীর ও গজ দাঁত আছে। সেজন্যই বিন্দুর প্রতি পরীর টান টা অন্যরকম। বিন্দুর মধ্যে সোনালীকে দেখতে পায় সে। শুধু গাঁয়ের রং টাই পার্থক্য। পরী দেরি না করে পড়া শুরু করল। সেই চিঠিটা পড়েই সোনালী রাখালের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। তারপর ছোট ছোট প্রেম জড়ানো অনুভূতির কাহিনী লিখেছে

সোনালী। ভরা বর্ষায় রাখাল ওর জন্য কদম গুচ্ছ নিয়ে আসতো কখনো বেলি ফুল। স্কুলে যাওয়ার পথে লোকচক্ষুর অন্তরালে গুঁজে দিতো নিজের অদম্য অনুভূতি। শাপলা বিলে নৌকায় করে ঘুড়ে বেড়াতো দু'জনে। পদে পদে ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছে সোনালী।

“আকাশকে বিধাতা সুন্দর করে বানিয়েছেন।এই ধরণী তার থেকেও বেশি সুন্দর। আমার তা দেখতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় তুমি না থাকলে এই পৃথিবী সুন্দর লাগতো না। বৃষ্টি এতো মোহনীয় লাগতো না,ঘাসগুলো নেতিয়ে পড়তো,বিচিত্রময়ের ফুলগুলো বিচ্ছিরি রং নিতো, পদ্মার পানি

কালচে হয়ে যেতো, নূরনগর শ্রান্ত হয়ে পড়তো,আর এই রাখাল রং হারা হতো।”শান্ত নজরে সোনালী তার রাখালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতো। এতো ভালো সোনালী নিজেও রাখালকে বাসতে পারেনি। চোখের অশ্রু গুলো হানা দিলো কপোলদ্বয়ে। আনন্দ অশ্রু,যার সাথে রাখাল প্রতিদিন মিলিত হয়। এই

অশ্রু রাখালকে বড় শান্তি দেয়। ও বুঝে যায় এই স্বর্ণকেশী কন্যা ওর ভালোবাসা খুব করে বুঝে গেছে।

আরো কিছু ঘটনা তুলে ধরেছে সোনালী। শাপলা বিলে ঘুরতে গিয়ে আফতাবের কাছে ধরা খাওয়ার পরের কাহিনী। একের পর এক আঘাতে সেদিন চুর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল সোনালীর দেহখানা। রক্ত লাল দাগ

কেটে গিয়েছিল সারা শরীরে। কাঠের লাকড়ির মারের দাগে সাতদিন জ্বরে ভুগেছিল সে। তবুও রাখালের নাম ভোলেনি সে। এর পরের দিনগুলো আরো দূর্বিষহ হয়ে ওঠে। আঘাতে আঘাতে দিন কাটে ওর। মায়ের কাছে আসার সুযোগ ও থাকে না তখন। বন্দী ভাবে পড়ে থাকে নিজ কক্ষে। তার পরের

সবকিছু পরীর জানা। আফতাবের উপর রাগটা পরীর আরো বেড়ে যায় তখন। তবে ও পারে না দৌড়ে গিয়ে বোনের ঘরের দরজা খুলে দিতে। সেদিনের পর থেকেই পরী আর রুপালির বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেয় আফতাব। সাথে বাড়ির সব মহিলাদের ও।

তার পর আসে সেই দিন যেদিন সোনালী পালিয়ে যায় রাখালের সাথে। ওকে সাহায্য করেছিল রুপালি। রুপালির কাছে সানু প্রায়ই আসতো সোনালীর খবর নিতে তাও গোপনে।সেই সুযোগ লুফে নিলো সোনালী। ঘরের জানালা দিয়ে রুপালি আর পরী লুকিয়ে কথা বলতো বোনের সাথে। রুপালির

কাছে একখানা চিঠি গুঁজে দেয় সোনালী আর সেটা সানু পৌঁছে দেয় রাখালের কাছে। রাখালের কি অবস্থা হয়েছিল তা সোনালী জানতে পারেনি শুধু এটুকুই দেখেছিল যে লতিফ আর দেলোয়ার রাখালকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সোনালী তখনই বুঝতে পেরেছিল রাখালের সাথে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। আফতাব

বিয়ে ঠিক করে তার বড় মেয়ের আর তার মেয়ে নিজের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বের হয়ে যায় নিজ গৃহ ছেড়ে। দু'বার লোকলজ্জায় পড়ে গিয়ে আফতাব মেয়েকে আর ঘরে তুলতে চান না। তারপরে আর কিছু লেখা নেই। হয়তো এখানেই সমাপ্ত করেছে সোনালী। কিছু একটা ভেবে পরের পাতা উল্টায় পরী। সেখানে

লেখা আছে,“আমি ওই সাধারণ ছেলেটার পিছনে যতোটা ছুটেছি, রাজপ্রাসাদের রাজপুত্রের পিছনেও কেউ অতোটা ছুটবে না। ওকে ছেড়ে থাকি কি করে?তাই গন্তব্য দূর অজানায়, চলে যাচ্ছি আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না রে পরী।”

লেখাটার উপরে একফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো। সেটা পরীর চোখের

পানি। বুকের ভেতর টা মোচড়াচ্ছে খুব। তাহলে কি সোনালীর কথাটা সত্যি?আর কোনদিন দেখা হবে না বোনের সাথে?পরী পরের পাতায় দেখতে পেলো,

“তোর খুব কাছের মানুষগুলো তোর প্রিয় মানুষ গুলোকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলছে পরী। সময় হলে ঠিকই বুঝতে পারবি।”কথাটায় ধাক্কা

খেলো পরী। কাছের মানুষ প্রিয় মানুষকে আঘাত করে কিভাবে? তাহলে কি কাছের মানুষ আর প্রিয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে? ঠিকমতো মগজে ঢুকাতে পারছে না পরী। বোঝার জন্য পরের পৃষ্ঠায় গেলো তবে সেখানে কিছুই লেখা নেই। আরো কিছু পৃষ্ঠায় শুভ্র রংএর মেলা। তার মানে আর কিছু লেখা

নেই। সোনালীর লেখা শেষ বাক্যটা ভাবনায় ফেলে দিলো পরীকে। কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষের মানেটা পরীর মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। সোনালী আসলে কি বোঝাতে চাইছে পরীকে? এই রহস্য উদঘাটন করতে হলে মালার কাছে যেতে হবে। একমাত্র মালা'ই পারবে সোনালীর কথার মানে বোঝাতে। ওর কোন কাছের

মানুষ ওর প্রিয় মানুষকে আঘাত করছে তা জানতেই হবে!! ভাবনা গুলো আর ঘুমাতে দিলো না পনেরো বছরের কিশোরীটিকে। বাকি প্রহর বিনা নিদ্রায় পার করলো সে।ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে পরী। ফলে ওর ঘুম ভেঙ্গেছে দেরিতে। কাল রাতের কথা মনে পড়তেই ও ছুটে গেল মায়ের কাছে। কিন্তু মালাকে

অন্দরের কোথাও পেলো না। দরজার ফাঁক দিয়ে বৈঠক ঘরে চোখ পড়তেই মালাকে দেখল পরী। আসিফ আর শেখরের সাথে কথা বলছে মালা। পরী নিজের ঘরে চলে যেতে চেয়েও থেমে গেল। শেখর আর আসিফকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কথা শেষে যখন ওরা চলে গেল তখন ওদের পায়ের

দিকে তাকালো পরী। মৃদু হেসে সে দৌড়ে চলে গেল আর ভুলে গেল সোনালীর বলা কথাটা।মেঘেদের শব্দে উথাল পাথাল ধরণী। সূর্য লুকিয়েছে ছাই রঙা মেঘের আড়ালে। বৃষ্টি হচ্ছে,খুব বেশি না। তবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে যাবে। ছাউনির নিচে দাড়িয়ে শায়েরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

আছে পালক। খাবারের তদারকি করছে শায়ের। এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে সব কাজ করছে। কপাল বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। হাত দিয়ে বার বার পানি ঝারছে সে। শায়েরের বিরক্তি ভাব দেখে মৃদু হাসলো পালক। যদি অসুখ করে বৃষ্টিতে ভিজে! এই ভেবে মুখটা কালো করে ফেলে পালক।

তবুও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। সাদা পাঞ্জাবীতে আবৃত পুরুষটি বড্ড আকর্ষণ করছে ওকে।'মিস পালক সরকার অতো দেখো না। পুরুষটি মুসলিম,মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে রুমির দিকে তাকালো পালক। রুমি ঠোঁট টিপে হাসছে।

তারমানে রুমি কিছুটা বুঝেছে। শায়েরের দিকে তাকিয়েই পালক বলল,’ভালো লাগাটা ধর্ম দেখে হয় না,মানুষ দেখে হয়।’

‘বুঝি না এই গ্রামে এসে সবার হলো কি?নাঈম, শেখর,আসিফ তুই!!তবে তোর কথাটা আলাদা। এটা সম্ভব না।’

‘আমি সম্ভব করতে চাইও না।’

‘তাহলে ওভাবে দেখছিস কেন?’

পালক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,’কদিন ই তো আছি দেখলে তো কোন দোষ নেই। ‘

নিজের কাজে মন দিলো পালক। রুমি আর কথা বলল না। মেয়ে মানুষ অদ্ভুত,কখন কাকে নজর বন্দি করে ফেলে তা বোঝার উপায় নেই। কাজ শেষ করে সবাই একসাথে

এক নৌকাতে এসেছে। সাথে শায়ের ও ছিলো। জমিদার বাড়িতে ফিরে সবাই তাদের ঘরে গেল। পালকরা ওদের ঘরে গিয়ে চমকে গেল পরীকে দেখে। পালঙ্কের উপরে বসে পা দোলাচ্ছে। ওদের দেখেই নেমে কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠস্বর টেনে বলল,’আপনেরা শহরে ফিইরা যাবেন কবে?’

আকস্মিক প্রশ্নে চমকালো ওরা। পালক বলল, ‘কেন বলতো?’

‘যত তাড়াতাড়ি চইলা যাইবেন ততই ভাল। এই গেরামডা বেশি ভাল না। মরণ সব খানেই খারাইয়া থাহে।’

আবার চমকে যায় ওরা। মিষ্টি খানিকটা রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল,’কি সব আবোল তাবোল বকছো বলতো? আসার পর থেকেই দেখছি

আমাদের দেখতেই পারনা তুমি। আমরা তো ইচ্ছে করে এখানে আসিনি, আনা হয়েছে । মেহমানদের সাথে কিরকম আচরণ করতে হয় জানো না?ভাল না লাগলে বলো চলে যাই। এভাবে অপমান হতে তো আসিনি আমরা।আর আমরা বয়সে তোমার বড় তাও এভাবে কথা বলবে?’মিষ্টির কথায় হাসলো পরী

বলল, ‘আপনাগো ভালোর লাইগা কইতাছি। আর কি কইলেন?বয়সে বড়!! অন্যায় করলে আমি আমার বাপরেও ছাড় দিমু না।যাই হোক অন্দরে পুরুষ ঢোকা মানা এইডা তো জানেন?তারপরও দুই ডাক্তার সাহেব আইছিল। আমার হাতে পড়ে নাই ভাগ্য ভাল। মেহমান বইলা ছাইড়া দিলাম। সাবধান কইরা

দিয়েন। আর তাড়াতাড়ি চইলা যান। আমি রাইগা গেলে ভাল হবে না। আমি বয়স দেইখা না মানুষ দেইখা সম্মান দেই।’

পরী বের হতে গিয়েও ফিরে এসে মিষ্টির সামনে দাঁড়াল বলল,’বয়স কম কিন্তু রক্ত গরম।’ কথাটা বলার সময় চোখ থেকে আগুন ঝরছে পরীর। যেন ভষ্ম করে দেবে

মিষ্টিকে। পরী চলে যেতেই রাগটা বাড়লো মিষ্টির।

‘কি তেজ?ওরা এসেছিল বলে এতো রাগার কি আছে?’পালক একটু ভেবে বলল,’এই মেয়ের রাগটা তোর কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেও আমার কাছে স্বাভাবিক। কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি এই মেয়েটা পুরুষ

মানুষ বিশ্বাস করে না। এই দিক দিয়ে খুব কঠোর ও।’

‘তোর এমনটা কেন মনে হচ্ছ?আর ছেলে মানুষদের এত অপছন্দ কেন করে পরী?’

রুমির প্রশ্নে পালক বলল,’ঘৃণাটা হয়তো ওর বাবার থেকে শুরু। দ্বিতীয় বিয়ে আর পরীর বড় বোন সোনালীও এর মধ্যে হয়তো আছে।

অন্য কোন কারণ ও থাকতে পারে। তবে আমি এটা বুঝেছি যে পরী ওর বড় বোনকে অনেক বেশি ভালোবাসে। এজন্য ও মরিয়া হয়ে গেছে সোনালীকে খোঁজার জন্য।’

‘ভালো রহস্য উদঘাটন করেছিস তুই।’‘অনেক টাই বের করেছি। এই বাড়িটা অনেক অদ্ভুত। এতগুলো ঘর পড়ে আছে অথচ সব বন্ধ। সবচেয়ে

বড় কথা হলো পরীর কাকাকে অন্দরে ঢুকতে দেওয়া হয় না কেন? আর এত বয়স হওয়ার পর ও তিনি বিয়ে কেন করছেন না?আর দেখ পরীর মা অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পরী একটি বার ও মায়ের ঘরে গেল না। অথচ পরীর চোখে আমি ওর মায়ের জন্য ভালোবাসা দেখেছি। এর কারণ কি?পরী ইচ্ছে করে যায় না নাকি

পরীর মা চান না তার মেয়ে আসুক?’

পালকের কথাটা ভাবাচ্ছে ওদের দুজন কে। কিছু তো একটা গন্ডগোল আছে এই বাড়িতে। নিজের রাগ দমিয়ে মিষ্টি বলল, ‘কিন্তু এসবের মানে কি?সবকিছু ধোয়াশার মধ্যে রেখেছে কেন ওরা?’

‘কি জানি?তবে আমার মনে হয় সব প্রশ্নের জবাব একমাত্র পরীর মা দিতে পারবে।’একটু চুপ থেকে পালক আবার বলে উঠল, ‘আজ পরী পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না ঠিকই কিন্ত এমন একদিন আসবে যে ও নিজেই এক পুরুষে এমনভাবে আসক্ত হবে,তাকে ছাড়া ওর নিশ্বাস নেওয়া কঠিন হবে।’

আর কোন কথা কেউ বলল না। যে যার কাজে মন দিলো। এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই ওরা কদিন এর অতাথি মাত্র।

ভেলা নিয়ে বের হয়েছে বিন্দু। ওর বাবা মহেশ এসেছে। সাথে সাথেই চন্দনা ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। ঝড়ে আটকে গিয়েছিল মহেশ তাই আসতে পারেনি। আর এ নিয়ে

এলাহি কান্ড শুরু করে দিয়েছে চন্দনা। বিন্দু থাকতে না পেরে চলে এসেছে।একটু এগিয়ে যেতেই সম্পানের নৌকা দেখা গেল। বিন্দু তাকিয়ে রইল সেদিকে। নৌকার ভেতর লোক ছিল বিধায় দুজনের কথা হলো না। সম্পান ঝুকে একটা শাপলা তুলে ছুড়ে দিল। বিন্দু খপ করে ধরে নিলো সেটা। মুখে হাসি

ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল সম্পানের দিকে। শাপলাটা হাতে নিয়েই সে ঘুরে বেড়ায় তলিয়ে যাওয়া গ্রাম।পরী নিজের ঘরে বসে আছে। রাগ কমেছে ওর। নাঈম,শেখর কে ধরতে পারলে ও কি যে করত!! ওর কাছে ভাল পুরুষ মানুষ দুইজন। একজন সম্পান আরেকজন হলো রাখাল। বাকিদের ও ঘৃণা করে।

এসব ভাবতে ভাবতে পরী দোতলা থেকে নিচে নেমে এলো। আনমনে এগিয়ে গেল বৈঠক ঘরের দরজার দিকে। দরজা হাট করে খোলা। ওখান থেকে শায়েরের ঘরটা দেখা যায়। বারান্দায় থাকা কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে শায়ের। থমকে দাঁড়াল পরী। হঠাৎ ওর মনে পড়ল যে এই মানুষ টাকে দেখলে ওর রাগ

হয় না। কারণ টা পরীর অজানা। ঘুমন্ত মানুষ টার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরী। আচমকা হাতে টান পড়তেই সরে এল সে। গালে থাপ্পড় পড়তেই হুশ ফিরে পেল সে। মালা রেগে বলে,’ওইখানে কি করস?তোরে মানা করি নাই?’

মালার কথার উত্তর না দিয়ে পরী মালার হাত দুটো ধরে বলল,’আম্মা

আপনের তো অনেক জ্বর। আহেন, ঘরে তো ডাক্তার আছেই। 'মালা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,'তোর এতো ভাবতে হবে না যা ঘরে যা।'

মালার ধমকে পরী রাগ করে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা খুলে রাখার জন্য কুসুমের গালেও পড়লো একটা। মালা অনেক বকাবকি করলেন কুসুম কে। নিজের ঘরে

বসে রাগে ফুসছে পরী। মায়ের এই একটা স্বভাব ভাল লাগে না পরীর। মালার যতোই অসুখ হোক না কেন কখনোই পরীকে তার কাছে ঘেষতে দেন না। এমনকি তার ঘরে যাওয়ার অনুমতিও পরীর নেই। এমন কারণের কোন মানে আছে?এজন্য পরীর খুব রাগ হয়।

শাপলা হাতে বিন্দু আসতেই পরীর ধ্যান ভাঙে। বিন্দু হাসি মুখে এসে বলে,’আছোস কিবা পরী?সব ঠিকঠাক তো?’

‘হ,বয় এইহানে! তোর খবর কি? আর মাঝি?’

‘সবই ভালা,তবে আহার সময় দেখলাম শায়ের দাদা শুইয়া আছে। জিগাইলাম কইলো জ্বর হইছে।

আহারে মানুষ টা বড্ড ভাল। কেউই নাই এহন দেখব কেডা?’পরী চমকে তাকালো বিন্দুর দিকে। বলল,’জ্বর হইছে মানে?চল তো দেখি?’

বিন্দু পরীকে বাধা দিয়ে বলল,’পাগল তুই?জেডি দেখলে তোরে মারবো।’

পরী একটু ভেবে বলল,’তুই এক কাজ কর,বাটিতে কইরা পানি আর

কাপড় নিয়া পট্টি দে আমি ওষুধ আনতাছি।’

বিন্দুকে পাঠিয়ে পরী ছুটে গেল পালকের কাছে। জ্বরের ওষুধ চেয়ে নিয়ে বিন্দুকে দিয়ে পাঠায়। পালক ভেবেছিল মালার জন্য পরী ওষুধ নিচ্ছে। কিন্তু বারান্দায় আসতেই ওর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পালক ভাবতেও পারছে না যে পরী

শায়েরের কথা ভাবছে কেন?ওখানে বেশিক্ষণ থাকলো না পরী,মালা দেখলে রাগ করবে। দোতলায় উঠে পালকের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় পালক বলে উঠল, ‘আমি যতদূর জানি তুমি পুরুষ মানুষ পছন্দ কর না। তাহলে এই ছেলেটার জন্য এত কিছু করছো কেন?’উওর টা দিতে পারলো না পরী। নিজেকেও সে এই

একই প্রশ্ন পরী করেছে কিন্ত উওর খুঁজে পাচ্ছে না। তাই ও নিজের ঘরে চলে গেল। পালক আগের মত দাঁড়িয়ে রইল।

আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মিষ্টি গিয়ে নাঈম আর শেখরকে ধরল। রেগে বলল,’তোরা কি কখনোই মানুষ হবি না?’

শেখর মজা করে বলল,’কোন সন্দেহ আছে?’

‘গাধা একটা। পরী জেনে গেছে তোরা কাল রাতে ওর ঘরে গিয়েছিলি আর আমাদের হুমকি দিয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি চলে যাই।’নাঈম অবাক হয়ে বলে,’কি? পরী জানলো কিভাবে?কাল রাতে তো পরী বাড়িতেই ছিল না।’

নাঈম শেখর বাদে সবাই চমকালো। নাঈম বলল,’কালকে আমরা পরীকে দেখতে পারিনি। কারণ পরী অন্দরে ছিল না। বাইরে ছিল, কিন্ত কোথায় গিয়েছিল তা জানি না। আর পরী যদি থাকত তাহলে আমরা ধরা খেতাম’

সবাই বেশ অবাক হয়ে গেল। রুমি বলে,’তাহলে পরী বুঝলো কিভাবে যে তোরাই এসেছিলি?’

পালক বলল,’এটুকুই বয়সে যথেষ্ট বুদ্ধির অধিকারি হয়েছে মেয়েটা। আর পরী এটাও বুঝেছে যে তোরা দুজন এসেছিলি।’

‘ওসব বাদ দে চল আমরা চলে যাই। আমার এই যায়গাটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। বিপদ হতে পারে।’

মিষ্টির কথায় নাঈম বলল, ‘আমরা কেন যাব?কাজে এসেছি কাজ শেষ করে তারপর যাব।’

‘তাহলে পরীর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।’নাঈম জবাব দেয়ার আগেই পালক বলল, ‘মিষ্টি ঠিক

কথা বলেছে নাঈম। পরীর কথা মাথা থেকে বের করে দে তাহলে আমাদের সবার ভাল। পরীর মধ্যে কিছু একটা আছে। গোপন কোন রহস্য। যার জন্য ও নিজেকে শক্তিশালী মনে করে। তাই আমাদের ভালোর জন্য হলেও এসব চিন্তা বাদ দে।’

নাঈম কথা না বলে স্থান ত্যাগ করল। তবে ওর চিন্তা তরতর করে বেড়ে গেল। সবখানে এত রহস্যের গন্ধ কেন?এখন ওর মনে হচ্ছে এই গ্রামটাই রহস্যজনক। কারো মুখে জমিদার বাড়ির কোন কথা শোনা যায় না। ভালো মন্দ কোন কথা না। জানার আগ্রহ আরও বাড়ছে

নাঈমের। কিছু তো একটা গোপন তথ্য আছে ওই বাড়িতে।

কাজ শেষ করে ফিরতেই শায়েরের মুখোমুখি হয় নাঈম।

‘আপনার জ্বর এখন কেমন?’বিগলিত হেসে শায়ের জবাব দিলো,’কাজের মানুষ আমি,জ্বরের কথা ভাবলে হবে?’

‘নিজের শরীরের কথাও ভাবতে হবে। কালকে বৃষ্টিতে ভেজা আপনার উচিত হয়নি। এই সময় একটু সাবধানে থাকবেন। ‘

‘আচ্ছা থাকব।’

‘শুনুন!’

শায়ের চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল। নাঈম বলল, ‘এই বাড়ির ভেতরে বোধহয় অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

আমার বন্ধুরা তাই বলল। আপনি কি কিছু জানেন?’

‘আমার জানা মতে জমিদারের তিন কন্যা আর এক পুত্র। এবং দুই বউ। আর একটা ভাই আছে। বাড়িতে কাজের লোক আছে পাহারাদার আছে। আর কি জানতে চান?’

নাঈম আমতা আমতা করে বলল,’মানে পরী,,!’‘এই নামটা ভুলে

যান। গ্রামের প্রায় সব মানুষ পরীকে চিনলেও স্বীকার করে না আপনিও তাই করুন ভাল হবে। এর বেশি কিছুই আমি জানি না। আর আপনি জানার চেষ্টাও করবেন না।’

কথাগুলো গম্ভীর কণ্ঠে বলল শায়ের। নাঈমের অদ্ভুত লাগল শায়েরের কথাগুলো। এভাবে বলল কেন? ওহ শায়ের তো জমিদারের লোক। যদি

সবাইকে বলে দেয়? ইশ ভুল যায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। রাতের বেলা ঘটে গেল অনাকাঙ্খিত ঘটনা। যা নাঈম কল্পনাও করতে পারেনি। রাতে খবর এলো বাগান বাড়িতে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কোন কিছু না ভেবে নাঈম একজন মাঝিকে নিয়ে একাই গেল। তবে ফেরার পথে হলো সমস্যা।

অন্ধকারের মধ্যে কেউ শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করে নাঈমের মাথার পেছনে। পড়ে গেল নাঈম, ব্যাথায় গোঙাতে লাগল। মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে কি না অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। অজ্ঞান না হলেও সব কিছু ঝাপসা দেখছে সে।এভাবেই কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবে কেউ এলো না। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে

আসছে। আর কিছুক্ষণ পর হয়তো ও মারা যাবে। ঠিক তখনই হাজির হলো শায়ের। হারিকেন হাতে নিয়ে কাছে আসতেই দেখল নাঈম বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। শায়ের ছুটে গেল। চিৎকার করে কাউকে ডাকলো।সবাই ধরাধরি করে নাঈমকে বাড়িতে নিয়ে এলো। আসিফ আর শেখর মিলে নাঈমের

মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিলো। আঘাত তত গুরুতর না। রক্ত ও বেশি বের হয়নি। নাঈমের জ্ঞান এখন ও আছে। ও ভাবছে কে করতে পারে কাজটা?পরী?হয়তো, কারণ ওর জানা মতে রাতে পরী বের হয়। আবার ভাবছে শায়ের ও হতে পারে। কারণ আজকে শায়েরের কথাগুলো ভাল লাগেনি। তাহলে

শায়ের ওকে বাচালো কেন?যাতে নাঈমের সন্দেহ না হয় সেজন্যই কি?নাঈম নিজের ঘরে শুয়ে আছে। মাথার মধ্যে হালকা

ব্যথা অনুভব করছে। যার জন্য মাথাটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে নাঈমের। জ্বর ও এসেছে গায়ে। আজকে ওদের কেউই বের হয়নি। সবাই এখন নাঈমের পাশেই বসে

আছে। মিষ্টি ভিশন ক্ষেপেছে পরীর উপর। ওর ধারণা পরীই একাজ করেছে। কিন্ত কিছু বলতে পারছেনা। ওর খুব ভয় করছে। এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তখনই ঘরে প্রবেশ করল শায়ের। নাঈমের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,’এখন কেমন আছেন?’

নাঈম চোখ তুলে তাকিয়ে আলতো হাসলো,'জ্বী ভালো।'

চেয়ার টেনে বসে শায়ের বলল,'ভাগ্য ভাল যে আমি ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলাম। রাতে জ্বরটা বেড়েছিল। ভাবলাম বের হব না। আল্লাহ ই নিয়ে গেছে আমাকে।''আপনার কি মনে হয়? মানে কাজটা কে করতে পারে?'

‘আমার মনে হয় বিপক্ষ দল একাজ করেছে। আর নয়তো আপনার উপর কারো ক্ষোভ ছিল। আপনার সাথে কি কারো মনোমালিন্য হয়েছিল?’

নাঈম মাথা নেড়ে না বলল।

‘তাহলে বুঝতে পারছি না। বন্যার কারনে লোকজন ও লাগাতে পারছি না।’

পালক বলে উঠল,’জমিদার এবং ওনার ভাই এখন কোথায়?দেখছি না তো?’

‘ওনারা শহরে গিয়েছেন। দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আমি এখন আসি।’

শায়ের উঠে চলে গেল। মিষ্টি বলল,’আমি নিশ্চিত কাজটা পরী করেছে।’

পালক শায়েরের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,’ছেলেটা অদ্ভুত,মেয়েদের চোখের দিকে তাকিয়ে কখনোই কথা বলে না।’‘ওই অদ্ভুত এর মধ্যে ভুত আছে। এটা জমিদার বাড়ি় নাকি ভুতের বাড়ি় বুঝিনা। শোন নাঈম আমি আর কোন কথা শুনব না। এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি।’

নাঈম কে শাসিয়ে কথাটা বলে মিষ্টি। প্রতুত্যরে নাঈম বলল,'আমাকে পরীর সাথে কথা বলতে হবে। কাজটা কি সে সত্যিই করেছে?'

'পরী আপার লগে দেহা করার কথা ভুইলা যান সাহেব। আপার পরাণ থাকতে বেডা মাইনষের সামনে আইব না।'

হাতে ফলের থালা নিয়ে ঘরের ভেতর এলো কুসুম। তারপর আবারও বলতে লাগল, ‘পরী আপা আমারে পাঠাইছে আপনাগো সব কইতে। জানেন তো আমাগো বড় মা আপারে কসম দিছে হেয় যেন কোন পুরুষরে মুখ না দেহায়। কিন্তু ক্যান কসম দিছে তা আপাও জানে না। আপনাগো কেউ অন্দরে গেছিল

আপা জানে কিন্তু হেয় আপনাগো ক্ষতি চায় না।এই গেরামের মানুষ একে অন্যের শত্রু। তাই আপা চায় আপনাগো ক্ষতি না হোক। আর আপনাগো সাবধান থাকতে কইছে। রাইতের বেলা বাইর হবেন না। সবসময় শায়ের ভাইয়ের সাথে থাকবেন। '

কথা শেষ করে কুসুম চলে গেল। কুসুমের কথার মানে পুরোপুরি কেউ না বুঝলেও পালক বুঝেছে। ও বলল,'তার মানে মালা বেগম এর কসমের জন্য পরী কারো সামনে আসে না। এমনকি নিজের চাচার সামনেও না। কারণ কি?পরীর রুপ? নাকি এর মধ্যে অন্য কারণ আছে?''বেশি ভাবিস না পালক।

ওদের সম্পর্কে জানার দরকার নেই। আজ নাঈমের উপর হামলা করেছে কাল আমাদের উপর ও করতে পারে!তার থেকে ভাল আমরা এখান থেকে চলে যাই।’

ভয় জড়ানো কন্ঠে বলল রুমি। নাঈম এবার রাগ করে বলে,’তোরা থামবি?এক চিন্তায় মরে যাচ্ছি আরেক চিন্তা ঢোকাচ্ছিস মাথায়।

আমার মনে হচ্ছে কুসুম সব কথা বলেনি। এই বাড়ির সবাই আমাদের থেকে কিছু আড়াল করছে।'

'অন্দরে যা হচ্ছে তা সবকিছু পরীর মা জানে। কিন্তু আমার মাথায় যেভাবনাটা ঢুকেছে সেটা হলো পরীর চাচা।'

পালকের কথায় শেখর বলল, 'বিয়ে করেনি তাইতো?তার বউ হয়তো

মারা গেছে। এজন্য আর বিয়ে করেনি। আর এসব ব্যাপার বাদ দে তো। আমরা দুদিনের অতিথি বলতে গেলে। কারো পারিবারিক বিষয়ে জেনে কি হবে?’

আসিফ বলল,’সেটাই ঠিক। বেশি গোয়েন্দাগিরি করলে শেষে আমাদের ই বিপদ।’কেউ আর কোন কথা বলল না। নাঈম ভাবছে, শায়েরের

কথা শুনে মনে হল ও কিছুই করেনি। কিন্তু কে করেছে?মাথা ফেটে যাচ্ছে নাঈমের। অন্যদিকে পালক ভাবছে মালার কথা। মালা হয়তো অনেক কিছুই জানে। কিন্তু কি জানে?

কুসুম ছুটে গেল পরীর কাছে। এতক্ষণ সব লুকিয়ে শুনেছে সে। পরীকে খবরটা দিতেই ছুটে গেল।

পরীর সামনে গিয়ে হাপাতে হাপাতে সব বলল। সব শুনে পরী মুচকি হাসল বলল,’শহরে বাবু পরীর লগে কথা কইতে চায়। এতো সপন দেহা ভাল না কুসুম। পরী তারে কিছুই করব না। পরীর বাপে জানলে অনেক কিছু করবো।’

‘একখান কথা জিগাই আপা?বড় মা আপনেরে কসম দিছে ক্যান?’

‘জানি নারে কুসুম। আম্মার মনে অনেক কষ্ট। সোনা আপার তো কোন খবর নাই। রুপা আপা থাকতেও নাই। আমারে নিয়া অনেক চিন্তা করে আম্মা। রুপ থাকা হইল অভিশাপ রে কুসুম। ‘‘কন কি আপা?আপনে মেলা সুন্দর। যার লগে আপনার বিয়া হইবে হেয় অনেক ভাগ্যবান। ‘

‘নারে কুসুম। রুপ আছিল বইলা সবাই সোনা আপার দিকে খারাপ নজরে তাকাইতো। রুপা আপারে তো,’

একটু থামল পরী। ধরা গলায় বলল,’আমার দিকে কেউ খারাপ নজর না দেয় তাই আম্মা কসম দিছে আমি যেন কাউরে মুখ না দেহাই। পুরুষ মাইনষের নজর খুব

খারাপ। মন চায় চোখ দুইটা উঠাইয়া ফালাই।’

কুসুম চুপ করে রইল। রাগে শরীর কাপছে পরীর। কুসুমের মনে হলো পরী বোধহয় কারো লালসার শিকার হয়েছিল। কিন্ত জিজ্ঞেস করল না। পরীকেই বলতে দিলো।

‘আজকের পুরুষ মানুষ সুন্দর কিছু দেইখা মুগ্ধ হয় না। লালসার চোখে

দেখে। সুন্দর ছুঁতে পাগল হয় তারা। হিংস্র থাবা দিয়ে সব সৌন্দর্য শ্যাষ কইরা দেয়।আমার কাছে ওই পুরুষগো বাঁচার দরকার নাই। জানস কুসুম আমি একটা মানুষ রে খুন করতে চাই।যে তিন তিনটা জীবন নষ্ট করতে চাইছিল।’

চমকালো কুসুম, পরীর দিকে তাকিয়ে ভাবল এত সুন্দর ফুলকে

কে নষ্ট করতে চেয়েছিল?সে বলল, ‘কেডা আপা?’

মুহূর্তেই পরীর ভাব গতি বদলে গেল বলল,’তা দিয়া তুই কি করবি?আম্মা আইবো কহন?’

একটু ভয় পেল কুসুম। এতক্ষণ তো ভাল করে কথা বলছিল এখন আবার হলো কি?কুসুম

বলল,’কবিরাজ দেহান হইলেই আইব।’

‘তুই যা এহন।’কুসুম কোনোমতে ছুটে পালালো। পরী জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে রুপালির কথা ভিশন মনে পড়ছে পরীর। অনেক দিন দেখে না রুপালিকে। প্রিয়জন দূরে থাকলে বুঝি এমন কষ্ট হয়। পানি এলো পরীর চোখে।

বোনদের খুব মনে পড়ে ওর। যাদের সাথে শৈশব কেটেছে আজ তারাই নেই।

রাতে মালার অবস্থার অবনতি হলো। কবিরাজ দেখিয়ে কোন লাভ হলো না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মালার। জেসমিন মালার পাশে বসে চোখের পানি ফেলছে।পরীকে খবর দিতে না চাইলেও সে খবর পেয়ে যায়।

জুম্মান গিয়ে পরীকে খবর দিতেই পরী ছুটলো মায়ের ঘরের দিকে। পথিমধ্যে কিছু একটা ভেবে থেমে গেল পরী তারপর আবারও ছুটল পালকদের ঘরে। পরীর কথা শুনে ওরা সবাই ছুটে গেল মালার ঘরে। মালা তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সবাইকে একসাথে আসতে দেখে জেসমিন আতকে ওঠে। পালক

এগিয়ে এসে বলল,’কি হয়েছে ওনার?আমাকে দেখতে দিন?’

জেসমিন বলে উঠল, ‘তোমরা সবাই চইলা যাও।আপা এমনেই ঠিক হইয়া যাইব।’

পরী ক্ষেপে গেল জেসমিন এর উপর বলল,’বাধা দেন ক্যান?আমার আম্মা ভাল হইলে তো আপনার ক্ষতি তাই না?আমার আম্মার যদি কিছু হয়

তাইলে ভাল হইব না। সইরা যান কইতাছি।'জেসমিন কাঁদতে কাঁদতে পরীর হাত ধরে বলল, 'পরী তুমি চইলা যাও। আপার ভাল চাই দেইখা কইতাছি। '

গর্জে ওঠে পরী,'হাত ছাড়েন আমার। ওই বুড়ি আর আপনে আম্মারে খালি কবিরাজের কাছে নিয়া যান যাতে আম্মা ভাল না হয়। আমি এইবার

সব বুঝছি। আপনেগো কারণে আমি আম্মার ঘরে আইতে পারি না। আম্মা আগে ভাল হোক তারপর ওই বুড়িরে আমি ওর স্বোয়ামির কাছে পাঠায় দিমু। ডাক্তার আপা আপনে আম্মারে দেখেন।'

মাথা নেড়ে পালক কাছে যেতে জেসমিন আবারও না করছে। উপস্থিত সবাই অবাক হচ্ছে।

জেসমিন এরকম করছে কেন?পরী বারবার অপমান করছে তবুও জেসমিন মানছে না। শেষে পরী আর রুমি টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো জেসমিন কে। মিষ্টি ও চলে এসেছে।

ঘন্টা খানেক পালক ছিল মালার কাছে। মালাকে একটু সুস্থ করে পালক বাইরে আসতেই পরী

বলল,’কি হইছে আম্মার?আম্মা ভাল হইব তো?’পালক কিছু না বলে জেসমিন কে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল বাকিদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলল।পরীর তর সইছে না। রুমি পরীকে শান্তনা দিলো কারণ মেয়েটা শব্দ করে না কাঁদলেও চোখ থেকে পানি ঝরছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর পালক এসে পরীকে বলল,’পরী তোমার মায়ের অবস্থা বেশি ভাল না। শহরে নিয়ে গেলে তোমার মা ভাল হয়ে যাবে। যা করার জলদি করতে হবে। কবিরাজ তোমার মা’কে ভাল করতে পারবে না।’

পরীর ভয় হলো মালাকে নিয়ে। মালার কিছু হলে পরী কাকে নিয়ে

থাকবে?শরীর ঝাকুনি দিয়ে উঠল। চেষ্টা করেও নিজেকে শক্ত রাখতে পারছে না পরী। মায়ের প্রতি সব মেয়েরাই দূর্বল হয়। সব কষ্ট তারা হাসিমুখে মেনে নিলেও মায়ের কষ্ট মানতে পারে না। নারীর মন কোমল পদ্মের ন্যায় পরিস্ফুটিত। মায়ের জন্য মন চোখ দুটোই কাঁদছে পরীর। নিজেকে আজ দূর্বল মনে হচ্ছে।

পালক পরীর কাধে হাত রেখে বলল,’চিন্তার কোন কারণ নেই পরী। ভাল ডাক্তার দেখালে তোমার মা ভাল হয়ে যাবে।’পরী কৃতজ্ঞতার সহিত পালকের দিকে তাকালো। পালক সৌজন্য মূলক হাসি দিল। ঘরে গিয়ে পালক কারো সাথে কোন কথা বলল না।

সকালে কারো চিল্লানোর আওয়াজে ঘুম ভাঙে পালকের। বাইরে এসে দেখে মালা পরীকে মারছে।চুলের মুঠি ধরে মেরেই যাচ্ছে। জেসমিন মালার হাত ধরে টানছে। ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্ত পারছে না। পালক নিজেও দৌড়ে গেল। পরীকে ছাড়িয়ে বলল,'কি করছেন?এভাবে কেউ মারে নাকি?'

‘ওরে মাইরা ফালামু আমি। শরীর ভাল আছিল না দেইখা কাইল কিছুই কইতে পারি নাই। বড় মাইনষের মুখে মুখে তর্ক করা শিখছে ও। এমন মাইয়া লাগব না আমার।’

পরী বলল,’সব সময় আমার লগে এমন করেন ক্যান আম্মা। আমি আপনের ভাল চাই দেইখা,,,’

মালা পরীকে থামিয়ে বলল,’তোরে আমার ভাল দেখতে হইব না। তোর মুখ বন্ধ রাখলেই আমার ভাল। আল্লাহ এই কেমন মাইয়া আমার পেটে দিলা?’মালা বিলাপ করতে করতে চলে গেল। পরী রাগে ফুসতে ফুসতে নিজের ঘরে চলে গেল। জেসমিনের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য প্রায়ই পরী মার খেত

আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। মায়ের এরকম আচরণ পরীর ভাল লাগে না।আফতাব বিকেলে ফিরে এসেছে। কালকে আসার কথা ছিল কিন্ত আজকে হুট করেই চলে এসেছে। মালার অসুস্থতার খবর পালক নিজে আফতাবের কাছে বলল। এও বলল সে যেন মালাকে নিয়ে শহরে ভাল ডাক্তার দেখান।

নিজের পরিচিত একজন ডাক্তারের ঠিকানা ও পালক দিয়ে দিলো আফতাব কে। আফতাব দেরি করল না। পরদিন সকালে চলে গেল মালাকে নিয়ে। পরীকেও জানানো হলো না।মালাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সাথে আফতাব ও গিয়েছে একথা জানার পরেও পরী স্থির। অন্দরের উঠোনে মোড়া পেতে

জুম্মানের সাথে বসে বসে পেয়ারা খাচ্ছে। ব্যাগ নিয়ে বের হয়েছে পালক। পরীকে দেখে পালক একটা মোড়া টেনে বসে বলল,’তোমার মা’কে শহরে নিয়ে গেছে তোমার বাবা জানো?’

‘হুম,সকালে কুসুম কইলো।’

‘আচ্ছা পরী তোমার মা কবে থেকে এরকম অসুস্থ?’

পরীর খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বলে,'আম্মার অসুখ করলে কাউরে জানায় না। এমনকি আমারেও না। আম্মা কয় বড় বউগো নাকি এমনেই সব ত্যাগ করতে হয়।'কথাটা বলতে গিয়ে তাচ্ছিল্য করে হাসল পরী। পালক মুচকি হাসলো।

মেয়েরা যখন থেকে কোন বাড়ির বউ হয়ে পা রাখে তখন থেকেই সে

বাড়ির সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর দুঃখ গুলো ঘরের ময়লার ন্যায় ঝাট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। বাড়ির সকলের খেয়াল রেখে আর সময় থাকে না নিজের একটুখানি যত্ন নেওয়ার। হ্যা এটাই নারীর সংসার। নিজের গায়ে দাগ পড়লেও সংসারে এতটুকু দাগ লাগতে দেওয়া যাবে না।

মিষ্টি আর রুমি আসতেই পালক উঠে দাঁড়াল। পরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল,’ফিরে এসে তোমার সাথে অনেক গল্প করব পরী।’জবাবে পরী মাথা দোলায় শুধু। ওরা চলে যেতেই জুম্মান হেসে বলে,’এই আপা অনেক ভালো তাই না আপা?’

জুম্মানের কথায় পরী ও সায় দিলো। তারপর নিজের কাজে মন দিলো।

পালকের মনটা ভাল নেই কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। বৈঠক ঘরের উঠোনে পা রাখতেই শায়েরের সাথে দেখা। কিছু বলতে চেয়েও বলল না পালক। পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে নৌকায় উঠে সে। আজকে সবাই এক নৌকাতে

যাচ্ছে। সবাই চুপ করে আছে। শুধু পানিতে বৈঠা ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিরবতা ভেঙে নাঈম বলে উঠল,'বুঝলেন শায়ের সাহেব,জমিদার বাড়িটা ভিশন অদ্ভুত। বিশাল বাড়িতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন থাকে। কেমন ভুতের বাড়ি মনে হয়।'বাইরের দৃশ্য দেখছিল শায়ের। নাঈমের কথা শুনে

মুচকি হাসল বলল,'এখন ভুতের বাড়ি মনে হলেও একসময় লোক লস্করে পূর্ন ছিল এই বাড়ি। মাঝখান থেকে বন্যাই সব গুলিয়ে দিলো।'

কথাটা বলে আবার বাইরের দিকে তাকায় শায়ের। নাঈম আর কিছু বলল না। ভাবল শায়েরের মন হয়তো ভালো নেই। পালক শায়ের কে দেখছে। শায়েরের গোমড়া মুখটা

ওর ভাল লাগছে না। এমনিতেও খুব একটা হাসে না শায়ের। আজকে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বাগান বাড়িতে পৌছে পালক গেল শায়েরের পিছু পিছু। পালক কে নিজের সাথে আসতে দেখে দাঁড়াল শায়ের। পিছন ফিরে বলল, ‘কিছু বলবেন?’

পালক সহজ স্বীকারোক্তি দিলো,’হ্যা।’ শায়ের সোজা হয়ে দাঁড়াল। পালক জিজ্ঞেস করে,’আপনার মন খারাপ? তখন থেকে দেখছি চুপচাপ।’

‘শুধু কি এটুকুই জানতে চান?’শায়েরের প্রশ্নে অস্বস্তি বোধ করল পালক। কথা গুলিয়ে ফেলে সব। আমতা আমতা করতে লাগল

সে। পালকের অবস্থা দেখে শায়ের বলল,’আমার চোখ দুটোকে সস্তা ভাববেন না মিস পালক সরকার। আমার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সেটা আপনি জানেন না। সেটা হল আমার চোখের যার চোখ পড়ে তার মনের কথা আমার চোখ পড়ে নেয়।’ পালকের মনে ঝংঙ্কার তুলে চলে গেল শায়ের। থরথর করে কাপছে

সে। ভাবছে তাহলে কি শায়ের ওর অনুভূতি গুলো বুঝতে পেরেছে!! নাহলে তো এভাবে বলতো না। ওষ্ঠকোণে হাসি ফুটল পালকের। হাতের এপ্রোন শক্ত করে ধরে নিজের চেয়ারে বসল। এখনও তো শায়ের কে কিছুই বলেনি তাতেই এতো খুশি পালক। তাহলে ভালোবাসি বললে কত খুশি হবে?

তারমানে ভালোবাসি কথাটা বলার মাঝে আনন্দ আছে?কতটা আনন্দ? ভাবতে ভাবতে মুচকি হাসল পালক। এটাও ভাবল যে আজকে সব বলবে শায়ের কে। যদিও শায়ের তাকে মানবে না। তবুও অপূর্ণতা নিয়ে সে যাবে না।

বন্যার পানি কমতে শুরু করে দিয়েছে। দিন দশেকের মধ্যে পদ্মা

তার পানি ফিরিয়ে নিবে মনে হয়। এদিক দিয়ে পালক দের তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। গ্রামের সবাই কে ওরা মোটামুটি সচেতন করে ফেলেছে। তাই ওরা গ্রামের মানুষদের সাথে একটু বেশি সময় কাটাচ্ছে। সবাই কে ওরা এই ক'দিনে আপন করে নিয়েছে। সাধারণত গ্রামের মানুষগুলো একটু

নোংরা হয়ে থাকে। বন্যায় দিক দিশা হারিয়ে সবাই আরো নোংরা হয়ে গেছে। কোন কিছুর ই তাদের ঠিক নেই। তবুও নাঈমরা নিজ হাতে সবাইকে সেবা দিয়েছে। যে মিষ্টি প্রথমে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেই মিষ্টিও সবাইকে আপন করে নিয়েছে। গ্রামের সবার দোয়া এখন ওদের মাথায়। কত বৃদ্ধা যে

নাঈমের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেছে তার হিসেব নেই।অনেক দিন পর সম্পানকে দেখল নাঈম। সাথে বিন্দু ও রয়েছে। হাতে থাকা ব্যাগটা থেকে লাল রঙের দুমুঠো কাচের চুড়ি বের করে বিন্দুর হাতে দিয়ে শুধালো,’লাল শাড়ি পইরা,হাতে এই লাল চুড়ি আর সিথিতে লাল সিন্দুর পইরা যহন আমার বউ হইয়া

আমার ঘরে আইবি তহন চোখ ভইরা তোরে দেখমু বিন্দু।'

লজ্জায় মাথা নত করে বিন্দু। সামনে থাকা পুরুষটিকে নিয়েই তার যত কল্পনা জল্পনা। তার ঘরের ঘরোনি হবে। শাখা সিদূর পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াবে আর সম্পান সুমধুর কথা বলে লজ্জা দেবে বিন্দুকে। কিন্ত সম্পান তাকে এখনই লজ্জায়

আড়ষ্ঠ করে ফেলছে। সম্পান বুঝতে পারল বিন্দু লজ্জা পাচ্ছে তাই সে কথা ঘুরিয়ে বলল,’কাইল ভোরে শহরে যামু তোর লাইগা লাল শাড়ি আনমুনে। পারলে ভোরে দেহা করিস।’

-‘কিন্ত আমি তো ভোরে উঠতে পারি না।’

-‘তুই তো আবার ঘুম পাগল। এত ঘুম পাগল হইলে সংসার করা মুশকিল হবে তাই ঘুম কমা বিন্দু। পরাণে এতো ঘুম রাখিস না।’

-‘পরাণে তো তুমিও আছো। তোমারে নিয়া ঘুমাই।’দুষ্ট হাসলো বিন্দু সাথে সম্পান ও হাসলো। কিন্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নাঈম কে দেখে মিলিয়ে গেল বিন্দুর হাসি।

তড়িৎ গতিতে ‘যাই’ বলে চলে গেল। কিন্তু সম্পান ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নাঈম কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল,’নিজের ভালোবাসা তো ঠিকই পেয়ে গেছো অথচ আমার বেলায় অন্যায় কেনো সম্পান?তাহলে কি আমি ধরে নেব যার যার ভালোবাসা তার কাছে মূল্যবান বাকি সবই ঠুনকো?’

ঈষৎ চমকালো সম্পান। এই নাঈম কয়েকদিন আগে তার কাছে নিজের মনোভাব পোষণ করেছিল। বলেছিল সে পরীকে দেখতে চায় এবং খুব করে ভালোবাসতে চায়। সম্পানের কাছে আকুতি করে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু ভিতু সম্পান তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল সে কোন সাহায্য করতে পারবে না।

নাঈমের চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মায়া হয়েছিল সম্পানের কিন্তু তার কিছুই করার নেই। এই সুদর্শন পুরুষটিকে ফেরাতে মন চাইছিল না। এছাড়া যে কোন উপায় নেই সম্পান মাঝির কাছে। সে আস্তে করে বলল,'আমি কিছুই করতে পারমু না ডাক্তারবাবু। পরীর লগে কথা তো দূরের কথা জমিদার

বাড়ির ধারে কাছে যাওয়ার সাহস নাই আমার। ‘

-‘এতো ভয়ের কারণ কি সম্পান?’-‘কারণ আইজ থাইকা আট বছর আগে রাখাল দাদার যে অবস্থা হইছিল তা দেইখা ভয়ে কাপছিল পুরা গেরাম। তার পর থাইকা জমিদার বাড়ির কোন মাইয়ার দিকে তাকানোর সাহস কারো হয় নাই।

বিন্দু ও পারব না। আমি চাই না বিন্দুর কোন ক্ষতি হোক।’

কপালে দৃঢ় ভাজ পড়লো নাঈমের। রাখাল সম্পর্কে সে অবগত। সোনালী তার হাত ধরে পালিয়েছে। নাঈম আবার জিজ্ঞেস করে,’তুমি দেখেছিলে রাখাল কে? এখন ওরা কোথায় আছে?’

-‘জানি না। আমি তহন ছোড আছিলাম তাও আমার মনে আছে সব। আপনে যদি দেখতেন তাইলে আপনে ও পরীর আশেপাশে যাইতে চাইতেন না।আমি অখন যাই বাবু। একখান কথা কই, জমিদাররে যত ভাল দেখেন তত ভাল না। যেদিন রাখালরে মারছিল সবাই সেদিন বুঝছি আমি।’সম্পান চলে গেল।

নাঈম বুঝল রাখালের মারাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সবাই এখনও জমিদারের ভয়ে তটস্থ। এজন্য কোন পুরুষ জমিদার বাড়িতে যায় না।তবে কি রাখালের সাথে ভয়ংকর কিছু হয়েছিল?তাই হবে?নাহলে সম্পান এতো ভয় পেতো না। তবে ওরা দুজন এতো কিছুর পরেও একসাথে

আছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

সম্পানের কথাগুলো যেন নাঈমের ইচ্ছা আরো বাড়িয়ে দিলো। পরীর কথা সে কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারছে না। প্রতিটি মুহূর্ত তার পরীকে ভেবেই কাটে। এরই মধ্যে সন্ধ্যা হতে চলল। সঙ্গে ঝড়ের পূর্বাভাস। মৃদু বাতাসে ছেয়ে গেল

চারিদিক। মিষ্টি,রুমি আর আসিফ এসে নৌকায় চড়ে বসে। বড় নৌকা আজ নেই। তাই দুটো ছোট নৌকা ঘাটে বাধা। রুমিদের নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। তখনই মিষ্টি বলে উঠল,'এই যা,পালককে ফেলে চলে এলাম।'-'পালক পরের নৌকায় আসবে চিন্তা করিস না।'

আসিফের কথায় শান্ত হলো মিষ্টি। নৌকা জমিদার বাড়ির সামনে থামতেই ওরা নেমে ভেতরে গেল। অন্দরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় আসতেই ওরা দেখতে পেল হারিকেন হাতে পরী এদিকে আসছে। পরীর একহাতে হারিকেন আরেক হাত দিয়ে পরনের ঘাগড়া সামান্য উঁচু করে ধরেছে। লাল

আলোতে শোভা পাচ্ছে পরীর সৌন্দর্য যা দেখে ঈর্ষান্বিত হলো মিষ্টি। কিন্ত সে চুপ রইল। পরী কাছে এসে জানতে চাইল পালক কোথায়?রুমি জবাব দিলো সে পরের নৌকাতে আসছে। পরী একথা শুনে কুসুম কে ডাকতে ডাকতে নিচে চলে গেল।

নিজেদের কক্ষে গিয়ে মিষ্টি ক্ষোভ প্রকাশ করল। তেজি গলায় বলল, ‘এই মেয়েকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।’-‘ওর মতো সুন্দর না তুই এর জন্য?’

-‘নাহ ওর মতো সুন্দর হতেও চাই না। কিন্ত ওর জেদ দেখলে আমার বিরক্ত লাগে।’

-‘এতটুকু বয়সে এতো সাহস সঞ্চয় করতে সবাই পারে না। কিন্ত পরীর মধ্যে সে সাহস আছে। আছে যথেষ্ট বুদ্ধি। শক্তি দিয়ে না হলেও বুদ্ধি দিয়ে ও একশ জনের সাথে লড়তে পারবে।’

বিপরীতে জবাব দিল না মিষ্টি। চুপচাপ পোশাক বদলে পালঙ্কে সটান হয়ে শুয়ে রইল।

প্রহর বাড়তেই রুমির চিন্তা হলো। পালক তো এখনও এলো না। চারিদিকে প্রবল বেগে বাতাস বইছে। তাহলে কি ওরা আসতে পারেনি?মিষ্টি ঘুমাচ্ছে তাই রুমি গেল বৈঠক ঘরে। নাঈমদের কক্ষের দরজায় পরপর কয়েকবার টোকা দিতেই শেখর এসে দরজা খুলল। রুমি অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে

বলল,'তোরা চলে এসেছিস তাহলে পালক কোথায়?'বিস্মিত কণ্ঠস্বরে শেখর বলে,'তোদের সাথে আসেনি? আমরা তো ভাবলাম তোরা একসাথে এসেছিস।'

নাঈম শুয়ে ছিল। সে উঠে এসে বলল,'তাহলে পালক কোথায়?বাগান বাড়িতে আটকা পড়ল নাকি?'

-‘তাই হবে,তোরা পালককে আনার ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি।’

রুমিকে আশ্বাস দিয়ে নাঈম ছুটে গেল শায়েরের ঘরে। শায়ের ওদের সাথেই ফিরেছে। নাঈমের মুখে পালকের কথা শুনে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাগান বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে। প্রবল বাতাসের মধ্যেই

নাঈম,শেখর,আসিফ আর শায়ের বেরিয়ে পড়লো।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙে পরীর। কেন যেন অস্থির অস্থির লাগছে ওর। এই ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যেও ঘামতে লাগল পরী। একটা স্বপ্ন দেখেছে সে কিন্তু কি দেখেছে তা মনে করতে পারছে না। এমনটা মাঝে মাঝেই হয় পরীর সাথে। স্বপ্নে কি দেখে তা

কিছুতেই মনে করতে পারে না। সে কি সুস্বপ্ন দেখেছে নাকি দুঃস্বপ্ন? ভাবতে ভাবতে পরী হাটু জড়ো করে অন্ধকার কক্ষে বসে রইল। এভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। আর ঘুমাতে পারল না পরী। তবে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো।মোরগ ডাকার সাথে সাথেই কুসুম আর জুম্মান ছুটে এলো পরীর ঘরে। কুসুমের ডাকে

ধড়ফড়িয়ে ওঠে পরী। কিন্তু কুসুম কথা বলতে পারছে না শুধু হাপাচ্ছে। পরী তাকিয়েই রইল। কুসুম নিজেকে ধাতস্থ করে বলল,’পরী আপা সর্বনাশ হইয়া গেছে। কাইল রাইতে ডাক্তার আপা বন্যার পানিতে ডুইবা মইরা গেছে।’ কুসুমের কথাটা শুনে পরীর শরীর ঝাকুনি দিয়ে উঠল। কাপতে লাগল

সর্বাঙ্গ। কুসুম ডাক্তার আপা বলতে কাকে বোঝালো?প্রশ্ন টা করতে পারে না পরী। ঠোঁট দুটো তার অসম্ভব ভাবে কাপছে। পরীর চাহনি দেখে জুম্মান বলল,’ওই ভাল ডাক্তার আপা। আপা বাইরে লাশ আনছে।’পরীর কানে একটা কথা বাজতে লাগল,’ফিরে এসে তোমার সাথে অনেক গল্প করব পরী।’

আর বসে থাকতে পারল না পরী। ছুট লাগালো সে। সিড়ি ভেঙে নিচে এসে যেই না বৈঠক ঘরের দিকে যাবে তখনই মালা চেপে ধরে পরীর হাত। একটানে পরীকে এনে বুকে চেপে ধরে মালা। মালাকে দেখে পরী অবাক হয় না বরং শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মালাকে। পরীর মুখ থেকে বার বার আম্মা শব্দটি বের

হয়।রাতের ঝড়ে যে এতো বড় তান্ডব চালাবে তা নূরনগরের কারো জানা ছিল না। সে যে একটা নিষ্পাপ প্রাণ কেড়ে নিল। কিন্ত পালক কিভাবে পানিতে পড়ে গেল তা কেউই বুঝতে পারল না। পানির কাছেই বা কেন গেল?ইতোমধ্যেই সারা গ্রামে পালকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের পানি

ফেলছে অনেকেই। মেয়েটা অনেক ভাল ছিল এই কথাটা সবার মুখে শোনা গেল। ভিড় জমেছে জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গনে। নারী পুরুষ বাচ্চাদের আনাগোনা বাড়ছে। শহুরে ডাক্তারের লাশ দেখে যাচ্ছে এক এক করে।সাদা কাপড়ে ঢাকা পালকের নিথর দেহ পড়ে আছে। তার থেকে খানিকটা দূরে রুমি

কাদার মধ্যে বসে আছে ওর পাশে মিষ্টি একই ভাবে বসে আছে। মাঝরাতে যখন এই লৌহমর্ষক খবরটা পেলো তখন থেকেই কেঁদেছে। কিন্ত এখন কাঁদার শক্তি দুজনেই হারিয়েছে। তাই শুধু পালকের লাশের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির সে দৃষ্টি। কিছুটা দূরে গাছের শেকড়ের উপর নাঈম আর

শেখর বসে আছে। আসিফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে যখন সবাই বাগান বাড়িতে পৌঁছালো তখন ঝড় একটু কমেছে। পুরো বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পালককে ওরা পেল না। ওদের সাথে গ্রামের লোকেরাও খুজল। কিন্তু পেল না। কেউ একজন বাড়ির পেছনে গেল খুঁজতে। যেখানে কেউই

যায় না। পানিতে উপুড় হয়ে ভাসছে পালক। হারিকেনের আলোয় লোকটা ভালো করে কিছু দেখল না তবে চিৎকার দিয়ে সবাইকে ডাকল। কয়েকজন শায়েরের আদেশে সাথে সাথেই পানিতে নেমে পড়ল। সবাই মিলে ধরাধরি করে পালককে ডাঙায় তুলে আনে। নাঈম দ্রুত পালকের হাত ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই ছেড়ে

দিয়ে নিজের শরীরের ভর ছেড়ে দিল মাটিতে। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। শেখর আসিফ বুঝেও ছুটে গিয়ে পালকের হাত ধরল এবং ওরাও নাঈমের পাশে বসে পড়ল। এটুকু সময়ের মধ্যে কি হয়ে গেল?

রাতেই পালককে জমিদার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রুমি মিষ্টি এসে

পালকের লাশ দেখেই কাঁদতে লাগল। ওভাবেই সকাল হয়ে গেল। নাঈম পালকের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। এই পালকের সাথে কত মজা করেছে ওরা। একসাথে ক্লাস করেছে গল্প করেছে। একসাথে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। কত আনন্দ করে ছ'জন এই গ্রামে এসেছিল। এখন ফিরতে হবে

পাঁচজন কে। ভাবতেই অবাক লাগছে। নাঈমের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে পালক আর নেই। পানিতে ডুবে মারা গেছে। কি অদ্ভুত,যে পানি মানুষের জীবন বাঁচায় সেই পানিই মানুষের জীবন কেড়ে নেয়।

পালকের মৃত্যুটা শায়ের ও মানতে পারছে না। হঠাৎই এরকম ঘটনা

ঘটে যাবে তা সে ভাবতেও পারেনি। তাছাড়া মেয়েটার সাথে কাল ওর বেশ কিছুক্ষণ কথাও হয়েছিল। তাকিয়ে ছিল শায়েরের দিকে। অথচ কিছু সময়ের ব্যবধানে মেয়েটা আর নেই। আর কথা বলবে না। যে চোখে শায়ের পালকের অনুভূতি পড়েছিল সে চোখ জোড়া আর খুলবে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শায়ের গেল আফতাবের সাথে কথা বলতে। মালাকে নিয়ে আফতাব ভোরে ফিরেছে। পালকের খবর পেয়ে মালাও কেঁদেছে। মেয়েটা সত্যিই খুব ভাল ছিল। এভাবে মেয়েটা পৃথিবী ছাড়বে তা মালাও বোঝেনি।অন্দরের বারান্দায় পরীকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে মালা। জেসমিন কুসুম আর

জুস্মান ও আছে। বেশ কয়েকজন মহিলা ও এসেছে। ওদের দেখে আবার চলে যাচ্ছে। পরী এখনও মালাকে ধরে আছে। অনেক দিন পর মায়ের বুকে মাথা রেখেছে সে। হঠাৎ পালকের কথা মনে পড়তেই মাথা তুলে তাকালো বলল,’আম্মা ডাক্তার আপা!!’

-‘চুপ থাক পরী। কথা কইস না যা হওয়ার তা হইছে। তুই শান্ত থাক।’

চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বের হতে লাগল। সে বলল,’আম্মা ডাক্তার আপা কইছিল আমার লগে গল্প করবে। কিন্ত সে তো আর আইলো না আম্মা। আমার অনেক কষ্ট হইতাছে আম্মা।’

মালা মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, ‘কান্দিস না পরী। আমার মাইয়া তো নরম না। এতো কান্দে তো না। তাইলে এতো কান্দিস ক্যান।’মালা আবার পরীকে জড়িয়ে নিলো। পরী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মালাকে।

ঠিক তখনই মিষ্টি রুমি অন্দরে ঢুকল। পরী চট করে মাথা তুলে তাকায়। যন্ত্রমানবের মতো হেটে আসছে দুজনে। সিঁড়ি বেয়ে দুজন দোতলায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর নিজেদের ব্যাগ নিয়ে এলো ওরা। মালার সামনে গিয়ে রুমি ভাঙা গলায় বলল,'আমরা চলে যাচ্ছি ভালো থাকবেন। বুঝতে পারিনি যে,

হাসিখুশি ভাবে এসেছিলাম আর যেতে হবে কাঁদতে কাঁদতে। পালক কে এভাবে হারিয়ে ফেলব জানলে কখনও এখানে আসতাম না।’

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লো রুমি। চোখের জল মুছতে মুছতে অন্দর থেকে বের হয়ে গেল। ওরা চলে যাচ্ছে শুনে পরী উঠে দাঁড়াল বলে উঠল,’আমি একবার দেখব

ডাক্তার আপারে। আম্মা আমি বাইরে যামু। আম্মা আমারে একবার যাইতে দেন।’নাঈমরা নিজেদের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে। পালক কে নিয়ে এখনই শহরে রওনা হবে সবাই। পালকের বাবা মা শহরে থাকেন। ওখানেই দাহ করা হবে পালককে। কোন মুখে ওরা পালকের বাবা

মায়ের সামনে দাঁড়াবে তাই ভেবে পাচ্ছে না ওরা।

ঘাটে বিশাল ছই ওয়ালা নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সম্পান সহ আরো দুজন মাঝি। নৌকা করেই পালককে শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। নাঈম শেখর আসিফ গেল পালককে নৌকায় তুলতে। নাঈম পালকের

দেহে হাত দিতেই একটা নারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

-‘একটু দাঁড়ান,আমি দেখমু আপারে।’ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে পরী দৌড়ে এলো। নাঈম ছেড়ে দিলো পালক কে। হাটু মুড়ে সে পাশেই বসে রইল। পরী ছুটে গিয়ে নাঈমের পাশেই বসে। পালকের মুখের ওপর থেকে কাপড়টা নাঈম সরিয়ে দিলো।

পালকের মুখটা দেখেই কেঁদে ফেলল পরী। সাদা হয়ে গেছে মুখটা। ঠোঁট দুটো কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। কি জানি কতক্ষণ পানিতে ছিল?মলিন কোমল দেহটা শান্ত হয়ে আছে।

পরী আলতো করে পালকের গালে হাত রাখলো। শরীর বরফের ন্যায় ঠান্ডা।

-‘অনেক কষ্ট হইছে আপনার তাই না আপা?এখন আপনে শান্তিতে ঘুমান কেউ বিরক্ত করবো না। একটা কথা মনে রাইখেন এই পরী আপনার কথা কোনদিন ভুলবে না। সোনা আপার মতো আপনেও আমার আরেক আপা। ভালো থাইকেন।’দুফোটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে উঠে দাঁড়াল পরী। পিছিয়ে

এলো পালকের থেকে। নাঈম হাত বাড়িয়ে দিলো পালকের দিকে। তিনজন মিলে পালককে ধরে নৌকাতে তুলল। শায়ের যাচ্ছে ওদের সাথে। সবাই নৌকায় বসতেই সম্পান বৈঠা ফেলল। পরী দৌড়ে ঘাটে গেল। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকিয়ে রইল। নাঈম চোখ ঘুরিয়ে তাকালো পরীর দিকে। চোখদুটো

ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। হয়ত এই গ্রামে আর আসা হবে না ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নাঈম। বেশিক্ষণ দাঁড়াল না পরী। কুসুম এসে টেনে নিয়ে গেল পরীকে। এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

আজকে নৌকার সবাই চুপ। মনে হচ্ছে নৌকায় কেউই নেই। শুধু সবার শ্বাস প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

ভারি সে নিঃশ্বাস। মিষ্টি পালকের মাথায় হাত রেখে বলল,'কখনো ভাবিনি তুই এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবি। আমরা তোকে খুব ভালোবাসি পালক।'কেদে ওঠে মিষ্টি সাথে রুমিও। কিন্ত নাঈম শেখর আসিফ স্থির। ওদের ও ইচ্ছা করছে কাঁদতে। কিন্ত পুরুষদের যে কান্না মানায় না।অশ্রু শোভা পায় নারীর

চোখে। পুরুষের চোখে থাকে কঠোরতা। তাই ওরা তিনজন পুরুষ চুপ করে বসে রইল। শায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মাঝেমাঝে পালকের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হচ্ছে আবার বাইরের দৃশ্য দেখছে।

অন্দরের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে পরী। পরনের ঘাগড়াটা হাটু

অবধি উঠে আছে। ওড়নাটাও পাশে পড়ে আছে। অবুঝের ন্যায় বসে আছে পরী। অনুভূতিহীন চাহনিতে তাকিয়ে আছে পেয়ারা গাছটির দিকে। সেখানে একটা হলদে পাখি বসে আছে। পাখিটার নাম পরীর অজানা। একটা পাকা পেয়ারা খাচ্ছে পাখিটা। পরী দিকবেদিক ভুলে পাখিটা দেখায় মগ্ন হয়ে আছে।

পরীর ইচ্ছে হচ্ছে পাখি হতে। না থাকবে পরিবার না থাকবে কষ্টের পাহাড়। এমন সময়ে লাঠি ভর দিয়ে আবেরজান আসলো। তিনি সবসময় নিজের কক্ষেই থাকা খুব একটা বের হন না। পালকের খবর শুনে তিনি বের হয়ে এসেছেন। এতক্ষণ মালার ঘরে ছিলেন। নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন। পরীকে ওরকম অবস্থায়

দেখেই লাঠির খোঁচা দিয়ে বললেন,’অই মাইয়া এমনে কাপড় উঠাইয়া বইছোস ক্যান?পাও ঢাক কইতাছি। তোর বাপে আইসা পড়বো। কি মাইয়া যে হইছে আল্লাহ ই জানে। ওই কথা হুনোস না।’দাদির চেঁচামেচিতে পাখিটাই উড়ে গেল। যার দরুন বিরক্ত হলো পরী। কোন কথা না বলে ওড়না

হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে চলে গেল ছাদে। পাঁচিল ঘেষে দাঁড়াল সে। উদাস উদাস লাগছে পরীর। ও নিজেই চেয়েছিল শহুরে ডাক্তাররা চলে যাক আজ তাই হলো। কিন্তু ওদের চলে যাওয়াকে মানতে পারছে না পরী। পালকের কথা মনে পড়তেই কান্না আসছে ওর বারবার। জুম্মানের মুখে পরী একদিন

শুনেছিল ভালো মানুষ নাকি বেশিদিন বাঁচে না। কথাটা জুম্মানকে ওর মাদ্রাসার হুজুর বলেছিল। পরী ভাবল পালক ভালো ছিল বলেই অকালে হারিয়ে গেল।

সারাদিনে কিছুই মুখে তুলল না পরী। মালা এসে জোরাজুরি করেও পরীকে খাওয়াতে পারল না।নিজ কক্ষের এক কোণে চুপটি করে বসে

আছে পরী। জুম্মান তখন পরীর ঘরে ঢুকল হাতে একটা লাঠি নিয়ে। পরীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল,’আপা দেখো পানি অনেক কমে গেছে। আমি লাঠি দিয়া মাপছি।’

পরী ঘুরে তাকালো জুম্মানের দিকে। লাঠির মাঝখান বরাবর ধরে দেখালো জুম্মান। পরী মৃদু হেসে

বলে,’ভাল বুদ্ধি তো তোর। এমনে পানি মাপা শিখাইলো কে তোরে?’-‘নাঈম ডাক্তার বাবু।’

-‘ওহ্। আচ্ছা উনি কি ডাক্তারগো দিয়া আইছে।’

জুম্মান চোখ কুচকে বলে,’উনি কে আপা?’

-‘আরে ওই যে আব্বার লগে থাকে। পাঞ্জাবি পইড়া থাকে,চোখে সুরমা পড়ে।’

জুম্মান এবার খিলখিল করে হাসতে লাগল পরীর কথা শুনে। তা দেখে পরীর রাগ হলো বলল,’হাসোস ক্যান?আমি কি হাসার কথা কইছি?’

-‘সোজাসুজি কইলেই তো পারো শায়ের ভাই। তা না কইরা কি

কইতাছো? আসে নাই শায়ের ভাই। মনে হয় রাত হবে।’

-‘আইলে গিয়া খবর আনবি কি হইলো?’জুম্মান মাথা নেড়ে জানান দিলো সে কাজটি করবে।তার পর দৌড়ে গেল লাঠিটা পানির মধ্যে পুঁততে। নাঈম জুম্মান কে শিখিয়েছিল এইভাবে পানি মাপতে হয়। খুব সহজেই জুম্মান শিখে

নিয়েছে। সে খুশিও হয়েছে নাঈমের প্রতি।

সন্ধ্যা নামতেই মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য ওযু করতে কলপাড়ে গেল মালা। কিন্তু সে অবাক হলো পরীকে আসতে দেখে। পরী এসে ওযু করতে লাগল।

-'নামাজ পড়বি?' মায়ের প্রশ্নের জবাবে পরী ছোট্ট করে 'হুম' বলে।

মালা ভড়কায়। পরীকে অনেক বার সে নামাজ পড়তে বলেছিল। কিন্ত পরীর কোন হেলদোল নেই। মালা বলল,'নামাজ পড়লে সব ওয়াক্ত পড়তে হইবে কিন্ত। '

পরীর ততক্ষণে ওযু করা শেষ। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল,'আমি এখন থাইকা প্রতিদিন নামাজ পড়মু আম্মা। আমার সব প্রিয় মানুষ

গুলোর লাইগা দোয়া করমু।’মালা আর কথা বলল না। দাদির জন্য বালতি করে ওযুর পানি নিয়ে পরী চলে গেল। মালা চেয়ে রইল মেয়ের যাওয়ার পানে। মেয়েকে নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তা মালার। শুধু রাগ আর জেদ দেখাতেই পারে। বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই নেই। এনিয়ে মালার যত চিন্তা।

রাত যখন একটু গভীর হয় তখন জুম্মান এসে খবর দিলো শায়ের এসেছে। কিন্তু সে শায়েরের সাথে কথা বলতে পারেনি। আফতাব আর আখিরের সাথে কথা বলছিল শায়ের তখন। জুম্মান আরো বলল,' কাকা শায়ের ভাইরে গালাগালি করতাছে।'

পরী চট করে বলে উঠল,'ক্যান??'-'ভাই সব দেইখা

রাখতে পারল না ক্যান ডাক্তার আপা মরলো কেমনে?আরও কত কথা। এই কাকায় অনেক শয়তান রে আপা। সুযোগ পাইলেই ভাইরে গালাগালি করে।’

আখিরের নামটা শুনতে ইচ্ছা করে না পরীর। নিজের কাকা বলে সম্মান ও দেয় না। এই লোকটার প্রতি ঘৃণা ছাড়া কিছুই আসে না পরীর। আজ

এমনিতেও মন ভাল নেই ওর। তাই আর বেশি কিছু ভাবল না পরী। চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

কিন্তু রাত যত গভীর হলো পরীর খিদে তত বাড়লো। সারাদিন কিছু খায়নি। রাতে জুম্মান খেতে ডাকলেও গেল না। কিন্তু এখন আর খিদে সহ্য করতে না পেরে হারিকেন নিয়ে ছুটে গেল রন্ধনশালায়। ভাত

বেড়ে গপাগপ খেতে লাগল সে। তখনই দরজায় টোকা পড়ল। বৈঠক ঘর থেকে কেউ অন্দরের দরজার কড়া নাড়ছে। পরী এটো হাতে ঘোমটা টেনে গিয়ে দরজাটা হাল্কা করে খুলল।রাগন্বিত কণ্ঠে শায়ের বলল,’এতক্ষণ লাগে তোর দরজা খুলতে?আমার খাবার নিয়ে আয়।’

বলেই চলে গেল শায়ের। পরী থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণে মনে করল হয়তো কুসুম কে মনে করেছে শায়ের। নয়তো পরীকে ধমক দেওয়ার সাহস আছে ওই সামান্য কর্মচারীর?পরী গিয়ে শায়েরের জন্য ভাত বাড়লো তার পর আস্তে করে বৈঠক ঘরে পা রাখল।চারিদিকে কেমন গুমোট ভাব। ঘুটঘুটে

অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আশেপাশে। দূরের কোন স্থান থেকে নিশাচর পাখিটা ডেকে উঠছে বারবার। এমতাবস্থায় একটুও ভয় পাচ্ছে না পরী। অন্ধকার যেন পরীর সাহস আরো বাড়িয়ে দেয়। হারিকেনের আলো চারিদিক কিঞ্চিৎ আলোকিত করেছে। কাঠের ছোট জলচৌকির উপর শায়েরের খাবার রেখেছে পরী

কিন্তু শায়ের নেই। সে হয়তো কলপাড়ে গেছে ভেবে পরী দাঁড়িয়ে আছে। জুম্মান কে দিয়ে যে কথা জানতে চেয়েছিল তা সে এখন নিজেই জিজ্ঞেস করবে বলে মন স্থির করল পরী। তাই সে শায়েরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শায়ের এসে খেতে বসে পড়ল।সারাদিন না খাওয়া সে

তার উপর আখিরের বলা কটু কথা গুলো সহ্য হয়নি ওর।মাথা গরম আছে। কারণে অকারণে আখির ওকে কথা শোনায়। কারণ টা শায়ের বেশ বুঝতে পারে। জমিদার আফতাব শায়ের কে বেশিই বিশ্বাস করে। শায়েরের পরামর্শ গুলোকে একটু বেশিই গুরুত্ব দেন তিনি। যা আখির একটুও পছন্দ করে না। তাই

সবসময় সে ওত পেতে থাকে কিভাবে শায়ের কে আফতাবের সামনে খারাপ বানানো যায়। আর সে সুযোগ আজকে সে পেয়ে গেছে। পালককে উদ্দেশ্য করে অনেক কিছুই শায়ের কে বলছে আর শায়ের চুপ করে শুনে গেছে। তাই সে রাগ ঝেড়েছে সে কুসুম রুপি পরীর উপর। কিন্ত শায়ের এখনও টের

পায়নি যে ওর সামনে পরী দাঁড়িয়ে আছে। পরীও নিজের উপস্থিতি জানান দেয়নি। কিন্ত খাওয়ার মধ্যেই শায়েরের চোখ পড়ল একজোড়া কোমল পায়ের দিকে। ফর্সা পা জোড়ায় ভারি নূপুর চকচক করছে হারিকেনের লাল আলোতে। যদিও ওর সামন দাঁড়নো রমণীর মুখটা ঢাকা তবুও শায়েরের মস্তিষ্ক ভয়ের

আশঙ্কা পেলো। সে বুঝে গেল এই রমণীটি কুসুম নয়। খাওয়া ফেলে ছিটকে দূরে সরে এল শায়ের। আচমকা শায়ের কে দাঁড়াতে দেখে পরী কিছুটা কেঁপে ওঠে। সেও দুপা পিছিয়ে যায়। শায়ের থমথমে গলায় বলল, ‘আপনি কেন এসেছেন? আপনি কি জানেন না যে আপনার উপস্থিতি প্রতিটা পুরুষের জন্য

বিপদজনক? চলে যান এখান থেকে। অন্দরে ফিরে যান তাড়াতাড়ি নাহলে আমার বিপদ।’এক মুহূর্তের জন্য পরী থমকে গেল। সব পুরুষের জন্য ও বিপদজনক কথাটা তীরের মতো বিঁধলো পরীর মনে। সেখান থেকে বের হয় অদৃশ্যমান তাজা রক্তস্রোত। সে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল,’আমি তো পালক আপা,,,’

বাকিটুকু বলতে পারল না পরী তার আগেই শায়ের ওকে আটকে দিয়ে বলে,'আমি কিছু শুনতে চাই না। আপনি যার সামনে ইচ্ছা যান। কিন্তু আমার সামনে আসবেন না। এখন অন্দরে ফিরে যান।'

পরী আর দাঁড়াল না। দৌড়ে চলে আসে। আসার সময় পায়ে ব্যথা পায় সিঁড়ির সাথে ধাক্কা লেগে। সেটা

কোন ব্যথা নয় পরীর। মনে যে ক্ষরণ হচ্ছে তাতে আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে পরীর। নিজের কক্ষে গিয়ে ঠাস করে দরজা আটকে দিলো সে। ঘরের এক কোনায় গিয়ে মেঝেতে হাটু মুড়ে বসে বলতে লাগল, ‘আপা আমি কি সত্যি সব পুরুষ গো বিপদে ফালাই?তুমিও তাই বিশ্বাস করো?কই আমি ওইদিন না থাকলে

তো আব্বা আর সবাই মিইলা কানাই কাকার হাত কাইটা ফালাইতো। আমিই তো বাঁচাইছি তারে। তারপর ও ওই লোকটা ক্যান ওই কথা কইলো? আমি কি সবার শনি নাকি? আমি কি কারো প্রিয়জন হমু না কোনদিন? আপা তুমি তো রাখালরে পাইছো। আমি কি ওমন কাউরে পামু না?'নিজের মন মতো বকবক

করতে করতে পরী মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ওর ঘুম ভাঙে তখন উঠে বসে সে। বেলা কতটুকু হলো তা বোঝার জন্য পরী বাইরে এলো। দোতলায় দাঁড়িয়ে পরী দেখতে পেল মালা হারিকেন হাতে কলপাড়ের দিকে যাচ্ছে। পরী অবাক হয়ে গেল এসময় ওর ঘুম ভেঙেছে!!

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরী নিজেও গেল ওযু করতে।

ফজরের নামাজ পড়ে পরী আর ঘুমালো না। অন্দরের উঠোন জুড়ে হাটাহাটি করতে লাগল। কুসুম ভোরেই ঘুম থেকে ওঠে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। সে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে পরীকে দেখে চমকে গেল। পরীর দিকে

এগিয়ে এসে বলল, ‘পরী আপা আপনে এতো সক্কাল সক্কাল উঠছেন!! আমার তো বিশ্বাস হইতাছে না।’

-‘বকর বকর না কইরা সামনে থাইকা সর। তুই আইজ আমার সামনে আসবি না। আর যদি আসোস তাইলে ওই পানিতে তোরে চুবামু।’

রাতের রাগটা পরী কুসুমের উপর ছাড়লো। কুসুম বেচারি কিছুই বুঝলো না। এই সকালে সে তো কিছুই করেনি তাহলে এভাবে বলল কেন পরী?

-'এই সকালে কারে চুবাবি পরী?'

নারী কন্ঠস্বর পেয়ে ঘাড় ঘুরালো পরী। চোখের সামনে রুপালিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে

গেল। ঝাপটে ধরলো বোনকে কাছে পেয়ে। খুশিতে রুপালি ও আগলে নিলো আদরের ছোট বোনকে। কিছুক্ষণ দুবোন আলিঙ্গন করে তবে শান্ত হলো। পরী হাক ছাড়লো,’আম্মা!!ও আম্মাজান আপনে কই??দেখেন কেডা আইছে!!’

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মালা। রুপালিকে দেখে সেও চমকে

গেল। রুপালি মালাকে সালাম দিয়ে বলল,’কেমন আছেন আম্মা?শরীর ভাল তো?’-‘হুম ভাল। তা জামাই কই?’

-‘বৈঠক ঘরে। আম্মা সাথে নওশাদ ও এসেছে। আপনি ওদের নাস্তা দেন আমি ঘরে যাই। পরী আয় আমার সাথে।’

পরী খুশি মনে রুপালির পেছন পেছন দোতলায় নিজের ঘরে গেল। তালাবদ্ধ ছিল রুপালির ঘর। পরী গিয়ে চাবি নিয়ে আসে। নিজ হাতে সব পরিষ্কার করে। রুপালি ততক্ষণে কলপাড়ে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে। রুপালি এসে পালঙ্কের উপর বসতেই পরীর খেয়াল করে রুপালির পেটটা একটু উঁচু। পরী

গিয়ে রুপালির পাশে গিয়ে বসে ওর পেটের উপর হাত রাখলো। চোখের ইশারা করল বোনকে। ওর বোন ও মাথা নেড়ে সায় দিলো। পরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে,'আপা তুমি আহার সাথে সাথে এত খুশির খবর আনবা ভাবি নাই। তোমারে আমি আর যাইতে দিমু না। আমার কাছেই রাইখা দিমু।'

পরী খুশি হলো খুব। কারণ বিয়ের দুবছর ধরে যখন রুপালির বাচ্চা হচ্ছে না সবাই কথা শোনাতো রুপালিকে। বারবার জিজ্ঞেস করতো খুশির খবর কবে পাবো?এতে কষ্টের সীমা ছিল না রুপালির। বোনের কষ্ট পরীকে ও পোড়াতো খুব। কিন্ত এখন পরীর বেশ খুশি লাগছে।

রুপালি অবিশ্বাস্য চোখে তাকায় পরীর দিকে। কিছু আচ করেছে হয়ত। পরীও তাকিয়ে আছে তার প্রিয় বোনের দিকে। রুপালি পরীর কাধে হাত রেখে বলে,’এভাবে কথা বলছিস কেন তুই?’-‘কেমনে কথা কই মানে?’

-‘আগে তো এই ভাষাতে কথা বলতি না এখন হঠাৎ করে হলো কি তোর?

তুই না মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিস!! তাহলে এভাবে কথা বলছিস কেন? কি হয়েছে তোর?’

পরী সহজ স্বীকারোক্তি দিলো,’কিছু হয় নাই আপা। তুমি খালি খালি চিন্তা করতাছো।’

রুপালি কপট রাগ দেখিয়ে বলে,’আবার ওভাবে কথা বলিস। পরী তুই বুঝতে পারছিস না কেন

আমরা বড় ঘরের মেয়ে। আমাদের শৌখিন হতে হবে। কাজকর্ম, ভাষা,চলাফেরা সবার থেকে আলাদা হতে হবে।’

সামান্য হেসে পরী বলে,’বড় ঘরে বিয়া হইছে তোমার। এই কথা কি শ্বশুরবাড়ির মানুষ শিখাইছে তোমারে?একটা কথা মনে রাইখো আপা,কবর কিন্ত ধনী গরীব আর

ভাষা দেখে না। আর আমি আগের থাইকা বদলাইয়া গেছি।'

-'বদলালে হবে না পরী। তুই আগের মতো হ।'

তীক্ষ্ণ চাহনিতে রুপালির দিকে তাকালো পরী। অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। ফিসফিস করে বলল,'তুমি কি চাও আগের পরীকে?'রুপালি থমকে গেল পরীর চোখের দিকে তাকিয়ে।

আমতা আমতা করে বলল,’শুধু ভাষা ঠিক কর তাতেই হবে। তোর মনে নেই বড় আপার কথা? বড় আপা বলেছিল সবসময় এই পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে। আর গ্রাম্য ভাষা সেও পছন্দ করতেন না। আমাকে তোকে সবসময়ই তো শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বলতো।’

পরীর দূর্বল যায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে রুপালি। রুপালি খুব ভাল করেই জানে যে পরী একমাত্র সোনালীর কথা মান্য করে তাই সে পরীকে আটকে দিয়েছে। আসল কথা এখনো পরীকে জানায়নি রুপালি। পরীর জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছে সে। নওশাদের জন্য। নওশাদ রুপালির মামা শ্বশুরের

ছেলে। ফুপাতো ভাইয়ের বিয়েতে নওশাদ এসেছিল কিন্তু তের বছরের পরী তখন মায়ের আদেশে ঘরবন্দি। রুপালির শ্বশুরবাড়ির থেকে যেসব মেয়েরা এসেছিল তারা পরীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিল। সে কথা নওশাদের কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পরীর মুখ দেখা তার সাধ্য হয়নি। মাঝেমাঝে

সে রুপালির সাথে জমিদার বাড়িতে আসতো। নানা বাহানায় পরীকে দেখার চেষ্টা করতো কিন্ত বরাবরের মতোই সে ব্যর্থ হতো। তাই এবার সে সরাসরি রুপালির স্বামী কবিরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় নওশাদ। পরীকে না দেখলেও সে রুপালিকে দেখেছে। নিশ্চয়ই পরী রুপালির মতোই সুন্দর।আর তাছাড়া নওশাদ

কে না করার কোন কারন ও নেই। উচ্চবিত্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিত ছেলে। শহরে তার ব্যবসা। আগে সে চাকরি করতো। তাতে খুব কম বেতন বিধায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে। নওশাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালো। কবিরদের মতোই বাড়িতে আটচালা বড় বড় তিনটা টিনের ঘর। গোয়ালে

গরু আছে,পাকা করা কলপাড় কাজের মেয়ে আছে জমিজমার অভাব নেই। পরীর সুখ হবে সেখানে। তাই স্বামীর কথা ফেলতে পারেনি। তাছাড়া নওশাদ খুবই ভাল ছেলে। তা রুপালি ওর সাথে মিশে বুঝেছে। তাই রুপালির ও অমত নেই। এই বিষয়ে মালার সাথে কথা

বলবে রুপালি। কবির কথা বলবে আফতাবের সাথে।

পরী চুপ করে আছে দেখে রুপালি হালকা ধাক্কা দিলো পরীকে।

-'কি রে চুপ করে আছিস কেন?কথা বল?'নড়ে উঠলো পরী। একে তো পালকের জন্য খারাপ লাগছে। তার উপর শায়ের রাতে তাকে অপমান করেছে। আর রুপালি এখন ওর মন

খারাপ করে দিয়েছে। হাল্কা কেশে পরী বলল,’ঠিক আছে আমি এখন থেকে তোমার কথা শুনব। ভালোভাবে কথা বলব।’

কথাটা বলে পরী একদণ্ড বসলো না। দ্রুত পা ফেলে কক্ষের বাইরে চলে এলো। রুপালি ডাকলো অনেক বার পরী শুনলো না। কিন্ত বাইরে গিয়ে পরীর রাগটা আরো বেড়ে

গেল। জুম্মান দাঁত বের করে হাসতে হাসতে এসে বলে,'আপা শায়ের ভাইয়ের কাছ থাইকা ডাক্তার,,,,'

পরবর্তী বাক্য মুখ থেকে বের করতে পারল না জুম্মান। পরী কষিয়ে চড় মেরে দিলো জুম্মানের গালে। গালে হাত দিতে ভ্যাবলার মতো ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল সে। পরী ভারি গলায় বলে,'তোর কাছে শুনতে

চেয়েছি আমি?এরপর কোন ফালতু লোকের কথা আমাকে বলতে আসবি না।’কথাটা বলেই পরী চলে গেল। জুম্মান থাপ্পড়ের শোকের উপর আছে। কালকেই তো পরী জুম্মান কে বলল খবর আনতে আর এখন কি হলো?এক রাতে এতো পরিবর্তন!! ভাষার ও পরিবর্তন হয়েছে। জুম্মান ভাবলো হয়তো

কোন দুষ্ট জ্বীন ভর করেছে।ভয় পেয়ে সে দৌড়ে গেল রুপালির কাছে।

পরী অন্দরের উঠোনে আসতেই দেখল কুসুম বৈঠক ঘর থেকে অন্দরে ঢুকছে। পরীর কুসুম কে দেখেও রাগ হলো। তেড়ে গেল কুসুমের দিকে তবে মালাকে আসতে দেখে পদচরণ থামিয়ে দিলো।

পরীকে উপেক্ষা করে কুসুম মালাকে উদ্দেশ্য করে বলল,’বড় মা হুনছেন নি সুখান পাগলারে গফুর চাচা পানিতে চুবানি দিছে ইচ্ছা মতো।’বলেই কুসুম খিলখিল করে হাসতে লাগল। পরী ধমক দিয়ে বলে,’এতে হাসার কি আছে? একটা পাগলকে চুবালো আর তুই হাসছিস?

তোকে চুবানি দিলে বুঝবি কেমন লাগে?’

কুসুমের হাসি মিলিয়ে গেল। সকালেও পরী এই কথাটাই বলেছে।

-‘চুবাবে না তো কি করবে কন আপা। গফুর চাচার মাইয়া আমেনা আছে না ওরে তো সুখান পাগলা পানিতে টাইনা নিয়া মারতে

বইছিল। হের লাইগা তো চাচায় ওরে চুবাইছে।’

মালা শুধু একটা বাক্য ব্যবহার করলো,’কুসুম কথা না কইয়া রান্না ঘরে আয়।’

কুসুম পরীর দিকে তাকালো। পরী রাগি চোখে তাকিয়ে আছে। কুসুম দৌড়ে চলে গেল। অতঃপর পরীও নিজের ঘরে চলে গেল।

দুপুরে গোসল ছেড়ে সবেমাত্র বের হয়েছে পরী। এরমধ্যেই চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে নিচে নামে। কুসুম জোরে জোরে ডাকছে মালাকে। পরী দোতলায় দাঁড়িয়ে থেকেই বলল,'আম্মা নামাজ পড়ে এতো চিল্লাস কেন?'-'আপা শহরের ডাক্তারবাবু আছে না?ওইযে নাঈম ডাক্তার,হেয় আইছে তার কিসব

দরকারি জিনিস রাইখা গেছে। অখনই চইলা যাইতে চায় কি করমু?’

নাঈমের কথা শুনে চমকালো পরী। তবে কুসুমের সামনে তা প্রকাশ করলো না।

-‘এখন চলে যাবে কেন,তুই বল দুপুরে খেয়ে যেতে। না বললে শুনবি না। আমার কথা বলবি।’

কুসুম মাথা নেড়ে চলে গেল। মাথা মুছে পরী যোহরের নামাজ আদায় করে নিল। তারপর চুপচাপ নিজের ঘরে বসে রইল।নওশাদ আর কবিরকে বৈঠক ঘরের একটা কক্ষে থাকতে দেওয়া হয়েছে। এবাড়ির জামাইয়ের ও অন্দরে ঢোকা নিষেধ। তাছাড়া বিশালাকার বৈঠক ঘরে

অনেক গুলো ঘর আছে। যত মেহমান আসুক সমস্যা হয় না। নিজের কক্ষের বারান্দায় চৌকি পেতে বসে আছে নওশাদ। কবির ঘুমাচ্ছে। ওদের বাড়ি দূরে বিধায় ভোর রাতে রওনা হয়েছে ওরা। তাই সকালেই এসে পৌঁছেছে। নাঈম কে দেখে নওশাদ চিনলো না। পরে

দুজনে কথাবার্তা বলে পরিচিত হয়ে নিয়েছে।

কথা বলার সময় কুসুম এসে ওদের খেতে ডাকলো। হাত মুখ ধুয়ে সবাই খেতে বসলো। আফতাব,আখির আর শায়ের ও বসেছে।

মালা কুসুম আর জেসমিন খাবার বেড়ে দিচ্ছেন। খাওয়ার মাঝে কবিরই প্রথম কথা তুলল পরীর

বিষয়ে। আফতাব কে উদ্দেশ্য করে বলল,'আব্বা আমার একটা কথা আছে।'-'কি কথা??'

-'নওশাদ খুবই ভাল ছেলে। শহরে বড় ব্যবসা করে। তাই আমি একখান প্রস্তাব আনছি। যদি পরীর সাথে ওর বিয়ে দেন তো পরী ভালো থাকবে।'

উক্তিটি শেষ হতে না হতেই বিষম খেলো নাঈম। জোরে জোরে কাশতে লাগল সে। শায়ের ওর পাশেই বসেছিল তাই দ্রুত পানির গ্লাস এগিয়ে দিলো।কর্মজীবি নওশাদ,পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছে নিজের সাম্রাজ্য। যেখানে রানীর মতো থাকবে পরী। রাজকন্যাকে তো রানী হিসেবেই মানায়। তাই পরীর

স্থান কোন উঁচু পরিবারে হওয়া উচিত। নওশাদ সেই উঁচু পরিবারের ছেলে। এসব অনেক কথাই বলছে কবির। হাতে পানির গ্লাস নিয়ে নাঈম তা নিরবে শুনে যাচ্ছে। নিজের প্রিয় বন্ধুর অনন্ত শয্যাতে মনক্ষুণ্য তার। এখন আবার পরীর বিয়ে!!এসব মেনে নিতে খারাপ লাগছে নাঈমের। ও চলে যেতেই

নিচ্ছিল কিন্ত কুসুম পরীর কথা বলাতে রয়ে গেল। কেন জানি পরীর কথাটা ফেলতে মন চাইলো না নাঈমের। কিন্ত এখন ভাতের সাথে এসব কথাও যে তার হজম করতে হবে তা ভাবেনি। ওদিকে শায়েরের কোন হেলদোল নেই। প্রগ্রাসে গিলছে সে। জমিদারের পারিবারিক সিদ্ধান্তে শায়ের কখনও কথা

বলেনি। আজও তাই চুপ করে আছে।কবিরের কথা শেষ হতে না হতেই আখির বলে উঠল, ‘দেখো এখন এসব নিয়ে আমাদের ভাবার সময় নেই।বন্যায় তো সব তলিয়ে গেছে। তার উপর আমাদের বাড়িতে আসা একজন ডাক্তার মারা গেছে। এজন্য আমাদের কারো মন ভালো নেই। আর নওশাদ তো আমাদেরই

ছেলে। ধীরে সুস্থে সব করলেই ভাল হয়।’

আফতাব তাতে সায় দিয়ে বলে,’আর তাছাড়া বন্যার জন্য আমার কাজের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমরা আগে সব ঠিকঠাক করি তারপর নাহয় আগানো যাবে।’-‘আপনাদের যত সময় যত লাগুক সমস্যা নেই। কিন্তু

কথা দিন পরীকে আপনারা নওশাদের হাতে তুলে দেবেন?’ কবিরের কথায় আখির নিজেই কথা দিলো যে সে পরীর বিয়ে নওশাদের সাথেই দিবে। নাঈম আর বসে থাকতে পারল না। খাবার আর তার গলা দিয়ে নামবে না। সে উঠে চলে গেল কলপাড়ের দিকে। হাত ধুয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

সে ভাবতে লাগল সত্যিই তো পরীর স্থান কোন উঁচু পরিবারে হওয়া উচিত। কোন অংশে কম না পরী। বড় ঘরের মেয়ে সে আর আছে জ্যোৎস্নার মতো কোমল রুপ। নওশাদের মতো বড়লোক ছেলেকেই পরীর পাশে মানায়। নাঈম কলপাড় থেকে বের হয়ে নৌকাঘাটে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখা হলো রুপালির

সাথে। হাটতে হাটতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। নাঈমকে দেখেই রুপালি বলে উঠল,’আপনি নিশ্চয়ই নাঈম।’

নাঈম অবাক হয়ে দেখছিল রুপালিকে। অসম্ভব সুন্দর মেয়েটা। দেখলে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। নাঈম ও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। রুপালির প্রশ্নের জবাবে নাঈম বলে

উঠল,’জ্বী।’-‘আপনাদের কথাই শুনছিলাম পরীর কাছে। আপনাদের সাথে আসা একজন মারা গেছে শুনে খুব খারাপ লেগছে। তবে সবার কথাই পরী আমাকে বলেছে।’

মুচকি হাসলো রুপালি। নাঈম এখনও অদ্ভুত চোখে দেখছে রুপালিকে। তবে পরী ওর কথা বলেছে শুনে ভাল লাগল নাঈমের।

-‘ওহ আমি তো পরিচয় দেইনি। আমি রুপালি পরীর মেজো বোন। আজকে সকালেই এসেছি।’

এখন নাঈম চিন্তামুক্ত হলো। পরীর বোন রুপালি এজন্যই এতো সুন্দর। পরী নিশ্চয়ই রুপালির মতোই সুন্দর। নাঈম বলল,’ওহ,আমি আপনাকে তো দেখিনি তাই চিনতে

পারিনি। কিন্তু আপনি অন্দর থেকে বাইরে এসেছেন কেন?'

-'বুঝলাম না আপনার কথা!!'

-'আমি যতদূর জানি অন্দর থেকে মেয়েরা খুব কম বের হয়। আর আপনার বোন পরী তো বেরই হয় না।আপনি বের হয়েছেন তাই বললাম আরকি।'

-‘আপনি তো ঘরের খবর সব জেনে গেছেন দেখছি।অন্দর থেকে মহিলাদের বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ না। জমিদার বাড়ির আশেপাশে যেতে পারবে কিন্তু পরীর কথা আলাদা। ওর তো কোন পুরুষ কে মুখ দেখানো বারণ। এটা আম্মার কথা,আব্বা এসবে নেই।’মাথা নেড়ে নাঈম বলে,’ওহ।’

-‘আপনি নাকি আজই চলে যাবেন? থেকে গেলে ভাল হত।’

-‘নাহ,আসলে পালকের বাবা মা অনেক দূর্বল হয়ে গেছে। মেয়েকে হারিয়ে পাগল প্রায়। আমরা সেখানেই আছি। এখন সেখানেই যেতে হবে। যদি কখনও সময় হয় তো এসে দেখা করে যাব।’

মালা জেসমিন কে বলে নাঈম আর অপেক্ষা করলো না। নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে রুপালি পরীকে ডেকে এনে মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছে। পরী চুপ করে উদাসীন হয়ে বসে আছে। কেন জানি মনটা ভালো নেই তার। কারো সাথে কথা বলতে ভাল লাগছে না। সে একমনে

তাকিয়ে আছে বৈঠক ঘরের দরজার দিকে। ইচ্ছে করছে এক ছুটে বের হয়ে যেতে। কিন্তু মা যে ওর পা দুটো আটকে দিয়েছে। এরকম বন্দি জীবন ওর ভাল লাগে না। মুক্ত পাখিদের মতো উড়তে চায় পরী। তা বোধহয় কখনোই সম্ভব নয়।-'তোর কি মন খারাপ?'

-'হুম।'

-‘কি হয়েছে?’

-‘জানি না। বোধহয় মনের অসুখ করেছে।’

-‘এই অসুখ ভাল না। ডাক্তার দেখাইতে হইবে।’

কুসুম আসতে আসতে বলে উঠল,’খুবই সুন্দর ডাক্তার গো আপা। আমি দেখছি,পরী আপার লগে মানাইবো অনেক।’

পরী বুঝলো না কুসুমের কথা। তাই সে বলে,’কি বলস এসব তুই?’

-‘আল্লাহ আপনে জানেন না?মেজো আপার দেওরের লগে আপনার বিয়া ঠিক। আহা কি সুন্দর পোলাডা। আপনের লগে অনেক মানাইবো।’

পরী চট করে দাঁড়িয়ে গেল। রুপালির দিকে প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বলল,’আরে নওশাদ।

ছেলেটা খুব ভালো। তোর দুলাভাই,,,,,'

পরীর হুংকারে থেমে গেল রুপালি।

-'দুলাভাই কে বলো আর না আগাতে। নাহলে আমাকে তো চেনোই। বয়স দেখে আমি কারো সাথে না কথা বলি না গায়ে হাত তুলি সেটা ভাল করে জানো।'-'পরীইই তোর সাহস তো

কম না। নিজের দুলাভাই কে নিয়ে এসব বলে কেউ?’ধমকে উঠল রুপালি।

-‘বাহ স্বামীর জন্য এতো ভালোবাসা এতো দরদ। তাহলে ওই স্বামী কেন তোমাকে রেখে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?ভালোবাসা কি তার নেই?’

-‘পিছনের কথা বাদ দে। তুই কি তোর দুলাভাই কে মানতে পারছিস না?’

-‘তুমি পেরেছো মানতে?সিরাজ ভাইকে ছেড়ে,,’

-‘পরী চুপ কর।’ রুপালি মুখ চেপে ধরলো পরীর। আশেপাশে ভয়ার্ত নজর বুলিয়ে দেখে নিল আর কেউ আছে কি না। নাহ কেউ নেই। পরী

নিজের মুখ থেকে বোনের হাত সরিয়ে বলে,’একই রক্তের গন্ধ ও এক হয়। তোমার দেওরের ও তাই। আমাকে রাগাবে না। যে রক্তকে ঘৃণা করি সে রক্তকে নিজের করে নিতে পারব না।’

পরী দোতলায় দৌড়ে গেল। রুপালি বারবার পরীকে ডাকতে লাগল। বলতে লাগল নওশাদ ওরকম নয়

সে ভালো ছেলে। কিন্তু পরী সেকথা কানেও নিল না। কুসুম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পরীর কথাগুলো ওকে শোকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রুপালি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকালো। সাথে সাথেই ওর কপোলদ্বয় ভিজে গেল বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায়।সিরাজ কে ভালোবেসেছিল রুপালি। পাগলের

মতো ভালোবেসেছে। কিন্ত তার সাথে মিলন হলো না রুপালির। সদ্য ফোঁটা ফুলটা অকালেই ঝড়ে গেছে। কিন্ত রেখে গেছে তার সুবাস। যা কখনোই ভুলতে পারবে না রুপালি। ও পারে না ভেতরের ক্ষতটা কাউকে দেখাতে। কিন্ত পরী তা ঠিকই দেখতে পায়। তবে কখনোই বলেনি আজ রাগের মাথায় বলে দিয়েছে

পরী। এতে অনেক আঘাত পেয়েছে রুপালির মন। পালঙ্কের উপর বসে কাঁদছে সে। আর ফেলে আসা স্মৃতিচারণ করছে।

আফতাবের কর্মচারী ছিল সিরাজ। সেই সুবাদে জমিদার বাড়িতে আসা যাওয়া চলতো সিরাজের। রুপালির সাথে প্রতিদিন দেখা হতো ওর। কথা হতো, আবার রুপালি এটা ওটা

এগিয়ে দিতো। এভাবে কখন যে ওদের মন দেওয়া নেওয়া হয়েছিল তা দুজন টেরই পায়নি। কিন্ত এই প্রকৃতি মেনে নিলো না ওদের ভালোবাসা। ঝড় তুলে আলাদা করে দিলো দুজনকে। রুপালির বিয়ের পর আর দেখেনি সিরাজ কে। এক বুক কষ্ট নিয়ে সে পাড়ি দিয়েছে দূর অজানায়। আর রেখে গেছে মন

ভাঙা কিশোরীর এক সমুদ্র অশ্রুসিক্ত নয়ন। কত যে কেঁদেছে রুপালি। কাঁদতে কাঁদতে যখন চোখের পানি সব শুকিয়ে গেছে তখন আর কাঁদতো না।কিন্ত আজ আবার অশ্রুরা হানা দিয়েছে। ভাঙা মনটা আবার নতুন করে ভাঙছে।

নিজের ঘরে বসে রাগে ফুঁসছে পরী। নওশাদ কে সে কিছুতেই বিয়ে

করবে না। কবিরের রক্তই তো নওশাদ। এদের সবার স্বভাব ও এক। রুপালির বাচ্চা হচ্ছিল না দেখে কবির দ্বিতীয় বিয়ে করতে চেয়েছিল। পাত্রী ও দেখেছিল,সেদিন মালাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিল রুপালি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছে পরী। তারপর থেকেই কবিরকে ঘৃণা করে পরী।

ওর ধারণা পুরুষরা কেবল নারীদের ব্যবহার করতেই জানে ভালোবাসতে জানে না।

পরী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে নওশাদ কে কিছুতেই বিয়ে করবে না। এতে আফতাবের সাথে যুদ্ধ করবে সে। বাকি দুবোনের মতো সে নরম না। তার সাহস ও বুদ্ধি দুটোই অনেক।

নওশাদ চৌকি পেতে বসে আছে। জুম্মান ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে অন্দরে যাচ্ছিল। নওশাদ দেখে জুম্মান কে ডাকলো। নওশাদ হেসে বলল,’কোথায় গিয়েছিলে?’

-‘শাপলা বিলে। পরী আপা আমার উপর রাগ করছে। শাপলা গুলা দিলে আপা খুশি হইব।’

-‘শাপলা তোমার আপার পছন্দ?’-‘হু,তবে পদ্মফুল অনেক বেশি পছন্দ করে আপা। কিন্তু আমি তো পদ্মফুল পাইলাম না। গেরামের সব পোলাপান লইয়া গেছে। আর এই বিকালে কি ফুল ফোটে?আমি কলি আনছি এখন হাত দিয়া ফুল ফুটামু তারপর আপারে দিমু।’

হাসলো নওশাদ। জুম্মানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে,’আচ্ছা যাও। সন্ধ্যার পর আমার সাথে দেখা করো কথা আছে।’

জুম্মান মাথা নেড়ে অন্দরে ঢুকল। নওশাদ চেয়ে রইল জুম্মানের যাওয়ার পানে। এই ছেলেটা খুব শীঘ্রই ওর একমাত্র শালাবাবু হতে চলেছে। ভাবতেও ভালো লাগছে

ওর। খাওয়ার সময় ভদ্র ছেলের মত চুপ করেছিল সে। ভাবটা এমন ছিল যেন লজ্জা পাচ্ছে। অবশ্য একটু লজ্জা লাগছিল ওর কিন্ত অভিনয় করেছে বেশি। এটুকু না করলে কি চলে? নাহলে সে যে অতি ভদ্র তা প্রমাণ করবে কিভাবে?সবাই তো তাকে ভালো বলছে কিন্ত পরী!!সে কি বলে?পরীর মনের কথা তো

জানা দরকার। নওশাদের ভাবনার মাঝে কবির এসে বলল,'কি রে এখানে বসে আছিস যে?আসার পর তো দুদণ্ড বিশ্রাম করলি না।'নওশাদ হেসে বলে,'তোমার শালিকে বউ করে এনে দাও তারপর দেখবে দিনরাত শুধু বিশ্রাম করছি।'

কবির নওশাদের পিঠ চাপড়ে বসতে বসতে বলল, ‘ভালো কথা বলছিস দেখছি।’

-‘আচ্ছা ভাই তুমি কখনোই পরীকে দেখোনি?’

-‘পরী তো ওর কাকার সামনেই আসে না। আমার সামনে আসবে কেমনে?তোর কপাল ভাল রে নওশাদ। এই পরীকে পাওয়ার জন্য

কত পুরুষ বুকে পাথর বাঁধে আর তুই সেই পরীরে ঘরে তুলবি।’

-‘ভাগ্য ভাল কি না জানি না। তবে পরীর জন্য যা করতে হয় এই নওশাদ তা করবে। আমি পরীরে না দেখেই পছন্দ করি। তুমি জানো আমি এই বাড়িতে শুধু পরীর জন্য আসতাম। কিন্তু পরীর দর্শন পেতাম না। আমার খুব খারাপ লাগে পরী

কেন সামনে আসে না?কিন্ত স্বপ্নে আমি দেখি পরীরে। চোখ নাক মুখ স্বপ্নেই আঁকি। ভাই পরীরে কিন্ত আমার চাই।’-‘চিন্তা করিস না পরী তোর হবে। তোর ভালোবাসা সফল হবে নওশাদ।’

সৌজন্য মূলক হাসি দিল নওশাদ। পরীর জন্য যে তার আর তর সইছে না। মন চাইছে এখনই ছুটে অন্দরে

যেতে। আর পরীর সুন্দর বদন খানার মুখোমুখি হতে। কিন্ত এটা করলে বেয়াদবি করা হবে তাই মনের অদম্য ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে বসে রইল।

জুম্মান শাপলার কলিগুলোর সাথে এক প্রকার যুদ্ধ করে তাদের ফুলে রুপান্তরিত করলো। তারপর গুটি গুটি পায়ে পরীর ঘরে গেল। নীল

রঙের ফিতা দিয়ে চুল বাধছে পরী। জুম্মান আস্তে করে পরীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই পরী বলে উঠল,’এখানে এসেছিস কেন?’-‘আপা দেখো তোমার লাইগা শাপলা আনছি। আমি বিলে যাইয়া নিজেই তুইলা আনছি। নেওনা আপা?’

পরী ঘুরে জুম্মানের মুখের দিকে তাকালো। কাঁদো কাঁদো মুখ করে শাপলা বাড়িয়ে দিয়েছে জুম্মান। পরী আর না করলো না। হাত বাড়িয়ে শাপলা গুলো নিলো। সাথে সাথে জুম্মানের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল,’তোমার রাগ কমছে আপা? আমি তো ভাবলাম আপার হইলো কি?কথাও কেমনে জানি কও!!’

-‘কেন ভাল লাগে না?শোন তুই জমিদারের ছেলে জুম্মান। তুই এই গ্রামের সবচেয়ে ধনী ছেলে। তোর সবকিছুই তো সবার থেকে আলাদা হতে হবে। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবি। মনে থাকবে?’

জুম্মান মাথা নেড়ে বলল,’আমি তো তোমার মতো কথা কইতে পারি না!!’

-'আমি শেখাব তোকে।'

পরী ভেবে নিয়েছে যে জুম্মান কে ও নিজের মতো করে তৈরি করবে। তাই জুম্মান কে এটা ওটা শেখাতে লাগল। সাথে কিছু গভীর পরামর্শ করতে লাগল।সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই অঘটন ঘটিয়ে ফেলল নওশাদ। নাহ সে ঘটায়নি। অঘটন নিজেই তাকে ঘটিয়েছে। ঘুম ঘুম

চোখে ঘর থেকে বের হতেই ধপাস করে পড়লো গিয়ে গোবর গাদায়। পুরো শরীর মাখামাখি হয়ে গেল গোবরে। বিশ্রি গন্ধ আসছে পুরো শরীর থেকে। নওশাদের নিজেরই বমি পেয়ে গেল তা দেখে। এরকম করে কে গোবর ফেলে রেখে গেল? উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দ্বিতীয়বারের

মতো পড়লো সে। বিরক্ত হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নওশাদ।

শায়ের সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। নওশাদের অবস্থা দেখে হাসি পেলেও চেপে গেল সে। বলে উঠল,'কি ব্যাপার হবু জামাই?বিয়ে হতে এখনও ঢের দেরি আর আপনি এখনই গোবর খেলা শুরু করে দিয়েছেন?'

শায়েরের কটাক্ষ করে বলা কথাগুলো ভাল না লাগলেও তা হজম করে নিলো নওশাদ বলল,’আর বলবেন না কে যেন এখানে গোবর রেখে গেছে। আসতেই পড়ে গেলাম।’নওশাদ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল। হঠাৎই শায়েরের চোখ গেল অন্দরের দরজার দিকে। কয়েক জোড়া পা

দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ মনে সে কুসুম কে ডাকতেই পা গুলো সরে গেল। কুসুম এলো হাতে পানি ভর্তি বালতি আর ঝাড়ু নিয়ে। কুসুম নওশাদের দিকে তাকিয়ে বলল,’ইশশ রে কি অবস্থা!!কেমনে হইলো?’

জবাব টা শায়ের এগিয়ে এসে দিলো,’এখানে গোবর রেখেছে কে?’

-‘আমি রাখছি। উঠান লেপতে কইছে বড় মায়। কিন্ত হেয় না দেইখা হাটলে আমি কি করমু?’

কুসুম পানির বালতি সমেত নওশাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,’আহারে কি গন্ধ আসতাছে। খারান এহনই গতর ধুইয়া দিতাছি।’কুসুম বালতির সব পানি ঢেলে দিলো নওশাদের মাথায়।

প্রচন্ড রেগে গেল নওশাদ। কুসুমকে ধমক দিয়ে চলে গেল কলপাড়ের দিকে। কুসুমের কাজ দেখে শায়ের হেসে ফেলল। কুসুম অন্দরে চলে গেল। শায়ের খেয়াল করলো কুসুমের পা জোড়া আরেক জোড়া পায়ের সাথে মিলিত হয়েছে। শায়ের চিন্তা করলো এটা কি অনাকাঙ্খিত ঘটনা নাকি কেউ কঙ্খিত ভাবে

ঘটনাটা ঘটিয়েছে?কুসুম দৌড়ে পরীর কাছে গেল। এতক্ষণ পরী আর জুস্মান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর হাসছিল। পরিকল্পনাটা পুরোটাই পরীর। সে চায় নওশাদ যেন এখান থেকে চলে যায় তাই আজ থেকে সে নওশাদ কে নাকানি চুবানি খাওয়াবে। সেজন্য কুসুম আর জুস্মান কে হাত করেছে সে।

কুসুমের সাথে কথা বলে পরী নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

-‘পরী আপা।’ কুসুমের ডাকে ফিরে তাকায় পরী।

-‘আপনের পায়ের আরেকখান নূপুর কই??’নিজের পায়ের দিকে তাকাতেই চোখ জলে ভরে ওঠে পরীর। আরেকটা নূপুর গেল কোথায়?কখন খুলে পড়ে গেছে তা

টেরই পায়নি পরী। নূপুর জোড়া যে সোনালীর। যাওয়ার আগে পরীকে দিয়ে গেছে। কিন্তু পরী তার মূল্য দিতে পারেনি। হারিয়ে ফেলল সেটা!!চোখ মুছে পরী মেঝেতে বসে পড়ল। সোনালীর এই একটা স্মৃতিই পরীর কাছে ছিল। কিন্তু তার প্রতি হেয়ালিপনা কিভাবে করতে পারলো পরী?মনটা খারাপ করে ওখানেই

বসে রইল সে। কুসুম কাছে এসে বলে,’কি হইছে আপা?নূপুর খানা পড়লো কই?’-‘জানি না কুসুম। আমি এখন কোথায় খুজবো??’

জুম্মান পরীর পাশে বসে বলল,’তুমি চিন্তা কইরো না আপা। তুমি তো অন্দর ছাড়া কোন খানে যাও না। পুরা অন্দর খুঁজলেই পাওয়া যাইবো।’

পরী ভেবে দেখলো কথাটা ঠিকই বলেছে জুম্মান। কিন্তু সে তো বৈঠক ঘরেও গিয়েছিল। তাই পরী বলল,’তুই আর কুসুম বৈঠকে গিয়ে খোঁজ। আমি অন্দরে দেখতাছি।’

কুসুম আর জুম্মান তাই করে। বৈঠক ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজতে লাগলো দুজনে। শায়ের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে দেখলো ওরা

উকিঝুকি দিচ্ছে। শায়ের কিছু বলতে চাইলো কিন্ত পারলো না। নওশাদ ভেজা কাপড়ে এসেছে। কুসুম কে দেখে ওর রাগ হলো। সে রাগন্বিত কন্ঠে বলল,’এই মেয়ে তুমি আবার এসেছো!!আমার গায়ে গোবর,পানি দিয়ে মন ভরেনি তোমার?’

জুম্মান নওশাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে,’আরে ভাই পরী আপার

এক পায়ের নূপুর হারাইয়া গেছে। তাই খুঁজতে আইছি।’-‘পরীর নূপুর এইদিকে পড়েছে?কই দেখি।’

নওশাদ এগিয়ে নিজেও খুজতে লাগল। কুসুম জুম্মান কে চোখ মেরে বলল,’পরী আপার কত শখের নূপুর টা। যে পাইয়া দিব তারে পরী আপা মনে হয় পুরস্কার দিবো। চল জুম্মান ভাল কইরা খুঁজি।’

পরীর মন পাওয়ার লোভে নওশাদ বলল,’তোমরা যাও পরীর নূপুর আমি খুঁজে দিব।’

-‘দেইখেন কিন্তু হবু দুলাভাই। তাইলে পরী আপা আপনের উপর খুব খুশি হইবো।’

নওশাদের পাগলামো দেখে শায়ের হেসেই যাচ্ছে। কি নাকানি চুবানি দিচ্ছে ওরা। হঠাৎই শায়েরের

খেয়াল হলো সকাল থেকে সে একটু বেশিই হাসছে। আগে তো হাসতোই না। হলো কি ওর?এসব ভাবতে ভাবতে শায়ের নিজ গন্তব্যে চলে গেল।

শায়ের যখন ফিরল তখন বেলা সাড়ে দশটার বেশি বাজে। এসে দেখলো নওশাদ এখনও সেই হারানো নূপুর খুঁজে যাচ্ছে। শায়ের

হাসি চেপে এগিয়ে গিয়ে বলল,’আপনি এখনও সেই নূপুর খুঁজে যাচ্ছেন?’-‘কি করবো বলুন পরীর নূপুর বলে কথা।’

-‘আচ্ছা আপনি কি ছোট কন্যাকে কখনো এখানে আসতে দেখেছেন?’

-‘না তো।’

-‘তাহলে তার নূপুর এখানে আসবে কিভাবে?’

বোকা বনে গেল নওশাদ। তাই তো!!পরী তো কখনোই বৈঠক ঘরে আসেনা তাহলে নূপুর আসবে কোথা থেকে? তাহলে কি ওই কুসুম ওকে বোকা বানালো? রাগে গজ গজ করতে করতে নওশাদ নিজের ঘরে চলে গেল। শায়ের মুচকি হেসে নিজের ঘরে চলে গেলো।হতাশ হয়ে নিজের ঘরে বসে আছে পরী। খালি

পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সারা অন্দর খুঁজেও নূপুর টা পাওয়া গেল না। তারপর থেকেই পরীর মনটা একটু বেশিই খারাপ। পালঙ্ক থেকে উঠে গিয়ে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একঝাক মুক্ত বাতাস এসে ছুঁয়ে দিলো পরীকে। চোখদুটো বন্ধ করে ফেলে পরী। চোখের সামনে ভেসে উঠল সোনালীর হাস্যজ্বল

মুখটা। দেখতে বড়ই ভালো লাগছে পরীর। মনে হচ্ছে সোনালী ওর কাছেই আছে। কিন্ত এই ভালোলাগার স্থায়ীত্ব বেশিক্ষণ হলো না। দরজার ক্যাচ ক্যাচ শব্দে ফিরে তাকালো সে। রুপালি এসেছে,সে পরীর কাছে এসে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল,'রাগ করে আছিস আমার উপর?'

পরী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,’নাহ।’-‘পরী আমি সিরাজ কে ভালোবেসেছি আর বড় আপা রাখালকে। বড় আপার ভাগ্যে তার ভালোবাসা থাকলেও আমার ভাগ্যে নেই। কষ্ট হলেও আমি মানিয়ে নিচ্ছি পরী। তুই কেন পারবি না? তুই তো কাউকে ভালোবাসিস না। তোর তো কোন কষ্ট হবে না পরী।

আমার মতো তো অতীতের স্মৃতি নিয়ে তোকে বাঁচতে হবে না।'

-'ভালোবাসার মানুষ কে যেমন ভোলা যায় না তেমনি ঘৃণা করা মানুষ কে ভালোবাসা যায় না।'

-'এভাবে বলিস না পরী। নওশাদ কে আমি চিনি। ও খুবই ভাল ছেলে।'

-'নিজের স্বামীকে এতোদিনে চিনতে পারলে না। আর তুমি চিনবে তোমার দেওরকে?হাসালে আপা তুমি।'

কথার জালে বারবার রুপালিকে পেঁচিয়ে ফেলছে পরী। আর কিছুই বলার নেই রুপালির। যা করার এখন নওশাদ কেই করতে হবে। পরীকে বোঝাতে হবে যে নওশাদ

খুবই ভালো ছেলে। রুপালি আস্তে করে পরীর ঘর থেকে বের হয়ে এলো। পরী আবার জানালার ধারে গিয়ে আকাশ পানে তাকালো। আজ আকাশে মেঘ নেই ঝকঝকে রোদ উঠেছে। অথচ পরীর মনে রোদ নেই। মেঘে ঢাকা পড়েছে তার মনের সূর্যটা। পরী গোমড়া মুখে আকাশটাকে দেখে চলছে।মালা মুখ

কালো করে বসে আছে। পাশেই রুপালি বসে। মালা সায় দিচ্ছে না পরীর বিয়েতে। সে তো নওশাদ কে ভালোভাবে চেনে না। আর তাছাড়া নওশাদের পরিবার কেমন তাও জানে না। সোনালী তো চলেই গিয়েছে। রুপালি অনেক কষ্টে নিজের সুখ খুজে পেয়েছে। কিন্তু পরীর ব্যপারে মালা খুব সচেতন

তাই মালার মনের ভেতর নাড়া দিচ্ছে ভয়। রুপালি বারবার মালাকে বুঝিয়েও মানাতে পারছে না।

জুম্মান ঘাটে গেল পানি কতটুকু কমেছে তা দেখার জন্য। লাঠিটা উঠিয়ে সে দেখলো অনেক পানি কমে গেছে। যাদের বাড়িঘর একটু উঁচুতে ছিল তাদের ঘর জেগেছে। দুএক পরিবার ঘর ঠিক করে

সেখানে থাকছে। বন্যা এসেছে আজ ছাব্বিশ দিন চলছে। জুম্মান সব হিসেব করে রেখেছে। হিসেবের দিক দিয়ে জুম্মান খুবই সচেতন। সে লাঠিটা আবার পুঁতে দিলো। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো নওশাদ দাঁড়িয়ে আছে।-'মিথ্যে বললে কেন আমাকে?'

-'কি মিথ্যা কইছি আমি?'

-‘পরীর নূপুর সত্যিই হারিয়েছে?’

-‘সত্যিই তো। আপা সকাল থেকে মন খারাপ কইরা বইসা আছে।’

সন্দিহান চোখে জুম্মানের দিকে তাকিয়ে নওশাদ বলল,’তোমার আপা তো বৈঠক ঘরে আসে না তাহলে নূপুর টা বৈঠক ঘরে আসবে কিভাবে?’

জুম্মান মাথা চুলকে বলল,’সেটাও তো কথা। তাইলে আপা বৈঠক ঘরে আমাগো খুঁজতে কইলো ক্যান?’

নওশাদ বুঝলো যে ছোট্ট জুম্মান কিছুই জানে না। ওই কুসুম মেয়ে টাই কিছু করেছে। আসার পর থেকে ওর পিছনে লেগেই আছে মেয়েটা। এদিকে কবির ও নেই।

দুই শ্বশুরের সাথে কোথায় যেন গিয়েছে।

জুম্মান ছোট নৌকায় উঠতে উঠতে বলল,'যাই আবার কতগুলা শাপলা নিয়া আসি। দেখি আপার মন ভালো করতে পারি নাকি!!'নওশাদ শুনেই বলে উঠল,'এই আমি যাব আমি যাব।'

বলতে বলতে এক প্রকার লাফিয়ে নৌকায় চড়ে বসে নওশাদ।’

দুজনে মিলে শাপলা বিলে আসলো। বিলে গিয়ে দেখলো ছেলেমেয়েরা গোসলে নেমেছে। পানি অনেক কমে গিয়েছে বিধায় ওদের যেন সুবিধা হয়েছে। একপাশে বিন্দুর ভেলা দেখা গেল। সেও শাপলা তুলতে

এসেছে। জুম্মান কে দেখে সে ভেলা নিয়ে এগিয়ে এলো।

-‘আরে জুম্মান যে। তা কি মনে কইরা?আর এই বেডা কেডা?’

-‘মেজো আপার দেওর গো। হের লগে আমাগো পরী আপার বিয়া হইবো।’

বিন্দু পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবলোকন করলো নওশাদের।

দেখতে ছেলেটা ভারি সুন্দর। শার্ট প্যান্ট পড়ায় আরো সুন্দর লাগছে। এই গ্রামে খুব কম যুবকরা শার্ট প্যান্ট পড়ে থাকে। টাকার অভাবে অনেকে কিনতে পারে না। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরেই থাকে সারাদিন। সম্পানও লুঙ্গি পরে। বিন্দু ভাবলো ইশশ সম্পান যদি এই রকম শার্ট প্যান্ট পড়তো কতই না সুন্দর

লাগতো ওকে। নওশাদের মতো একজোড়া জুতো পড়লে একেবারে সাহেবদের মতো লাগবে। ভেবে মনে মনে হাসল বিন্দু।-‘কি গো বিন্দু দিদি কইলা না আপার জামাই কেমন?’

-‘রাজ পুত্তুর রে জুম্মান। পরীর চান কপাল। যেমন সুন্দর পরী তেমন সুন্দর জামাই। পরীর লগে তো কথা

কইতে হইবো। সই আমার বিয়া করব।'

-'তুমি পরীকে দেখেছো? কেমন দেখতে?'

হঠাৎই নওশাদ প্রশ্ন করে বসে। বিন্দু মৃদু হাসে নওশাদের আগ্রহ দেখে।

-'এতো গরজ ক্যান গো বাবু?তর সয় না বুঝি?চান্দের লাহান মুখখান

দেহার লাইগা তইয়ার হইয়া যান। জ্ঞান হারাইতে পারেন। তয় এইডা কইতে পারি আপনে ঠকবেন না।’

খিলখিল করে হেসে উঠল বিন্দু। তারপর নিজের কাজে মন দিলো। বিন্দুর কথা ও হাসির তোড় নওশাদের দুকান ভরে বাজে। সত্যিই এতো অপরূপা পরী?

জুম্মান হাল্কা ঝুঁকে শাপলা তুলতে গেল। কিন্তু নওশাদ তাতে বাধা দিলো। পরীর জন্য সে নিজেই শাপলা তুলবে। তাই সে ঝুকে কয়েক টা শাপলা তুলল। আরেকটু দূরে একটা পদ্ম দেখা যাচ্ছে। খুশিমনে নওশাদ পদ্ম তে হাত দিলো। পদ্মের বোটা একটু শক্ত বিধায় কসরত করতে হচ্ছে। এমন

সময় জুম্মান হাতের বাঁশ টা দিয়ে নৌকাটা হালকা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। ভারসাম্য রাখতে না পেরে নওশাদ ধপাস করে পানিতে পড়ে গেল। আশেপাশের সবাই তা দেখে হেসে উঠল। জুম্মান নিজেও হাসতে লাগল। বিন্দু হাসি থামিয়ে বলল,'কিগো বাবু পরীর প্রেমে পড়ার আগেই জলে পড়লা।'বিন্দুর হাসি

আরো বাড়লো। এবার আর রাগ করলো না নওশাদ। সে নিজেও হাসলো বলল,’তোমাদের পরীর প্রেমই আমাকে পানিতে এনে ফেলেছে। কি করব বলো?’

-‘তুমি খুব রসিক গো বাবু। পরীর ভাগ্য ভালা।’

বিন্দুর প্রশংসায় নিজের প্রতি গর্ব হচ্ছে নওশাদের। সে সাবধানের

সহিত পানি থেকে নৌকাতে উঠে আসে। তারপর ফিরে আসে জমিদার বাড়িতে। উঠোনের এক কোণে বাঁশের বেঞ্চি পাতা। শায়ের আর কবির সেখানে বসে কথা বলছে। নওশাদ কে ভেজা গায়ে আসতে দেখে কবির বলে উঠল,’তুই এভাবে ভিজলি কিভাবে?

-‘শাপলা তুলতে গিয়ে পানিতে পড়ে গেছি।’

-‘ইশশ শেষমেশ পঁচা পানিতে পড়লি!!যা যা কলপাড়ে। আমি তোর জামাকাপড় দিচ্ছি।’কবির উঠে চলে গেল। জুম্মান শাপলাগুলো দূরের ফেলে দিয়ে এলো। শায়ের অবাক হয়ে বলে,’ফেললে কেন?’

-‘তো কি করমু ওই বেডার ফুল আপারে দিমু? আপা তো আমারে মাইরা ফালাইবো। আমার ভাল লাগে না হ্যারে।’

-‘তাহলে কাকে ভাল লাগে?’

-‘আপনেরে।’

বলেই হাসলো জুম্মান। শায়ের বেশ অবাক হয়ে বলে,’আমার থেকেও

তো তোমার নওশাদ ভাই বেশি সুন্দর।’

-‘তাও তারে আমার ভালো লাগে না। হের চেহারায় কোন মায়া নাই। কিন্ত আপনের আছে। আপনে অনেক ভাল মানুষ। আপনের কথাও ভাল লাগে।’

তাজ্জব বনে গেছে শায়ের। মাথা ঠিক আছে তো জুম্মানের?কোথায়

নওশাদ আর কোথায় সে!! আকাশ পাতাল তফাত। তার সাথে তো নওশাদের তুলনা হয়ই না। জুম্মান চলে যেতে নিচ্ছিল কিন্ত আবার শায়েরের সামনে এসে বলে,’একখান কথা কই সুন্দর ভাই? পরী আপার লগে আপনেরে কিন্ত খুব মানাইবো।’ কথা শেষ করে জুম্মান আর দাঁড়াল না। দৌড়ে অন্দরের ভেতর চলে

গেল। শায়ের স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পরে ভাবল ছোট্ট ছেলে। মনে যা এসেছে তাই বলেছে। বুঝলে একথা বলতো না। কোথায় রাজকুমারি আর কোথায় সামান্য মালি।ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাত্রি অনেক তা বোঝাই যাচ্ছে।মধ্যরাতের বেশি তো হবেই। জমিদার বাড়ির চাকররা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্দরের দরজা

খুলে বৈঠকে প্রবেশ করে কেউ। তার হাতে হারিকেন। মুখটা সপ্তবর্ণে ঢেকে কিছু একটা খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্ত পাচ্ছে না তবুও সে হাল ছাড়ছে না। তখনই একটা ভারি পুরুষালী কন্ঠস্বর ভেসে আসে,'আপনি আবার বৈঠকে এসেছেন!!'হারিকেনের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কাঁপছে। এমনি এমনি

নয়,মৃদু বাতাস বইছে যার ফলে অগ্নিশিখা দুলে চলছে। শায়েরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরী। এখন তো শায়ের আবার ওকে অপমান করবে বৈঠকে আসার জন্য। যার জন্য এতো রাতে এলো তাতেও কাজ হলো না। সেই শায়েরের মুখোমুখি হয়েই গেল। রাগে পরী তাই ফিরেও তাকালো না। সে

চুপচাপ ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো।

-'দাঁড়ান!!' পা দুটো আপনা আপনিই থেমে যায় পরীর। ঘোমটা টা আরো বড় করে টেনে ঘুরে দাঁড়াল। শায়ের পরীর দিকে এগিয়ে এসে বলে,'এতো রাতে আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

-‘সেই কৈফিয়ত কি আমি আপনাকে দেব?’

হাসলো শায়ের তবে শব্দ হলো না।-‘জানতে চেয়েছি কৈফিয়ত চাইনি। আপনার ইচ্ছা না হলে বলবেন না। তবে রাতের বলা বৈঠকে আসবেন না। এখানে নতুন দুই পুরুষের আগমন ঘটেছে। তারা

কেমন তা না জানা পর্যন্ত এখানে না আসাই ভালো।'

-'আমার সুরক্ষা আমি নিজে করতে জানি।'

-'পুরুষের শক্তির সামনে নারীর শক্তি যে নগন্য ছোট কন্যা।'

ছোট কন্যা নামটি শুনে পরী অবাক চোখে তাকায় শায়েরের দিকে। এটা কেমন নাম? শায়ের কমপক্ষে সাত

আট বছরের বড় পরীর থেকে। সেক্ষেত্রে সে পরীকে নাম ধরে ডাকতেই পারে। কিন্ত তা শায়ের কখনোই করে না। আপাতত এসব না ভেবে পরী শায়েরের কথার জবাব দিলো,'পরীক্ষা করতে চান তো পারেন। এই লাঠিয়াল পরীর সাথে পারেন কি না?'-'আমি মেয়েদের সাথে লড়াই করি না।

মেয়েরা ফুলের মতো। তাদের শুধু ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লড়াই করার জন্য নয়।’

থমকালো পরী। হারিকেনের আলোয় ভাল করে তাকালো শায়েরের পানে। ছেলেটার চোখে সুরমা সবসময়ই থাকে। এতে ভিশন মায়াবী লাগে শায়ের কে। মুখ দিয়ে যেমন সুন্দর কথা বের হয় তেমনি চোখ দিয়ে ও

মায়া ছড়ায়। পরী কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেল। মাথা ঘুরে উঠলো তার। আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সে জ্ঞান হারাবে। তবুও পরী শায়েরের এই কথাটার ও জবাব দিলো,'ভালো কথা জানেন আপনি। তা বিয়ে করে নিলেই পারেন। দিন রাত বউকে সুন্দর সুন্দর কথা শোনাবেন।'

ওষ্ঠাধরে সূক্ষ্ম হাসির রেশ দেখা দিলো শায়েরের। সে শান্ত গলায় বলল,’বউ তো আছেই শুধু তিন কবুল পড়ে ঘরে তোলা বাকি। কিন্ত এই গরিবের যে ঘর নেই। আছে মন,আর মন দেখে তো আর কেউ আমার কাছে আসবে না।’

রাগ থাকলেও শায়েরের কথাগুলো মুগ্ধ করছে পরীকে। ওর কথাতে

শুধু মায়া নয় ভালোবাসা ও জড়ানো। যা শুধু পরী নয় যে বা যারা শুনেছে তারাই মুগ্ধ হয়েছে শায়েরের প্রতি। পরী এবার কোন কথা বলে না। চুপ করে তাকিয়ে রইল।-‘আপনি নূপুর খুঁজতে এসেছেন তাই না?কিন্ত আপনি তো এখানে আসেন না তাহলে নূপুর পড়বে কেন?’

একটু ভেবে শায়ের আবার বলে উঠল,’হবু বরের সাথে দেখা করতে এসেছেন নাকি?’

নওশাদের কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে গেল পরীর। রাগে গজ গজ করে বলল,’বাজে কথা বলবেন না। আর ওটা কোথায় ঘুমিয়েছে এখনই ওটাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।’

-‘বরকে মারলে আপনি যে বিধবা হবেন বিয়ের আগেই। তাছাড়া এখনই গোবরে ফেলে যে অবস্থা করেছেন বেচারা খুব তাড়াতাড়ি মরবে বোধহয়।’

শায়ের জানলো কিভাবে এসব পরীর কল্পনা?একটু ভয় ও পেলো পরী। শায়ের যদি সবাইকে বলে দেয় তাহলে কি হবে? মালা তো পরীকে

খুব মারবে। পরী নিজের ভয় লুকিয়ে বলে,’ভুলে যাবেন না সামান্য এক কর্মচারী আপনি। জমিদার কন্যার দিকে আঙুল তোলার সাহস হলো কিভাবে আপনার?’

শায়ের মাথা ঝুঁকে বলে,’ক্ষমা করবেন ছোট কন্যা আমার বড় ভুল হয়ে গেছে।’কথাটা বলে পকেট থেকে একটা মলমের কৌটা বের

করে এগিয়ে দিলো সে। সকালে পরীর পা চিনতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি তার। সেদিন রাতে পরীর হোঁচট খাওয়া ও চোখ এড়ায়নি। পরীর পা যে অনেক খানি ছড়ে গেছে। সেদিকে পরীর খেয়াল নেই। পায়ে ব্যথা অনুভব করলেও পরী তাতে পাত্তা দেয় না। তবে শায়ের তা ঠিকই দেখেছে। তার

কাছে মলমের কৌটা ছিল তাই সে সেটা পরীকে দিলো।

-‘আপনার পায়ে আঘাত পেয়েছেন। এটা লাগিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে।’

পায়ের জ্বালা তো মিটানো যাবে কিন্ত পরীর মনের জ্বালা কে মেটাবে?? শায়ের যে ওকে অপমান করেছে তা আবারও মনে পড়ে গেল। ওর কারণেই তো সে ব্যথা পেয়েছে।

ব্যথা দিয়ে আবার মলম দেওয়া হচ্ছে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পরী চেপে ধরে শায়েরের হাত। এতে চমকে যায় শায়ের। হাতটা টেনে হারিকেনের কাচের গায়ে চেপে ধরে হাতের তালু। প্রচন্ড গরম সে কাচ। আগুনের আচে যেন দ্বিতীয় অগ্নিশিখা। হাত পুড়ে যাচ্ছে শায়েরের। তবুও সে কিছু বলছে

না। চোখদুটো বন্ধ করে রেখেছে। পরী ছেড়ে দিলো শায়েরের হাত। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল,’মলমটা এখন আপনার কাজে লাগবে।’দ্রুত পদে পরী এগিয়ে গেল অন্দরের দরজার দিকে।কিন্তু শায়েরের বলা বাক্যে সে থেমে গেল আবার। শায়ের বলছে,’সামান্য

কর্মচারীকে তো ছুঁয়ে দিলেন ছোট কন্যা।'

পরী পেছন ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিলো,'এটা মধুরতম ছোঁয়া নয় শাস্তির ছোঁয়া।'

দরজার খুলে পরী চলে যেতেই শায়ের নিজের পোড়া হাতের দিকে তাকালো। ইতিমধ্যেই কালচে হয়ে গেছে হাতটা। এই হাতে এখন ওর

কাজ করা মুশকিল হবে। এই মেয়েটা প্রচন্ড জেদি আর রাগি। রাগ নাকের ডগায় সবসময়ই থাকে। জমিদার কে না জানি কত কিছু পোহাতে হয়। মাঝে মাঝে আফতাবের প্রতি মায়া হয় শায়েরের। এমন জল্লাদ মেয়ে সে আর দুটো দেখেনি। নওশাদের কপালে যে আর কি কি আছে তা

ভেবেই সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। হাতের তালুতে অপর হাত বুলাতে বুলাতে নিজের ঘরে চলে গেল।আজ ঘুম থেকে উঠে সাবধানের সহিত পা ফেলে নওশাদ। চারিদিক সতর্কতার সাথে চক্ষু বিচরণ করলো। নাহ কোথাও গোবর নেই। খুশিমনে সে কলপাড়ে চলে গেলো। তবে অসাবধানতার বসে পা পিছলে পড়ে

গেল। ফলে বাম পা মচকে গেছে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল ফর্সা চেহারা তার। ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারলো না।

নওশাদের পা মচকে গেছে শুনে অন্দরের সবাই এলো দেখতে। পরী আর আবেরজান এলো না। পরীর তো নিষেধাজ্ঞা আছে আর আবেরজান এর শরীর ভাল না।

কোথায় হবু জামাই এর সাথে জমিয়ে গল্প করবে!! তাই তার মনটা ভীষণ খারাপ। এই শরীর নিয়ে সে পারে না বেশি হাটাচলা করতে। আর তার ঘরটাও দোতলায়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা কষ্টকর। তাই তিনি আসতে পারলেন না। নওশাদ ব্যথায় কাতরাচ্ছে কবির চিন্তিত হয়ে বসে আছে।

-‘কবির তুমি বরং ওকে শহরের কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। তাহলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। গ্রামে তো ভালো ডাক্তার নেই।’আখিরের কথায় কবির ও সায় দিল। কারণ অবস্থা সুবিধার ঠেকছে না কবিরের কাছে। নওশাদ প্রথমে অমত পোষন করলেও পরে রাজি

হয়। কবির নওশাদকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

রুপালি আর মালা ঘাটে গিয়ে ওদের নৌকায় তুলে দিলো। মালা আগে আগে চলে গেলেও পেটের ভারে আস্তে আস্তে হাটছিল রুপালি। আচানক আখিরের সামনে পড়ল সে। আখির রুপালিকে ভাল করে দেখে বলে,'আসার পর তো একবার

দেখা করলি না? তা কি খবর তোর?’

ঘৃণায় চোখ সরিয়ে নিলো রুপালি। এই মানুষ টাকে সে মন প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। শুধুই রুপালি নয়। সোনালী,মালা আর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে পরী। রুপালি অন্যদিকে তাকিয়েই বলে,’আপনাকে দেখে আমার রুচি নষ্ট করার ইচ্ছা ছিলো

না।’-‘ক’দিন পর বাচ্চার মা হবি আর এখনও এত তেজ কোথা থেকে আসে তোর? সম্পর্কে আমি তোর কাকা হই ভুলে গেছিস?’

-‘আমি ভুলিনি কিছুই। কিন্তু আপনি ভুলে গেছিলেন আপনি আমাদের কাকা। তাই তো নিজের হিংস্র থাবা মেরেছিলেন সোযোগ বুঝে। সোনালী নরম ছিল আর আমিও কিছুটা দুর্বল

ছিলাম। কিন্তু পরী ছিল না। তাইতো পরীর হাতেই আপনার পতন ঘটেছিল। আপনার অবস্থা দেখে আমার হাসি পায়। এখন শুধু আপনার ওই নোংরা চোখদুটো উপড়ে ফেলা বাকি।'

-'তোর সাহস তো কম না আমাকে শাসাস!!ভয় দেখাস আমাকে?? সেদিনের পুচকে মেয়ে। জীব টেনে

ছিড়ে ফেলব তোর বাপ ও কিছু বলবে না।’

-‘পরীর কলিজায় হাত দেবেন এতো বড় কলিজা আপনার??ওই কলিজায় তলোয়ার চালাতে পরীর হাত কাঁপবে না। সাবধান,আপনাকে কিন্তু পরী ছেড়ে দিবে না।’

রুপালি আর কথা বাড়ালো না ধীর পায়ে চলে গেল। আখির ক্ষিপ্ত চোখে

তাকিয়ে রইল রুপালির দিকে। এই মুহূর্তে তার খুন করতে ইচ্ছা করছে। কিন্ত তা সম্ভব না তাই নিজের অদম্য ইচ্ছাকে মনের ভেতর কবর দিলো।

অন্দরে পা ফেলতেই ঘৃণায় দুঃখে চোখের পানি ফেলে রুপালি। নিজের আপন কাকা যে ওদের ওপর লালসার হাত বাড়াবে তা রুপালি

ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।সময়টা ছিল রুপালির বালিকা বয়সের। আফতাব তখন সবে জেসমিন কে বিয়ে করেছে। বাবার প্রতি তখনও ক্ষোভ জন্মায়নি রুপালির। সে তখন ওসব বোঝে না। আখিরকে রুপালি খুব ভালো জানে। কাকা কাকা বলে গলা জড়িয়ে ধরতো দেখা হলেই। সেই সুযোগ টাই কাজে লাগালো আখির।

হিংস্র থাবা দিলো ছোট্ট কোমল ফুলের উপর। কাকার আচরণ রুপালিকে অবাক করে দিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে সেদিন সোনালীর কাছে সব বলেছিল। ছোট্ট রুপালির মুখে আখিরের লালসার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল সোনালী। তার নিজের সাথে ও একই ঘটনা ঘটেছে। তারপর থেকে আখিরের

ধারে কাছে ঘেষতো না সে। আর এখন রুপালির দিকে হাত বাড়িয়েছে শয়তান টা। সোনালী সেদিন অনেকক্ষণ আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছিল। কি আছে এই সৌন্দর্যে?? যার কারণে আপন মানুষ পর্যন্ত ছাড় দেয় না?? নিজের সুন্দর চেহারাকে একটা অভিশাপ মনে করে সে। তার সৌন্দর্য ই পুরুষদের

আকর্ষণ করে তাকে কেউ ভালোবাসে না। কিন্ত কালো কেও তো কেউ পছন্দ করে না। তাহলে কি কালো ও অভিশাপ?? সোনালীর মনে হচ্ছে মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়াই অপরাধ। কিন্ত আল্লাহ তো নারীদের স্থান সর্বোচ্চ করেছে। মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত রেখেছে। তাহলে তো নারীর মূল্য অনেক।

কারণ প্রতিটা নারীই একদিন মা হবে। তবে দুনিয়ার পুরুষ কেন মেয়েদের লালসার শিকার বানায়?? অনেক কেঁদেছিল সোনালী বারবার প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ যেন ওর রূপ ফিরিয়ে নেয়। দরকার নেই এই সৌন্দর্যের।কিন্ত যেদিন আখির পরীর দিকে নিজের থাবা দিলো সেদিন ই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। সেদিনের

পর কয়েক বছর পার হয়ে যায়। পরী সবে ছয় শেষ করে সাতে পা দিয়েছে। সোনালী আর রুপালি সবসময়ই পরীকে আখিরের থেকে দূরে রাখতো। ওরা চাইতো পরী যেন এই ঘটনার সম্মুখীন না হয়। কিন্ত ভাগ্যবশত সেই একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি করে আখির। পরী দৌড়ে গিয়ে খুশিমনে কাকার কোলে চড়ে

বসে। পরীর সুন্দর কোমল দেহে লালসার হাত বিচরণ করতে বড়ই ভালো লাগলো আখিরের কিন্তু পরী কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। ছোট্ট পরী বুঝে গেল আখিরের উদ্দেশ্য। তবুও সে চুপ করেই রইল। পরীর হাত টেনে আখির নিষিদ্ধ স্থানে রাখতেই পরী মুখ খিচে ফেলে। রাগটা মাথায় চড়ে বসে। আখির

দেখতে পায় না পরীর লাল আভা ছড়ানো মুখখানা।হাতে চাপ প্রয়োগ করে পরী। একধ্যানে সামনের দিকে তাকিয়েই হাতের চাপ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করে সে। আখির ঘাবড়ে যায় পরীর কাজে। ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় পরীকে। কিন্ত তার শক্তি সে হারিয়েছে। পরী এতো জোরে তাকে ধরেছে যে আখির নিজের শরীরের

ভর ছেড়ে দিলো। এখন তার নিঃশ্বাস দিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পরী তাকে ছাড়ছে না। সে পরীকে কিছু বলতেও পারছে না। প্রথম দিকে সে পরীকে চড় থাপ্পড় মেরেছে ধারালো নখ দাবিয়ে ও দিয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। এই মুহূর্তে পরী হিংস্র হয়ে গেছে। তাকে থামানো কষ্টকর। ওদিকে মুখ দিয়ে বুদবুদ বের হচ্ছে

আখিরের। ঠিক তখনই ছুটে এলো পরীর দুবোন। টেনে ছাড়িয়ে আনলো আখিরের থেকে। আখির মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগল। কিন্ত পরী থেমে রইল না। ছুটে গেল রন্ধনশালায়। বটি নিয়ে আবার দৌড় দিলো। মেয়েকে এভাবে বটি নিয়ে ছুটে যেতে দেখে মালাও ছুটে গেল। সোনালী পরীকে টেনে ধরে আর

রুপালি বটি কেড়ে নিল। পরীকে এখন না থামালে খুন সে করেই দেবে। পরীর চিৎকারে জুম্মান কে কোলে নিয়ে ছুটে এলো জেসমিন। উপস্থিত ঘটনা দেখে সেও ঘাবড়ে গেছে। কি হয়েছে জানতে চাইছে। পরী গলা ছেড়ে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও আপা। জা**রের বাচ্চাকে আমি আজ খুন করেই

ছাড়বো। ওর রক্ত দিয়ে গোসল না করা পর্যন্ত আমি পরী শান্ত হবো না।’

মালা পরীকে টেনে দুটো থাপ্পড় লাগালো তারপর পরীকে নিয়ে ওর ঘরে আটকে রাখলো। জেসমিন খবর পাঠায় আফতাবের কাছে। আখিরের অবস্থা ভাল না তাই তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া

হয়।সেদিন সোনালী,রুপালি প্রথম মায়ের কাছে সব খুলে বলে। এর আগে আখিরের হুমকির সম্মুখীনে পড়ে কাউকেই তারা কিছু বলেনি। কিন্ত আজ বলে দিচ্ছে। দুই মেয়েকে বুকে চেপে ধরে মালা। অশ্রুজলে ভাসায় বুক। সৌন্দর্য যে মালাকেও এই পরিস্থিতির সামনে দাড়

করিয়েছিল। মা মেয়েরা যেন এক লালসার প্রাণী যে সবাই থাবা মারে। তবে সেদিনের পর নিজের পুরষত্ব হারায় আখির। ডাক্তারের অনেক চেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেলেও নিজের পুরষত্ব ফিরে পায় না। যার কারণে আখির আজও পরীর উপর ক্ষ্যাপা। আর পরীর মাথায় চাপা প্রতিশোধের

আগুন এখনও আছে। প্রাণ চায় সে আখিরের।

কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে মালা পরীকে নিয়ে আরো সচেতন হয়। মালা বুঝে যায় পরী আখিরের থেকে প্রতিশোধ তুলবেই। প্রয়োজনে আফতাবের উপর আক্রমণ করতেও পিছু পা হবে না। বাপ মেয়ের লড়াই থামাতে পরীকে ঘরবন্দি করে রাখে

সে। কিন্ত সোনালী চলে যাওয়ার পর আফতাব নিজেই সবাইকে অন্দরে বন্দি করে দেয়।

কিন্ত এতবছর পরও প্রতিশোধের আগুন একটুও কমেনি পরীর। আখির ও পরীর প্রতি জন্মানো ক্ষোভ যত্ন করে পুষছে। কখন যে চাচা ভাতিজীর যুদ্ধ শুরু হয় তা এখন কেউই বুঝতে পারবে না। কারণ

দুজনেই ঠান্ডা মাথার খিলাড়ি।দুপুরে খেতে বসে শায়ের পড়লো বিপদে। ডান হাত টাই পুড়িয়ে দিয়েছে পরী। এখন সে খাবে কিভাবে?? সকালে দুটো রুটি খেয়েছিলো বিধায় তেমন সমস্যা হয়নি কিন্তু এখন তো ভাত মেখে খেতে হবে। শায়ের পারলো না খেতে। মালা শায়ের কে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস

করল,’কি হইলো শায়ের??খাওনা ক্যান??’

ইতস্তত করে শায়ের প্লেটে হাত রাখতেই মালার চোখ পড়ল ওর হাতে। মৃদু চিৎকার দিয়ে মালা বলে উঠল, ‘ওমা,হাতের এই অবস্থা হইলো ক্যামনে?? এখন খাবা ক্যামনে??’

শায়ের মাথা নিচু করে বলে,’হারিকেনের সাথে লেগে পুড়ে গেছে।’-‘একটু দেইখা কাম করবা তো!!আহারে কতখানি পুইড়া গেছে!! আহো আমি খাওয়াইয়া দেই।’

-‘নাহ বড়মা আমি পারব।’

-‘কথা কইয়ো না। তুমি তো আমার ছেলের মতোই। আমার সোনালীও তো তোমার বয়সী আছিলো। আমি

খাওয়াইয়া দিতাছি।'মায়ের ভালোবাসা কপালে লেখা নেই শায়েরের তাইতো অকালে মাকে হারাতে হয়েছে। মাকে কখনো বলতে পারেনি যে,মা আজ তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাবো। আর তুমি আমাকে গল্প বলবে। সেই গল্প শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। এটা ওটা বায়না করা হয়নি মায়ের

কাছে। আঁচলে মুখ মোছা হয়নি। একটু খানি মাতৃত্বের গন্ধ ও নাকে ঢেউ খেলেনি। কারণ তাকে জন্ম দিয়েই সে পরলোকগমন করেছেন। তাইতো শায়েরের জীবনটা অতি বিষাদময় কেটেছে। শৈশব কেটেছে আরো অবহেলায়। এতগুলো বছর পর কেউ তাকে খাইয়ে দিচ্ছে ভাবতেই ভালো লাগছে ওর। মালা

পরম যত্নে খাবার তুলে দিচ্ছেন শায়েরের মুখে। আর শায়ের বাচ্চাদের মতো খাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে চোখের কোণে জমে থাকা জলটুকু সযত্নে মুছে নিলো সে।মালা যে শায়ের কে খাইয়ে দিয়েছে তা পরীর কানে যেতে সময় লাগলো না। পরীর চামচা কুসুম গিয়ে বলে,’জানেন পরী

আপা বড় মায় শায়ের ভাইরে খাওয়াইয়া দিছে আইজ। ভাইয়ের হাত নাকি পুইড়া গেছে। আমি নিজের চক্ষে দেইখা আইলাম।’

-‘কি বলিস??আচ্ছা আম্মাকে কিছু বলছে সে??’

-‘কি কইবো??’

-‘হাত পুড়েছে কিভাবে??’

-‘কইলো তো হারিকেনে পুড়ছে।’

পরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভয় পেয়ে গিয়েছে সে। যদি শায়ের ওর নাম বলতো তাহলে মালা ওর হাতটাও পুড়িয়ে দিতো। কিন্তু মালা শায়ের কে খাইয়ে দিয়েছে শুনে মুখ বাকিয়ে সে বলে,’সামান্য একটা কাজের ছেলেকে আম্মা খাইয়ে দিলো!!’-‘কি করবে কন আপা। একে তো হাত পুইড়া গেছে। তার

উপর জ্বর উঠছে। নিজের বাড়িও যাইতে পারব না। মা নাই তো। কে সেবা করবো?ভাইডা অনেক ভালা আপা।’

মনক্ষুণ্য হলো পরীর কথাটা শুনে তবে অতটা খারাপ লাগলো না। কারণ মা হারা শায়েরের কষ্ট টা সে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো না। মা হারা সন্তানের কষ্ট সেই

বোঝে যে মা হারিয়েছে। মায়ের আঁচলের নিচে থেকে অতি আদরে বড় হয়েছে পরী। তাই সে শায়েরের কষ্ট বুঝবে কি??

কবির নওশাদকে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। কেননা নওশাদের পা কেবল মচকায়নি। বাজে ভাবে ভেঙে গেছে। তাই কবির নূরনগরে না এসে নওশাদের বাড়ি চলে গেছে। ডাক্তার

পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে ওষুধ ও দিয়েছে। একজনকে দিয়ে আফতাব কে খবর পাঠিয়েছে কবির।

খবরটা জানার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হলো পরী। যাক আপদ বিদায় হয়েছে। এখন সে দুই রাকাআত নফল নামাজ পড়বে। মোনাজাতে পরী আল্লাহ কে বলেছিল,'আল্লাহ ওই নওশাদকে তুমি আমার কপাল

থেকে উঠাইয়া নাও তাহলে দুই রাকাআত নফল নামাজ পড়বো।'

আল্লাহ পরীর দোয়া কবুল করেছে। তাই পরীও নফল নামাজ পড়বে। খুশিমনে পরী নিজের ঘরে চলে গেল।

অক্টোবর মাস,,,,,,বন্যার সমাপ্তি ঘটেছে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে। পুরো তেত্রিশ দিন প্রলয়কারি বন্যা

ছিলো। বাংলাদেশের ৬৮ শতাংশ ডুবে গিয়েছিল এ বন্যায়। সেই দুর্ভিক্ষ এখনও নূরনগরের বাসিন্দারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পুনরায় নিজেদের ঘরবাড়ি ঠিক করে কোনমতে জীবনযাপন করছে। তবে অভাব তাদের ফুরাচ্ছে না। তাই গ্রামের অধিকাংশ পুরুষই শহরে পাড়ি জমিয়েছে। সম্পান মাঝিও

শহরে গেছে। পদ্মা তো তার সব জল নিয়ে গেছে। এখন আর মাঝিগিরি করলে তার পোষাবে না। বিন্দুকে নিজের ঘরোনি করতে হবে তো। কাজ না করলে মহেশ কি তার হাতে বিন্দুকে তুলে দেবে?? সম্পান ভেবেছে ফেরার সময় বিন্দুর জন্য লাল রঙের শাড়ি কিনে আনবে। এর আগে আনতে চেয়েছিল কিন্তু

আচানক পালকের মৃত্যুতে তা আর হয়ে ওঠেনি। কিন্ত এখন সে বিন্দুর জন্য নিজে পছন্দ করে শাড়ি নিয়ে যাবে।সম্পানের ভাগ্য ও ভালো বলা বাহুল্য। গ্রামে আসতেই পথে বিন্দুর দেখা। সম্পান খুশি হয়ে বিন্দুর কাছে এগিয়ে গেল। শাড়ির ব্যাগটা বিন্দুর হাতে দিয়ে সুধালো,’দ্যাখ বিন্দু তোর লাইগা শাড়ি আনছি।’

শাড়িটা বের করে খুশিতে বিন্দুর চোখজোড়া চকচক করে উঠলো। চোখে খুশির ঝিলিক দেখে সম্পান ও খুশি হলো। শাড়ি থেকে চোখ সরিয়ে সম্পানের দিকে তাকিয়ে বিন্দু বলল,'শাড়িটা খুব সুন্দর হইছে গো।'

-'ব্যাগের মধ্যে আরো একখান জিনিস আছে।'

বিন্দু ব্যাগ হাতে বড় একটা সিঁদুর কৌটা বের করলো। বিষ্মিত চোখে তাকালো সম্পানের দিকে। শ্যামা কন্যা বিন্দুর মুখে তৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পুরুষ কে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। এতো নিখুঁত ভাবে একমাত্র সম্পান ই পারে ভালোবাসতে।–‘আমি অপেক্ষা

করতাছি তোরে এই সিঁদূর পরানের।’

-‘খুব তাড়াতাড়ি সেইদিন আইবো??’

-‘হ রে বিন্দু। আমি আর বেশি দেরি করমু না বিন্দু। এইবার শহরে গেলে বিয়ার সবকিছু কিইনা আনমু।’

একটু লজ্জা পেলো বিন্দু। নিজের বিয়ের কথা শুনলে সব মেয়েরাই লজ্জা পায়। তেমনি বিন্দুও পেলো।

মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা ভালোবাসা সবটুকু সে সম্পান কে দিতে চায়। আঁকতে চায় ছোট একটি সুখি পরিবারের ছবি। সেখানে একটি ছোট্ট গ্রাম আর ছোট্ট একটি পরিবার থাকবে। মনে মনে নিজের ইচ্ছেগুলো পোষন করে সম্পানের পিছু পিছু হাটা ধরে বিন্দু। কাঁচা রাস্তায় কিছুক্ষণ হাটার পর

দুজন আলাদা পথ ধরে। রাস্তার পাশের ধান ক্ষেতের আইল বরাবর বিন্দু নেমে পড়ল। আর সম্পান রাস্তার পথ ধরলো। দুকদম এগিয়ে থেমে গেল বিন্দু। পেছন ফিরে গলা ছেড়ে ডাকলো সম্পান কে।-‘বিন্দুর মাঝে কি এমন দেখলা যে তোমার বিন্দুরেই লাগবো??’

সম্পান হেসে বলে,’বিন্দুরে দেখার পর তো আর কাউরে দেখি নাই। দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দর মাইয়ারা যদি আমার সামনে আসে তাগো মাঝে আমি এই বিন্দুরেই খুজমু। আমার খালি বিন্দু হইলেই চলবো।’

বিন্দু এ লজ্জা কোথায় লুকাবে??লাল শাড়িটি দিয়ে মুখ ঢেকে সামনের দিকে দৌড় দিলো। তবে লজ্জাবতীর

লজ্জা লুকাতে পারলো কই??ধান ক্ষেতের প্রতিটা শীষ দেখে নিলো। স্বাক্ষী রইলো আকাশ, হাওয়া আর গগনে উড়ে চলা একঝাক পাখি। কিন্ত শ্যামলতা বিন্দু ভাবলো তার লজ্জা সে আড়াল করে ফেলেছে। সম্পান দূর থেকেই বিন্দুর দৌড়ানো দেখছে। কিছুদূর গিয়ে ধপ করে মাটিতে পড়ে গলো বিন্দু। উঠে

আবার দৌড় লাগালো। সেই দৌড় গিয়ে থামলো জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গনে।বন্যা শেষে জমিদার বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে। আগের মতো নেই। দরজার বাইরে কড়া পাহারা। ছয়জন মিলে বাইরে পাহারা দিচ্ছে। বৈঠকে ও দুজন আছে। আগের কঠোর রূপ ধারন করেছে জমিদার বাড়ি। যেখানে প্রবেশ করতে হলে

আফতাবের অনুমতির প্রয়োজন। জমিদার বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গনে গাড়ি ভিড়েছে চার খানা। তিনখানা ভ্যানগাড়ি হলেও একখানা গরুর গাড়ি। গাড়িতে মালপত্র ওঠাচ্ছে দুজন। কেমন একটা সাজ সাজ রব। অবাক নয়নে সব দেখতে দেখতে বিন্দু পা বাড়ায় বৈঠকে ঢোকার বিশাল দরজায়। লতিফের

অনুমতি পেয়ে বৈঠক পেরিয়ে অন্দরে পা রাখলো বিন্দু।কুসুম ব্যতীত আরো তিনজন কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। তারা এই গ্রামেরই মেয়ে। চিনতে খুব একটা অসুবিধা হলো না বিন্দুর। তবে তাদের সাথে কথা না বলে বিন্দু গেলো তার প্রিয় সখির কাছে।

পরীকে আজ নতুন নতুন লাগছে। নতুন পোশাকে তৈরি করছে নিজেকে পরী। দেখে মনে হচ্ছে কোথাও যাবে সে। বিন্দু ঘরে ঢুকেই বলল,’পরী কই যাবি তুই??জেডি তোরে যাইতে দিবো??’

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রাণখোলা হাসি হাসে পরী। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বিন্দুকে।

-‘পরী ছাড় আমারে। আমার কাপড় নোংরা তোর কাপড় নষ্ট হইবে তো!!’

পরী বিন্দুকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে,’তোকে না বলেছি এসব কথা না বলতে? শরীরে ময়লা তো কি হয়েছে তোর মনটা তো পরিষ্কার।’

-‘নাহ,তুই কোথাও যাবি তাই কইলাম। তা যাবি কই??’

-‘রুপা আপার শ্বশুরবাড়ি। আপার ননদের বিয়ে। আমাদের যেতে বলেছে। তাই যাচ্ছি।’

-‘জেডি তোরে নিবো??’-‘না নিয়ে যাবে কই!!আপার শ্বশুর যেভাবে বলে গেছে না গিয়ে উপায় নেই। তাই আমিও যাচ্ছি।’

-‘ওহ,পরী তোর কাছে একখান জিনিস রাখতে দিমু রাখবি??’

কথা শেষ করেই সিঁদূর কৌটোটা বাড়িয়ে দিল পরীর দিকে। বিন্দুর হাতে থাকা লাল শাড়ির দিকে এতক্ষণে চোখ পড়ল পরীর। সুন্দর শাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে,’কে দিলো এই শাড়ি??’

বিন্দু সম্পানের দেওয়া শাড়ি আর সিঁদূর কৌটোর কথা খুলে বলল। পরী সযত্নে সিঁদূর কৌটোটা আলমারিতে তুলে রাখে। বেশি সময় নেই তার তাই সখিকে বিদায় দিলো।

কালো বোরখাটা গায়ে জড়িয়ে নেকাপ বেধে নিলো।

তারপর নিচ তলায় গেলো। মালা,জেসমিন,জুম্মান সবাই তৈরি। আবেরজান যেতে পারবে না। তার সে ক্ষমতা নেই। দুজন কাজের মেয়েকে রেখে গেলো আবেরজানের কাছে। কুসুম আর নতুন কাজের মেয়ে শেফালিকে সাথে নিলো।

গরুর গাড়ি আনা হয়েছে পরীর জন্য। কেননা গরুর গাড়ি চড়তে

পরী খুব পছন্দ করে। তাই তো এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালা,জেসমিন ওঠে এক গাড়িতে।আফতাব আর আখির অন্য গাড়িতে। শায়ের সহ আরও দুজন উঠেছে অপর গাড়িতে। গরুর গাড়িতে পরীর সাথে জুম্মান,কুসুম আর শেফালি। পরীকে দেখে রাখার জন্যই ওদের সাথে দিয়েছে মালা।কাঁচা মাটির রাস্তায়

হেলেদুলে চলছে গরুর গাড়ি। পরীর ভিশন ভালো লাগছে। মাটির গন্ধ আসছে নাকে। সাথে গ্রামের দৃশ্য। নেকাবের নিচে হাস্যজ্বল চোখে সব দেখছে পরী। হঠাৎই রাস্তার পাশে নাম না জানা বেগুনি রঙের ফুলে চোখ আটকে গেল পরীর। ফুলের প্রতি প্রতিটি নারীর টান অনবদ্য। পরী ফুল ছোঁয়ার লোভে গাড়ি

থামিয়ে কুসুম কে পাঠালো ফুল ছিড়ে আনতে।

গাড়ি থেকে নেমে কুসুম ছুটলো সেদিকে। কিন্ত ফুলে হাত দিতেই ঘটলো অঘটন। পাশে কদম গাছের নিচে বসে থাকা সুখান পাগলকে সে খেয়াল করেনি। কুসুম ফুলে হাত দেওয়ার আগেই সুখান পাগল তার হাত টেনে ধরে। চেঁচিয়ে বলে,'তুই

আমার রানীর ফুল ছিড়বি?ওই ছেমরি! তোর চুল আমি সব ছিইড়া ফালামু।'

ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেছে কুসুমের। পরীর আদেশে সে ভুলেই গিয়েছে যে এখানে সুখান থাকে। সুখান চুল টেনে ধরে কুসুমের। কুসুম এক চিৎকার দিলো,'পরী আপা আমারে বাঁচান।'

চমকে গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি মারে পরী। শেফালি জুম্মান ততক্ষণে নেমে পড়েছে কিন্তু সুখানকে দেখে ওরা আগানোর সাহস পেলো না। কুসুম চিৎকার করে বলছে,’আমি তোর রানীর ফুল ছিড়মু না ছাড় আমারে।’-‘তোরে ছাড়লে তুই আবার ফুল ছিড়বি!!’

– ‘আল্লাহ গো আমারে রক্ষা করো তাইলে আমি পাগলরে ভিক্ষা দিমু।’

লাঠি হাতে গাড়ি চালক এগিয়ে গিয়ে কুসুম কে ছাড়িয়ে আনলো। কাঁদতে কাঁদতে কুসুম গাড়িতে উঠতেই পরী বলল,’আমি বুঝিনি কুসুম যে ওখানে পাগলটা থাকে। তাহলে আমি তোকে যেতে বলতাম না।’

কুসুম রাগ করে হাটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল। একে তো ভয় পেয়েছে তার উপর চুলের ব্যথা। সেজন্য কাঁপছে কুসুম। পরীর মন খারাপ হল তা দেখে।

জুম্মান প্রশ্ন করে বসে,'আপা রানী কেডা? ওই পাগলটা রানী কইলো কারে??'

জবাব টা পরী দিতে পারলো না। সে জানে না তবে শেফালি বলল,’সুখান পাগলার বউ রানী। আগে ও ভালাই আছিলো কিন্ত বউ মরার পর পাগল হইয়া গেছে। গ্রামের সবাই এইয়াই কয়।’

পরী অবাক হয়ে বলে,’ভালোবাসা মানুষ কে পাগল করেও দেয়??’

-‘যে সত্যি ভালোবাসে সে তো পাগল হইবোই।’পরী আর কথা বলল না। সারা রাস্তা সুখানের কথা চিন্তা করতে করতে গেলো।

পরীদের আগেই বাকিরা পৌঁছে গেছে রুপালির শ্বশুরবাড়ি। পরীরা পৌঁছাতেই কয়েকজন মেয়ে এসে ওদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

আশেপাশে না দেখে মাথা নিচু করে পরী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর জুম্মান এসে খবর দিলো এখানে নওশাদ ও এসেছে। সে লাঠিতে ভর দিয়ে হাটাচলা করছে। তার পা এখনো ঠিক হয়নি। পরী ভাবলো তাহলে কি নওশাদের সাথে পরীর বিয়েটা ভাঙতে চলছে???দুই বিঘা জমির উপর

কবিরদের বাড়িটি। চারখানা বড় বড় টিনের ঘর। চারভাই চার ঘরে থাকেন। রান্নাঘর গোসলখানা সব আলাদা। পুরো বাড়ির চারপাশে টিনের বেড়া দেওয়া। যাতে বাইরের পুরুষ ভেতরে না আসতে পারে। আম আর কাঁঠাল গাছে ভরা বাড়িতে। দুএকটা অন্য গাছও আছে। বাড়ির পেছনে শান বাধানো

বড় একটা পুকুর আছে। সেখানে মাছ চাষ করা হয়। মাছ বিক্রি করে অনেক টাকা রোজগার হয় কবিরের। তাছাড়া পরীদের বাড়িতেও মাছ পাঠানো হয়। ফলমূল তো পাঠায়ই।এছাড়াও কবিরসহ বাকি তিন ভাইয়ের ও বেশ কয়েক বিঘা জমি আছে।

বাড়িটা দেখলে যে কেউ এই বাড়িতে নিজের মেয়ে দিতে চাইবে। স্বনামধন্য পরিবারের মেয়েদের ই ঘরে তুলেছে রুপালির শ্বশুর। রুপালি এবাড়ির সেজ বউ। রুপালির বিয়ের ছ'মাস পর ওর দেওরের বিয়ে হয়।

তবে তিন জা মিলে হিংসে করে রুপালিকে। কেননা তারা রুপালির

মতো অতো সুন্দর নয়। অতিরিক্ত সাজগোজ করেও রুপালির মতো সুন্দর তারা হতে পারে না। অথচ খুব সাদামাটা ভাবেই রুপালিকে কোন রাজকন্যার থেকে কম লাগে না। সবসময় রুপালির রূপে ঈর্ষান্বিত হন তারা। রুপালি সব বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে।

কারণ এদের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না। কিন্তু আজ তারা তিনজনই ছুটে এসেছে পরীকে দেখতে। কারণ এতোদিন ধরে তারা শুধু পরীর সুনামই শুনেছে কিন্তু চোখের দেখা দেখেনি। রুপালির বিয়ের পর এই প্রথম পরী এই বাড়িতে পা রাখলো। তাই ওনারা তিনজন ছুটে এলে

পরীকে দেখতে।পরী সবেমাত্র পালঙ্কের উপর বসেছে। নেকাব এখনো খোলেনি। তার মধ্যেই ওরা এসে হাজির। এসেই রুপালির বড় জা কাকলি বলে উঠল,'দেখি দেখি রুপার বোন কেমন দেখতে??'

মালা জেসমিন জলচৌকি পেতে বসে আছে পরীর কাছে। কুসুম গোমড়া মুখে জেসমিন আর মালাকে বাতাস

করছে। শেফালি পরীকে বাতাস করছে। কাকলির কথা শুনে সবাই চমকে তাকালো। ততক্ষণে রুপালিও চলে এসেছে। পরীর ভাবান্তর না দেখে কাকলি আবার বলল,’কই নেকাব সরাও দেখি তোমার চাঁদবদন খানি!!’

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল তিনজন। পরী রুপালিকে জিজ্ঞেস

করে,’আপা এখানে কোন পুরুষ আসবে না তো??’রুপালিকে উওর দিতে না দিয়ে ওর মেজ জা পাখি বলল,’কেন গো??পুরুষ দেখলে তোমার রূপ কমে যাবে নাকি??’

হাসির ছলে অপমান করছে পরীকে তা পরী ঠিকই ধরতে পারলো। নেকাব খুলে আলতো হেসে বলল, ‘যেখানে এক নারী অন্য নারীর

সৌন্দর্য দেখে হিংসা করে সেখানে পুরুষদের বিশ্বাস করি কিভাবে?? আপনাদের বর যদি আমাকে দেখে পাগল হয়ে যায় তখন তো আমাকেই দোষ দিবেন। তাই আগে থেকেই সাবধান হচ্ছি। আমার আবার কারো ঘর ভাঙ্গার ইচ্ছে নেই।’

হাসির ছলে পরী ও পাল্টা জবাব দিলো। রুপালি মুখ টিপে হাসে

ওদের কান্ড দেখে।তিন জা পরীর দিকে বিষ্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। সত্যি অনেক সুন্দর পরী। রুপালির থেকেও বেশি সুন্দর। কাজল বর্ণ আঁখি যুগল যখন পলক ফেলে তখন কি সুন্দর ই না লাগে!!বদনে ছড়িয়ে আছে একরাশ মায়া। আল্লাহ যেন নিজ হাতে ওকে বানিয়েছে। তবে পরীর বলা তিক্ত কথাগুলো ওনাদের

পছন্দ হয়নি। তাই সবার সাথে কুশলাদি করে চলে গেলেন। বোরখা খুলে মাথায় কাপড় জড়ালো পরী। একে একে মহিলারা এসে পরীকে দেখে যাচ্ছেন। আর ওর প্রসংশা করে যাচ্ছে। নূরনগর থেকে যেন এক টুকরো নূর এসেছে। পরীর বিরক্ত লাগছে এসব। মনে হচ্ছে আজ যেন ওর নিজেরই বিয়ে। মালা

আছে বলে পরী চুপ করে আছে। নাহলে দুকথা শুনিয়ে বিদায় করে দিতো।

মেজাজ গরম হচ্ছে পরীর। শেফালির হাতপাখার বাতাসও ঠান্ডা হচ্ছে না পরীর মাথা। রুপালির জা রা যে একটু কটু কথা বলে তা জানে পরী। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে অনেক গল্প করেছে রুপালি ওর কাছে।

সেখান থেকেই এই বাড়ির প্রত্যেকের স্বভাব সম্পর্কে সে অবগত।সাত মাসের পেটটা নিয়ে পরীর পাশে বসে পরী। মা আর পরীর সাথে টুকটাক কথা বলছে। আর পরী চুপ করে শুনছে।

বিয়ে খেতে এসে পরীর বিয়ের কথা তুলে বসে নওশাদের বাবা শামসুদ্দিন মাতুব্বর। তিনি চান

তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে। কিন্তু এখানে আফতাব বেঁকে বসেন। তিনি খবর পেয়েছেন নওশাদের পা নাকি কখনোই ঠিক হবে না। হাটতে পারবে কিন্তু লাঠির সাহায্য নিয়ে। তাই তিনি পরীর সাথে নওশাদের বিয়ে দেবেন না। একথা শুনে শামসুদ্দিন বলে,'আপনারা কিন্তু কথা

দিয়েছেন জমিদার সাহেব। কথার খেলাপ কইরেন না।’

-‘আমি কথা দেইনি কথা দিয়েছে আমার ছোট ভাই। আর আমি আমার মেয়েকে কোথায় বিয়ে দেবো তা আমিই বুঝবো। আপনার ছেলে এখন অচল হয়ে গেছে। আমার মেয়েকে বিয়ে করার কোন যোগ্যতা তার নেই। তাছাড়া আপনার ছেলে

আমার মেয়েকে সুখি রাখতে পারবে না।’-‘আমার ছেলের এই অবস্থার জন্য তো আপনারাই দায়ী। আপনাদের বাড়িতে গিয়েই তো পা ভাঙলো।’

-‘আমরা কেউ তো আপনার ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেইনি। আপনার ছেলেই নিজেকে সামলাতে পারেনি। তবুও সমস্যা নেই,আপনার ছেলের

সমস্ত ভরন পোষন এবং চিকিৎসার দায়িত্ব আমি নিলাম। তবুও আমার মেয়ে আমি বিয়ে দেবো না।’

-‘আপনি কি টাকার গরম দেখাচ্ছেন জমিদার সাহেব??আমার কি টাকা পয়সার অভাব নাকি? আপনার মেয়ের মতো অনেক মেয়ের ভরন পোষনের ক্ষমতা আমার আছে।

আমাকে টাকার গরম দেখাবেন না। তাহলে ভাল হবে না।’

-‘তা কি করবেন আপনি হুম??’পাল্টা জবাব দিল শামসুদ্দিন। দু এক কথায় কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। লোকজন জড়ো হয়ে ও গেলো। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। লোক জানাজানি বেশি হওয়ার আগেই শায়ের আফতাব কে

সরিয়ে নিলো। আলাদা ঘরে টেনে নিয়ে বলল,'এখন মাথা গরম করবেন না। নওশাদের বাবা কিন্তু ভালো লোক নয়। তিনিও প্রভাবশালীদের একজন। প্রতিশোধ নিতে সে পাগল হয়ে যাবে। আর এই গ্রামের কেউ কিন্তু আপনাকে জমিদার মানবে না। তাই একটু

শান্ত হন। হিতে বিপরীত হতে পারে।’

আফতাব একটু শান্ত হলো। ভাবতে লাগল সত্যিই তো। এখন যদি তার কোন ক্ষতি করতে চায় শামসুদ্দিন?? তখন কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন তিনি??এখানের কেউ তো তার হয়ে লড়াই করতে আসবে না। কবির ও তো কিছু করতে পারবে

না। কারণ দুপক্ষই ওর আত্মীয়। কার হয়ে সাফাই গাইবে সে? কবিরের উপর সে ভরসা করতে পারছে না। তাছাড়া ওরা যদি রুপালির কোন ক্ষতি করে দেয়? আখির চলে এসেছে সব শুনেছে সে। আফতাব কে উদ্দেশ্য করে আখির বলল,’ভাই ঝামেলা বাড়বে

অনেক। আমি বলি কি বিয়েটা দিয়ে দেন।’

-‘আমার মেয়েকে আমার ইচ্ছাতে বিয়ে দেব। তোর কিছু বলতে হবে না। তোর জন্যই তো সব হয়েছে। আগ বাড়িয়ে কথা দিলি কেন তুই??’

আখির চুপ করে গেল। আফতাবের মাথা এখন গরম আছে। কুটুম বাড়িতে এসে যা করেছে এতে

লোকজন কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া এখানে আর বেশিক্ষণ থাকাটা নিরাপদ নয়। খাওয়া শেষ হতেই আফতাব,জেসমিন ও মালাকে গরুর গাড়ি ভাড়া করে দিলো শায়ের। সাথে দুজন দেহরক্ষী। আর পরী,জুম্মান,শেফালি,কুসুম গেল ওদের গাড়িতে। তবে এবার শায়ের

ও ওদের সাথে গেল। কারণ যদি ওদের ক্ষতি করতে আসে তখন কি হবে?? তাই গাড়ি চালকের পাশে গিয়ে বসে সে।শায়ের ঠিকই সন্দেহ করেছিল। গ্রামের শেষ মাথায় আসতেই সাত আট জন লোকদের লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তারা ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থামতেই ওদের

একজন পেছনে এসে বলল,’সবাই বের হও। কথা না শুনলে টেনে নামাবো।’

সবাই নেমে পড়ল। পরী আর শায়ের বাদে সবাই ভয়ে কাঁপছে। কুসুমের তো বেহাল অবস্থা। আসার পথে এক দৌড়ানি খেয়েছে এখন যাওয়ার পথে আরেক দৌড়ানি।

শেফালি জুম্মান কে ঝাপটে ধরে আছে। ভয়ে ওরাও সিটিয়ে গেছে।

শায়ের ভেবেছিল ওরা হয়তো আফতাবের গাড়ি আটকাবে তাই আগেই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্ত ওদের গাড়ি আটকানোর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

একজন লোক বলে উঠল,'জমিদার কন্যা পরীকে আমাদের সাথে যেতে

হবে। আর বাকিদের সবাই চলে যাও।'

পরী শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে,'কারণটা কি??'

-'সেকথা আপনাকে বলতে বাধ্য নই।'

-'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি।'

অতঃপর পরী শায়েরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,'কি হয়েছে??'

-‘এরা নওশাদের বাবার লোক। মনে হয় আপনাকে নিয়ে নওশাদের সাথে বিয়ে দেবে এরা। বিয়ে করতে চাইলে চলে যেতে পারেন।’-‘আমি আপনার কোন কথাই বুঝতে পারছি না।’

-‘আপনার বোঝার বয়স হয়নি।’

-‘বেশি কথা বলেন কেন??আমি যথেষ্ট বড়। সব বুঝতে পারি।’

-‘তাহলে আমার কথা বুঝলেন না কেন??’

কুসুম,শেফালি,জুম্মান ওদের ঝগড়া দেখছে। বিপদের মুখে পড়েও যে কেউ ঝগড়া করতে পারে তা এই প্রথম দেখলো ওরা। পরীর পাল্টা জবাব দেয়ার আগেই জুম্মান বলল,’আপা আমার ডর করতাছে।

আর তুমি ঝগড়া করতাছো??এখন কি হইবো?’

পরীর হুশ ফিরল। সত্যি তো ওদের এখন বিপদ। আগে বিপদ থেকে মুক্ত হোক তারপর না হয় ঝগড়া করা যাবে।

এর মধ্যে একজন বলল,’না যেতে চাইলে জোর করে নিয়ে যাব। তাই বলছি ভালোয় ভালোয় চলুন।’

শায়ের শান্ত থেকেই বলল,’আচ্ছা নিয়ে যান আপনারা।’পরী নেকাবের আড়ালে ঢাকা চোখদুটো বড় বড় করে তাকালো শায়েরের দিকে। বলল,’কি বলছেন আপনি এসব??’

শায়ের গরুর গাড়ি থেকে দুটো শক্ত লাঠি বের করলো। একটা পরীর হাতে দিয়ে বলল,’আপনি তো একদিন নিজেকে আমার কাছে

প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তো আজকে করুন। দেখি জমিদার কন্যা কেমন লাঠিয়াল!!’

হাসলো পরী। তবে সে হাসির মাধুর্য কালো নেকাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। পরী দুপা এগিয়ে যেতেই জুম্মান চিৎকার করে বলে,’আপা যাইও না।’

-‘তুই চুপ থাক জুম্মান। আমাকে দেখতে দে।’

পরী এগিয়ে যেতেই একজন দ্রুত ওর সামনে এসে বলে,’আপনার গায়ে হাত ওঠানোর হুকুম আমাদের কাছে নেই। আর আপনি পারবেন না আমাদের সাথে। তাড়াতাড়ি চলুন।’কথা না শুনে পরী তাকে আক্রমণ করে বসে। লাঠি দিয়ে

আঘাত করে লোকটার মাথায়। ওরা কেউ আশা করেনি পরী এমনটা করে বসবে। মাথায় হাত দিয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই তিনজন লাঠি নিয়ে দৌড়ে এলো। পরী ওদের ওপর ও আক্রমণ করে। উপায়ন্তর না দেখে তারাও লাঠি চালালো পরীর উপর। দক্ষ পরী প্রতিহত করতে লাগল শত্রুর

আক্রমণ। লাঠি ঘুরিয়ে নাস্তানাবুদ করতে লাগল সবাইকে। কিন্তু এতো জনের সাথে লড়াই করা একটা মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তাই একটা লাঠির আঘাত এসে পড়ে পরীর বাহুতে। ছিটকে দূরে পড়ে যায় পরী।

আরেকজন এসে লাঠি চালালো পরীর গায়ে। পরী চোখ বন্ধ করে

নিলো। কিন্ত আঘাত অনুভব করতে না পেরে চোখ মেলে তাকালো। শায়ের তার লাঠি দ্বারা শত্রুর লাঠি আটকে দিয়েছে। সে পরীকে উদ্দেশ্য করে বলল,'উঠে দাঁড়ান,পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াতে হয়।'পরী উঠে দাঁড়াল আবার। ওরা দুজন মিলে সবকটাকে কুপোকাত করে দিলো। কিন্ত সমস্যা আবার হলো। ওরা দূর থেকে

দেখতে পেল এবার পুরো বাহিনী আক্রমণ করতে চলেছে। ওদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। শায়ের সবাইকে বলল,’বাঁচতে চাইলে দৌড়ান সবাই। আমার সাথে আসুন।’

সাথে সাথেই সবাই দৌড় দিলো। রাস্তা দিয়ে গেলে নূরনগরে পৌঁছাতে সময় লাগবে তাই ধান ক্ষেতের

আইল বরাবর ওরা নেমে পড়ে। পেছনে তাকানোর সময় নেই। গাড়িওয়ালা চাচা দৌড়াতে দৌড়াতে বলল,'আমার গরু দুইডা ফালাই আইছি অহন আমার কি হইবো?'

শেফালি বলল,'নিজে বাঁচলে বাপের নাম। ভাগো তাড়াতাড়ি।'

জুম্মান হাপাতে হাপাতে বলে,’বাঁইচা ফিরলে আব্বায় গরু কিনে দিবো তোমারে। অহন পালাও’

শত্রুরাও ওদের পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে কিন্ত পরীরা তাদের থেকে অনেক এগিয়ে। তাই ওদের ধরতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর কুসুম বলে উঠল,’পরী আপা আর পারি না। আমার কষ্ট হইতাছে।’

-‘মনে কর তোরে সুখান পাগল ধাওয়া করছে। এখন দৌড়া।’পরীর কথায় কুসুমের শক্তি যেন বেড়ে গেল। পরনের কাপড় একটু তুলে ধরে দিলো দৌড়। শায়ের কে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে গেলো। এই বিপদের মধ্যে থেকেও সবাই হেসে উঠল। সবাই আরো কিছুক্ষণ দৌড়ে পরবর্তী একটা গ্রামে ঢুকলো।

কিন্তু ওদের পা আর চলছেই না। কোনরকমে এগিয়ে চলছে। তবে এই গ্রাম পেরোলেই নূরনগর। তবুও ওদের পা চলছে না। মনে হচ্ছে শত্রুর হাতে এবার ধরা দিতেই হবে।

কিন্তু তখনই আফতাবের লোকেরা এসে হাজির। লাঠিসোটা নিয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়লো। শায়ের যেন হাঁফ

ছেড়ে বাঁচল। এবার সবাই দৌড় থামিয়ে রাস্তা ধরে হাটতে লাগলো। নূরনগরের গন্ডি পেরোতেই পরী রাস্তার ধারে বসে পড়ল। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পরীর দেখাদেখি বাকি সবাই বসে পড়ল। অনেক দৌড়েছে আজ। আর হাটার শক্তি নেই ওর।বন্যা যেতে না যেতেই শুরু হয়ে গেছে মারামারি।

এসব ভাল লাগে না পরীর। এর আগেও সে শুনেছে আফতাব কে কেউ মারার চেষ্টা করেছে। কিন্ত তাতে ও মাথা ঘামায়নি। এখন নিজেই দেখতে পেল সব। তবে কে বা কারা ওদের ওপর আক্রমণ করলো সেটাই বুঝতে পারছে না পরী। আক্রমণ করার কারনই কি হতে পারে??

পরী শায়েরের দিকে তাকিয় জিজ্ঞেস করল,'এবার তো বলুন ওরা কেন আমাদের তাড়া করলো??'রক্তলাল দিবাকর মেঘেদের আড়ালে লুকাতেই উদয় হয় এক টুকরো সুধাকর। মুহূর্তের মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার কোমল আলো। সেই আলোতে ধান ক্ষেত গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাল্কা বাতাসে দুলছে ধানের

শীষ। প্রাকৃতিক এই স্নিগ্ধ রূপ দেখে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে পরী। গ্রামের এই দৃশ্য কখনোই সে দেখেনি। তাই দুচোখ ভরে দেখছে সে। এটা তার প্রথম জ্যোৎস্না বিলাস। এর আগেও সে দেখেছে,তবে তা নিজ কক্ষের জানালা দিয়ে। আর আজ রাস্তার ধারে বসে কোমল জ্যোৎস্না গায়ে

মাখছে। ইচ্ছা করছে নেকাব খুলে মন ভরে শ্বাস দিতে কিন্তু শায়ের সামনে আছে বিধায় পারছে না। রাস্তার ধার ঘেষে ঘাসের ওপর বসে আছে পাঁচজন ব্যক্তি। তবে কারো মুখে কোন শব্দ নেই। এতক্ষণ শায়ের কথা বলছিল। নওশাদের বাবা আর আফতাবের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছে। কথা শেষ

করতেই পরীর রাগ হলো নিজের বাবার ওপর। কথা দিয়ে আফতাব কোন কালেই কথা রাখেনি। যদিও সে নওশাদ কে পছন্দ করে না তবুও ওর কিছুটা হলেও খারাপ লাগছে। কিন্তু আপাতত নওশাদের চিন্তা বাদ দিয়ে চাঁদের আলোয় মন দিলো।নেকাব টা খুলতে খুব ইচ্ছা করছে। ঠান্ডা হাওয়া থেকে ঘ্রাণ

নিতে চাচ্ছে সে। কিন্তু এই শায়ের গন্ডগোল পাকিয়ে দিলো। পরী মুখ বিকৃত করে শায়ের কে উদ্দেশ্য করে বলে,'আপনি একটু ওদিক ঘুরুন তো। আমি নেকাব টা খুলবো।'

শায়ের কথা বলল না। চুপচাপ অন্যদিকে ফিরে ঘাসের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। একহাত চোখের উপর দিয়ে রাখলো। পরী একটু

খুশি হলো। নেকাব সরিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিলো। আহা চারিদিক থেকে কত রকমের ঘ্রাণ আসছে। এরকম অনুভুতির সাথে কখনোই মিলিত হয়নি পরী। উঠে দাঁড়িয়ে পরী ধান ক্ষেতের দিকে দৌড় দিলো। আশেপাশের ক্ষেতের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। জুম্মান

চেঁচিয়ে পরীকে বলে,’আপা আসো বাড়ি যাই। বড় আম্মা চিন্তা করবো।’

পাশে থেকে কুসুম বলে উঠল,’পাখি খাঁচা থাইকা ছাড়া পাইছে তো তাই উড়তাছে।’

পরী সাবধানে রাস্তার উপর উঠল। নেকাব পড়ে নিল। শায়ের আগের মতোই শুয়ে আছে। জুম্মান বলল, ‘সুন্দর ভাই উঠেন বাড়ি যাই।’

চট করে উঠে বসে শায়ের। তারপর সবাই হেঁটে হেঁটে বাড়ির পথ ধরে। তবে যাওয়ার সময় কেউ কারো সাথে কথা বলে না।জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গনে শ'খানেক মানুষের উপস্থিতি। তাদের মাঝে আফতাব বসে আছে এবং আখির ও আছে। তারা গভীর আলোচনা করছে। শায়ের কে আসতে দেখেই সবাই রাস্তা ছাড়লো।

পরীরা পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর যাচ্ছিল। কিন্তু আখিরের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে থেমে গেল পরী। সে শায়ের কে ধমকে বলছে,’এতক্ষণ কোথায় ছিলে ওদের নিয়ে? যদি কোন বিপদ হতো তাহলে কি করতে? একা সামাল দিতে পারতে?’

তবে এবার শায়ের জবাব দিলো,'বিপদ কি হয়নি আজকে?কার জন্য হয়েছে এই বিপদ?'

-'দেখছেন ভাই কতবড় বেয়াদব এই ছেলে? মুখে মুখে তর্ক করছে আমার। এই ছেলে তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছো তুমি? আমি চাইলে তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে জানো তুমি?'

আফতাবের আগেই পরী এগিয়ে এসে জবাব দিল,’আপনার ভাইকে জবান সামলে কথা বলতে বলুন আব্বা। না জেনে ওনাকে কেন দোষ দিচ্ছেন? দোষ তো আপনাদের। কথা দিয়ে কথা রাখেননি আপনারা যার জন্য আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছে। আর উনি না থাকলে আমাদের বেঁচে ফেরা সম্ভব হত না।’

আফতাব কিছুই বলল না। শুধু কড়া চোখে তাকালো পরীর দিকে। পরী তা গ্রায্য করলো না।-‘পরী তুই ঘরে যা। আমরা সব দেখছি।’

আখিরের কথা শুনতেই রাগ হয় পরীর। ওর নামটা এই খারাপ লোকের মুখে শুনতে চায় না। এখানে অনেক মানুষ আছে বিধায় চাচাকে কথা শোনাতে সে পারলো

না। শায়েরের দিকে এক পলক তাকিয়ে সে অন্দরে চলে গেল। পরী চলে যেতেই আখির আবার শায়ের কে কতগুলো কথা শোনালো। শায়ের এবার আর কিছু বলে না। শেষে আফতাবের ধমকে আখির থামে।শামসুদ্দিনের উপর পাল্টা হামলা করা হবে। আজকে ভাগ্যক্রমে আজ ওরা বেঁচে গেছে।

তাই ওদের আরো শক্তিশালী হতে হবে। এনিয়ে অনেক কথা বলে সবাই। পরবর্তী সভা কাল সকালে হবে। এখন রাত হয়ে গেছে। তবে সবার আগে শায়ের নিজের ঘরে চলে গেল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আখিরের কথা শুনে। পাশে থাকা জলচৌকিতে লাথি মেরে নিজের রাগ দিনের চেষ্টা করলো।

কিন্তু আজ সে কিছুতেই নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কি করে না সে? জমিদার বাড়ির জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত সে। তবুও আখির ওকে অপমান করে। এটা সবসময়ই করে,কিন্তু আফতাব কে কখনোই প্রতিবাদ করতে শায়ের দেখেনি। অথচ শায়ের কে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত আফতাব নিতে পারে না। তাহলে

এই বৈষম্যতা কেন?? পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায় সে। সুখটান দিতে থাকে একের পর এক। সিগারেট খুব একটা খায় না শায়ের। যখন অতিরিক্ত রেগে যায় তখন খায়।

সকালে পরীর ঘুম ভাঙে কোলাহলে। বিরক্ত হয়ে সে অন্দরের উঠোনে আসলো। সোনালী আর ওর

শ্বাশুড়িকে দেখে সেদিকে দ্রুত পদে এগিয়ে গেল। মালা জেসমিন ওখানেই ছিলেন। রুপালির শ্বাশুড়ি মালার হাতদুটো চেপে ধরে চোখের জল ফেলছে আর বলছে,'আপনের কাছে আমি আমার মাইয়া দিয়া গেলাম। ওরে ভাল কইরা রাইখেন। ওইহানে থাকলে ও বাঁচবো না। ওরা মাইরা ফেলাইবো ওরে।'বলতে

বলতে তিনি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। রুপালিও নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। শ্বাশুড়িকে সে খুব ভালোবাসে। ঠিক নিজের মায়ের মতো। ওই বাড়িতে এই একটা মানুষকে সে নিজের থেকে বেশি বিশ্বাস করে। নিঃস্বার্থ ভাবে এই মানুষ টা তাকে বেশি ভালোবাসে। তাই তিনি রুপালির

চিন্তা করে ওকে এখানে রেখে গেলেন। কেননা কবির এখন তার আসল রূপে ফিরে এসেছে।

শুধু কবির নয়। ওনার বাকি তিন ছেলেও ক্ষেপেছে। আফতাবের পতন ঘটাতে চায় সবাই। এমনকি তার নিজের স্বামী ও।শামসুদ্দিন রুপালির শ্বাশুড়ির ভাই। বেশ নামডাক তার। টাকা পয়সা জমি জমার অভাব

নেই। সাথে আছে ক্ষমতা। আফতাবের করা অপমান তিনি মানতে পারেননি তাই তার লোক দিয়ে পরীকে তুলে এনে ছেলের সাথে বিয়ে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে সফল হননি। তারপর চোখ পড়ে রুপালির উপর। রুপালিকে কেন্দ্র করে আফতাবকে নাচাবে। গর্ভবতী রুপালিকেও ছাড় দেবে না। একথা

রুপালির শ্বাশুড়ি জানতে পারে তাই ভোর হবার আগেই রুপালিকে নিয়ে চলে আসে।

সে জানে এতে সেও বিপদে পড়বে। তবুও পুত্রবধুকে তিনি বাঁচাবেন।

পরী রুপালির কাছে গিয়ে ওর দিকে তাকাতেই চমকে গেল। রুপালির গালে তিন আঙুলের ছাপ স্পষ্ট। ফর্সা গাল রক্ত লাল হয়ে গেছে।

ঠোঁটের কোণে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। রুপালির দুবাহু চেপে ধরে পরী বলল,'আপা তোর এই অবস্থা কে করেছে?'রুপালি জবাব দিল না পরীর প্রশ্নের। অন্য কথা বলল সে,'পরী চল ঘরে। তারপর সব বলছি। মা আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। নাহলে আমার আব্বাও

আপনার ক্ষতি করে দেবে। এরা এখন পিচাশে পরিণত হয়েছে।’

রুপালির মাথায় হাত বুলিয়ে ওর শ্বাশুড়ি চলে গেল। রুপালি মালার দিকে তাকালো। মালা কাঁদছে তা দেখে রুপালি বলল,’কাঁদবেন না আম্মা। আপনার কান্না আমার ভাল লাগে না। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যেতেই হবে আমাদের। শুধু

দোয়া করবেন পরীর ভাগ্য যেন ভালো হয়। আপনার স্বামী যেন পরীর জীবন নষ্ট না করে।’

রুপালি পরীর হাত ধরে নিচতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। পালঙ্কের উপর আস্তে করে বসে পরীর দিকে তাকিয়ে বলে,’অনেক প্রশ্ন তোর মনে তাই না পরী?আমার বিয়ের পর থেকেই

তোর মনে হাজার প্রশ্ন। আজ সব বলবো তোকে শুনবি?’

চুপ করে রুপালির ক্ষতের দিকে তাকিয়ে আছে পরী। রুপালি বলতে শুরু করে,-‘যদি কোন পুরুষ নারী নেশায় আটকে যায় তাহলে যত সুন্দর মেয়ে তার জীবনসঙ্গী হোক না কেন সেই নেশা পুরুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অভ্যাস বদলানো

খুব কঠিন। সেরকম একটা পরিবারে বিয়ে হয়েছে আমার। আমার মুখে যে ক্ষত দেখছিস এটা নতুন কিছু না খুব পুরনো। যখন মেয়েদের নেশায় বুদ থাকতো প্রতিবাদ করতাম। তারপর আমার এই হাল করতো সে। ইচ্ছে করলে আম্মাকে সব কথা পারতাম কিন্ত বলিনি। কারণ বড় আপাকে হারিয়ে আম্মা এখনও কষ্ট

পাচ্ছেন। আমার কষ্টের কথা শুনলে তিনি আরো কষ্ট পাবে। কিন্তু তা হলো না পরী। আল্লাহ মনে হয় আম্মাকে কষ্ট পেতেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।প্রথম প্রথম কবির ভালোই ছিল। আমার সাথে ভালো ব্যবহার ও করতো। কিন্তু ওর ছোট ভাইয়ের চাহনি অত্যন্ত নোংরা ছিল। আমার দিকে সবসময় নোংরা ভাবে

তাকাতো। বিশ্রী কথাবার্তা বলতো। গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতো। এসব কবির দেখেও না দেখার ভান করতো। আমি সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। কবির ওর ভাইকে কিছু বলছে না দেখে। তাই আমার শ্বাশুড়িকে সব বলি। তিনি আমাকে বাঁচাতে ছোট ছেলের বিয়ে দেন। আমার শ্বাশুড়ি সত্যিই খুব ভাল

আমাকে অনেক ভালোবাসে। কালকে তোরা আসার পর কবির আর ওর ভাইয়েরা মিলে জঘন্য পরিকল্পনা করে। ওদের মামার অপমানের প্রতিশোধ নিতে জোর করে তোর সাথে নওশাদের বিয়ে দেবে। কিন্তু তোরা নাকি নিজেদের বাঁচিয়ে গ্রামে চলে এসেছিস। তার পর ওদের চোখ পড়ল আমার ওপর। ওরা

ভেবেছে আব্বার দূর্বলতা আমি। মেয়েকে বাঁচাতে আব্বা সবকিছু করবেন। কিন্ত ওদের ধারণা যে ভুল পরী। আব্বা নিজের সম্মানের জন্য যেভাবে বড় আপাকে ছেড়ে দিয়েছেন সেভাবে আমাকেও মরে যেতে দেখতে পারেন। আমার শ্বাশুড়ি আমার ভাল চান বলেই আজকে দিয়ে গেলেন আমাকে। না

জানি তার কি অবস্থা করবে আমার শ্বশুর??

ভাবিরা অমাকে হিংসে করতো তার কারণ তাদের স্বামীরা সবসময় আমার রূপের প্রশংসা করতো। তাদের চোখ ও যে নোংরা তা আমি ঠিকই টের পেয়েছি। কিন্ত ভাবিরা আমার খারাপ চায়নি কখনো। সবশেষে এটা বলতে পারি

কবিরদের পরিবারে ভাবিরা আর আমার শ্বাশুড়ি ছাড়া সবাই কুৎসিত লোক। আর কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না পরী। তবে আরো অনেক কথা তোর অজানা। পরে বলব সব।'

নিজের কথা শেষ করে লম্বা দম ফেলে রুপালি। পরীর চেহারায় শান্ত ভাব দেখে চমকায় সে। কিন্ত পরীর

তো রাগার কথা। পরী ধীর পায়ে এসে রুপালির পাশে বসে। খুব শান্ত গলায় বলে,’তুমি যদি বিধবা হও,তোমার সন্তান যদি পিতৃহারা হয়ে তাহলে তুমি কষ্ট পাবে না তো??’

সর্বাঙ্গ তড়িৎ গতিতে ঝাকুনি দিয়ে উঠল রুপালির। মাথা ঘুরে উঠলো। এসব বলছে কি ওর বোন? মৃত্যু

খেলা খেলবে নাকি?-‘পরী তুই এসব বলছিস কি?’

-‘তিন বছর আগে যা হয়েছিল আবার তা হবে।’

-‘পরী আমার কথা শোন পিছনে যা হয়েছে তা ভুলে যা।’

-‘পরী কিছুই ভোলে না আপা। ওরা তোমার গায়ে হাত তুলতো তুমি তা না বলে অন্যায় করেছো। শাস্তি

তোমাকেও পেতে হবে। শাস্তি হিসেবে বিধবা হতে হবে তোমাকে। নিজেকে তৈরি করো।’

-‘পরী এমন করিস না বোন আমার। আমি ভাল নেই তো কি হয়েছে তোকে ভাল রাখবো আমি। ওদের সাথে তুই পারবি না পরী। ওরা ভয়ানক,আমার কথা শোন পরী।’

-‘তাতে আমার কিছু যায় আসে না আপা। ওরা তোমার গায়ে হাত তুলেছে। মনে আছে তোমার গায়ে হাত দেওয়ার কারণে শশিলকে আমি,,,’

বাকি কথা বলতে দিলো না রুপালি। হাতের তালু দ্বারা আবদ্ধ করে নিলো পরীর ঠোঁট জোড়া। অসম্ভব কাঁপতে লাগলো রুপালি। পরীকে শান্ত করার

চেষ্টা করতে লাগলো সে। কিন্তু পরী নাছোড়বান্দা। সে হাল ছাড়বে না। সে বলল,’আমি নওশাদ কে বিয়ে করব আপা।’-‘নাহ পরী এটা কিছুতেই সম্ভব না।’

-‘কেন তুমিই তো বলেছিলে নওশাদ ভালো ছেলে। তাহলে??’

-‘আমি এখনো বলছি নওশাদ ভালো ছেলে। কিন্তু ওর পরিবারের কেউ ভাল না পরী।’

-‘নওশাদ কে বিয়ে করলে আমি ওই পরিবারে ঢুকতে পারবো। তার পর আমি আমার প্রতিশোধ নিবো। ছাড়বো না কাউকে আমি।’

-‘আব্বা তোকে এ বিয়ে করতে দেবে না।’

-‘আমি বিয়ে করবোই।’পরী দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অন্দরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আব্বা আব্বা বলে চিল্লাতে লাগল। আফতাব কথা বলছিল আখির আর শায়েরের সাথে। পরীর গলার আওয়াজ পেয়ে তিনি অন্দরে গেলেন। আফতাব কে দেখা মাত্রই পরী বলে উঠল,’আমি নওশাদ কে বিয়ে করব আব্বা। আপনি সব

ব্যবস্থা করেন।'আফতাবের রাগ যেন আকাশ ছুঁয়েছে। শত্রুপক্ষের সাথে আত্মীয়তা করতে চাইছে তার মেয়ে!!একথা আর পাঁচকান হলে তো সর্বনাশ। শত্রুর সাথে মিলিত কখনোই সে হবে না। মালাও চলে এসেছে মেয়ের চিৎকার শুনে। পরীর কথা শুনে সে হতভম্ব। আফতাব আছে বিধায় কিছু বলেনা মালা।

আফতাব বলে,’তোমার সাহস দিনকে দিন বাড়ছে পরী। আমার মুখের উপর এতবড় কথা বলতে বাধলো না তোমার??’

-‘বাধলে বলতাম নাহ।’

-‘মেয়েকে বোঝাও মালা। নাহলে খুব খারাপ হবে কিন্ত। মেয়ে মানুষের এতো জেদ ভাল না।’

-‘আর পুরুষ মানুষের এতো অবহেলাও ভালো না।’

আফতাব এবার কড়া চোখে মালার দিকে তাকিয়ে বলে,’পাগল হয়ে গেছে তোমার মেয়ে। সামলাও মেয়েকে।’

বলেই আফতাব অন্দর ছেড়ে চলে গেলেন। মালা পরীর গালে পরপর কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে ওর ঘরে

আটকে রাখলো।জানালার ধারে বসে আকাশের দিকে তাকালো পরী। কি সুন্দর নীল আকাশ। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ আনন্দের সহিত ভাসছে। ওদের দিন রাত নিশ্চয়ই খুব সুখে কাটে? নাহলে এতো আনন্দ পায় কোথায় ওরা?পরীর ভাবনায় সবসময় পাখি আর আকাশ নিয়ে। ওই পাখির মতো যদি সে আকাশে

উড়ে বেড়াতো তাহলে কতই না ভালো হতো!! কেউ তাকে বকতো না। না কোন বিপদ হতো। এসব ভাবনা প্রতিনিয়ত পরীর মগজ খায়।

দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকায় পরী। কুসুম শব্দহীন পা ফেলে পরীর কাছে এসে বলল,'আপা আপনেরে বড় আম্মা বৈঠকে যাইতে

কইছে। শায়ের ভাই কথা কইবো আপনের লগে।’

শায়ের পরীর সাথে আবার কি কথা বলবে?ভাবনাটা মনের ভেতর রেখে মাথায় ওড়না জড়ালো পরী। তারপর এগিয়ে গেলো বৈঠক ঘরের দিকে। কুসুম ও সাথে গেলো। ইশারায় শায়েরের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল সে। পরী পা রাখলো চৌকাঠের

ভেতরে। শায়ের তার জন্য অপেক্ষা করছে। পরীকে আসতে দেখে সে হাত দিয়ে জলচৌকি দেখিয়ে বসতে বলে। তাই করে পরী। মাথা নিচু করে শায়েরের সামনে বসে পরী।-'শুনলাম আপনি নাকি নওশাদ কে বিয়ে করতে চান?'

-'হুমম।'

-‘কতকিছু হয়ে গেল এসব নিয়ে তারপরও আপনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি?’

পরী জবাব দিল না দেখে শায়ের আবার

বলে,

-‘আপনার কি মনে হয় এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব?আপনাকে যতটা বুদ্ধিমতি মনে করেছিলাম

আপনি ততটাই বোকা দেখছি। নওশাদ কে বিয়ে করলে আপনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন এটা আপনার ধারনা। কিন্ত এতে আপনার ক্ষতি হবে বেশি। আচ্ছা বিয়ের পর আপনি কিভাবে প্রতিশোধ নিবেন? ওদের সাথে একা কিভাবে লড়াই করবেন? কালকে তো সাত জনের সাথেই লড়াই

করতে পারলেন না। আর ওই বাড়িতে যত লোক আছে তাদের সাথে কি শক্তিতে পারবেন? নাহ,কারণ আপনি মেয়ে। একজন দুজনের সাথে পারলেও শতজনের সাথে পারবেন না। আর আপনার বাবাকে তো চেনেন। দরকার পড়লে আপনাকে খুন করে ফেলবে তবুও নওশাদের সাথে আপনার বিয়ে

দেবেন না। নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। আর মাথা গরম না করে ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।

একা যুদ্ধে জয় করা অনেক কঠিন। আপনি যা ভাবছেন তা আপনার জন্য বিপদজনক। তাই ওসব চিন্তা বাদ দিন। তার জন্য আমরা সবাই আছি। আপনি ঘরের দিক সামলান।

আমি জানি আপনি শক্ত মনে মানুষ কিন্তু আপনার মা এবং বোন কিন্তু তা নয়। যা করবেন ভেবে করবেন। আমিও আবারো বলছি এভাবে কখনোই প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব না। মাথা ঠান্ডা রাখুন।'

শায়েরের বলা প্রতিটি কথাই সত্য। তা মাথা খাটিয়ে ভেবে দেখলো পরী। ইশশ কি বোকা সে?ভাবতেই

ওর নিজেরই লজ্জা করছে। নিজের গ্রামে পরী যা'ই করুক না কেন অন্য গ্রামে তা পারবে না। আফতাব নিজেই তো পারলো না। মেজাজ আরো খারাপ হলো

পরীর। তবে তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করে না। চুপ করেই বসে আছে সে। পরীকে এখনো চুপ থাকতে দেখে শায়ের বলে,'তো এখন কি

সিদ্ধান্ত নিলেন? নওশাদ কে বিয়ে করবেন?’

পরী চট জলদি উঠে দাঁড়িয়ে বলে,’আমি আসি।’

-‘প্রশ্নের উত্তর টা দিলে ভালো হয়।’

-‘আপনাকে বলার প্রয়োজনবোধ করছি না।’

এক দৌড়ে নিজের কক্ষে চলে এলো পরী। ভাবনা ওর বাড়ছে। কবিরের

কাছে তাহলে ও পৌঁছাবে কিভাবে? রুপালিকে করা আঘাত গুলো পরীকে পোড়াচ্ছে খুব। সহ্য হচ্ছে না পরীর। কবিরকে খুন করতে পারলে ভালো হতো। কিছু একটা মনে করে পরী ছুটলো নিচ তলায়। পথেই মালা ওকে টেনে ধরে কলপাড়ে নিয়ে যায়। কয়েক বালতি ভর্তি পানি। আরেক বালতি ভরার জন্য

কল চাপছে কুসুম। মালা পরীকে বসিয়ে মাথায় পানি ঢালতে লাগল। অবাক হয়ে পরী বলে,’আম্মা করেন কি?’-‘চুপ থাক। সবসময় মাথা গরম থাহে। আইজ সব ঠান্ডা কইরা দিতাছি।’

হতাশ হলো পরী। মাথায় পানি ঢাললে তো মাথা ঠান্ডা হবে। কিন্তু ওর মনে যে দাবানল হচ্ছে তা

কিভাবে ঠান্ডা হবে?পরী মাথার তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,'মাথায় তো ঠান্ডা পানি দিতেছেন। পরাণে ঠান্ডা পানি কেমনে দিবেন?'

মালার হাত থেমে গেল। আর পানি ওঠাতে পারলেন না তিনি। কুসুম কে পানি ঢালতে বলে চলে গেলেন।

কেটে গেছে দুদিন। এই দুদিন পরী শুধু শায়েরের কথাগুলো ভেবেছে।

একবার নয় বারবার ভেবেছে। এটা করলে অনেক বড় ক্ষতি হতো পরীর। তাই ওসব বাদ দিয়েছে পরী।

আজকে নিঃশব্দে বিন্দু এসে পরীর পাশে দাঁড়াল। বিন্দুর অস্তিত্ব পেয়ে পরী ফিরে তাকালো। প্রিয় সখির মুখটা দেখে খুশি হতে পারলো না পরী। কেননা আজকে যে সে মুখ

ভার করে রেখেছে। বিন্দুর বিরসচিত্ত বদনের দিকে তাকিয়ে পরী জিজ্ঞেস করে, ‘কি হয়েছে বিন্দু? মুখটা শুকনো কেন?’

প্রশ্নের জবাবে কেঁদে দিলো বিন্দু। মুক্তার ন্যায় অশ্রু গুলো হানা দিলো শ্যামা কপোলে। পরী চিন্তিত হলো বিন্দুর চোখে পানি দেখে। যে গজদন্তিনীর ঠোঁটে সর্বদা হাসি

থাকতে আজ সে ঠোঁট কান্নায় ভাঙছে!-‘কি হয়েছে বিন্দু? বল আমাকে?’

-‘পরী আমি মনে হয় মাঝিরে পামু নারে।’ বলেই বিন্দুর কান্নার বেগ বাড়লো। পরী ওর চোখের জল মুছে দিয়ে বলে,’আগে আমাকে সব বল। নাহলে বুঝব কিভাবে?’

-‘ওইদিন মাঝি আমারে কাপড় দিছে,সিঁন্দুরের কৌটা দিছে। এই কথা কেডা জানি আমার মায়রে কইয়া দিছে। মা আমারে অনেক মারছে পরী। আমার লাল কাপড় টা পোড়াইয়া দিছে। অখন সিঁন্দুরের কৌটা কোথায় তা জিগাইতাছে। আমি কি করমু পরী?’

-‘বলে দে তুই সম্পান মাঝিকে ভালোবাসিস। বিয়ে করতে চাস। আর সম্পান মাঝিও এখন তোকে বিয়ে করতে পারবে।’

-‘কইছি পরী কিন্ত মা বিয়া দিবে না মাঝির লগে। মাঝির নাকি বাপের পরিচয় নাই। হের মায় ও নাকি জানে না ওর বাপ কেডা।’বিন্দুর কথায় বিষ্মিত হলো না পরী। সম্পান

যে পিতৃহারা তা জানে পরী। গর্ভবতী অবস্থায় নিজের ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছিল সম্পানের মা। নিজের বোন বলে সেদিন সম্পানের মামা তাকে থাকার জায়গা দিয়েছিল। বাড়ির এক কোণে ছোট্ট একটা ঘর তুলেছিলো সম্পানের মা রাঁখি। সেখানেই জন্ম সম্পানের। গ্রামের অনেক লোক কথা শুনিয়েছিলো

রাঁখিকে। কেননা নিজের ভালোবাসার মানুষের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল রাঁখি। বছর খানেক বাদেই ফিরে আসে সে। কিন্তু ওর স্বামীর খবর কেউ জানে না। রাঁখির ভাষ্যমতে ওর স্বামী ওকে রেখে শহরে কাজে গেছে তিন মাস আগে। আর আসেনি,রাঁখি আর থাকতে না পেরে চলেই আসে। তবে

রাঁখির বিশ্বাস তার স্বামী একদিন ফিরে আসবেই। সেজন্য আজও অপেক্ষা করছে রাখি। সবার কটু কথা সহ্য করে ছেলেকে নিয়ে পড়ে আছে এখানে। গ্রামের সবাই সন্দেহ করে রাঁখিকে। অবৈধ সন্তান হিসেবে জানে সম্পান কে। সম্পান কেও কম কথা শুনতে হয় না। কিন্ত মায়ের অতীত সম্পর্কে অবগত সে। রাঁখি

সবই বলেছে ছেলেকে। এও বলেছে সম্পানের বাবা এখনো বেঁচে আছে। সেজন্য রাখি আজও শাখা সিঁদূর পড়ে।ঠিক এই কারণেই চন্দনা নাকচ করেছে সম্পান কে। মেয়ের মুখে সম্পানের কথা শুনতেই বিষ্ফোরিত হয়ে নিজের মেয়ে কে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। বিন্দুকে সম্পানের সাথে বিয়ে দিলে লোকে

কি বলবে?? চুনকালি পড়বে মুখে। চন্দনা তা হতে দেবে না। দরকার পড়লে মেয়েকে হাত পা ভেঙে ঘরে বসিয়ে রাখবে। তবুও সম্পানের হাতে বিন্দুকে তুলে দেবে না।

পরী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বিন্দুর হাত ধরে টেনে পালঙ্কের উপর বসিয়ে বলল,'চিন্তা করিস না। তোর বিয়ে সম্পান মাঝির সাথেই হবে।

আপাতত চুপচাপ থাক। সম্পান মাঝি এখন কোথায়??’

বিন্দু নাক টেনে জবাব দিলো,’শহরে গেছে। আইবো কবে জানি না।’

-‘এক কাজ কর তুই। তোর মা’কে কিছু বুঝতে দিবি না। ভান ধরবি যে তুই সম্পান মাঝিকে ভুলে গেছিস। সম্পান মাঝি আগে গ্রামে ফিরে

আসুক তার পর পরবর্তী চিন্তা ভাবনা করা যাবে।’

বিন্দু জড়িয়ে ধরে পরীকে। চোখের জলে ভাসালো পরী কাধ। সে জোরে জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘আমি মাঝিরে ছাড়া বাঁচমু না পরী। সত্যি করে মইরা যামু।’নিজের থেকে বিন্দুকে ছাড়িয়ে নিলো পরী। রেগে

গিয়ে বলল,’মরার কথা বলস কেন? থাপ্পড় চিনোস?

যা বলেছি তাই করবি। এখন বাড়িতে যা।’

নিজেকে ধাতস্থ করে উঠে দাঁড়াল বিন্দু। দরজা পর্যন্ত যেতেই পরীর ডাকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

-‘বিন্দু,মানুষ পাগলের মতো ভালোবাসে কেমনে?’

এতক্ষণে একটু খানি হাসলো বিন্দু। ঠোঁটে হাসির রেশ ধরেই বলে,’পাগলের মতো কেউ ভালোবাসে না। ভালোবেসেই মানুষ পাগল হয়।’

-‘সুখান পাগলার মতো?’

-‘কি জানি?আমি তো আর দেখিনি সুখান পাগলা ওর বউরে কেমন ভালোবাসতো।’

একটুখানি চুপ থেকে বিন্দু আবার বলল, ‘সত্যি ভালোবাসলে মানুষ পাগল হবেই। কেউ বাইরে থেকে তো কেউ ভেতর থেকে।’বিন্দুর প্রস্থানও পরীর ঘোর কাটলো না। তবে বিন্দুর কথাটা বাস্তব। সত্যিকারের ভালোবাসা একটা মানুষ কে পাগল বানিয়ে দেয়। প্রিয় মানুষকে হারানোর যন্ত্রনা সবাই সহ্য

করতে পারে না। যারা সহ্য করতে পারে তারা মন থেকে ভেঙে পড়ে। আর যাদের সহ্য হয়না তারা মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যায়। শরীরের ক্ষত সারানো গেলেও মনের ক্ষত সারানো সম্ভব না।

পুরোনো স্মৃতি আকড়ে ধরে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। প্রতিদিন মৃত্যু

সমতুল্য যন্ত্রণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। অভাব,অনটন,টাকা পয়সা হীন,অসহায় হয়েও বেঁচে থাকা যায় কিন্ত বেদনাময় অতীত কে সাথে নিয়ে বেঁচে থাকা অধিকতম কষ্টকর। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ সুখান পাগল। নিজের প্রিয়তমাকে হারিয়ে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। তার

স্মৃতিচারণ করতে করতে আজ সে এমন স্থানে এসেছে যে এখন তার স্মৃতিতে তার প্রিয়তম ছাড়া অন্য কিছুই নেই।পরী শুধু ভাবছে কীভাবে মানুষ এতো ভালোবাসতে পারে? কই সে তো পারছে না কাউকে ভালোবাসতে। তার জীবনে তো কেউ আসেনি এখনো। কীভাবে সে

বুঝবে যে একটা মানুষ তাকে ভিশন ভালোবাসে?

সোনালী,বিন্দু আর সুখান নিজেদের ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে। পরীকে কে কেউ কি তার ভালোবাসার প্রমাণ দেবে না? নাকি পরী নিজেই তার ভালোবাসা খুঁজে নেবে?কিন্তু কীভাবে?ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শীত বাড়তে থাকে। এসময়ে

কুয়াশাচ্ছন্ন হয় চারিদিক। দূর থেকে কুয়াশার ভেতর থেকে মানুষ বের হয়ে আসতে দেখা যায়। কোন সাদা পর্দা মনে হয় এ কুয়াশাকে। অদৃশ্য সে পর্দা ভেদ করে মানুষের চলাফেরা। সবার গায়ে থাকে শীত নিয়ন্ত্রণ বস্ত্র। তবুও যেন শীত মানতে চায় না। ঠকঠক করে কাঁপে বৃদ্ধরা। ঊষার আলো ফুটতেই

উঠোনে জটলা বাধে সবাই। মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে আরাম করে। ঘাসে জমে থাকা কোমল শিশির বিন্দুর অপরূপ সৌন্দর্য যেন আরো মোহনীয় করে তোলে শীতকালকে। মানুষের পদচরণে ভাঙে সে শিশিরের ঘর। মাকড়সার জালে জমে থাকা শিশির দেখে মনে হয় এ যেন সচ্ছ কাচের তৈরি ঘর।

কারিগর যেন খুব যত্নে তৈরি করেছে। আঙুল দিয়ে টোকা দিতেই ঝরঝর করে শিশির ঝরে পড়লো। জালের উপর থাকা মাকড়সাটা দৌড়ে চলে গেল। বিন্দু খিলখিল করে হেসে উঠল তা দেখে। এই কাজটা করতে ওর ভিশন ভালো লাগে। এজন্য সে শীত কালের অপেক্ষায় থাকে।–'কি গো কারিগর

পলাইলা ক্যান? ঘর বানাইবা শক্ত কইরা যাতে কেউ ভাঙতে না পারে। আর তোমারেও পলাইতে না হয়। ঘর বানাও তুমি থাকো তুমি আবার ডর পাও তুমি। এমন হইলে চলবো না।'

আবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠে বিন্দু। ওর হাসিতে মুখরিত হয় এই কুয়াশাময় সকাল। খেজুর গাছের

উপর থেকে মহেশ মেয়ের হাসির শব্দ শুনে হাঁক ছাড়ে,'কি রে মা কার লগে কথা কইয়া হাসোস??'

রসের হাড়িটা শক্ত হাতে ধরে বাবার পানে চেয়ে বিন্দু বলে,'কিছু না,তুমি নামো তাড়াতাড়ি।'

মহেশ ধীর গতিতে নেমে পড়ল। বাবার হাত থেকে আরেকটা হাঁড়ি সে হাতে নিলো। লম্বা বাঁশের দুই

প্রান্তে ছয়টা করে মোট বারোটা রস ভর্তি হাঁড়ি বাধা আর বিন্দুর দুই হাতে দুটো। মহেশ বাঁশটা কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলো। বিন্দু চললো বাবার পিছু পিছু। শীতকালে মাছ ধরে না মহেশ কারণ তখন পানি শুকিয়ে যায়। পদ্মায় জাল ফেলে তখন মাছ পাওয়া দুষ্কর। খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করে

বাজারে বিক্রি করে সে। আর চন্দনা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে। তা দিয়েই চলে সংসার।এখনও সূর্যের আলো দেখা দেয়নি। এই সময়ে রোজ

মহেশ আর বিন্দু বের হয় রস আনতে। বাবার সাথে যেতে বিন্দুর বেশ লাগে। মহেশ আর বিন্দুর আগমনে দৌড়ে যায় সখা। রসের

হাঁড়ি হাতে নিয়ে খুশিতে গদগদ করে মায়ের কাছে গেল। চন্দনা বড় পাতিল চাপিয়েছে মাটির চুলায়। ইন্দু উনুন ধরাচ্ছে। চন্দনা এক হাঁড়ি রস বিন্দুর হাতে দিয়ে জমিদার বাড়িতে দিয়ে আসতে বলে। বিন্দুও সাথে সাথে ছুটলো। মেয়ের যাওয়ার পানে দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দনা।

মেয়েটার মাথা থেকে যে সম্পানের ভুত নেমেছে তাতেই সন্তুষ্ট সে। নাহলে রক্ষে ছিল না। গাঁয়ের মানুষ যে ছিঃ ছিঃ করতো। বাপের নাই খবর,না জানি কোন অকাম করে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে!!ভালোই হয়েছে বিন্দু বুঝতে পেরেছে।

চন্দনা মহেশকে ডেকে বলে,'হ্যাগো শুনছো,পশ্চিম পাড়া থাইকা বিন্দুর

লাইগা একখান সম্বন্ধ আইছে। পোলা খুব ভালা। শহরে কাম করে। ফুলি বু আইয়া কইলো। আমি কিছুই কই নাই। তুমি এট্টু খোঁজ নিয়া দেহো। ভালো হইলে আগামু।’মহেশ মাথা নেড়ে বলে,’দেখমুনে,পোলা যদি ভালা হয় তাইলে আমি আপত্তি করমু না। আমার বড় মাইয়া ভালো থাক এইডাই চাই আমি।’

স্বামীর কথায় যারপরনাই আনন্দিত হলো চন্দনা। মেয়েটাকে ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারলেই খুশি সে। দিন দিন গায়ের রঙ আরো চাপা হচ্ছে বিন্দুর। হবেই না বা কেন??সারাদিন রোদে টোকলা সেধে বেড়ালে এমন তো হবেই। নাহলে মেয়েটা আরেকটু ফর্সা হতো বলে মনে করে চন্দনা।

শহর থেকে গ্রামের ফেরার পথটার দিকে তাকিয়ে আছে বিন্দু। সে রোজ এখানে এসে দাঁড়ায়। ওর সম্পানের জন্য। কিন্তু সম্পান মাঝির দেখা মেলে না। সেই যে গেছে আর আসেনি। বিন্দু তাকে জানাতে পারেনি যে তার মা সব জেনে গেছে। সেদিন পরীর কথামতো কাজ করেছিল বিন্দু। চন্দনা প্রথমে বিশ্বাস

না করলেও বিন্দুর হাবভাবে বুঝেছে। তার মেয়েসম্পান কে ভুলে গেছে। কিন্ত বিন্দুর মনে সম্পানের জন্য এখনও আগের মতো ভালোবাসা আছে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি চন্দনা।

বিন্দু প্রতিদিন অপেক্ষা করে কবে আসবে তার মাঝি?কবে লাল রঙে রঙিন করবে তার সিঁথি?মন যে আর

মানছে না। বিরহের দহনে পুড়ছে মন,ঝলসে যাচ্ছে সারা অঙ্গখানি। কবে তার প্রিয়তমের হাতের ছোঁয়ায় ঠান্ডা করবে মন?যন্ত্রণায় সে যে ছটফট করছে। অশান্ত মনকে মিথ্যা শান্তনা দিতে দিতে বিন্দু এগিয়ে চলল জমিদার বাড়ির দিকে।

জমিদার বাড়িতে লোকজনের সমাগম সবসময়ই থাকে। আজকে

এর বিচার তো কালকে ওর বিচার। কাজ নিয়ে সবসময় দরবার হতেই থাকে। পাহারা তো আছেই। শামসুদ্দিনের উপর পাল্টা হামলা করা আর হয়নি। পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ দুই পক্ষকে কঠিন হুশিয়ার করে গিয়েছে। এরপর কোন সংঘর্ষ হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হবে। এ

কথায় দুই পক্ষ দমে যায়। তবে সুযোগ পেলে কেউ কাউকে ছাড় দেবে না।

সপ্তবর্ণে রক্ষিদের পাশ কাটিয়ে অন্দরে ঢুকল বিন্দু। উঠোনের এক কোণে একটু রোদ এসে পড়েছে। মালা সেখানে বসে রোদ পোহাচ্ছে। শরীর টা তেমন ভালো নেই। তাই রান্না করতে যাননি। জেসমিন আর

বাকিরা সব দেখছে। বিন্দু মালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে,’জেডি তোমাগো রস।’-‘রান্ধাঘরে দিয়া ছাদে যা তো। পরী আছে, ওরে ডাইকা নিয়া আয়। রস খাইবোনে।’

বিন্দু তাই করলো। এই সকাল বেলা পরী ছাদে কি করে তা ভাবতে ভাবতে ছাদে উঠলো বিন্দু। পরী বেলিফুল ছিঁড়ে চুলে গাঁথছিল।

বেলিফুল তার ভিশন প্রিয়। মন মাতানো তার সুবাস। এই সুবাস নিতে সে ছাদে আসে। মাটির টবে অনেক গুলো বেলিফুল গাছ লাগিয়ে ছিল পরী। ফুলে ভরে গেছে ছাদ। বিন্দু পরীর কাছে গিয়ে বলে,'এই সক্কাল বেলা ছাদে আইছোস ক্যান পরী?'

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলো পরী। কানে দুটো ফুল গুঁজে বলল,’দেখতো কেমন লাগছে?’

-‘তুই তো এমনেই সুন্দর। তোর গায়ে আছে বইলা ফুল গুলা সুন্দর লাগতাছে। কিন্ত ওই গাছের ফুল গুলা সুন্দর লাগতেছে না।’পরী শব্দ করেই হাসলো। বিন্দুর মুখে পরী সবসময় নিজের প্রশংসা পায়। পরী

বিন্দুর কানে দুটো ফুল গুঁজে দিয়ে বলে,'তোকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে।'

-'ইশশ আমি তো কালো।'

-'আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর নারী তুই। তুই সুন্দর বলেই সম্পান মাঝির ভালোবাসা পেয়েছিস। আর আমি এখনো পাইনি।'

সম্পানের নাম শুনে বিন্দুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। গোমড়া মুখে বলল,'মাঝি তো এহনও আইলো না পরী।'

পরী বিন্দুর চিবুক স্পর্শ করে বলে,'চিন্তা করিস না এসে পড়বে। চল রস খাই।'

বিন্দু প্রতিদিন জমিদার বাড়িতে রস দিতে আসে। কারণ জুম্মান আর

পরী সকাল বেলা ঠান্ডা রস খেতে খুব ভালোবাসে।

দুটো গ্লাসে রস নিয়ে বসে আছে মালা। পরী দৌড়ে এসে বসে। কোথা থেকে জুম্মান ও চলে আসে। নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে পরীকে বলে,'আপা চলো দেখি কে আগে সব রস শেষ করতে পারে?'

-‘আচ্ছা দেখি।’দুজনে একসাথে গ্লাসে চুমুক দিলো। একটু খেয়ে দুজনেই কাশতে লাগল। এতো ঠান্ডা রস কি তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়? মালা ধমক দিয়ে বলে, ‘আস্তে খা। নাইলে খাইতে দিমু না আর।’

সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল দুজনেই। আস্তে আস্তে রস পান করলো দুজনে।

দুদিন পর সম্পান বাড়ি ফিরলো। এবার আসার সময় বিন্দুর জন্য আরেকটা শাড়ি এনেছে। সাথে কিছু চুড়ি ফিতা। বিন্দুর কানে খবর যেতেই সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। তার মাঝি এসেছে। এবার তাহলে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। বিন্দুর খুশি লাগছে অনেক। বাড়ি থেকে বের হওয়ার বাহানা

খুঁজছে সে। সম্পান কে একটু চোখের দেখা দেখবে। কিন্তু চন্দনা এটা ওটা বলে আটকে দিচ্ছে বিন্দুকে। তখনই ফুলি এলো চন্দনার কাছে। এসেই বলল, ‘কিগো তাড়াতাড়ি করো। ওরা আইলো বইলা। মহেশ কই?’অতঃপর তিনি বিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলে,’আরে

তুই এইহানে খারাইয়া আছোস ক্যান? ভালো একখান কাপড় পর।’ বিন্দু আগা গোড়া কিছুই বুঝতাছে না। কে আসবে? আর ওর মা কেন এতো আয়োজন করছে?বিন্দু কিছু বলার আগেই মহেশ মিষ্টি নিয়ে এসে চন্দনার হাতে দিলো। চন্দনা বিন্দুকে নতুন কাপড় পরতে পাঠালো। মনে সংশয় নিয়ে নতুন

কাপড় পরলো বিন্দু। চন্দনার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলেই ধমক দিচ্ছেন। ইন্দু নিজের বোনকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো। চুল বেঁধে চোখে কাজল পরিয়ে দিলো। বিন্দু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পাত্র পক্ষ এসে পড়েছে। তাদের খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন চন্দনা আর ফুলি। সাথে মহেশ ও আছে। মহেশ

খবর নিয়েছে ছেলের। খুবই ভাল ছেলে। তার মেয়ে সুখেই থাকবে সেখানে। তাই সে ও রাজি।

বিন্দুকে দেখে সবাই পছন্দ করে। তা শুনে চন্দনার খুশি দেখে কে!! বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। এখন পৌষ মাস চলছে। পৌষ মাসে বিয়ে হওয়া অমঙ্গল। তাই মাঘ মাসের শুরুতে বিয়ে ঠিক হয়। কেউ গিয়ে

বিন্দুকে জিজ্ঞেস করেও না যে সে রাজি কি না। সে অন্য কাউকে ভালোবাসে কি না?সবাই তাদের মতামত দিচ্ছে। বিন্দু আর অপেক্ষা করলো না। পাত্র পক্ষ চলে যেতেই সে ছুট লাগালো।হলুদ শর্ষে ক্ষেতের পাশ দিয়ে দৌড়ানো রমণীর চক্ষুযুগল ভেজা। কাজল লেপ্টে গেছে চোখের জলে। শাড়ির আঁচল

শর্ষে ক্ষেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোন দিকে তাকাচ্ছে না সে শ্যামবতী। সে দৌঁড় থামালো সম্পানের বাড়িতে গিয়ে। রাঁখিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল বিন্দু। আচমকা বিন্দুর কাজে ভড়কে গেল রাঁখি। সম্পান ঘুমিয়ে ছিল। বিন্দুর কান্না ওর ঘুম ভাঙালো। উঠে এলো সে। বিন্দু রাঁখিকে জড়িয়ে ধরে বলতে

লাগল,'আমারে তোমার পোলার বউ বানাও গো জেডি। নাইলে এই বিন্দু মইরা যাইবো। ওরা আমার চিতা সাজাইতাছে যে।'

সম্পান টেনে তুললো বিন্দুকে। ইশশ চোখের পানি তে কাজল ধুয়ে গালে লেগে আছে। চোখদুটো ফুলে গেছে। সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। সম্পান বিন্দুর চোখের পানি মুছে

দিয়ে বলে,'কি হইছে বিন্দু? আমারে 'ক'?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিন্দু বলল,'মায় আমার বিয়া ঠিক করছে মাঝি। আমি ওই পোলারে বিয়া করমু না। আমি তো তোমার ঘরের বউ হইতে চাই মাঝি। ওরা ক্যান বোঝে না?'বিন্দু ঝাপিয়ে পড়ল ওর প্রিয়তম মাঝির বুকে। আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে

ধরে সম্পান কে। তড়িৎ গতিতে সবকিছু হওয়াতে সম্পান ভড়কে গেল। বিন্দু সম্পান কে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে,'তোমারে ভোলার আগে আমি নিজেরেই ভুলমু। আমার শরীর নিস্তব্ধ হইবো,চোখের পাতা বন্ধ হইবো,হাত পা ঠান্ডা হইবো,নিঃশ্বাস শ্যাষ হইবো তাও তোমারে আমি ভুলমু না। আমি

থাকতে পারমু না মাঝি। তোমার নামের সিঁদুর ছাড়া অন্য নামের সিঁদুর আমার মাথায় পড়ার আগেই যেন আমার মরণ হয়।’-‘বিন্দু কস কি এইয়া? চুপ থাক,তুই আমার বউ হবি। নাইলে কারো বউ হবি না।’

বলেই সম্পান অসহায় দৃষ্টিতে রাঁখির দিকে তাকালো। রাঁখি ছেলের সম্পর্কে অবগত। বিন্দুকে তিনিও

ছেলের বউ হিসেবে দেখতে চান। আজকে বিন্দুর কান্না দেখে তারও কষ্ট হচ্ছে। রাঁখি সম্পান কে উদ্দেশ্য করে বলে,’চল সম্পান, আমি আইজই কথা কমু বিন্দুর মা’র লগে।’

রাঁখি সম্পান আর বিন্দুকে নিয়ে উপস্থিত হলো চন্দনার কাছে। বাড়িতে তখন বিন্দুর খোঁজ চলছিল।

চন্দনা ভাবছিল মেয়েটা গেল কোথায়? তখনই ওদের তিনজনকে আসতে সেদিকে এগোয় চন্দনা। রাঁখি চন্দনার হাতদুটো ধরে বলে,'তোমার মাইয়ার হাত দুইটা আমার পোলার লাইগা ভিক্ষা চাই গো দিদি। ওরা দুইজন দুইজনরে পছন্দ করে। বিয়া হইলে সুখে থাকবো।'

রেগে গেলো চন্দনা। ঝাড়ি মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,’দূর হও বাড়ি থাইকা। তোমার পোলার জন্মের ঠিক নাই। আবার ওই পোলার লগে আমার মাইয়া বিয়া দেবার কয়!!শখ কতো!!ওর লগে মাইয়া বিয়া দিলে লোকে ছিঃ ছিঃ করবো।’-‘না দিদি,ওর বাপ আছে।’

-‘তা কয়জন ওই পোলার বাপ?’

-‘ভুল বুইঝেন না দিদি। আমার সম্পানের বাপ আছে। তার কোন খোঁজ নাই। আমার গায়ে কোন কলঙ্ক নাই দিদি।’

-‘হইছে আর কথা কইয়ো না। একটা বে**ন্মা পোলার হাতে আমার মাইয়া দিমু না।’

এই পর্যায়ে সম্পান ভয়ানক রেগে গেল। তেড়ে গেল চন্দনার দিকে। রাখিঁ টেনে ধরে সম্পান কে।

-'আমার মা'র নামে খারাপ কথা কইলে আপনার গায়ে হাত উঠবো কইলাম।'

চন্দনা চেঁচিয়ে বলে,'পোলার সাহস কত বড়! আমারে মারব আবার আমার মাইয়া বিয়া করব। এই

নেমকহারাম বের হ বাড়ি থাইকা।’চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়েছে। তবে কেউ কথা বলছে না। সম্পান পাল্টা জবাব দিচ্ছে আর চন্দনা ও খারাপ খারাপ কথা বলতেছে। শেষে মহেশ এসে চন্দনাকে টেনে সরিয়ে নিলো। এখানে মহেশ নিজেও কিছু বলতে পারছে না। চন্দনার কথাই শেষ

কথা। কয়েক জন সম্পান কে বাড়ি যেতে বলল। যার মেয়ে সে বিয়ে না দিলে কার কি করার আছে? অবশেষে সম্পান মা'কে নিয়ে ফিরে গেল।

বিন্দু দৌড়ে পরীর কাছে গেল। এই মুহূর্তে পরী ব্যতীত কেউ ওর সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। চন্দনার ভাষা শুনে বিন্দু আর

সেখানে দাঁড়ায়নি। সম্পানের অপমান সে দেখতে পারবে না।

পরী তখন নিজের ঘরে বসেছিল। বিন্দু এসেই হাঁপাতে লাগলো। সখির অবস্থা দেখে পরী গিয়ে ধরলো বিন্দুকে। চিন্তিত হয়ে পরী বলল,'কি হয়েছে বিন্দু? এরকম করছিস কেন?'

বিন্দু সকল ঘটনা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে। পরীর এবার রাগ হলো চন্দনার উপর। মহিলাটা ভিশন কঠোর। এই মহিলার কঠিন তম শাস্তি হওয়া উচিত। রুষ্ঠচিত্ত কন্ঠে পরী বলে,’তোর মা ভাল না বিন্দু। একটা শিক্ষা দিতে হবে তোর মা’কে।’-‘আমি জানি না তুই কি

করবি কিন্তু আমারে বাঁচা। মাঝিরে ছাড়া আমি থাকতে পারমু না।’

পরী বিন্দুকে শান্ত হতে বলে। পরী নিজে গিয়েও কিছু বলতে পারবে না। কেননা সে নিজেই চুক্তিবদ্ধ মায়ের কাছে। তাই যা করার বিন্দু আর সম্পান কেই করতে হবে।

পরী কাঠের আলমারি থেকে বিন্দুর সিঁদুর কৌটো বের করে বলল,’সিঁদুর

পড়ালেই বিয়ে হয় তাই না বিন্দু?’পৌষের শীত রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌছে যায়। ভোরে গরম কম্বলের নিচ থেকে কেউ উঠতেই চায় না। পরীও কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। রুপালি এসেছিল

পরীকে দেখতে। সে পরীর ঘর থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে নিচতলায় নেমে এলো। গরম চাদর

গায়ে জড়িয়ে উঠোন জুড়ে হাটাহাটি করতে লাগলো। পেটটা বেশ উঁচু হয়েছে। কয়েক দিন বাদেই পৃথিবীতে ভুমিষ্ঠ হবে ওর সন্তান। মা হওয়ার আনন্দ সব মেয়েরই থাকে। কিন্ত কেন জানি রুপালি সে আনন্দ পাচ্ছে না। সেদিনের পর তো কবির আর তার কোন খবর নেয়নি। নেয়ার সাহস ও নাই। এই বাড়িতে

পা রাখলে কবির প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কি সন্দেহ।

যদি রুপালিকে কবির ভালোবাসতো তাহলে সে প্রাণের মায়া না করে ঠিকই আসতো। রূপের মোহে কবির তাকে বিয়ে করেছে ঠিকই কিন্তু ভালোবাসতে পারেনি। তার কাছে মেয়েদের দেহটাই প্রধান। রুপালির প্রথম মনে হতো সে'ই পারছে না

কবির কে স্বামী হিসেবে টেনে নিতে। কিন্তু আস্তে আস্তে তার ভুল ধারণা ভেঙে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলা আর মালার চোখের জল সহ্য করা ছাড়া রুপালির আর কিছুই করার নেই।রোদ উঠেছে বেলা আটটা নাগাদ। এতক্ষণ কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল চারিদিক। এরই মধ্যে জমিদার বাড়িতে এসে হাজির হলো

নাঈম,শেখর,আসিফ। বৈঠকে ওদের বসতে দেওয়া হলো। মালা ও জেসমিন গিয়ে দেখা করে ওদের সাথে। অনেক দিন পর দেখা হতে ওদের ভালোই লাগলো। গরম গরম ভাপা পিঠা ওদের খেতে দেওয়া হলো।

নাঈম ভাবছে আজকের দিনটা ইনিয়ে বিনিয়ে থেকে যেতে হবে।

পরীকে দেখার ইচ্ছাটা ওর কখনোই মিটবে না। একটাবার সে পরীকে দেখার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। কিন্ত অতি আবেগের শেষ ফলাফল শুন্য।

আসিফ নাঈম কে বলে,'কি সিদ্ধান্ত নিলি? থাকবি নাকি চলে যাবি?'-'সবে তো এলাম দেখি কি করি?'

-‘তোর না দেখা বউয়ের দেখা শ্বশুর বাড়ি। থাকলে সমস্যা নেই।’

বলেই হাসলো সে। নিজের ঘর থেকে বের হতেই নাঈমদের দেখেই সেদিকে এগিয়ে গেল শায়ের। বলল,’আপনারা!! কখন এসেছেন??’

নাঈম মৃদু হেসে জবাব দিল,’এইতো কিছুক্ষণ। আপনার অবস্থা কেমন??’

-‘জ্বী ভালো। তা হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়ল??’

-‘হঠাৎ মানে?’

-‘মানে এতদিন পর এলেন তাই বললাম।’

নাঈমের বদলে আসিফ বলে,’আসলে এসেছি গ্রামটা দেখতে। বন্যার সময় এক রকম ছিল আর এখন আরেক

রকম। এটাই দেখতে এসেছি। একটু পরেই চলে যাবো।’

নাঈম চোখ গরম করে আসিফের দিকে তাকালো। বিনিময়ে হাসলো আসিফ। দিলো সবকিছু মাটি করে। আগ বাড়িয়ে কথাটা বলার প্রয়োজন ছিল কি?-‘আজকে বরং থেকেই যান। পাশের গ্রামে যাত্রাপালা হচ্ছে।

রাতে সবাই দেখতে যাবো। আপনাদের ভালোই লাগবে।’

শায়েরের কথা শুনে নাঈম তৃপ্তির হাসি হাসল বলল,’তাই নাকি!! তাহলে তো যেতেই হয়। সমস্যা নেই আমরা থাকবো।’

-‘শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা আপনারা থাকুন আমি আমার কাজে যাই। রাতে দেখা হচ্ছে।’

শায়ের চলে গেল। নাঈম মনে মনে খুব খুশি। আজকে অন্তত শেষ চেষ্টা করে দেখবেন সে। পরীর মুখোমুখি সে হবেই।নিজের ঘরে বসে কুসুমের পরনের কাপড়টা ভাজ করছে পরী। কুসুম কে একখানা নতুন চাদর দিয়ে ওর পুরোনো চাদরটাও এনেছে। এমনকি জুতো টাও কুসুমের। কোন রকম ঝুঁকি নিতে

প্রস্তুত নয় পরী। আজকে রাতের আঁধারে বের হবে সে। অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরী। বিন্দু আর সম্পানের বিয়ে দেবে সে তাও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। বিন্দুকে বলেছে যাতে সে সম্পান কে সব বলে। সম্পান ও রাজি। আর কি চাই? পরিকল্পনা অনুযায়ী,পশ্চিমের জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো কালী

মন্দির আছে। ওখানেই বিয়ে সম্পন্ন হবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে চন্দনার আর কিছুই করার থাকবে না। বিন্দু সম্পান ও সুখে থাকবে। তাই আগে থেকেই তৈরি হচ্ছে পরী। রুপালির বাড়ি যাওয়ার সময় কুসুম দেখিয়েছিল জঙ্গলটি। কুসুমের ধারণা এই জঙ্গলে ভুত প্রেতের বাস। তাই দিনের বেলাতেও কেউ

যায় না। এটাকেই হাতিয়ার হিসেবে ধরেছে পরী। তবুও কেউ যাতে দেখে না ফেলে তাই রাতেই সেখানে যাবে ওরা। এখন শুধু রাতের অপেক্ষা।সন্ধ্যা নামতেই চারিদিক হালকা কুয়াশায় ভরে গেলো। গ্রামের মানুষ দলে দলে বের হলো যাত্রা দেখবে বলে। আফতাব সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত।

তাই সবাই রওনা হলো। কিন্তু নাঈম গেলো না। শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে শুয়ে থাকলো। সেজন্য সবাই তাকে ফেলে যেতে বাধ্য হলো। আসিফ আর শেখর সব বুঝলো কিন্ত কিছু বলল না।

ওরা চলে গেল যাত্রা দেখতে। জমিদার বাড়ির সব পুরুষ চলে গেল শুধু রয়ে গেল নাঈম আর রক্ষিরা।

রাতের অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই রুপালির চিৎকার শোনা গেলো। রুপালির প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। বাড়িতে একটা হইচই পড়ে গেল। ইতিমধ্যে কয়েকজন মহিলা এসে পড়েছে। আবেরজান নাতনির কথা শুনে আর থাকতে পারলেন না। তিনিও চলে এলেন। সবাই এখন রুপালিকে নিয়ে ব্যস্ত।

পরী সেই ফাঁকে বেরিয়ে গেল। এর মধ্যে কেউই পরীর খোঁজ করবে না। সদর দরজা দিয়েই বের হয়েছে সে। কুসুমের পোশাকে ছিল বিধায় কেউ বুঝতে পারেনি। রক্ষিরা ভেবেছে হয়তো কোন কাজে কুসুমকে পাঠানো হয়েছে কারণ সে দ্রুত যাচ্ছে। বাঁধা দিলে রাগ করবে।

পরী ক্ষেতের আইল দিয়ে যাচ্ছে। কারণ অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে পরীর। তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে ওর। বিন্দু সম্পান হয়তো আরো আগে পৌঁছে গেছে।হারিকেনের আলোয় দ্রুত পা চালায় পরী। সম্পান বিন্দুকে এক করতে পারলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে পরী। বেশ সময় লাগলো জঙ্গলে পৌঁছাতে।

কিন্তু কালী মন্দিরটা কোথায়??সেটা তো পরী জানে না। খুঁজতে হবে। জঙ্গলটা বেশ বড়। তবুও পরী খুঁজতেছে। কিছুক্ষণ খুঁজে পেয়ে ও গেলো। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে বিন্দু সম্পান এখনো আসেনি। পরীর হাতে বিন্দুর সেই সিঁদূর কৌটো। এটা দিয়েই বিয়ে হবে। কিন্তু ওরা এখনো আসছে না কেন?

পরী ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তবুও বিন্দু সম্পানের নাম গন্ধও নেই। পরীর এবার ওদের জন্য চিন্তা হচ্ছে। বিন্দু কি বের হতে পারবে? নাকি চন্দনার হাতে ধরা পড়ে যাবে?বকুল ফুলের ঘ্রাণে ম ম করছে চারিদিক। পরী থাকতে পারলো না আর। পাশেই একটা বড় বকুল ফুল গাছ। তলায় চাদরের

মতো বিছিয়ে আছে সাদা ফুলগুলো। হারিকেনটা মাটিতে রেখে ফুল কুড়ায় পরী। মাঝে মাঝে ঘ্রাণ নেয়। পরী ফুল দিয়ে কোচড় ভর্তি করে ফেলেছে। তখনও কেউ আসছে না। পরী আবার আগের জায়গাতে বসে পড়ল।

কারো পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে পরী। পাতার খসখস আওয়াজ টের

পাচ্ছে। সে খুশি হলো। তারমানে ওরা এসে পড়েছে। পরী হারিকেন হাতে নিয়ে একটু এগিয়ে থেমে গেল। ও বুঝতে পারল বিন্দু সম্পান আসছে না। বেশ কয়েকজন লোক আসছে। তাদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে পরী। এখানে থাকাটা ঠিক হবে না ভেবে উল্টো দিক দিয়ে দৌড় দিলো পরী। পরী বুঝতে

পারল তাকে দেখে ফেলেছে এবং তাড়া করছে। তাই সে প্রাণপণে ছুটলো। বেত ঝারের মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছে পরী। গায়ের চাদর কিছুর সাথে আটকে গিয়েছিল বিধায় সেটা ফেলেই চলে এলো। এখন দাঁড়ানোর সময় নেই। ধরা পড়লে চলবে না। অনেকটাই এগিয়ে এসেছে পরী। হঠাৎই গাছের সাথে ধাক্কা লেগে

হারিকেনের কাচ ভেঙে গেল। হারিকেনটা ও ছিটকে পড়ে। কোথায় পড়ে তা পরী খেয়াল করে না। সে দৌড়াতে থাকে।অনেক আলো আসতেই পরী পেছন ফিরে তাকায়। আগুনের ফুলকি উঠছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। পরী বুঝতে পারলো যে হারিকেনটা ছিটকে খড়ের গাদায় পড়েছে। আগুন

দেখেও অপেক্ষা করে না পরী। আবার দৌড় দিলো। রাস্তায় এসে হুশ ফিরলো পরীর। ঘাড় ঘুরিয়ে জঙ্গলটা দেখে নিলো সে। আগুনের লাল আলো এখনো দেখা যাচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পরী। হঠাৎ করে কি হয়ে গেল তা বোধগম্য হচ্ছে না ওর। বিন্দু সম্পান কোথায়? আশেপাশে ভালো করে

তাকায় সে। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যায় না। মাথা ধরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো পরী। এই রাস্তায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ। চাদরটাও হারিয়ে গেছে। মুখটা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকলো পরী।তারপর হাঁটা ধরে বাড়ির পথে। এক পা এগোতেই পায়ে ব্যথা অনুভব করে

পরী। জুতো খুলে দেখে তাতে বড়সড় বেল কাটা বিঁধে আছে। টেনে কাটা বের করার চেষ্টা করে পরী। কিন্ত পারে না তাই জুতো খুলে খালি পায়ে রওনা হলো। ঠান্ডা মাটি তার উপর গায়ে চাদর নেই। তাছাড়া শরীর জ্বালাপোড়া করছে খুব। শরীরের কিছু কিছু জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেছে। এতক্ষণ

উত্তেজনায় পরী কিছু টের না পেলেও এখন পাচ্ছে। অন্ধকারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতে লাগল পরী। কোনরকম পথ চিনে বিন্দুর বাড়িতে গেলো।

অনেক মানুষের জটলা বিন্দুদের বাড়ি। চন্দনা মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে আর সম্পান কে গালমন্দ করছে। সম্পান নাকি

বিন্দুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এটা বলছে আর সম্পান কে অভিশাপ দিচ্ছে। পরী এবার বেশ অবাক হলো। ওরা যদি পালিয়ে যাবে তাহলে পরীকে বলল না কেন??এক মুহূর্ত দেরি না করে পরী ছুটলো নিজের বাড়ির দিকে। তবে এবার সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে পারলো না সে। তাই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে

গাছে উঠে ছাদে গেল সে। তারপর নিজের ঘরে গেল।মালাকে ওর ঘরে দেখে আঁতকে ওঠে পরী। মালা যে এসময় ওর ঘরে আসবে তা ভাবেনি পরী।

আজ মালা ভয়ানক রেগে আছে। ফর্সা মুখখানি লাল বর্ণ ধারণ করেছে। মাকে এভাবে দেখে ভয় হলো পরীর। মালা জিজ্ঞেস

করল,’কোথায় গিয়েছিলি??’পরী চট জলদি জবাব দিতে পারলো না। মালা অপেক্ষাও করলো না। ঠাস করে চড় মেরে দিলো পরীর গালে। এমনিতেই পরীর শরীর দূর্বল। তাই সে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। মালা পরীকে টেনে তুলে আবার থাপ্পড় দিলো। পরপর কয়েকটা থাপ্পড় দিতেই রক্ত লাল

হয়ে গেছে পরীর গাল দুটো। শক্ত হাতের মারে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে যেনো। পরী চুপচাপ রইলো। মালা চিৎকার করে উঠল বলল,’এই দিন কি দেখতে চাইছি আমি??তোরে সব বিপদ থাইকা আগলাইয়া রাখতে ঘর থাইকা বাইর হইতে দেই না। ক্যান জানোস?? কারণ সুন্দরের কদর সবাই করে না। লালসার চাহনি

অনেক ভয়ংকর। সুন্দর সবাই ধরতে চায়। চোখ দিয়া তারা শরীরে হাত দেয়। তোরে সেই সব থাইকা বাঁচাইতে ঘরে আটকাইয়া রাখি। আর তুই রাইত বিরাইতে বাইরে যাস। আমার কথা তো বুঝোস না। ঝিনুকের মুক্তা যহন মানুষ দেখে তহন বেইচা দেয়। না দেখলে ওই মুক্তা সুরক্ষিত থাহে। তোরে

তেমনিই সুরক্ষিত রাখতে আমি ঝিনুকের মধ্যে রাখলাম যাতে কেউ দেখতে না পারে। আর তুই!! তুই কি আমার মাইয়া??’মালা পরীকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। পরী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মা ওকে কিসব বলে গেল?? কোন লালসার কথা বলে গেল??তাহলে নিশ্চয়ই মালাও এরকম কিছুর শিকার ছিলো। কোন

কিছু নিয়ে ভিশন ভয় পাচ্ছে মালা। যার কারণে পরীকে সে ঘরবন্দি করে রাখে। সেই ভয়ের কারণ টা কি?? একে তো বিন্দুর চিন্তা আর মালাও কি বলে গেলো। মাথায় প্রশ্নের জটলা পেকে গেছে। তাকে যে জানতে হবে সব প্রশ্নের উত্তর।

সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি পরী। কাপড় বদলে

নিজের পোশাক পড়ে নিলো সে। বিন্দুর সিঁদুর কৌটো হাতে নিয়ে সারারাত ভেবেই গেল। বিন্দু সম্পান কোথায় গেলো?সত্যিই পালিয়ে গেল??এসব ভাবনা পরীকে ঘুমাতে দিলো না। সকাল হতেই নিজ ঘর ছেড়ে বের হয় পরী। হাতে তার তখনও সিঁদুর কৌটো আছে। সেটা পরী খেয়াল করলো না। বাইরে

এসে দেখে অন্দরের উঠোন ভর্তি মহিলা। সবাই রুপালির ঘরে উঁকি দিচ্ছে। পরী দ্রুত রুপালির ঘরে যায়। নবজাতক কে দুগ্ধ পান করাচ্ছে রুপালি। পরী গিয়ে আস্তে করে রুপালির পাশে বসে। অসম্ভব সুন্দর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে অষ্ফুটস্বরে বলে উঠল,'মাশাল্লাহ'আবেরজান পাশেই

বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ‘তোর অহন আহার সময় হইলো? পোলা হইছে কোন রাইতে।’

দাদির কথায় রুপালি বলল,’আহ দাদি থাক না। পরী তো ঘুমাচ্ছিল। এখন তো এসেছে।’

পরীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রুপালি। পরীও হাসলো কিন্ত মনটা এখনও কু গাইছে। পরী বাচ্চাটাকে

কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো। পরীর হাতে সিঁদুর কৌটো দেখে রুপালি জিজ্ঞেস করে,’তোর হাতে এটা কেন??’

পরী জবাব দিতে পারে না। রুপালিও ফের প্রশ্ন করতে পারে না। কারণ বাইরে থেকে জুম্মানের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সে ‘পরী আপা’ বলে ডাকছে। পরী

দৌঁড়ে বের হয়ে জুম্মানের কাছে গেলো। জুম্মান তখনো হাপাচ্ছে। পরী জিজ্ঞেস করে, ‘কি হয়েছে জুম্মান??’

জুম্মান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,’আপা,,,’-‘কি??’

-‘আপা বিন্দু দিদি,,’

-‘বিন্দু কি??’

ভয়ে কথা বলতে পারছে না জুম্মান। শরীর এখনো কাঁপছে জুম্মানের। পরী চিৎকার করে জুম্মান কে ঝাঁকিয়ে বলে,’বল না বিন্দুর কি হয়েছে??’

-‘বিন্দু দিদি পশ্চিম জঙ্গলে গাছের ডালে ঝুলতাছে আপা।’জুম্মান কে সরিয়ে পরী দৌড় দিলো। মালা সাথে সাথেই পরীকে টেনে ধরে।

কিন্তু এবার মায়ের কোন বাঁধা মানে না পরী। ঝাড়ি মেরে মালার হাত ছেড়ে দৌড়ে চলে যায়। আজ পরী ভুলে গেছে মায়ের দেয়া কসম। ভুলে গেছেন নেকাব পরতে। ভুলে গেছে নিজের সৌন্দর্য লুকাতে। যে পরীর সৌন্দর্য পর্দার আড়ালে লুকানো ছিল আজ সেই পরী পর্দা ভেদ করে বের হয়েছে।সব

ভালোবাসা সুখকর হয়না। পায়না সে নিজস্ব পূর্ণতা। কিয়ৎকালের জন্য সুখ দিয়ে সারাজীবন দেয় বেদনা। প্রহর গুলোতে আনন্দ দিলে,ঋতু জুড়ে দেয় বেদনা। ভালোবাসা কি আদৌ সুখ দেয়?ভালোবাসা ছাড়া কি বেঁচে থাকা যায় না?ভালোবাসা যদি সুখ দিতো তাহলে বিশ্বজুড়ে ভালোবাসাতে ভরে যেতো। কষ্ট

চেনার সাধ্য কারো হতো না। সবার ক্ষেত্রে ভালোবাসা আনন্দময় হয় না। ভালোবাসা নামক সুখ পাখিটা সবার জীবনে ডানা ঝাপটাবে। কিন্তু পাখিটা কি আদৌ পোষ মানবে কি? সবাই তো পোষ মানাতে পারে না। কিছু অবহেলায় পাখিটা চলে যায় আবার কেউ যত্ন করেও পোষ মানাতে পারে না। ভাগ্য যে কাকে

কোথায় নিয়ে যাবে তা কেউই জানে না। বিধাতার লিখন যে কেউ খন্ডাতে পারবে না।

বিন্দুর জীবনে সুখ পাখিটা ডানা ঝাপটে ছিল। ধরা দিয়েছিল বিন্দুর হাতে। কিন্ত যত্নেও পোষ মানাতে ব্যর্থ বিন্দু। যার কারণে তার শাস্তি পেয়েছে সম্পানও।সম্পানের কিছু প্রহর আনন্দে কেটেছে কিন্ত বাঁকি

ঋতুগুলো বোধহয় আনন্দ আর কখনোই আসবে না।

প্রিয়তমা তার সাথে করে সেই সুখটুকুও যে নিয়ে গেছে। তাই সে তার সুখের স্থির দেহের পাশে বসে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। মুখের অজস্র কাটা ছেড়া তার প্রিয়তমার। তার মধ্যে থেকেই সুখ খুঁজে যাচ্ছে সে। অথচ কত কষ্ট দিয়েই না তার

সুখের প্রানটা তার দেহ থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে।

রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসছে পরী। গায়ের চাদরটা বৈঠকে পড়ে গেছে আসার সময়। গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ফর্সা শরীরে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা জমেছে। চুলের খোপা যে কখন খুলে পিঠ ছড়িয়েছে তা সে টেরই পায়নি।

পরীর দৌড় থামলো বিন্দুকে দেখে। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বিন্দুর মুখখানা। একটু থেমে পরী দৌড়ে গিয়ে ধপ করে সম্পানের পাশে বসে পড়ল।জঙ্গলের ভেতরে গাছের ডালে বিন্দুর লাশ ঝুলতে দেখা যায়। সকালে ভোরে গ্রামেরই কেউ যাচ্ছিল কালী মন্দিরে। হঠাৎই তার চোখ যায় গাছের ডালে থাকা ঝুলন্ত বিন্দুর

দিকে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। কেউ কেউ ভেবেছিল যে বিন্দু আত্মহত্যা করেছে। কেননা সবাই জানে বিন্দু সম্পান কে ভালোবাসে। আর বিন্দুর বিয়ে অন্য ছেলের সাথে ঠিক হয়েছে। বিন্দু তাই মানতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্ত লাশ নামাতে গিয়ে সবাই বুঝলো

বিন্দু আত্মহত্যা করেনি। মেয়েটার ক্ষত বিক্ষত শরীর টাই তার আসল প্রমাণ। বিন্দুর পরনের লাল পাড়ের সাদা শাড়িটি দিয়ে গলা পেঁচিয়ে গাছের ডালে ঝুলানো ছিল।

বিন্দুর লাশ জঙ্গলের বাইরে এনে শোয়ানো হয়েছে। শাড়িটিও ওর গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একে একে ভিড় জমতে লাগলো।নিজের

প্রান প্রিয় সখির স্থির দেহের দিকে তাকিয়ে আছে পরী। কি সুন্দর মায়াবী চোখ বিন্দুর!!ওই চোখজোড়া খুলে আর দেখবে না পরীকে। দেখবে না ভালোবাসার সম্পান কে। গজদন্তিনী আর হাসবে না। আর সে হাসিতে পরীও মুগ্ধ হবে না। সে আর দৌড়ে জমিদার বাড়িতে উঠবে না। হবে না মায়ের হাতের মার

খাওয়া। ঘুম কাতুরে বিন্দু আজ চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। শত ডাকেও সে সাড়া দিবে না।

পরী আলতো করে বিন্দুকে ঝাঁকিয়ে বলে,'এই বিন্দু তুই ঘুমিয়ে আছিস কেন? ওঠ,এতো ঘুমালে চলে? তুই তো বিয়ে করতে এসেছিস। এই দেখ আমি এসেছি সম্পান মাঝি এসেছে। তোর আর সম্পান মাঝির

বিয়ে হবে। ওঠ না,আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে রাগ করে ঘুমিয়ে থাকবি? ওঠ,ওঠ না,ওঠ বিন্দু!!’নাহ বিন্দুর সাড়া নেই। যে মেয়েটা পরীর এক ডাকে দৌড়ে চলে আসে আজ সেই মেয়েটা পরীর শত ডাকেও উঠছে না। পরী বিন্দুর দেহ ধরে ঝাকুনি দিচ্ছে আর উঠতে বলছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কি কখনো জীবিত

হতে পারে? তাই বিন্দুও উঠলো না। পরী এবার বিন্দুকে ছেড়ে দিয়ে সম্পানের দিকে তাকালো বলল,'সম্পান মাঝি,তুমি বললে বিন্দু ঠিক উঠবে। তুমি ওরে উঠতে বলো। তোমরা বিয়ে করবা না? আমার বিন্দুরে ঘরে তুলবা না?'

চোখের পানিতে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে পরীর কিন্তু সম্পান এখনও চুপ

করে দেখছে বিন্দুকে। হঠাত করেই সম্পান পরীর হাত থেকে সিঁদূর কৌটো নিয়ে নিলো। হাতে কৌটোর সব সিঁদূর ঢেলে রাঙিয়ে দিলো বিন্দুর সিঁথি। ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধময় হাসি ফুটল সম্পানের। সে বলল,’তোরে খুব সুন্দর লাগতাছে বিন্দু। একেবারে বউ। তুই তো চাইছিলি আমার বউ হইতে। আমার

হাতের সিঁদূর পরতে। দেখ আমিও সিঁদূর পরাইছি। আয়নায় একবার দেখ কত সুন্দর লাগতাছে তোরে। না থাক, তুই তো ঘুমাইতাছোস। উঠলে দেহিস। অহন ঘুমা তুই।'-'সম্পান মাঝি কি বলো এইসব তুমি? বিন্দু,,'

সম্পান পরীর দিকে তাকিয়ে তর্জনী আঙুল মুখে চেপে বলল,'হুসসস

বিন্দু ঘুমায় পরী। কথা কইয়ো না। চুপ থাকো চুপ থাকো।'

সম্পান আবার বিন্দুকে দেখায় মন দিলো। পরী থাকতে না পেরে চেপে ধরে সম্পানের কলার। নিজের দিকে সম্পান কে ঘুরিয়ে বলে,'তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে সম্পান মাঝি? হ্যা ? বিন্দুর ভালোবাসায় কি পাগল হয়ে

গেলে? কথা বলো না? আমার দিকে তাকাও?’

গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটাও আজ সম্পানের চোখ সরাতে পারছে না বিন্দুর থেকে। ভালোবাসা তো এমনই হওয়া উচিত। সৌন্দর্য থাকবে না কিন্তু মাধুর্য থাকবে অপরিসীম। সে ভালোবাসায় মন

জুড়াবে। পরী সম্পান কে ছেড়ে আবারো বিন্দুকে ডাকতে লাগল। নারী পুরুষের ভিড় জমেছে। সবাই পরীকে অবাক হয়ে দেখছে। যে মেয়ের চেহারা কোন পুরুষ দেখেনি আজকে কতশত পুরুষ দেখে নিলো সেই পরীকে। শোক পালনের থেকে এখন সবাই পরীকেই দেখে চলেছে। কিন্তু পরীর সেদিক কোন খেয়াল

নেই।চন্দনা বিন্দুর খবর শুনে বেশ কয়েকবার জ্ঞান হারিয়েছে। পরে সেও এখানে চলে এসেছে। এসেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল চন্দনা। বলতে লাগল,'ও আমার বিন্দু রে,,তুই ক্যান আমাগো ছাইড়া গেলি? এট্টু চাইয়া দ্যাখ,,'

বিলাপ করছে চন্দনা। ইন্দু আর সখা ও দিদির জন্য কাঁদছে। মেয়েকে

এমতাবস্থায় দেখে মহেশ ও নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দনার কান্না আর সহ্য হলো না সম্পানের। দুহাতে চেপে ধরে চন্দনার গলা। মাটিতে ফেলে আরো জোরে চেপে ধরে সম্পান। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে চন্দনার। চোখ উল্টে গেল তৎক্ষণাৎ। সম্পান বলতে লাগে,'তোর লাইগা আইজ এই

অবস্থা। তোর লাইগা বিন্দু আমারে ছাইড়া চইলা গেছে। আমি তোরে শ্যাষ কইরা ছাড়মু।’মহেশসহ কয়েক জন মিলে সম্পানকে টানতে লাগল। কিন্ত ছাড়াতে পারছে না। এই মুহূর্তে সম্পানের শক্তির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে। দূর থেকে নাঈম এসব দেখতে পেলো। তাই সে দৌড় দিলো সেদিকে। নাঈম শুনেছে

বিন্দুর খবর,এও শুনেছে যে পরীও এখানে এসেছে। তাই সে দেরি না করেই ছুটে এসেছে। সে দৌড়ে কাছে আসতেই কেউ একটা চাদর দিয়ে পরীর মুখসহ পুরো শরীর ঢেকে দিলো। চকিতে তাকালো নাঈম। সেই ব্যক্তিটি আর কেউ না। স্বয়ং মালা। মালা চাদরসুদ্ধ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। যাতে কেউ তার

মেয়েকে দেখতে না পারে। নাঈম কাছে এসেও পরীকে দেখতে পেলো না। মায়ের সান্নিধ্য পেয়ে পরীও নিজেকে গুটিয়ে নিলো। ঠান্ডা শরীরটা একটু উষ্ণতায় নেতিয়ে গেলো। পরীর কান্নার আওয়াজ বা কথার আওয়াজ ও শোনা গেল না।

কুসুম এসে বলে,’বড় মা,বড় কর্তা আইবো তো। তাড়াতাড়ি বাড়িতে

চলেন।’মাথা নেড়ে মালা পরীকে গাড়িতে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

একটুর জন্য নাঈম পারলো না পরীর মুখ দেখতে। আরেকটু জলদি আসলেই দেখতে পারতো। নিজেকেই নিজে কিছুক্ষণ গালমন্দ করলো সে। এরই মধ্যে আফতাব সেখানে আসে। সবাই রাস্তা করে

দেয় আফতাব কে। শায়ের ও সাথে এসেছে। বিন্দুর মৃত্যুর খবর শায়ের কেও ভাবাচ্ছে। মেয়েটাকে এভাবে নৃশংস ভাবে হত্যা করলো কারা?

পুলিশ কে খবর আগেই দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলে তারাও চলে আসে। সবাইকে দূরে সরিয়ে দিলো। সম্পান কে সবাই মিলে ধরে রেখেছে। চন্দনা জ্ঞান হারিয়েছে

আবার। তাকে সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যায়। পুলিশ সব দেখছে। শায়েরের পরিচিত ই তারা। শায়ের পুলিশ প্রধান কে বলে,'আপনি একটু ভাল করে দেখবেন। আমাদের গ্রামে এমন কখনোই হয়নি। অপরাধি কে বা কারা তাদের তাড়তাড়ি ধরার চেষ্টা করুন।'

-‘আমরা চেষ্টা করব শায়ের সাহেব। তবে এটা বুঝতে পারছি বেশ কয়েকজন যুবক ছিল। নাহলে মেয়েটাকে এভাবে,,’

চোখ বন্ধ করে নিলো শায়ের। কিছু পল ওভাবে থেকে চোখ মেলে বলল,’আমার মনে হয় কালকে যারা যাত্রা দেখতে এসেছিল তাদের কেউই হবে।’পুলিশ প্রধান একটু

ভেবে বলে,’আমার মনে হয়না এরকম সাহস কোন সাধারণ মানুষের হবে। মনে হচ্ছে কোন অপরাধী এরকম করেছে। আমার মনে হচ্ছে,,,!’

-‘কি মনে হচ্ছে?’

-‘শশীল নয়তো? ও তো বড় একজন অপরাধী। আপনার মনে

আছে চার বছর আগের সেই ঘটনার কথা?’

-‘হ্যা আছে। কিন্তু শশীল তো,,,’

-‘গাঁ ঢাকা দিয়েছে। ওকে ধরার চেষ্টা করছি দুবছর ধরে কিন্তু পারছি না। এমনও তো হতে পারে যে শশীল যাত্রা পালায় আসা মানুষের সাথে মিশে এসব করেছে।’

আফতাব একথা শুনে হুংকার দিয়ে উঠলো। আশেপাশে থাকা সবাই কেঁপে উঠল। আফতাব বলল,’ওই জানো**য়ার টাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করেন। সবার সামনে ওর গলা কেটে শান্ত হবো আমি।’

-‘আমরা এখনো সঠিক বলতে পারছি না। আগে তদন্ত করি তারপর বলা যাবে।’

নারকেল পাতার পাটিতে মুড়িয়ে বিন্দুকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। সম্পান দৌড়ে গিয়ে টেনে ধরেছিল বিন্দুকে। কিন্ত গ্রামের লোকজন তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। সম্পান বারবার বলেছে বিন্দুকে যেন না নিয়ে যায় কিন্ত কেউ ওর কথা শোনেনি।অন্দরের উঠোনে পরী চাদর জড়িয়ে বসে আছে। কাঁপছে

ওর সারা শরীর। বিন্দুর মুখটা এখনও ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মুখের প্রতিটা ক্ষত কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। পরীর চোখে এখনও তা ভেসে উঠছে। মালা পরীর কাছে এসে বলে,'পরী অহন ঘরে যা।'

পরী মায়ের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠল। মালার হাত দুটো ধরে বলল,'আম্মা আমার বিন্দু!!

ওরা আমার বিন্দুকে মেরে ফেলেছে। আমি কাল রাতে ওই জঙ্গলে গিয়েছিলাম বিন্দু আর সম্পানের বিয়ে দিতে আম্মা। আমি পারি নাই আম্মা। কারা জানি এসেছিল সেখানে। ওরাই মনে হয় আমার

বিন্দুকে মেরে ফেলেছে আম্মা। আমি কেন পালিয়ে আসলাম? আর ওই আগুন!!’আগুনের কথা মনে হতেই পরী থমকে যায়। তখন আগুন লাগলো কীভাবে?? এখন তো শীতকাল। শিশিরে ভিজে ছিল খড় গুলো। হারিকেন ছিটকে পড়লে তো আগুন নিভে যাওয়ার কথা। তার বদলে আগুন জ্বলে উঠল কীভাবে??

তার মানে ওই খড় গুলোতে কেরোসিন দেওয়া ছিল। তাই হারিকেন পড়তেই আগুন জ্বলে উঠেছে। এজন্যই পরী তখন কেরোসিনের গন্ধ পাচ্ছিল। তারমানে ওরা বিন্দুকে মারার পর পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু আগুন লাগার কারণে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। হ্যা তাই হবে। পরী

এতক্ষণে সব বুঝতে পারল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার পা বাড়ালো বৈঠকের দিকে। মালা এবার শক্ত করে টেনে ধরে পরীকে। বলে,’অনেক হইছে পরী। আর না। তুই আর বাইর হবি না। আমার কসম।’

-‘আম্মা আমাকে আব্বার কাছে যেতে হবে। সব বলতে হবে। বিন্দুকে ওরা পুড়িয়ে ফেলতে

চেয়েছিল। কাল রাতের সবকিছু আমি জানি। আমি বলব সব। ওদের ধরে কঠোর সাজা না দিলে আমি শান্ত হবো না।'

-'ওদের শাস্তি হবে। পুলিশ কে খবর দেওয়া হয়েছে। ওনারা ঠিক খুঁজে বের করবে।'

আফতাব কথাগুলো বলতে বলতে অন্দরে ঢুকলো। পরী সেদিকে

তাকিয়ে বলল,’কি বলেছে পুলিশ? জানতে পেরেছে কিছু? কারা করেছে খুন?’উত্তেজিত হয়ে গেছে পরী। আফতাব বলে,’পুলিশ সন্দেহ করছে শশীলের উপর। আগে শশীলকে ধরুক তারপর জানা যাবে।’

পরী সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠল। ঘোর বিরোধিতা করে বলল,’নাহ শশীল এই কাজ করতে

পারে না। আপনি ওদের মানা করুন। একাজ অন্য কেউ করেছে।’

-‘পুলিশের থেকে বেশি বোঝো তুমি? যাও ঘরে যাও। মেয়ে মানুষ এতো কথা বলো কেনো??’

-‘আপনি বোঝেন না। আপনার কি কোন দায়িত্ব নেই নাকি? কিসের জমিদার আপনি?’পরীকে রাগারাগি করতে দেখে মালা বলে,’পরী,

বাপের লগে খারাপ কথা কওয়ার সাহস পাইলি কই তুই?’

-‘আম্মা উনি বোঝে না কেন শশীল খুন করে নাই।’

মালা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করে,’তুই কেমনে জানলি শশীল খুন করে নাই?’

-‘শশীল বেঁচে থাকলে তো খুন করবে আম্মা। দুইবছর আগে আমি

নিজ হাতে শশীল কে খুন করছি আম্মা, নিজের হাতে।’নূরনগরের পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ স্বনামধন্য ব্যক্তি সম্রাট মির্জার একমাত্র পুত্র শশীল। একমাত্র সন্তান

হওয়ায় বাবা মায়ের একমাত্র আদরের সে। যখন যা চায় তাই পায়। ছেলের আবদার পুরন করতে করতে কখন যে ছেলেকে বিপথে

পাঠিয়ে দিয়েছেন তারা নিজেরাও বুজতে পারেননি। বুঝতে পেরেছে শেষ সময়ে। এখন সম্রাট তার ছেলেকে ঠিক করতেই পারছেন না। বেশ কয়েকবার জেল থেকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন। তবুও ছেলের অন্যায় কমাতে পারছে না। নিষিদ্ধ জায়গায় গিয়ে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে মেলামেশা আর

নেশা করতে করতে চরিত্র টাই বখে গেছে।ওই খারাপ চোখের ললুপ দৃষ্টি পড়ে রুপালির উপর।

রুপালি তখন স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। ওর সাথে সবসময় একজন রক্ষি থাকতো বিধায় শশীল শুধু লালসার দৃষ্টি দিতো। বারবার চেষ্টা করেও রুপালির ধারে কাছে সে ঘেষতেও পারে না। এতে দিন দিন

আরো ক্ষিপ্ত হয় শশীল। সবসময় হিংস্র বাঘের মত ওত পেতে থাকতো। কিন্ত সে তার শিকার কে ঘায়েল করতে পারতো না।

তবে একদিন সে সুযোগ এসেই গেলো। সেদিন ছিল জমিদার বাড়িতে অনুষ্ঠান। অনেক মানুষের আনাগোনা। সন্ধ্যার পর জলসার আয়োজন করা হয়েছিল প্রাঙ্গনে।

এরই মধ্যে রুপালির কাছে একটা ছোট বাচ্চা এসে চিঠি ধরিয়ে দিলো। চিঠিতে লেখা ছিলো,”তোমার জন্য বাড়ির পিছনে অপেক্ষা করছি।

সিরাজ,,,”তখন ওদের দুজনের ভালোবাসা আরো গভীরে চলে গিয়েছিল। খুব বিশ্বাস করতো সিরাজকে। তাই হারিকেনের আবছা আলোয় ওতটুকু পড়েই রুপালি

সেখানে চলে গেল। বাড়িতে অনেক মেহমান। ওকে কেউ খুজবে না। সেই সুযোগে রুপালি চলে গেল। কিন্তু সেখানে সিরাজের পরিবর্তে ছিলো শশীল। জমিদার বাড়ির পেছনে খানিকটা জঙ্গল ছিল তখন। তবে এখন তা পরিষ্কার করা হয়েছে।

রুপালির চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে আরেকটু ভেতরে নিয়ে গেল শশীল। চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। কেননা দেওয়ালের ওপারে শব্দ খুব কমই যায়। তাছাড়া গান বাজনা চলছে এতে আরো শুনতে পাবে না কেউ। তবুও রুপালি চিৎকার করছে। শশীল সম্পর্কে গ্রামের সবাই অবগত। ওর

কর্মকান্ড সবাই জানে। রুপালির ভয়ে জ্ঞান হারানোর অবস্থা।শশীল রুপালিকে মাটিতে ফেলে হাতটা পা দিয়ে চেপে ধরে। ব্যথায় গোঙ্গাতে লাগলো রুপালি। শশীল তার হাতের থাবা রুপালির শরীরে দেওয়ার আগেই সে স্থির হয়ে গেলো। রুপালি খেয়াল করল তরল জাতীয় কিছু শশীলের থেকে নির্গত হয়ে

রুপালির গলায় পড়ছে। হাত ভেজালো রুপালি সে তরলে। চন্দ্রের একটুখানি আলো গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে। রুপালি সেই আলোতে হাতটা এগিয়ে ধরতেই শিউরে ওঠে। ততক্ষণে শশীলের দেহ মাটিতে পড়ে গেছে। রুপালি স্থির দেহের দিকে তাকালো। একটু ও নড়ছে না। তারমানে মারা গেছে শশীল।

রুপালি মুখ ঘুরিয়ে তাকালো এবং পরীকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। দা হাতে দাঁড়িয়ে পরী। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে দা থেকে। শশীলের চোখদুটো এখনো খোলা। পরী দায়ের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়ে বলে,'রুপালির দিকে নজর দিয়েছিস কিন্তু এই পরীর

দিকে তোর মৃত চোখ দুটোও নজর দিতে পারবে না।'

ওড়নার বাঁধন খুলে পরী নিজের মুখটা বের করে। এই মুহূর্তে ভয় পেলো না পরী। নিজের করা প্রথম হত্যা তবুও পরী ভয় পেলো না। দ্রুত রুপালিকে ধরে ওঠায়। রুপালি তখনও কাঁপছে। পরী জিজ্ঞেস

করে,’তুমি ঠিক আছো আপা??’-‘পরী তুই খুন করলি!!’

-‘মরে গেছে!!সত্যি সত্যি!’

একটু অবাক হলো পরী। কারণ সে বাজে ভাবে জখম করতে চেয়েছিল। কিন্ত পরীর ধারণার চাইতে কোপ টা একটু জোরে হয়ে গেছে। রুপালি পরীর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে,’কি করলি পরী!!এখন কি হবে?’

-‘তো কি করবো?নাহলে ওই শয়তান টা তোমার সর্বনাশ করতো যে।’

রুপালির ভয় আরো বাড়লো। সে বলল,’সবাই জানলে কি হবে পরী? তোকে পুলিশ ধরবে যে। এটা তুই কি করলি পরী?’

রুপালি কাঁদতে লাগল। শশীলের শরীর দেখে ভয় পেতেও লাগল।

এতো জোরেই আঘাত করেছে পরী যে মাথার অর্ধেক কেটে গেছে। রাতের বেলা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না। দিন হলে রুপালি নির্ঘাত জ্ঞান হারাতো। পরী রুপালির হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। আর বলতে লাগল,'এতো বোকা তুমি কি করে হও? ওই কাগজের লেখাটা সিরাজ ভাই লেখেনি। হাতের লেখা

বোঝনি তুমি? আর সিরাজ ভাই এমন লোক না যে তোমাকে ওই জঙ্গলের মধ্যে ডাকবে।’রুপালি দাঁড়াল, সত্যি তো। সিরাজ তো কখনোই এখানে আসতে বলতো না। হারিকেনের আলোয় হাতের লেখা ঠিক খেয়াল করেনি রুপালি। তাহলে কি শশীল নিজেই চিঠি পাঠিয়েছিল! রুপালি আবার

চমকালো বলল,’পরী,শশীল কিভাবে জানলো আমার আর সিরাজের সম্পর্কের কথা? আমি তো সব লুকিয়ে গেছি।’

-‘এখন কথা বলার সময় নয়। আগে ঘরে যাই তারপর সব কথা হবে।’

মেহমান থাকার কারণে ওরা গাছ বেয়ে ছাদে উঠলো। তার পর দুজনেই পরীর ঘরে গেল। আলোতে

নিজের শরীরে রক্ত দেখে গা গুলিয়ে এলো রুপালির। পরীর শরীরেও কিছু রক্ত লেগেছে। দুজনে গোসল সেরে জামা কাপড় ধুয়ে দিলো।কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো পরের দিন সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। শশীল যে মারা গেছে তা গ্রামের কেউ জানতে পারলো না। শশীলের লাশ কেউ কি দেখেনি? লাশটা তো

ওখানেই ফেলে এসেছে ওরা। তাহলে!!!শশীলের পরিবার ও তার খোঁজ করেনি। কারণ কদিন আগে সে একটা মেয়েকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। সেজন্য পুলিশ তাকে খুঁজছে। শশীলের বাবা ওকে ভারত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। বাবার কাছ থেকে বিদায় নিলেও শশীল গ্রামেই পলায়িত ছিল। শশীলের

নজর রুপালির দিকে তখনো অটুট। তাই ভারতে যাওয়ার আগে রুপালির উপর শেষ থাবা দিতে চেয়েছিল কিন্ত ও নিজেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সম্রাট ভেবেছে হয়তো তার ছেলে ভারতে চলে গেছে।

পরী কিছুতেই বুঝতে পারছে না শশীলের লাশ কোথায়? সেজন্য ওই জঙ্গলে পরী যেতে চাইলে রুপালি

আটকে দেয়। বলে,'তুই যাবি না পরী। ভালোই হয়েছে কেউ জানেনা। পুলিশ জানাজানি হলে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। একটু চুপ থাক পরী। তুই একজন গ্রামের মেয়ে সেভাবেই পড়ে থাক। এতো গোয়েন্দা গিরি করবি না। দেখ আম্মা কিন্ত তার বড় মেয়েকে হারিয়েছে। এখন আমাদের হারালেন আম্মার কি

অবস্থা হবে ভেবেছিস কখনো? এতো সাহসী হওয়া ভালো না পরী।’বোনের কথায় মনক্ষুণ্য হলো পরীর। মালাকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। মালাকে সে আর কষ্ট দিতে চায়না। তাই কিছু ঘেটে দেখতে পারলো না সে। ওই ঘটনা চাপা পড়ে গেল পরী রুপালির মাঝে। আরও কেউ আছে যে লাশ

সরিয়েছে। সে কে তাও চাপা পড়ে গেল। পরী এরপর থেকে নিজেকে বদলে ফেললো। একজন গ্রামের মেয়ে তৈরি করলো নিজের মধ্যে।

আজ পরী নিজের পুরোনো সত্ত্বায় ফিরে এসেছে। সেদিন খুন ইচ্ছা করে করেনি পরী। চেয়েছিল সামান্য আঘাত করতে কিন্তু সেটা খুন হয়ে গেল। আজ পরীর সত্যিই খুন

করতে ইচ্ছা করছে। বিন্দুকে যারা মেরেছে তাদের আরও নির্মম ভাবে খুন করতে চাইছে পরী।সিরাজের কথা বাদ দিয়ে পরী শশীল কে খুন করার কাহিনী সবই বলে দিলো। আফতাব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আর মালা মুখে হাত চেপে কাঁদতে লাগল। এ কেমন মেয়ে জন্ম দিয়েছেন তারা যে মানুষ মারতেও

দ্বিধা বোধ করে না। আর পাঁচকান হলে তো বিপদ। রুপালি নিজ কক্ষের দরজায় বসে সব শুনেছে। সেও কাঁদছে। পরীকে বারণ করা সত্ত্বেও সে বলে দিয়েছে। শুধু কুসুম ই ছিল সেখানে উপস্থিত। পরী খুন করেছে শুনে সেও ঘাবড়ে গেছে। এতো সুন্দর কোমল মেয়েটা যে মানুষ খুন করতে পারে তা জানা

ছিল না কুসুমের। সে ভয়ে চুপ করে আছে।

আফতাব বলে উঠল,'এই কথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। আর পরী তোমার এখন থেকে ঘর থেকে বের হওয়াও বন্ধ। তোমার সবকিছুই ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মালা নিজের মেয়েকে তুমি সামলাও নাহলে খারাপ হয়ে যাবে কিন্ত।'পরী

চেঁচিয়ে উঠলো,’নাহ আমি ঘরে থাকবো না। আমার বিন্দুকে কে মেরেছে তা আমাকে জানতে হবে।’

-‘জেনে কি করবে তুমি? আবার খুন করবে? তারপর কি হবে জানো? বাইরের জগত ঘরে বসে দেখা যায় না। আমার সম্মান নষ্ট করবে না। মালা মেয়েকে কাছে রাখতে চাইলে আটকে রাখো।’

আফতাব অন্দর থেকে বেরিয়ে গেল। পরী আরো চেঁচিয়ে বলতে লাগল সে ঘরবন্দি হবে না। বিন্দুর খুনিকে সে নিজে খুজবে। মালা পরীর হাত ধরে দোতলার ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। পরী বলল,'আম্মা হাত ছাড়েন আমার। আমার বিন্দুকে ওরা মেরে ফেলছে আমি ওদের শাস্তি দেবো।'

-‘তার লাইগা পুলিশ আছে। তারা খুজবো। তুই ঘরেই থাকবি।’

পরীকে আর বলতে না দিয়ে ওকে ঘরে আটকে রাখেন মালা। পরী মেঝেতে বসেই কাঁদতে লাগল। সাথে বিন্দুর সাথে কাটানোর মুহূর্ত মনে করলো। কতই না আনন্দের ছিল সময়টা আর আজ! সেই বিন্দুটাই নেই। এই ক্ষতটা পরীর

সারাজীবন থাকবে।এরই মধ্যে পরীর জন্য অনেক গুলো সম্বন্ধ এসে পড়েছে। কোথায় শোক কোথায় কি? পরীর বিয়ের আলোচনা চলছে এখন। আফতাব এখন নিজেও চায় এই মেয়ে বিদায় হোক। এই মেয়ে ঘরে থাকলে ওনাকে নির্ঘাত থানা পুলিশ দৌড়াতে হবে। সম্মান নিয়ে

টানাটানি হবে। এর চেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই হবে উত্তম কাজ।

এসব ঘটনা দেখে নাঈম নিজেই চমকে গেছে। একটু আগে কত কিছু ঘটে গেল। ঘরের বাইরে শোক পালন করে এসে ঘরের ভেতরে বিয়ের আলাপ করছে। সত্যিই এই জমিদার বাড়ি আর লোকজন অদ্ভুত।

তবে গ্রামের মানুষ এরকমই হয়ে থাকে।

নাঈমের সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে পরীকে দেখতে না পারার কারণে। রাতে সে যা ভেবেছিল তার উল্টো হয়েছে। রুপালির প্রসব বেদনার কারণেই নাঈম ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তখন অনেক মানুষ ছিল। নাঈম ধরা পড়ে যেতো। তবুও

হাল সে ছাড়েনি। জেগেছিলো সারারাত যদি একটু সুযোগ সে পায়। তাও পায়নি নাঈম। তাই গাঢ় ঘুমে বিভর ছিল সকালে। যখন ঘুম ভাঙলো সব শুনে দৌড়ে গেল। কিন্ত ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। পরীকে সে দেখতে পারলো না।নিজের ঘরে নাঈম মনমরা হয়ে বসে আছে। নিজের প্রতি নিজেই সে বিরক্ত।

তখনই আসিফ এসে ঘরে ঢুকলো। নাঈম কে উদ্দেশ্য করে বলল,'নাঈম তুইও কি পরীকে দেখেছিস আজকে??'

নাঈম নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল। আসিফের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে তাকালো বলল,'নাহ,কেন বলতো? তোরা কি দেখেছিস?'

আসিফ ভীত কণ্ঠে বলল,’আমি দেখিনি তবে শেখর দেখেছে।’

নাঈম চট করে দাঁড়িয়ে গেল বলল,’তুই আর শেখর তো একসাথে যাত্রা দেখতে গিয়েছিলি।’

-‘হ্যা গিয়েছিলাম। কিন্ত শেষ প্রহরে শেখর শায়েরের সাথে চলে এসেছিল আমি আসিনি। যাত্রা দেখতে দেখতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’

নাঈম কিছু বলল না। আসিফ একটু চুপ থেকে বলে উঠল,'পরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাঈম।

-‘জানি,সেতো আরো আগে ঠিক হয়েছে।’

-‘নাহ নাঈম এই মাত্র ঠিক হলো। জানতে চাইবি না কার সাথে পরীর বিয়ে?’

-‘কার সাথে?’-‘শেখরের সাথে। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে শেখর। সামনের মাসে বিয়ে ঠিক করা হয়েছে।’

নাঈমের মনে হলো কেউ তাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলো। ক্ষত না হলেও ব্যথা অনুভব করছে নাঈম। সব জেনে শেখর এটা কিভাবে করতে পারলো? নাঈম ঘর

থেকে বের হতে নিলে আসিফ বলে,’গিয়ে লাভ নেই। শেখর শহরে চলে গিয়েছে। সে আমাদের সাথে আর সম্পর্ক রাখবে না।’

নাঈম এবার বেশ রেগে গেল। সে বাইরে বের হতে হতে বলল,’ওর সাথে শেষ কথা তো আমাকে বলতেই হবে।’কোলাহল পূর্ণ শহরের রাস্তায় যানবাহনের আনাগোনা।

গাড়ির হর্ণে কান তব্দা দেয়। ফুটপাত জুড়ে রয়েছে ছোটখাট দোকান। মানুষের ভিড়ে চলাফেরা করা মুশকিল। গ্রামে শীতকাল চললেও শহরে শীতের ছিটেফোটাও নেই। এ যেন চৈত্র মাস। লোকজনের মাঝে শীত নিজেই ঢুকতে পারছে না। কথাটা বেশ হাস্যকর মনে হলেও এটাই বাস্তব।

নাঈম রিকশায় বসে আছে। জ্যামে আটকে গেছে সে। আটকেছে গিয়ে একেবারে সূর্যের নিচে। গাছের ছায়াও নেই সেখানে। তপ্ত গরমে ঘেমে একাকার সে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। লাল বর্ণ ধারণ করেছে ফর্সা মুখখানা। পকেট থেকে রুমালটা বের করে ঘাম মুছে নিলো সে। জ্যাম ছাড়তেই রিকশা চলতে

লাগল। শেখরের বাসার সামনে নামলো নাঈম। ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে গেল সে। চারতলা বিল্ডিং এর দোতলায় থাকে শেখর। কলিং বেল চাপতেই শেখরের ছোট বোন এসে দরজা খোলে। নাঈম কে দেখে সে খুব খুশির হলো। ভাইয়ের বন্ধু হিসেবেই অত্যন্ত ভালো জানে সে নাঈম কে। নাঈম সৌজন্য মূলক

হাসি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তারপর সোজা শেখরের ঘরে চলে গেল। শেখর কে কিছু বলতে না দিয়েই বলল,'কি রে আমাকে না জানিয়ে চলে এলি?আমাকে বললে আমিও তো আসতাম।'

শেখর সোজা হয়ে দাঁড়াল বলল,'কাজ ছিলো।'-'কাজ তো থাকবেই বিয়ে বলে কথা। আমাকে

একবার জানালি না। আর তুই নাকি আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবি না।'

-'আরে আসিফ আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিলো তাই ওসব বলেছি।'

-'আসিফ তোর মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতেছিল। এমনটা করার কারণ কি শেখর? তুই সব জেনেও এমন সিদ্ধান্ত কীভাবে নিলি?'

-‘শোন,তুই কিন্ত পরীকে দেখিসনি। আমি দেখেছি। আমি বললে ভুল হবে আরো অনেকেই দেখেছে।’

-‘এক দেখাতে মোহ সৃষ্টি হয় শেখর। তুই তোর পরীকে ভালোবাসিস না। আর জানিসই তো আমি পরীকে,,’

নাঈম কে থামিয়ে শেখর বলল,’তুই তোর দেখিসনি তাহলে তুই কিভাবে

ভালোবাসিস বল? আমি দেখে ভালোবাসতে না পারলে তুইও পারিসনি নাঈম। হ্যা মানছি আমি পরীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছি তাহলে তো তুইও হয়েছিস। দেখিসনি পরীকে কিন্ত মুখের কথা শুনেই তোর এই অবস্থা আর আমার দেখে কি অবস্থা হয়েছে ভাবতে পারছিস?’

ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলো নাঈম। ছিঃ!!এতোটা জঘন্য মনের মানুষ শেখর তা আজ জানলো নাঈম। শেখরের দৃষ্টিভঙ্গি এতোটা কুৎসিত!! ওর মতো ছেলে পরীকে পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।-'তোর দৃষ্টি যে এতো নোংরা তা আমার জানা ছিল না

শেখর। ওই মেয়েটার দিকে ভালোবেসে তাকানোর বদলে ললুপ দৃষ্টি দিচ্ছিস?’

-‘আমি খারাপ নজরে দেখিনি পরীকে। তুই যদি তখন একবার পরীর স্নিগ্ধ মুখশ্রি দেখতে তাহলে তুইও এক দেখায় আবার নতুন করে মেয়েটির প্রেমে পড়তি। বিশ্বাস কর আমি খারাপ চোখে দেখিনি। আমি

কেন কোন পুরুষ ই বিকৃত নজরে দেখার কথা ভাবতেও পারবে না। মোহে আটকে গেলেও একদিন ঠিকই ভালোবেসে আগলে রাখব।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নাঈম বলে,'আমি মানতে পারছি না শেখর। বন্ধু হয়ে এইভাবে বেঈমানি করে ঠিক করলি না।'

-'নিজের পছন্দ কে পাওয়াটা বেঈমানি নয়।'

নাঈম আর কথা বলল না। চলে যেতে উদ্যত হয়েও ফিরে তাকালো। শেখর কে উদ্দেশ্য করে বলল,'যদি কোনদিন শুনি পরী তোর কাছে ভালো নেই সেদিন তোকে খুন করতেও আমি পিছপা হবো না।'শশ্মানে কাঠ পোড়ার ধোঁয়া

উঠছে এখনো। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে বিন্দুর চিতায়। দূরে মাটিতে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্পান। নাহ আজ তার চোখে এক ফোটা জল নেই। সব শুকিয়ে গেছে। বিন্দুর কথাগুলো মনে পড়ছে খুব। বিন্দু তো বলেছিল সে সম্পান কে ভুলবে না। তাহলে আজ কেন ওকে ভুলে রেখে গেল? সম্পান কেও তো

সাথে নিয়ে যেতে পারতো? হঠাৎই সম্পান শুনলো বিন্দু আগুনের ভেতর থেকেই যেন বলছে,’তোমার নামের সিঁদুর ছাড়া অন্য নামের সিঁদুর আমার মাথায় পড়ার আগেই যেন আমার মরণ হয়। আমি তোমার বউ হমু মাঝি।’

সম্পান তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। ‘বিন্দু’ বলে দৌড়ে এগিয়ে গেলো

আগুনের দিকে। কিন্তু তার আগেই কয়েকজন লোকেরা টেনে ধরে সম্পান কে। চেতনা হারিয়ে সম্পান ঝাপ দিতেও পারে ওই আগুনে। সম্পান চিৎকার করে বলতে লাগল,'আমি তোরে সিঁদুর পরাইছি বিন্দু। তাও আমারে রাইখা যাইস না। তোরে ছাড়া আমি ভালো থাকমু না বিন্দু।'

মহেশ সম্পানের পাগলামো দেখতেছে আর চোখের পানি ফেলছে। এখন মহেশের মনে হচ্ছে সম্পানের সাথেই বিন্দু ভালো থাকতো। ছেলেটা সত্যিই বড্ড বেশি ভালোবাসে তার মেয়েকে। কিন্তু এখন এসব বলে কি লাভ?? সেই বিন্দুটাই তো নেই। মহেশের এখন মনে হচ্ছে এই পরিস্থিতির জন্য

একমাত্র দায়ী চন্দনা। চন্দনা যদি রাজি হতো সম্পানের সাথে বিন্দুকে বিয়ে দিতে তাহলে এসব হতো না। আদরের মেয়ে বিন্দুর এমন পরিণতি হতো না।

বিন্দুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হতেই সবাই চলে গেল। সম্পান হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কিছুটা ছাই হাতে নিলো। পানি দিয়ে আগুনের আভা

কমানো হলেও এখনও ছাই বেশ গরম। তবে প্রেমিক পুরুষ সম্পানের হাত তা সয়ে নিলো। ছাই নিয়ে সে ছুটলো। গন্তব্য কোথায় তা সে নিজেও জানে না।জমিদার বাড়িতে আজ যেনো ছোটখাটো অনুষ্ঠান। অন্দরের উঠোনের খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে বসে আছে তিনজন মধ্যেবয়স্ক নারী। তারা তাদের ব্যাগ

থেকে নানা ধরনের শাড়ি বের করছে। আবেরজান আর শেফালি একটা একটা করে পরীর গায়ে ধরে দেখছে। কোনটাতে পরীকে বেশি মানাচ্ছে। সবগুলো রঙেই পরীকে সুন্দর লাগছে। পরী নির্জীব হয়ে বসে আছে। রঙহীন হয়ে আছে মুখখানা। বিন্দু চলে গেছে আজ সাতদিন পার হয়ে গেছে অথচ কোন

খবর পরী পায়নি। কে মারলো বিন্দুকে তাও জানেনি কেউ। পরী রোজ কুসুম কে দিয়ে খবর নেয়। সেদিনের পর থেকেই পরী ঘরবন্দি। আজকেই তাকে বাইরে আনা হয়েছে। আর আজকেই পরী জানতে পারলো যে শেখরের সাথে তার সামনের মাসে বিয়ে। অন্য কোন সময় হলে পরী হয়তো কিছু বলতো

কিন্তু আজ তার কিছুই ভালো লাগছে না। প্রাণহীন মনে হচ্ছে নিজেকে। পরীকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে আবেরজান বলল,’এই,এমনে চুপ থাকলে হইবো?চোখ ঘুরাইয়া দেখ কোনডা পছন্দ হয়?’

বিরক্ত হলো পরী বলল,’তুমিই দেখো দাদি।’-‘কাপড় পইরা তো আমি জামাইর কাছে খারামু না তুই?দেখ।’

পরী এবার বেশ চটে গেল। মোড়া থেকে দাঁড়িয়ে বলল,’তুমিই দেখো বুড়ি। একটা কাপড় পরে দাঁড়াও আমি তোমাকে আকাশে ছুড়ে মারি। নিজের জামাইকে তখন দেখাইও।’

-‘তোর আর কইতে হইবো না। তোর মতো বয়সে কতো দেখাইছি।’

-‘সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আমাকে এর মধ্যে টানবে না বুড়ি।’

পরী নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর রুপালি কুসুম কে দিয়ে কয়েকটা শাড়ি পাঠালো পরীর ঘরে। পরী তখন পড়ার টেবিলে বসে সোনালীর খাতাটা নেড়ে দেখছিল। কুসুম আস্তে করে পরীর পাশে দাঁড়িয়ে বলে,'আমার অনেক কষ্ট হইতাছে বিন্দুর লাইগা আপা। আপনেও কষ্ট পাইতাছেন জানি।

কিন্ত এখন আপনার বিয়া না দিলেও পারতো। আপনার মনডা তো ভালা নাই। আপনে চইলা গেলে আমি আর জুম্মান থাকমু কেমনে আপা?’

পরী কুসুমের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ জোড়া জলে ভরা। তবুও পরী ঠোঁটে হাসির রেশ ধরে বলে,’আমার রুপা আপা আর তার ছেলেকে দেখে রাখিস কুসুম। ওদের দায়িত্ব আমি

তোকে দিয়ে গেলাম। যেকোন বিপদে তুই ওদের পাশে থাকবি।’-‘কথা দিলাম আপনেরে আমি হ্যাগো পাশে থাকমু।’

পরী হাসলো। কুসুম ওকে অনেক বিশ্বাস করে। পরী জানে কুসুম তার কথার খেলাপ করবে না। এতে ওর প্রাণ সংকটে হলেও না।

আজ রাতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল শায়েরের। সামনের মাসে পরীর বিয়ে। জমিদার বাড়ির মেয়ের বিয়ে বলে কথা। এখন থেকেই টুকটাক কাজ সারতে হবে। সেজন্য শায়ের শহরে গিয়েছিল। আসতে আসতে তাই অনেক রাত হয়ে গেছে। বৈঠকে গিয়ে আগে কলপাড় থেকে হাতমুখ ধুয়ে নিলো। তারপর

নিজের ঘরে গেল। হারিকেনের আচ কমানো ছিল। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে পেছন ফিরতেই দুকদম পিছিয়ে গেল শায়ের। সামনের জলচৌকিতে কেউ বসে আছে। সেটা যে পরী তা শায়েরের বুঝতে বেগ পেতে হলো না। নেকাবের আড়ালে থেকেই পরী বলল,’ভয় পেলেন নাকি?’-‘এতো

রাতে আপনি আমার ঘরে কেন এসেছেন?’

পরী শান্ত গলায় জবাব দিলো,’বিন্দুকে কারা মেরেছে?’

-‘আমি এখনো জানতে পারিনি। তবে পুলিশ তদন্ত,,,’

বাকিটুকু শায়ের বলতে পারলো না। পরী মৃদু চিৎকার করে বলে,’কথা ঘোরাবেন না। আমি জানি আপনি

সব জানেন।হারিকেনের টিমটিম আলোতে পরীর চোখে প্রকাশিত পাচ্ছে ক্ষোভ। শায়ের চুপ করে আছে পরীর ধমকে। পরী উঠে দাঁড়াল শায়েরের সামনে। আশেপাশে তাকিয়ে শায়ের দেখলো কেউ আছে কি না? যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে পরীকে কিছু বলবে না কিন্তু শায়ের কে অনেক কিছুই শুনতে

হবে তার। সে বলল,’কেউ দেখলে খারাপ ভাববে। তাছাড়া আপনার সামনে বিয়ে। একটু ভেবে কাজ করবেন।’

-‘আমাকে নিয়ে ভাবতে আপনাকে হবে না।’

-‘আপনাকে নিয়ে ভাবছি না আমি। নিজেকে নিয়ে ভাবছি। কেউ দেখে ফেললে আমারই বিপদ।’

-‘ওসব কথা থাক। বিন্দুকে কারা মেরেছে?’

-‘আমি সত্যিই জানি না। আমাকে জানার অধিকার আপনার বাবা দেয়নি।’

বিষ্মিত হলো পরী। বলে,’মানে?ভাল করে বলুন।’-‘আমাকে এই ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। দেখুন আমাকে ঠিক যতটা বলা হয়

ঠিক ততটুকুই করি। আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আপনার বাবার গোলাম মাত্র। আমাকে তিনি যা বলেন আমি তাই করি। প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। বিন্দুর মৃত্যুর কথা জানলেও কাউকে বলতে আমি পারবো না। আপনার বাবাই সবাইকে বলবেন।পুলিশ এখনও কাউকে ধরতে পারেনি।’

-‘আমার বিশ্বাস হয় না আপনার কথা। আপনি মিথ্যা বলছেন। বলুন না বিন্দুকে কারা মেরেছে?’

শেষ কথাটাতে অসহায়ত্ব ফুটে উঠল। পরীর চোখের পানি স্পষ্ট দেখতে পেল শায়ের। খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই শায়েরের। একটু ভেবে শায়ের হাত বাড়িয়ে দিলো পরীর দিকে

বলল,’বিশ্বাস না হলে শাস্তি দিতে পারেন। হারিকেনটা ওখানে আছে।’পরী একপলক হারিকেনের দিকে তাকিয়ে আবার শায়েরের দিকে তাকালো। এই মুহূর্তে সে কিছুই বিশ্বাস করতে চাইছে না। তবে শায়েরের কথা শুনে মনে হলো সে মিথ্যা বলছে না। তাহলে সত্যিটা কি?বিয়ের পর তো এখানে আসতে

পারবে না পরী। তাহলে সত্য উদঘাটন করবে কীভাবে?ছোট্ট মস্তিষ্কে আর চাপ নিতে পারছে না পরী। তাই বিনা বাক্যে প্রস্থান করলো।

বিন্দুর চলে যাওয়ার আজ বাইশ দিন। পুলিশ এখনও কোন হদিস পায়নি। তাদের ধারণা আসামীরা

গা ঢাকা দিয়ে আছে। এখন ওদের ধরা অসম্ভব। তাই কেসটা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সবাই ভুলে গেছে বিন্দুর কথা। তবে ওত পাতাই থাকবে। এখন শুধু আসামীদের বের হওয়ার পালা। সন্দেহ তাদেরই করা হয়েছে যারা যাত্রাপালায় ছিল কিন্ত বিন্দুর মৃত্যুর পর তাদের কোন খবর নেই।

কুসুম এসে কথাগুলো পরীর কানে তুললো। পরী কিছু বলল না। কুসুমের খারাপ লাগছে পরীকে এভাবে দেখে। যে মেয়েটা সারা অন্দর ঘুরে বেড়াতো সেই মেয়েটা কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। কুসুম হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে,'আচ্ছা আপা আপনে যে খুন করলেন আপনের ডর করে নাই?'কুসুম ভেবেছিল পরী

রাগ করবে ওর কথায়। কিন্তু পরী তা করলো না। বলল,’মানুষ যখন কোন খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন কোন ভয় থাকে না তার। আমার ও তাই হয়েছিল। তখন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই রাগের বশে খুন করে ফেললাম।

পরে অবশ্য আমি নিজেও ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আপাকে বুঝতে দেইনি।’

-‘আপনের অনেক সাহস আপা। আমি তো মুরগি জবাই দেখতে ভয় পাই। আর আপনের মানুষ জবাই করলেন!!’

-‘জানোয়ার জবাই করতে ভয় কিসের??’

কুসুম দাঁত বের করে হাসলো। সবসময় সঠিক জবাব পায় সে পরীর থেকে। মালাকে আসতে দেখে কুসুম হাসি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলো। মালা পরীর মুখোমুখি বসলো। হাতে একটা কাপড়ের তৈরি ব্যাগ। ব্যাগ থেকে বেশ কিছু গয়না বের করে বলল,’দেখ তো পছন্দ হয়?’

পরী গয়না গুলোর দিকে তাকালো না। মালার দিকে তাকিয়ে রইল। কুসুম উঁকি দিয়ে বলে,'একদম খাঁটি সোনা আপা। একবার দেখেন?'হেসে পরী বলে,'আমি খাঁটি সোনা'ই দেখতাছি কুসুম।'

মালা অবাক হয়ে তাকালো পরীর পানে। কাঁদছে পরী। মালার নিজের চোখেও অশ্রুরা ভিড় করলো।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'কান্দোস ক্যান?'

-'আপনাকে রেখে আমি যাবো না আম্মা।'

মালাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে পরী। কাঁদতে কাঁদতে বলে,'আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না আম্মা। আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।'মালাও কাঁদছে। পরীকে যতটুকু শাসন

করেছে তার দ্বিগুণ ভালোবেসেছে। পরীকে বুঝতে দেয়নি। পরীর সুরক্ষার জন্য কসম দিয়ে ঘরবন্দি করে রেখেছিলেন মালা। তিনি চাননি সোনালী আর রুপালির মতো কাউকে পছন্দ করে ঠকুক তার ছোট মেয়ে। কষ্ট পাক,তাছাড়া সকল খারাপ দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে পরীকে। না জানি পরীর স্বামী তাকে

কতটা সুরক্ষা দেবে? কিন্ত মালা তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এখন কোন আফসোস নেই। উপরওয়ালার কাছে সে সম্মানের সহিত ছোট মেয়ের কথা বলতে পারবে। এটাই তার প্রশান্তি।

পরীকে শান্তনা দিয়ে মালা বললেন,'সব মাইয়া গো একদিন পরের ঘরে যাইতে হয় রে। দোয়া

করি তুই যেন সুখি হোস। শহরে তুই ভালো থাকবি। ওইখানে ভালো স্কুল কলেজ আছে তুই পড়ালেখা করবি।'পড়ার কথা শুনে মালাকে ছেড়ে দিল পরী। কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল। পড়ার প্রতি মনই টানে না পরীর। যেদিন প্রথম পড়ার জন্য স্কুলে মার খেলো সেদিনই শাপলা বিলে এসে পরী ওর বইগুলো ছুঁড়ে

ফেলে বিলের পানিতে। মাছ,ব্যাঙ আর সাপ দের খাওয়ার জন্যই দেয় বই গুলো। এজন্য মালার কম মার খায়নি পরী। কিন্ত পরী তবুও পড়াশোনায় মন দিতে পারেনি। মাধ্যমিক দেওয়ার পর সে পড়াই বাদ দিয়েছে। গ্রামে তো কোন কলেজ নেই এটাই মূল কারণ। এতে পরী ভিশন খুশি ছিল। যাক

আর পড়তে হবে না। কিন্তু মালা এখন আবার কি বলল!! মাথা ঘুরছে পরীর।

মালা এটাই চেয়েছিলেন। পরী যাতে কান্না বন্ধ করে। সেজন্যই পড়ার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

মালা মেয়ের হাত ধরে কাছে টেনে বলে,'শহর কেমন তা আমি জানি না। সাবধানে থাকবি একলা বাইর

হবি না। জামাইরে নিয়া যাবি।’জামাই শব্দটাতে যেন বিষম খেলো পরী। সে তো শেখরকে ঠিকমতো চেনেই না। কীভাবে মানিয়ে নেবে শেখরের সাথে পরী? চিন্তায় পড়েছে সে। মালা ততক্ষণে চলে গেছে কুসুমও গেছে। পরীর চেতনা ফিরতেই চোখের সামনে ছড়িয়ে রাখা গয়না গুলো দেখতে

পেলো। তাতে হাত বুলিয়ে বলল,’এই গয়না কি সুখ দিতে পারে?টাকা পয়সা কি শান্তি দেয়? তাহলে এতো ঐশ্বর্য থাকতে আমি কেন এক টুকরো সুখ পাই না? অট্টালিকায় সুখ না থেকে যদি কুঁড়ে ঘরে সুখ থাকে তাহলে আমি ওই কুঁড়ে ঘরে যেতে চাই।’

পরীর ইচ্ছা গুলো রঙ ওঠা চার দেয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ রইলো। তারাও যেন বুঝে গেছে পরী কি চায়!!জীবনে যে ভালোবাসাই সব। ধন সম্পদ দিয়ে কি হবে যদি ভালোবাসা না থাকে। পরী ভাবছে শুধু। তার জীবনে কোন মানুষটা সঠিক হতে পারে?দিন পেরিয়ে রাত,রাত পেরিয়ে দিন। প্রকৃতির

নিয়ম মেনে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে জমিদার কন্যার বিয়ের দিন। উৎসবে মেতেছে পুরো গ্রাম। দলে দলে মেয়েরা অন্দরে ঢুকছে নববধু কে দেখার জন্য। বিদায় দেওয়ার পূর্বে পরীকে সবাইকেই দেখে নিচ্ছে। বয়স্করা পরীকে দোয়া দিচ্ছে। আর পরী চুপচাপ তা মাথা পেতে নিচ্ছে। নতুন

সাজে সাজানো হচ্ছে জমিদার বাড়িকে। সবকিছুর তদারকি করছে শায়ের। দম ফেলানোর সুযোগ নেই তার। গায়ে হলুদের সব জিনিস পত্র গুনে গুনে অন্দরে পাঠাচ্ছে সে। একটু পরেই গায়ে হলুদ শুরু হবে। হলুদ কাপড় পরিয়ে পিড়িতে বসানো হয়েছে পরীকে। রুপালিও এসেছে,ছেলেকে শেফালির কাছে

রেখে এসেছে। হলুদ বাটছে একজন মহিলা। পরী অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে। পিঠ ছড়ানো চুল গুলো,হাতে চুড়ি আর হলুদ রঙে পরী যেন ঝলমল করছে। এই পরীকে দেখে আজ যেন প্রকৃতি হিংসে করছে। তাইতো সূর্যকে আজ লুকিয়ে রেখেছে। রুপালি তাড়া দিয়ে বলে,'আপনারা তাড়াতাড়ি করুন।

এই শীতের মধ্যে কতক্ষণ বসে থাকবে। এরপর গোসল করাতে হবে। কুসুম গরম পানি নিয়ে আয় না।’

সবাই খুব তাড়াতাড়ি সব করতে লাগল।প্রথমে পরীকে মালা হলুদ ছোঁয়ালো। কপালে গাঢ় চুম্বন করে বলে,’সুখি হ।’

জেসমিন এই প্রথম পরীকে ছুঁয়ে দিলো। মন্দ লাগলো না পরীর। ওর মায়ের স্পর্শই যেন পেল। চোখ তুলে জেসমিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। জেসমিন ও কপালে চুমু এঁকে দিলো। পরীর সারা শরীরে হলুদ মেখে দিলো এক এক করে। আবেরজান তা দেখে বলে,'অতো

হলদি মাখিস না। আমার নাতনি এমনেই সুন্দর। অহন গোসল দে।’

আরেকজন রসিকতা করে বলে,’নাত জামাইর যে চান কপাল। আমাগো পরীর মতো মাইয়া পাইছে।’

-‘হ,এই চান দেখলে তো আর ছাড়তে চাইবো না।’হাসাহাসির রোল পড়ে গেল সবার মধ্যে। পরী আগের মতোই বসে আছে। কুসুম গরম

পানি আনলো। গোসল করানো হলো পরীকে। গরম পানিতে গোসল করেও শীত লাগছে পরীর। ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠোঁট দুটো নীল হয়ে আসছে। সারা শরীরে হলুদ মাখানোর ফলে হলদেটে হয়ে আছে ফর্সা দেহখানা। রুপালি আবার তাড়া দিতেই পরীকে ঘরে নিয়ে গেল। হলুদ শাড়ি পাল্টে লাল শাড়ি পরানো

হলো। আর কিছুক্ষণ পরেই বর আসবে।

এরই মধ্যে মালা এলেন হাতে পায়েশের বাটি নিয়ে। নিয়ম অনুসারে পরীকে তিনবার খাইয়ে দিলো মালা। তারপর বাকিটুকু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেতে দিলেন। গায়ে হলুদের আগেই পরীকে ভাত খাইয়ে দিয়েছিল স্বয়ং জেসমিন।

আজ পরী কাউকে না করেনি। জেসমিনের খুব ভাল লাগলো পরীর আচরণে। নিয়ম মতো পরী গায়ে হলুদের পর আর কিছুই খেতে পারবে না। শুধু ওই পায়েশ বাদে। নিয়ম শেষে লাল বেনারশিতে সাজানো হলে পরীকে। বোনকে নিজ হাতে সাজালো রুপালি। সবশেষে লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়ে

বলল,’মাশাল্লাহ তোকে রাজকন্যার চেয়েও সুন্দর লাগছে পরী। বরের নজর ব্যতীত আর কারো নজর যেন না লাগে!!’হাসলো রুপালি। পরী কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালো রুপালির দিকে। এটা কেমন দোয়া?? বরের নজর পড়বে শুধু। পরীও হাসলো রুপালির দোয়া বুঝতে পেরে।

আছরের আযান পড়ে গেছে। এখন বরযাত্রী এসে পৌঁছায়নি। শহর থেকে আসছে বিধায় আরো দেরি হচ্ছে। ঘুম এসে গেছে পরীর। ওর পাশে বসে থাকা মেয়ে গুলোও ঝিমাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিয়ে টাকে অসহ্য লাগছে পরীর। এতক্ষণ বসে থাকতে ভালো কার লাগে!!

সময় পার হতে হতে মাগরিবের আযান দিয়ে দিয়েছে। এখন পরীর বিরক্ত লাগছে। ইচ্ছে করছে শাড়ি গয়না টেনে খুলে ফেলতে। রাগ প্রকাশ করতেও পারছে না। তখনই কয়েকজন মহিলা এসে পরীকে নিয়ে গেল বৈঠকে। পুরুষ নেই বৈঠকে। আফতাব, কাজি আর বর ই পুরুষ। মেঝেতে খেজুর পাতার তৈরি বড়

পাটিতে বসানো হলো। সামনে টানানো হলো পাতলা চাদর। উসখুস করছে পরী। শুধু কবুল বললেই আজ সে এক পুরুষদের অর্ধাঙ্গিনী হয়ে যাবে। তার উপর সমস্ত অধিকার পাবে পরী।কাজী সাহেব উচ্চস্বরে বলতে লাগল,'নূরনগর গ্রামের জমিদার আফতাব উদ্দিনের কনিষ্ঠ কন্যা পরীকে বিশ হাজার

এক টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহ করতে আপনি কি রাজি? রাজি থাকে বলুন কবুল!’

পরী মাথা নিচু করে শুনছে। এই মুহূর্তে ওর অন্যরকম অনুভুতি হচ্ছে। পরী ভাবছে এরকম অনুভুতি কি সব মেয়েরই হয়? অপর পাশ থেকে বেশ দেরি করেই উত্তর এলো। শেখর কি মেয়েদের মতো

লজ্জা পাচ্ছে নাকি? অসহ্য লাগলো ব্যাপারটা।এরপর কাজি পরীকে উদ্দেশ্য করে বলে,'নবীনগর গ্রামের শাখাওয়াত সাহেবের একমাত্র পুত্র সেহরান শায়ের আপনাকে বিশ হাজার এক টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। আপনি কি রাজি? তাহলে বলুন কবুল!!'বৈঠকে উপস্থিত সবাই

স্বাভাবিক থাকলেও বধূ বেশে বসে থাকা তনয়ার মনে জাগলো কৌতুহল। বিষ্মিত চোখে তাকালো পর্দার অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির পানে। কিন্ত মুখটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। পরী তবুও দেখার চেষ্টা করছে ঘোমটার ফাঁকে। কিন্ত সে ব্যর্থ। পরী কি ভুল শুনলো??যদি সঠিক শুনে থাকে তাহলে বাকি

সবাই এতো স্বাভাবিক কেন? কিছু কি হয়েছে? মাথা ঘুরে উঠেলো পরীর। চেয়েও শান্ত থাকতে পারছে না।

ওদিকে কবুল বলার জন্য বারবার তাড়া দিচ্ছেন কাজি সাহেব। পরী রয়েছে অন্য ধ্যানে। ঘোর কাটছে না কিছুতেই। অনেকক্ষণ ধরে সবাই বলছে কবুল বলতে কারো কথা

পরীর কান অবধি পৌঁছায়নি। শেষে আফতাব দিলো ধমক। সব মেয়েরা থেমে গেল। পরী চমকে উঠে বাবার দিকে তাকালো। আফতাব গম্ভীর সুরে বলে,'এতো দেরি করছো কেন পরী? তাড়াতাড়ি কবুল বলো।'পরপর কয়েক ঢোক গিলে পরী তিন কবুল পড়ে ফেলে। কিন্ত শরীরের ভর আর ধরে রাখতে পারে

না পরী। ঢলে পড়ে কুসুমের গায়ে। পরীর ঘোমটা আরো টেনে দিয়ে কুসুম ঝাঁপটে ধরে পরীকে। কুসুম জোরেই

বলে উঠল,'পরী আপা আপনের কি হইছে?'

সামনের পর্দাটা সরিয়ে ফেলা হলো। আফতাব মহিলাদের সব সামলাতে বলে কাজিকে নিয়ে চলে গেল।

পরীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এই মুহূর্তে ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার পরীকে। বৈঠকে আর মহিলাদের থাকা সম্ভব নয়। মেয়ের খবর শুনে মালা দৌড়ে এলো। কয়েকবার ডাকলো পরীকে কিন্তু পরী সাড়া দিলো না। শায়ের এখনও আগের মতোই বসে আছে। দৃষ্টি তার নত অবস্থায়। মালা শায়ের কে

আদেশ দিলেন পরীকে নিজের ঘরে দিয়ে আসতে। আদেশ পেয়ে শায়ের উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলো তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে। তারপর অন্দরের পা ফেললো। অনেক গুলো বছর পর এই প্রথম আফতাব ব্যতীত কোন পুরুষ অন্দরে পা ফেলেছে। কুসুম আগে আগে গিয়ে পরীর ঘর দেখিয়ে

দিলো।সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একেবারে কোণার ঘরটা পরীর। পালঙ্কের উপর পরীকে শুইয়ে দিয়ে শায়ের কক্ষ ত্যাগ করলো। কুসুম আর মালা রইলো সেখানে।

নূরনগর গ্রামের প্রতিটা মানুষ আজ পরীকে নিয়ে কথা বলতেছে। চার গ্রামের জমিদার আফতাব। ধন সম্পদ কম নেই তার। যেন এক

রাজা। আর মেয়েগুলো দেখতে রাজকন্যার থেকে কম নয়। সোনালী আর রুপালির থেকেও বেশি সুন্দর পরী। এমন সোনাবরণ মেয়ের বিয়ে হলো শেষে এক সামান্য কর্মচারীর সাথে!! এটা কেউই মানতে পারছে না। কোথায় রাজকন্যা আর কথায় প্রজা! আফতাবের এমন সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না গ্রামবাসীরা।

শায়ের ছেলে হিসেবে খারাপ না। সবাই ভালো জানে তাকে। কিন্তু তাই বলে জমিদার কন্যা বিবাহ করার যোগ্যতা ওর নেই। বড় মেয়ে তো নিজের কপাল নিজেই পুড়িয়েছে আর ছোট মেয়ের কপাল আফতাবই পোড়ালো। গোবরে পদ্মফুল মানায় না।বাইরে সবাই নানা ধরনের কথা

বললেও জমিদার বাড়ির আঙ্গিনায় আসতেই সবার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। থমথমে পরিবেশ। কারো মুখে কথা নেই। শেখর না আসায় এমনিতেই আফতাব বেশ চটে আছে। এখন কেউ ভালো কথাও আফতাবের সামনে বলতে পারছে না। সব কথাই তেঁতো লাগছে তার কাছে।

এমনকি নিজের ভাই আখির কেও অসহ্য লাগছে।

জ্ঞান ফিরেছে পরীর। চোখ মেলে আশেপাশে তাকিয়ে পরী বুঝতে পারল সে নিজের ঘরে আছে। তাহলে কি পরী এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো? পরী চট করে উঠে বসলো। ঘরে কুসুম ছাড়া আর কেউই নেই। তাই কুসুম কে

জিজ্ঞেস করল,'আমি এখানে কীভাবে এলাম কুসুম? আমি তো বৈঠকে ছিলাম। আর তখন,,,,'

পরী একটু থামলো তারপর বলল,'বিয়ে কি হয়ে গেছে?'-'কন কি আপা আপনের মনে নাই?আপনে তো কবুল কইয়া হুশ হারাইলেন।'

-'আর বিয়েটা কার সাথে হয়েছে?'

-‘আপনে দেহি সব ভুইলা গেছেন। শায়ের ভাইয়ের লগে আপনের বিয়া হইছে।’

-‘তাহলে শহরের ওই ছেলেটা কোথায়?’

কুসুম থামলো বড় করেনিঃশ্বাসফেলে বলল,’জানি না আপা। আমরা সবাই তো বরের অপেক্ষা করতাছিলাম। দেরি দেইখা শায়ের ভাই তো লোক

পাঠাইছিল। হেই লোক গুলান শহরে যাইয়া ফিইরা আইছে তাও বরযাত্রী আহে নাই। শহরে বাবুর বাড়িতে যাইয়া কেউরে পায় নাই। এখন কি হইবো? হের লাইগা বড় কর্তা শায়ের ভাইয়ের লগে আপনার বিয়া দিলো।'

-‘ওরা গেলো কোথায়? হঠাৎ করে তো কোন মানুষ উধাও হয়ে যায় না।’

-‘কি জানি? গত কাইল তো শায়ের ভাইয় সহ আরো মানুষ যাইয়া দেহা কইরা আইছে। এহন কই আছে কে জানে? তয় একখান কথা কই। শহরে পোলাডারে আমার ভালো লাগে নাই। হের লগে বিয়া হয় নাই

শোকর করেন। হেগোরে নিয়া ভাববেন না। কোথায় যাইবো? বড় কর্তা একবার ধরতে পারলে মাইরা ফেলবো। জমিদারের লগে রসিকতা!!'

পরী আর কথা বাড়ালো না। হাঁটু মুড়ে ওখানেই বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদেই মালা আর জেসমিন আসলো। মালা কুসুম কে বলল পরীর কাপড়

গুছিয়ে দিতে। পরী বলে উঠল,'কাপড় গোছাবে মানে? আমি কোথায় যাবো?'

-'শ্বশুড় বাড়ি।'পালঙ্ক থেকে নেমে পরী বলল,'কিন্ত আম্মা উনি তো আমাদের এখানেই থাকে। আমরা এখানেই থাকি?'

মালা জবাব না দিয়ে কুসুমের সাথে পরীর কাপড় গোছাতে লাগলেন।

জেসমিন এগিয়ে এসে পরীর হাত ধরে বললেন,’এখন শায়ের এই বাড়ির জামাই পরী। তার আর এখানে থাকা চলবো না। লোকে কি বলবে তখন?? তাই তোমারে নিয়া যাইবো এখনই। অনেক দূরের পথ পরী। তোমার গয়না সব খোলো আর শাড়ি বদলাও।’

পরী কিছু বলতে চাইলো কিন্তু জেসমিন বলতে দিলো না। নূরনগর থেকে সাত গ্রাম পার হয়ে নবীনগর। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে পরীকে। পথে যদি চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়ে তো গয়না গুলো লুটে নেবে। তাই জেসমিন গয়না গুলো একটা ব্যাগে ভরে মালার কাছে দিলো। মালা সেগুলো পরীর জামা

কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে দিলো। মায়ের কথামতো পরী বেনারশি খুলে সুতি শাড়ি পরলো। মালা পরীর মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে নেকাব বেঁধে দিলো। তারপর গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়ে বলে,’চাদর খুলবি না। বাইরে ঠান্ডা অনেক।’-‘আম্মা আমাকে বিদায় করার এতো তাড়া আপনার?’

মালার বুক কেঁপে উঠল। মেয়ে তার দিকে আঙুল তুলছে!! পরী কি জানে না যে ওকে বিদায় দিতে কতখানি কষ্ট হচ্ছে মালার? জানলে এই প্রশ্ন করতো না। মালা জবাব দিলো না। পরীর হাত ধরে নিচে নেমে এলেন। পরী নিচে এসেই জুম্মান কে খুঁজতে লাগলো। আজ সারাদিন সে দেখেনি ছোট ভাইটাকে। সবার মাঝে

জিজ্ঞেস করতেও পারেনি। এখন যাওয়ার সময় তো জিজ্ঞেস করতেই পারে। পরী মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই জুম্মান এসে হাজির। ভাইকে কাছে টেনে পরী বলে,'কোথায় থাকিস তুই?

আজ আমার সাথে দেখা করলি না কেন??'

-‘তোমারে দেখলে আমার কান্না পায় আপা। আমারে ছাইড়া চইলা যাবা।’ বলতে বলতে কেঁদে ওঠে জুম্মান। পরী বলে,’কাঁদিস না জুম্মান। আমি আবার আসবো। তুই আমাকে আনতে যাবি কিন্ত?’জুম্মান মাথা নাড়ে। পরী বিদায়ের সময় যেন কাঁদা ভুলে গেছে। বাড়ির বাকি সবার একই অবস্থা। বিয়ে টা

উলটপালট হওয়াতে কারো বিস্ময় এখনও কাটেনি। কিসের কান্নাকাটি?? পরী চোখের জল ফেলল রুপালির কোলের নবজাতক শিশুটিকে কোলে নিয়ে। অল্প দিন ধরে সে দুনিয়ার আলো দেখেছে। পরী চেয়েছিল নিজে লালন পালন করবে কিন্ত তা আর হলো না।

সবার থেকেই বিদায় নিলো পরী। মায়ের হাত ধরে বাইরের পা দিলো। যেই ঘর ওর নিজের ছিলো আজ সেই ঘর থেকেই বঞ্চিত হলো সে। আজকের পর থেকে নিজের বাড়িতে মেহমান হিসেবে আসতে হবে পরীকে। কথাটা ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসে পরীর।

গরুর গাড়ি দাঁড় করানো। সেখানে যেতেই হুশ ফিরল পরীর। শক্ত করে মালাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। মালার চোখের পানিও বাধ সাধলো না। মেয়েকে কিছুক্ষণ আলিঙ্গন করে গাড়িতে তুলে দিলো।

গাড়ি চলতে শুরু করল। কেউই যাচ্ছে না পরীর সাথে। শুধু শায়ের আর পরী। গাড়ির ভেতরে হারিকেন

জ্বলছে। রাত বাড়ছে বিধায় কোন মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শিয়াল,কুকুর,ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। সাথে গরুর পায়ের শব্দ।শায়ের গম্ভীর হয়ে বসে আছে। পরীর থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে। একবারও তাকায়নি পরীর দিকে। দেখে মনে হচ্ছে কিছু ভাবছে সে। পরী এতক্ষণ ধরে শায়ের কে

দেখে চলছে। এই মুহূর্তে ওর স্বামীর মাথায় কি চলছে তা জানা দরকার। কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না পরী। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলেই ফেললো,'আপনি কিছু ভাবছেন?'

এতক্ষণ পর পরীর দিকে তাকালো শায়ের। অন্যমনস্ক ছিল বিধায় পরীর

কথা তার কানে গেলো না। সে বলল,’কিছু বললেন?’

-‘বললাম আপনি কেন বিয়েতে রাজি হলেন? আমাকে দেখলেই তো দশ হাত দূরে যেতে বলতেন। এখন কেন বিয়ে করলেন?’

-‘আপনার বাবা বলেছে তাই।’

-‘আব্বা বললো আর আপনি রাজি হয়ে গেলেন?’-‘আমি তো আপনাকে

বলেছি যে আপনার বাবা আমাকে যতটুকু করতে বলেন আমি ঠিক ততটুকুই করি। আপনাকে বিয়ে করতে বলেছে তাই করেছি নাহলে করতাম না।’

শেষ কথায় অপমানিত বোধ করল পরী। কুসুমের মুখে শুনেছে কতো ছেলেরা নাকি পরীর জন্য পাগল অথচ এই ছেলেটাকে দেখো? পরী

রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। সে আর কোন কথা বলল না।

দুহাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে পরী। এতো রাত অবধি জেগে থাকা সম্ভব নাকি? আরো কতদূর কে জানে? শায়ের জেগে আছে। পরীর দিকে তাকিয়ে রইল এবার। এখনও মুখটা দেখা হলো না। নেকাবের আড়ালের সৌন্দর্য

নিয়ে ভাবছে শায়ের। কেমন দেখতে মেয়েটি? লোকজনের মুখে বলা চেহারার থেকে বাস্তব চেহারা কি বেশি মাধুর্যময়? একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে শায়ের। মধ্যরাতে গাড়ি থামলো নবীনগর। বাকি পথটুকু হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। তবে সমস্যা হলো পরী। সে এখনও ঘুমাচ্ছে। এবার কীভাবে

ডাকবে শায়ের? সেই চিন্তায় ঘামছে শায়ের। অস্বস্তিকর লাগছে ওর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে উপায় খুঁজতে লাগল। কিন্ত কপাল খারাপ যে কোন উপায়ন্তর না দেখে শায়ের নিজেই ডাকলো পরীকে,’শুনছেন!! এইবার উঠতে হবে।’

চোখ মেলে তাকালো পরী। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল,’কি

হয়েছে??’-‘আমরা পৌঁছে গেছি। নামতে হবে।’

পরী নামলো গাড়ি থেকে। শায়ের ব্যাগ হাতে নিয়ে হাটা ধরলো। পরীর ঘুমভাব কমেনি। ঢুলছে আর হাটছে। শায়ের তা খেয়াল করে বলে,’এভাবে হাটলে পড়ে যাবেন তো। হাত ধরে হাটবেন?’

থমকে দাঁড়িয়ে পরী বলে,’আমি পারবো। আপনার হাত ধরতে যাব কেন??’

-‘বাকি জীবন তো আমার হাত ধরেই কাটাতে হবে।’

-‘তাহলে আজকে নাহয় বাদই দিলাম। বাকি জীবন আপনার হাত ধরবো।’শায়ের আর কথা বলল না। পরীও হাত ধরল না। কিছুক্ষণ হেঁটে

ওরা একটা বাড়িতে পৌঁছালো। অন্ধকারে ঠিক বুঝলো না পরী কিছু। বাড়িটা কেমন দেখতে তাও আন্দাজ করতে পারলো না। তবে উঠোনে দাঁড়িয়ে এটা বুঝলো যে এখানে বেশ কয়েক টা ঘর আছে। শায়েরের পিছু পিছু পরী একটা ছোট ঘরের সামনে গেলো। দরজায় কয়েকবার টোকা দিলো শায়ের। ভেতর থেকে

আওয়াজ এলো,’কেডা রে?? এতো রাইতে দরজা গুতায় কেডা?’

শায়ের জবাব দিলো,’ফুপু আমি সেহরান।’

একটু পরে একজন পঞ্চাশের বেশি বয়স্ক মহিলা হারিকেন হাতে দরজা খুলল। শায়ের কে দেখে সে খুশি হয়ে বলে,’এতো রাইতে কই থাইকা আইলি?’-‘ফুপু,,’ বলতে বলতে

শায়ের ঘাড় ঘুরিয়ে পরীর দিকে তাকালো। মহিলাটি হারিকেন উঁচিয়ে পরীকে দেখে বলে,’এই ছুরিডা কেডা?’

পরী অবাক হলো মহিলার কথা শুনে। কিন্ত পর মুহূর্তেই থমকে গেল। কারণ শায়ের জবাব দিয়েছে,’আমার বউ।’‘বউ’ দুই অক্ষরের শব্দটি সম্পূর্ণ নতুন পরী

আর শায়েরের কাছে। পরী আজ কারো বউ। তাকে কেউ বউ বলে পরিচয় দিচ্ছে। শীতল স্রোত বইছে যেন শরীরে। পরী শায়েরের থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো। মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছে অবাক হচ্ছে। মধ্যরাতে কেউ যদি এসে বলে আমি বিয়ে করেছি। তাহলে তো অবাক হওয়ার কথা। মহিলাটি দরজা ছেড়ে

বের হয়ে এসে পরীর সামনে দাঁড়াল। হারিকেন মুখের ওপর ধরে দেখার চেষ্টা করলো। তারপর বলল,’বউ!!

হ্যারে সেহরান তুই মজা করস নাকি?’-‘এতো রাতে কেউ মজা করে? আমার ঘরের চাবি দাও?’

-‘এতো রাইতে বউ পাইলি কই? কার বউ লইয়া আইছোস?’

-'মাঝরাতে ঘুম ভাঙছে তো তাই উল্টাপাল্টা বকছো। চাবি দাও আমি আমার বউ নিয়া ঘরে যাই।'

শায়েরের মুখে বারবার বউ শুনতে লজ্জাবোধ করছে পরী। তবে এখন তার কিছু বলা বা করার নেই। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ফুপু আবার বলে উঠল, 'আরে থাম। বউ

কি এমনেই ঘরে যাইবো নাকি? নিয়ম আছে না?’

-‘রাত দুপুরে আবার কিসের নিয়ম ফুপু? এখন সবাই ঘুমাচ্ছে। কাল সকালে যা করার করো।’

ফুপু শুনলো না। দৌড়ে উঠোনে চলে গেল। হাঁক ছেড়ে ডাকতে লাগল সবাইকে। পরী ভড়কে গেল মহিলার কান্ডে। সে চিৎকার করতে করতে

বলল, ‘ওরে কেডা কোথায় আছোস রে হগ্গোলে বাইর হ। সেহরান বউ লইয়া আইছে। ওরে হেরোনা,আকবর, আবুল,বাবু রে,,,’কানে হাত চেপে ধরে পরী। এই মহিলার গলার আওয়াজে কান দুটোই না নষ্ট হয়ে যায়। এ কোথায় এসে পড়লো ও? বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরী। ওদিকে ফুপু

ডেকেই চলছে। ঝনাৎ ঝনাৎ করে দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। তিনজন দম্পতি বের হয়ে এলো আলো হাতে নিয়ে। হাই তুলতে তুলতে হেরোনা নামের মহিলাটি এসে বলে, ‘আরে খুসিনা আপা। এতো রাইতে চিল্লাও ক্যান?? ডাকাত পড়ছে নাকি?’

-‘হুদা কামে কি চিল্লাই? দ্যাখ সেহরান বউ লইয়া আইছে।’

হেরোনা চমকে ওঠে খুসিনার কথায়। শায়ের বিয়ে করেছে!! তবে তিনি এতে বেশ খুশি হলেন। ভাসুরের ছেলেকে এমনিতেই তিনি অপছন্দ করেন। বাবা মা মারা যাওয়ার পর সবাই শায়েরকে এড়িয়ে চলে। হেরোনা তো দেখতেই

পারে না। তার উপর হেরোনার বড় মেয়ে চম্পা শায়ের বলতে পাগল। শায়ের এই বাড়িতে আসতোই না। বছরে দু'তিনবার আসে। তাও খুসিনা ফুপুর কাছে। হেরোনা চিন্তায় ছিলো কিভাবে শায়েরের থেকে মেয়েকে সরাবে। এখন দেখছে মেঘ না চাইতে জল। সে উঁকি দিতে দিতে এগিয়ে গেল পরীর দিকে। মুখ

ভেংচে বলে,'কই দেখি দেখি? এতিম পোলারে মাইয়া দিলো কেডা?'

শায়ের চুপ করে রইল। এটা নতুন কিছু না। সহ্য হয়ে গেছে এসব। ছোট থেকেই শুনে আসছে সে। খুসিনা ধমক দিয়ে বলে,'চুপ থাক। আগে ওগোরে ঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা কর। থালায় কইরা কাঁদামাটি লইয়া আয়। বউ ঘরে তুলতে হবে

তো।’হেরোনা মুখ ঘুরিয়ে মেজ জা রিনাকে বলে,’তুই যা। আমি চৌকি নিয়া আহি।’

পরী সব কথাই শুনছে। এদের ব্যবহার ওর ভালো লাগছে না। এভাবে কষ্ট দিয়ে কথা বলার কি আছে?রাগ হচ্ছে হেরোনার উপর। রিনা একটা থালাতে করে ভেজা কাদা নিয়ে এসে উঠোনে রাখে।

হেরোনা দুটো চৌকি এনে রাখলো তার সামনে। খুসিনা শায়ের কে উদ্দেশ্য করে বলে,’এই ছ্যামড়া বউ লইয়া এইহানে খাড়া আয়।’

শায়ের বুঝতে পারলো এরা তাকে ছাড়বে না। তাই সে পরীর কাছে গিয়ে বলে,’চলুন,নাহলে এরা শান্ত হবে না।’

-‘কি বউর লগে গুজুর গুজুর করস? হাত ধইরা আন।’

শায়ের হাত ধরল পরীর। তারপর এসে দুজন দুই চৌকির উপর দাঁড়ালো। খুসিনা একটা বাটিতে করে খানিকটা খেজুরের গুড় এনে বলল,’ও নতুন বউ মুখ খোল দেহি? মিডা খাও,তাইলে মিডা মিডা কথা কইবা।’

পরী নেকাব খুলল না। সামনে তিনজন অচেনা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরী শায়েরের দিকে তাকাতেই সে বলল,'আমি ছাড়া আমার বউয়ের মুখ কোন পুরুষের দেখা নিষিদ্ধ ফুপু।'-'অ্যাহ,মনে হয় আসমানের পরী ধইরা আনছে। যে অন্য কেউ দেখলে লইয়া যাইবো।'

কথাটা বলেই খিলখিল করে হাসতেই লাগল হেরোনা। সাথে রিনাও যুক্ত হলো। শায়ের মুচকি হেসে বলল, ‘আসমানের পরী কি না জানি না। তবে সে এখন আমার ঘরের পরী বুঝলেন?’

হাসি বন্ধ করলেন ওনারা। খুসিনা বললেন,’তোরা ঘরে যা আমি বউ নিয়া পরে যামু।’

হেরোনা চলে গেলেও রয়ে গেল রিনা। আকবর,আবুল, বাবু নিজ ঘরে চলে গেল। খুসিনা গুড় খাওয়ালো না। পরীকে বলে,’ও বউ এই কাদায় পা দেও দেখি।’পরী তাই করলো কাদাতে পা ডুবিয়ে দিলো। রিনা পা ধুয়ে দিলো। তারপর শায়ের কে ওর ঘরের চাবি দিলো খুসিনা। পরীকে সাথে নিয়ে পাশের ঘরে গেল

শায়ের। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে ওরা। খুসিনা এসে হারিকেন দিয়ে গেল। আলোতে পরী স্পষ্ট দেখতে পেলো ঘরের ভেতরটা। ঘরের এক পাশে একটা পালঙ্ক। তবে বেশি বড় নয়,দুটো জলচৌকি আর একটা ছোট আলমারি। ঘরের বেশির ভাগ জায়গা খালি। ঘরটা যে সম্পূর্ণ টিনের তাও

বুজলো পরী। শায়ের একপাশে ব্যাগ রেখে বাইরে চলে গেলো।

পরী আবার পুরো ঘরে চোখ বুলায়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হবেই বা না কেন? খুসিনা কয়েক দিন পর পর ঘর পরিষ্কার করে। অপরিষ্কার জায়গা শায়ের একদম পছন্দ করে না।

নেকাব টা এবার পরী খুলল। মাথার ওড়না খুলতেই পিঠ ছড়িয়ে গেল ঘন চুলগুলো। পরনের শাড়িটা ঠিক করতে করতে খেয়াল করলো সে বেলি ফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছে। তীব্র সে ঘ্রাণ অনুসরণ করে পরী জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জানালার পাশে একটা বেলি ফুল গাছ লাগানো তাতে অনেক ফুল ধরেছে। জানালার

গ্রীল ধরে পরী সুবাস নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।কম্বল আর বালিশ নিয়ে ঘরে ঢুকলো শায়ের। পরীর দিকে প্রথমে চোখ গেলো তার। পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরী। শায়ের কথা না বলে পালঙ্কের উপর বালিশ আর কম্বল রাখলো।

-'আল্লাহ!!!ওইহানে কি করো নতুন বউ?'

পরী চমকে পেছন ফিরে তাকালো খুসিনার দিকে। শায়ের নিজেও তার ফুপুর দিকে তাকালো। কিন্ত খুসিনার মুখ থেকে টু শব্দটিও আর বের হলো না। সে একধ্যানে পরীর দিকে তাকিয়ে আছে। ফুপুর ভাবান্তর না দেখে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও তাকালো পরীর দিকে। জোরে

বলতে না পারলেও বিড়বিড় করে সে বলে উঠল,মাশাল্লাহ।’

খুসিনা ভাবলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখতেছে। তার শায়েরের জন্য এত সুন্দর মেয়ে আল্লাহ রেখেছেন এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। পরীর দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। থুতনিতে হাত রেখে বললেন,’আমার সেহরান এতো

সুন্দর বউ আনছে!! চান্দের লাহান চেহারা। ও সেহরান তোর ভাগ্য যে ভালা তা এতো দিন বুঝি নাই রে। স্বামী নিয়া সুখি হও মা। আমার সেহরান বড় ভালা গো নতুন বউ।'পরী শায়েরের দিকে তাকালো। সে এখনও চোখের পলক ফেলতে পারেনি। মনে হচ্ছে চোখের পলক ফেলতে গেলে পরী উধাও হয়ে

যাবে। শায়ের কে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেন আড়ষ্ঠ হলো পরী। মাথা নিচু করে ফেললো তখনি। খুসিনা বলল, ‘হলদির ঘ্রাণ এহনো গায়ে আছে তো। এই রাইত বিরাইতে জানালার ধারে কি করো? তেনারা আশেপাশে আছে গো। রাইতের বেলা বুঝি বাইরে যাও!!’

খুসিনা বিদায় নিয়ে ঘরে চলে গেল। শায়ের জানালা বন্ধ করে দিলো। এখন ও কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। উসখুস লাখছে। নতুন বিয়ে করলে কি সবাই এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে? আগে তো পরীর সাথে কথা বলতে এরকম হতো না। আজ বউ বলে কি এরকম হচ্ছে??কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ

মেলল সে। পরী পালঙ্কের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। শায়ের বলল,'আপনার বাবার মতো ঐশ্বর্য নেই আমার। জানি না আপনাকে ঠিক কতটা ভাল রাখতে পারবো!! তবে আপনাকে ভালো রাখার সব রকমের চেষ্টা আমি করব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।'

পালঙ্কের উপর উঠে বসে পরী। কম্বল টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্ত শায়ের জলচৌকিতে বসে রইল। পরী ভাবলো বাকি রাত টুকু কি শায়ের ওভাবে কাটাবে নাকি? শীত অনেক,কষ্ট হবে তো। কিন্ত একথা মুখ ফুটে পরী বলতে পারে না। আজ লজ্জায় মুখের কথা আটকে আসছে বারবার।সকালে

বেশ দেরি করেই ঘুম ভাঙে পরীর। আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই পাশে তাকালো। শায়ের নেই। জলচৌকি ফাঁকা। কখন ঘুম থেকে উঠলো সে? পালঙ্ক থেকে নেমে বাইরে আসতে যেয়েও থেমে গেল পরী। না জানি বাইরে কতজন পুরুষ আছে? পরীর আর যাওয়া হলো না। তাই চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর একদল

মহিলা এলো ঘরের মধ্যে। পরীর চট করে দাঁড়াল ওনাদের দেখে। মহিলা গুলো পরীকে দেখে হা করে তাকিয়ে আছে। একজন বললেন,’আমাগো সেহরানের কপাল গো!! মেলা সুন্দর বউ পাইছে। সেহরান রে ধইরা আন তো দেহি পাশে খাঁড়াইলে কেমন দেহায়?’

-‘হেয় তো কামে ব্যস্ত গো। বউ লুকাইতে বেড়া দিতাছে। কলপাড় বেড়া দিছে আর অখন নিজের ঘরের পাশে বেড়া দিতাছে। সুন্দরী বউ বইলা কথা।’

দুজন মহিলা হাসতে হাসতে বের হয়ে গেল। একটু পর তারা শায়ের কে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে এলো। ধাক্কা দিয়ে পরীর দিকে পাঠিয়ে

দিলো। শায়ের কোন রকমে পরীর গায়ে পড়া থেকে বেঁচে গেলো। নিজেকে সামলিয়ে সে পরীর পাশে দাঁড়িয়ে বলল,'তোমরা এখন যাও তো!! অনেক হয়েছে এবার যাও।'

হাসির তোড় যেন বাড়লো সবার। একজন বললেন, 'বুঝছি তো বউ লইয়া এহন একলা থাকতে চাও। তা ভালা কইরা কইলেই

পারো।’একজন ধাক্কা দিলো পরীকে। পরী গিয়ে পড়লো শায়েরের উপর। পরবর্তী ধাক্কা দেওয়ার আগেই শায়ের একহাতে পরীকে জড়িয়ে ধরে ঘুরিয়ে এনে বলে,’তোমরা যাবে?এতো রসিকতা আমার বউ পছন্দ করে না। যাও তো?’

হাসি তামাশা করতে করতে সবাই চলে গেল। শায়ের এখনও পরীকে

আগের মতোই ধরে রেখেছে। খেয়াল হতেই শায়ের সরে দাঁড়িয়ে বলল,’ক্ষমা করবেন আপনাকে বাঁচাতে আপনাকে ছুঁতে হয়েছে। আর কখনোই তা হবে না। আসলে ওনারা মজা করছিলেন। কিছু মনে করবেন না।’

পরী ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। শায়ের পরীকে নিয়ে কলপাড়ের

দিকে গেলো। পরী দিনের আলোতে চারিদিক চোখ বুলাতে লাগলো। শায়ের তার ছোট্ট ঘরের চারপাশে টিনের বেড়া দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। এতকাজ সে করলো কখন? নিশ্চয়ই অনেক ভোরে উঠেছে ঘুম থেকে। তখনই ওর মনে পড়ল কাল তো শেষ প্রহরে ঘুমিয়েছে সে। তাহলে শায়ের

নিশ্চয়ই জেগে ছিলো। এসব ভাবতে ভাবতে কলপাড়ে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলো। বাইরে আসতেই সে দেখলো শায়ের গামছা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পরী আসতেই শায়ের গামছা এগিয়ে দিলো। পরীও নিয়ে মুখমন্ডল মুছে নিলো। তখনই দুটো মেয়ের আগমন ঘটে সেখানে।

চম্পা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে,’সেহরান ভাই আপনে নাকি বিয়া করছেন?’-‘হুম করেছি।’

চম্পা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তার চোখ গেল পরীর উপর। পরীও চম্পার চোখে চোখ রাখে। মেয়েটাকে বেশ শৌখিন মনে হলো পরীর। চুলগুলো বেণুণি করা,চোখে গাঢ় কাজল দেওয়া আর

ঠোঁটে লিপস্টিক। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি সাজগোজ করা পছন্দ করে। কিন্তু হঠাৎই মেয়েটার চোখের দুটো ছলছল করে উঠল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছনের মেয়েটি এগিয়ে এসে বলে,'সেহরান ভাই, কত্ত সুন্দর নতুন ভাবি!! আসমানের চান্দের মতন। তা কেমন আছো ভাই? মেলা দিন পরে আইলা।'

-‘ভালো তুই কেমন আছিস?’

-‘খুব ভালা আছি আমি।’

চম্পা দৌড়ে চলে গেছে। তা দেখে চামেলি হেসে বলল,’আপায় কষ্ট পাইছে ভাই। তোমার লাইগা কতো রুমাল সেলাই করছে আর তুমি বিয়া কইরা আনলা?’চামেলি হাসতে লাগল। পরী অবাক হয়ে গেল।

মেয়েটা কষ্টের কথা বলছে আবার হাসছে! আজব!

শায়ের চামেলি ঘরে যেতে বলে নিজেও পরীকে নিয়ে ঘরে এলো। পরীর সামনে কি সব বলছিল। পরী এখন কি ভাববে? বড্ড সহজ সরল চামেলি। সব কথাতেই হাসবে। সুখ দুঃখ সব কিছুতেই ওর হাসি থামে না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। পরী এতক্ষণ ঘরের বাইরের ছোট্ট উঠোনে বসে ছিল। এমনি এমনি নয়। খুসিনা ফুপু একগাদা মহিলাদের সঙ্গে পরীকে সাক্ষাৎ করাচ্ছে। বিরক্ত হলেও চুপ থাকতে হচ্ছে পরীর। ইচ্ছা করছে ছুটে ঘরে চলে যেতে কিন্তু পারছে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বিধায় খুসিনা

পরীকে ঘরে যেতে বলল। ঘরে আসতেই পরী দেখলো শায়ের ঘুমাচ্ছে। কাল রাতে একটুও ঘুমাতে পারেনি সে তাই সেই দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছে এখনও ওঠার নামগন্ধ নেই। পরী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। একটাই ঘর তাই অন্য কোথাও যেতে পারছে না। তাই জলচৌকির উপর বসে রইল।রাতের খাবার

খুসিনা ফুপু ওদের ঘরে এনে খাওয়ালো। তারপর তিনি চলে গেলেন। খাওয়ার পর পরীর শীত যেন তরতর করে বাড়লো। টিনের ঘরের ফাঁক দিয়ে নিশি এসে ঢুকছে। পরী তাড়াতাড়ি কম্বল গায়ে জড়াতেই চোখ পড়ল শায়েরের দিকে। সে কালকের মতোই বসে আছে। পরী ভাবলো আজকেও

এভাবে বসে থাকবে নাকি? এই শীতে এভাবে বসে থাকাটা ঠিক বলে মনে হলো না পরীর। তাই সে বলে,'আজকেও কি এভাবে বসে থাকবেন নাকি?'

শায়ের বোধহয় অন্যকিছু ভাবছিল। তাই সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে,'হু,,,।'

-‘বলছি ঘুমাবেন না? সারারাত ওভাবে বসে থাকার চিন্তা করছেন নাকি?’

শায়ের বেখেয়ালি ভাবে বলে,’ঘুমাবো!!কোথায়? ‘

-‘আপনার মাথায় কি সমস্যা আছে নাকি? আপনি না সাহসী পুরুষ। তাহলে বউয়ের পাশে ঘুমাতে ভয় পাচ্ছেন কেন?’

-‘আমি ভয় পাবো কেন? ঘুমাতে কি কেউ ভয় পায়?’

-‘দেখতেই তো পাচ্ছি ভয়ে কাঁপছেন।’

-‘ভয়ে না শীতে কাঁপছি।’বলতে বলতে শায়ের ওপর পাশ দিয়ে পালঙ্কে উঠে বসে। পরী মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর। ঘুমে মগ্ন পরী। শীতের মধ্যে কম্বলের উষ্ণতা বেশ লাগে পরীর। কিন্ত হঠাৎই ওর ঘুম যেন হাল্কা হয়ে এলো। পরী অনুভব করছে কেউ ওর গায়ে হাত বিচরণ করছে। কিন্ত ও ঘুরতে পারছে না। শরীর এতো ভারী হয়ে গেছে যে সে নড়তেই পারছে না। হাতটা যেন পরীর শাড়ির আঁচল টেনে ধরছে।

আঁচলটা জোরে টান দিতেই পরী যেন শক্তি ফিরে পেলো। উঠে বসলো শয্যা ছেড়ে। এই শীতের মধ্য দিয়েও পরী ঘামতে লাগল। শাড়ির আঁচল টেনে ঘাম মুছলো পরী। গলার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাশে ফিরে তাকালো পরী। হারিকেন এখনও জ্বলে বিধায় শায়েরের ঘুমন্ত চেহারার স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছে সে। তার মানে এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল? কি ভয়ানক স্বপ্ন? পরী দ্রুত কম্বল ফেলে নেমে পড়ল। জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নিলো। এরপর কি আর ঘুমাতে পারবে সে??একবার ভাবলো জানালা খুলে বেলি ফুলের ঘ্রাণ নিবে। কিন্ত ফুপুর কথা মনে পড়তেই আর জানালা

খোলা হলো না। এখন ওর পালঙ্কের দিকে এগোতেই ভয় লাগছে।

পরী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সুধালো,পরী তুই তো সাহসি। রুপালির বাড়ি থেকেই আসার সময় তো কতগুলোকে একসঙ্গে পিটিয়েছে। এই সামান্য বিষয়ে ভয়ের কি আছে? কিন্ত স্বপ্ন টা ভাবাচ্ছে

পরীকে।-‘আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন?’

সম্বিৎ ফিরে এলো পরীর। তাকিয়ে দেখলো শায়ের জেগে গেছে। উঠে বসে পরীর দিকে তাকিয়ে আছে। পরী কম্পিত কণ্ঠে বলে,’পানি খেতে এসেছিলাম।’

কথাটা বলে পরী ধীর পায়ে এসে পালঙ্কে বসে। শায়ের বলে,’আপনি

মনে হয় কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন তাই না?’

-‘হুম খুবই খারাপ স্বপ্ন।’

-‘আচ্ছা এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।’

-‘নাহ।’ আতকে ওঠে পরী।

-‘কেন?’

-‘না মানে যদি স্বপ্ন টা আবার দেখি?’

হাসলো শায়ের,পরী কৌতুহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

-'তাহলে কি সারারাত জেগে থাকবেন নাকি?সকালে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে পারবেন না। কালকে আপনাকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাবো।'মনটা ভালো হয়ে গেল পরীর। খুশিতে মনটা নেচে

উঠলো। সে হেসে জিজ্ঞেস করে,’সত্যি!!’

-‘হ্যা সত্যি। এবার তো ঘুমান?’

পরী শুয়ে পড়ল। কিন্ত ঘুম আসছে না। পরীকে এপাশ ওপাশ করেতে দেখে শায়ের বুঝলো পরী ঘুমায়নি। বাড়িতে যাওয়ার খুশিতে নাকি স্বপ্নের ভয়ে? শায়ের বলল,’ছোটবেলায় আমি যখন

ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম তখন মায়ের হাত ধরে ঘুমাতাম। আর কোন খারাপ স্বপ্ন দেখতাম না।'

-'আমিও কি তাই করব এখন?'

-'করতে পারেন।'

-'তাহলে আপনার হাত দিন?'

-'হুম দেওয়া যায় আশেপাশে হারিকেন নেই এখন।'

অতীত মনে পড়তেই হেসে উঠল পরী। ইশ খুব বাজে ভাবে পুড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা। আর এখন সেই হাতটাই সারা জীবনের জন্য ধরতে হচ্ছে। পরী আলতো করে শায়েরের হাতটা ধরে তারপর চোখ বন্ধ করে নেয়। শায়ের আনমনে বলে উঠল,'আপনার হাসি সুন্দর।'চোখ

বন্ধ থাকা অবস্থাতেই পরী বলে,’শুধুই সুন্দর?’

-‘ভিশন সুন্দর আপনার হাসি। আপনার থেকেও আপনার হাসি বেশি সুন্দর।’

পরী এবার জবাব দিল না। সে চুপচাপ শুয়ে রইল। শায়ের একটু চুপ থেকে আবার বলল,’বাড়াবাড়ি রকমের সৌন্দর্যের চোখ ঝলসানো

মায়া থাকে। ঝলসে যাবে চোখ,হৃদয় পুড়বে তাও সে মাধুর্য থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। যে আগুন সব জ্বালিয়ে দেয় সে আগুন কে ক'জন ভালোবাসতে পারে বলুন?'

পরী এবার শায়েরের হাত ছেড়ে অন্যদিক ফিরে শুয়ে রইল। সে বুঝতে পারছে পাশে থাকা মানুষটির মনের কথা। প্রথম দেখাতেই যে সে

পরীতে বেঁধে গেছে। সে পরীর সান্নিধ্য চায় এটাও পরী বুঝেছে। পরীর অনুমতি ব্যতীত শায়ের তাকে স্পর্শ করবে না এটাও ওর জানা। তবুও কিসের এতো দ্বন্দ্ব? কেন পরী শায়েরকে কিছু বলতে পারে না? শায়েরের প্রতি ওর যেন অদৃশ্য টান উপস্থাপনা করেছেন সৃষ্টিকর্তা। সেজন্য পরীর নিজেরও ইচ্ছা করে

দুদণ্ড শায়েরের সাথে বসে কথা বলতে। কিন্ত কোন এক আড়ষ্ঠতা জেঁকে ধরে ওকে।পাখি ডাকা ভোরে ঘুম ভাঙে পরীর। গায়ের কম্বল ফেলে উঠে বসে সে। শায়ের এখনও ঘুমাচ্ছে। পরী পাশ ফিরে তাকালো। এবং কিছুক্ষণ ধরে সে তাকিয়েই রইল। প্রশ্ন জাগছে ওর মনে। এতক্ষণ ধরে দেখছে কেন সে মানুষ

টাকে? মনে ধরেছে নাকি? পরী কোথায় যেন শুনেছে ভালোবাসলে সে যেমনই হোক না কেন তাকে দেখতে অসম্ভব ভাল লাগে। চোখ জুড়িয়ে দেখার আনন্দ অনেক। সেরকমই ভালো লাগছে পরীর। উঠতে গিয়ে পরী খেয়াল করে ওর আঁচল শায়েরের পিঠের নিচ পর্যন্ত। আস্তে করে পরী টান দিলো আঁচলটা

কিন্তু পারে না। আরেকটু জোরে টান দিতেই শায়ের চোখ মেলে তাকালো। ঘুম জড়ানো গলায় বলল,’কোন সমস্যা?’পরক্ষণে সে নিজেই বুঝে গেল। পরীকে সাহায্য করলো সে। পরী উঠে চলে গেল। বাইরে এখন সে যেতে পারবে। তাই পরী কলপাড়ে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলো। আসার পথে খুসিনা ফুপু

এসে হাজির। তিনি বললেন,’নতুন বউ তুমি উইঠ্যা পড়ছো। যাও গোসল কইরা একখান ভালা কাপড় পইড়া আহো দেহি। আমার রান্ধায় সাহায্য করো।’

মাথা নাড়লো পরী। ঘরে গিয়ে একটা কমলা রঙের শাড়ি নিয়ে কলপাড়ে গিয়ে গোসল করে নিলো। তারপর রান্নাঘরে খুসিনার কাছে

গেলো। খুসিনা রুটি বানাচ্ছে পরী একটা পিঁড়িতে বসলো। খুসিনা বটি দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ কাটতে দিলো পরীকে।

এটা সে পারে। তাই সে পেঁয়াজ কাটছে। এমন সময় চামেলি এলো সেখানে বলল,'নতুন ভাবি কি করো?'

পরী তাকালো চামেলির দিকে। মুচকি হেসে বলে, ‘কাজ করি। তুমি আমাদের সাথে নাস্তা করে যেও?’

-‘আইচ্ছা।’ হাসলো চামেলি। খুসিনা পরীকে জিজ্ঞেস করে,’কি কি রান্ধা পারো নতুন বউ?’

-‘আমি কিছুই রান্না করতে পারি না ফুপু।’খুসিনা যেন আকাশ থেকে

পড়লো। বলল,’কও কি? এতো বড় মাইয়া রান্ধা পারো না?’

-‘আম্মা আমাকে রান্না ঘরে যেতে দেয় না। কাজের লোক আর আম্মাই সব করে।’

চামেলি অবাক হয়ে বলে,’তোমাগো বাড়িতে কামের মানুষ আছে নতুন ভাবি? তোমার বাপের অনেক টাকা বুঝি?’

পরী আবারো হাসলো। তারপর বলল,’আমার আব্বা চার গ্রামের জমিদার। আমি জমিদার কন্যা।’

রুটি ছ্যাকা বন্ধ করে দিলো খুসিনা। শায়ের জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে শুনে বেশ অবাক তিনি। হেরোনাকে কতবার বলেছে যেন চম্পার সাথে শায়েরের বিয়ে দেয়। হেরোনা অনেক কথা শুনিয়েছিল

তাকে। এখন খুসিনাও কথা শোনাবে। ভেবেই তিনি মনে মনে খুশি হলেন বললেন, ‘রান্ধা শিখবা আমার থাইকা। এহন বিয়া হইছে আর ক’দিন পর পোলাপান হইবো। নিজের সংসার নিজেরেই তো দেখতে হইব।’ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো পরী। এখনই বাচ্চার কথা

বলছে এই মহিলা। না জানি পরে আর কি কি বলবে কে জানে?

ঘরে পাটি বিছিয়ে খেতে বসেছে শায়ের আর চামেলি। পরী খাবার বেড়ে দিচ্ছে। খুসিনার কথাতেই সে খাবার বেড়ে দিচ্ছে। এই প্রথম সে এ খাবার বাড়ছে একজন স্ত্রী হিসেবে। চামেলি আর শায়ের খেতে

বসেছে। সে পরীকে বলে,’আপনি খাবেন না?’

-‘আমি পরে খাবো ফুপুর সাথে। আপনারা খেয়ে নিন।’

শায়ের খাচ্ছে। চামেলি বলল,’ভাই তোমরা আইজ নতুন ভাবিগো বাড়িতে যাবা?’

শায়ের খেতে খেতে জবাব দিল,’হুম কিন্ত তোকে নিতে পারবো না।’

মুখটা কালো করে ফেলে চামেলি। সে তো যাবে বলেই কথাটা বলল। কিন্তু শায়ের আগেই বুঝে গেছে। পরী বলে,'যাক না ও আমাদের সাথে।'-'ও গেলে আপনাকে কথায় কথায় লজ্জিত হতে হবে। আগে ভাল করে কথা শিখুক তার পর নাহয় নিবো।'

চামেলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে,’কে কইছে আমি কথা পারি না। এই তো কথা বলতাছি। আমি খালি সুন্দর করে কথা কইতে পারি না। তাতে কি হইছে। আমারে কি নেওয়া যায় না? সবাই কি সব পারে?নতুন ভাবিও তো রান্ধা পারে না তাইলে হ্যারে নিবা ক্যান।’

চামেলির বোকা বোকা কথায় জবাব দিলো না শায়ের। এই মেয়েটা এরকমই। কথা না বুঝে বলে ফেলে। পরী বলে,'ঠিক আছে। তোমাকে আরেকদিন নাহয় নিয়ে যাবো।'

-'নতুন ভাবি তুমি ভাইরে কও না? কিছু না পারলে কি বিয়াও হয় না? তুমি তো রান্ধা পারো না। তোমারও

তো বিয়া হইছে। ফুপু তো কইলো আর কয়দিন পর তোমাগো পোলাপান হইবো। তাইলে তো আমারও,,,’

কথা শেষ করতে পারলো না চামেলি। শায়েরের কাশির শব্দে সে থেমে গেল। পরী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। শায়ের কে পানি দিতেও ভুলে গেছে সে। চামেলির কথায়

শায়ের পরী দুজনেই হতভম্ব। চামেলি বলে,’নতুন ভাবি পানি দাও ভাইরে।’পরী তাড়াতাড়ি পানি দিলো শায়ের কে। পানি খেয়ে শায়ের রাগি দৃষ্টিতে তাকালো চামেলির দিকে।

বলল,’এতো কথা তোকে কে বলতে বলেছে? একটু চুপ থাকতে পারিস না তুই?’

খাওয়া শেষ না করে শায়ের চলে গেল। পরীর দিকে তাকানোর সাহস আর হলো না ওর।

বোরখা পরে তৈরি পরী। বাড়ি যাওয়ার আনন্দ ওর। তাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছে। চামেলিকে ফেলে যাওয়া সম্ভব হলো না। সে কেঁদে অস্থির। হেরোনা মানা করলো না মেয়েকে। কেননা চামেলির কাছ

থেকে শুনবে শায়েরের শ্বশুর বাড়ি কেমন? গাড়ি ভাড়া করেছে শায়ের। তাতে করে তিনজন রওনা হলো। নূরনগর পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেলো। নিজ বাড়িতে এসে ছুট লাগালো পরী। সবার আগে গেলো মালার কাছে। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে,'কেমন আছেন

আম্মা?’-‘ভালো!!তুই কেমন আছোস?’

-‘আপনাদের ছাড়া আমি ভালো নাই আম্মা। অনেক মনে পড়ে সবাইকে।’

মালা পরীর গালে হাত রেখে বলে,’সবকিছু যেদিন আপন কইরা নিবি সেদিন দেখবি ওই বাড়িই তোর সব।’

জুম্মান দৌড়ে এলো পরীর কাছে। পরীকে দেখে সে খুব খুশি। পরী জুম্মান কে নিয়ে গেল রুপালির কাছে। বাবুকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলো। ওখানে বসেই হাসিতে মেতে উঠলো। কুসুম দৌড়ে এসে বলে,’পরী আপা আপনে এইহানে! বড় আম্মা ডাকতাছে।’মায়ের কাছে যেতেই একগাদা বকুনি খেতে হলো

পরীকে। শায়ের কে কেন এখনও বৈঠকে একা ফেলে এসেছে সেজন্য। কোন জ্ঞান বুদ্ধি কি ওর নেই নাকি? যথেষ্ট বড় হয়েছে সে। তবুও এমন ভুল করে কিভাবে? পরী মাথা নিচু করে সব শুনলো। মালা নিজের কথা শেষ করে পরীকে নিজের ঘরে পাঠালেন। মন খারাপ করে ঘরে গেল পরী। শায়ের কে খেয়াল

করলো না। পরীকে এভাবে আসতে দেখে

শায়ের বুঝলো না যে কি হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করে, ‘বাড়িতে আসলেন মন ভালো করার জন্য। আর এসে মন খারাপ করেন বসে রইলেন কেন?’

-‘আমার মন ভালো করানোর কেউ নেই। তাহলে মন ভালো হবে কীভাবে?’

-‘আপনি বুঝলেন কীভাবে যে কেউ নেই?’

-‘আমি বুঝি সব। আমি কি ছোট নাকি?’

-‘ওহ,আপনি তো যথেষ্ট বড়। বিয়েও হয়ে গেছে। কিন্তু,’জুম্মান তখনই

এসে বলে ওদের খেতে ডাকছে মালা। তাই আর কথা হলো না ওদের। নিচে নেমে গেলো।

খাওয়া শেষে মালা শায়ের কে ডাকলেন। তিনি বললেন,'আমি জানি না বাবা তুমি কেমন? যতটুকু দেখছি জানছি খারাপ জানি নাই। পরী আমার সব চাইতে আদরের মাইয়া। ওরে এতোদিন অনেক কষ্টে

আগলাইয়া রাখছি। এহন ও তোমার কাছে থাকবো। তুমি আমার মাইডারে আগলাইয়া রাইখো। পরী এহনও জানে না বাইরের দুনিয়া কেমন? কোনদিন বাইরে যায় নাই তো। ওরে তুমি সব বুঝবা। আমার মাইয়াডারে ভালো রাইখো।’

বলতে বলতে মালা চোখ মুছলেন। শায়ের মালাকে আশ্বস্ত করে

বলল,’আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ে আমার দায়িত্ব। এখানে থাকাকালীন আমি যেমন আমার সব দায়িত্ব নিখুঁত ভাবে পালন করেছি তেমনি আপনার মেয়ের সব দায়িত্ব ও পালন করবো। আপনি চিন্তা করবেন না।’শায়েরের কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মালা। পরী বড়ই দূরন্ত। কখন কি

করে বসে বোঝা অসম্ভব। রাগটাও একটু বেশি। শায়ের পরীকে সামলাতে পারবে কি না এই চিন্তা মালার বেশি। কিন্ত শায়েরের সাথে কথা বলে সে বুঝতে পারল শায়ের ঠিকই পরীকে মানিয়ে নিতে পারবে। মালা চলে গেল। শায়ের সামনে পা বাড়াতেই দেখলো পরী দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা এখনও গম্ভীর করে

আছে। শায়ের কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পরী বলে উঠল,’আমি সত্যিই কি শুধু আপনার দায়িত্ব? আপনি আপনার কাজকে আর আমাকে একই নজরে দেখেন?’

-‘নাহ আসলে,,’

-‘আপনাকে আর কষ্ট করে কিছু বলতে হবে না।’চলে গেল পরী। খুব রাগ হচ্ছে শায়েরের উপর। পরীকে

দায়িত্ব মনে করে সে? বিয়েটা কি ছেলেখেলা নাকি? পরীর কাছে তাই মনে হচ্ছে প্রথমে নওশাদ তারপর শেখর। শেষমেশ শায়েরের সাথে বিয়ে হলো। এটাকে তো খেলাই মনে হয়। সে ঠিক করলো শায়েরের সাথে কথাই বলবে না।

শায়ের বুঝলো পরী অভিমান করেছে। এখনই এতো অভিমান।

পরে আর কি হবে কে জানে? কিন্ত সে আর পরীর মান ভাঙাতে যেতে পারলো না। কারণ আফতাব তাকে ডেকেছে। সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরলো শায়ের কিন্ত পরী নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শায়ের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।ছাদের কার্ণিশ ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে পরী। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিন্দুকে খুঁজছে। বিন্দুই

একদিন বলেছিল যে মানুষ মারা গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। তাই পরী এসেছে বিন্দুর সাথে কথা বলতে।

-‘তুই থাকলে খুব ভালো হতো বিন্দু। আজ তুই নেই বিন্দু কিন্তু তোর মাঝি তোকে এখনও ভালোবাসে। সোনা আপা তার ভালোবাসা পেয়েছে। রুপা আপা

পায়নি কিন্তু সিরাজ ভাইয়ের ভালোবাসা সত্যি। আর আমাকে দেখ,একজনের দায়িত্ব আমি। ওই সুখান পাগল টাও ভালোবাসা বোঝে। কত গভীর ওর ভালোবাসা। আমার কপাল খারাপ বিন্দু।’

জ্বলন্ত তারা গুলোর দিকে তাকিয়ে হাসলো পরী। বিন্দুকে খুব মনে

পড়ছে। কিন্ত ওই বিন্দু এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

-‘চাদর ছাড়া ছাদে কেন এসেছেন আপনি? ঠান্ডা লাগছে না?’

শায়েরের গলার আওয়াজ চিনলো পরী। তাই পেছন ফিরে তাকালো না। পরী ওভাবেই বলল,’এই দায়িত্ব টা আপনার নিতে হবে না।’পরীর অভিমান যে গাঢ় হয়েছে তা বেশ

বুঝতে পারছে শায়ের। সে পরীর পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,’স্ত্রীকে সূখে রাখার দায়িত্ব তো স্বামীর নিতে হয়। শুধুই সুখ নয় ভালোবাসার দায়িত্ব ও কিন্ত নিতে হয়। আপনি কোন দায়িত্বের কথা বলছেন বুঝলাম না।’

পরীর জবাব না পেয়ে শায়ের বলতে শুরু করল, ‘আমি আপনাকে প্রথম

কবে দেখেছি জানেন? হয়তো জানেন বিয়ের দিন। নাহ,আমি আপনাকে প্রথম দেখছি সম্পানের নৌকাতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর আপনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমিও ভেতরে গেলাম। আপনি তখন ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। নেকাব পড়েননি। আপনার খেয়াল ছিল না যে আপনার

মুখ বরাবর আয়না গাঁথা ছিলো নৌকার ছইয়ের সাথে। যেখানে স্পষ্ট আপনার মুখটা আমি দেখে ছিলাম।'-'আপনি এমন একজন নারী যাকে ফেরানোর সাধ্য কারো নেই। আপনাকে দেখে যদি কোন পুরুষ প্রেমে না পড়ে তাহলে সে সবচেয়ে বড় পাপী। আমিই সেই পাপ কি করে করি? কিন্তু আমার কাছে

আপনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আমরা বেশি আকৃষ্ট হই। তবুও আপনার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি সবসময়। আপনার আমার মাঝে আকাশ পাতাল তফাত। কোথায় রাজকন্যা আর কোথায় রাজার বাগানের সামান্য মালি!! এই দ্বন্দ্ব আপনার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু

নিয়তি দেখুন। আমি কখনোই এটা ভাবিনি যে আমার ভাগ্যে আপনিই আছেন।'আকাশের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শায়েরের দিকে তাকালো পরী। কিন্তু শায়ের তখনও আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছে। পরীর জবাব না পেয়ে শায়ের আবারো বলল,'আমি আপনার বড় বোনকে দেখিনি আর তার

ভালোবাসার মানুষ কেও দেখিনি। সুখান পাগল আর তার বউয়ের ভালোবাসাও দেখিনি। আর রইল সিরাজ ভাইয়ের কথা। সে চলে যাওয়ার পরই কিন্তু আপনাদের বাড়িতে আমি প্রথম আসি। মূলত সিরাজ ভাইয়ের জায়গাটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। ওদের ভালোবাসা আমি বুঝবো কিভাবে? তবে সম্পান

বিন্দুর ভালোবাসার সাক্ষী আমি নিজেও।’

আকাশের দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে পরীর দিকে তাকালো শায়ের,’পৃথিবীতে কেউ কারো মতো করে ভালোবাসতে পারে না। তাহলে সব ভালোবাসার পরিণতিও যে একই হত। নিজ স্থান থেকে নিজের প্রিয় মানুষ কে ভালোবাসতে হয়।

সে ভালোবাসার মাধুর্য থাকে অন্যরকম। এখন আপনিই বলুন ওদের মতো ভালোবাসা চাই নাকি আপনার স্বামীর ব্যক্তিগত ভালোবাসা চাই কোনটা?’দ্বিধায় পড়ে গেল পরী। কি উওর দিবে বুঝতে পারল না। চেয়েও পরী কঠোর হতে পারছে না। যেই মেয়েটা অধিকতর সাহসি,রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার মিশে আছে রাগ। আজ

সেই মেয়েটির রাগ উধাও!!সাহস ও হারিয়ে গেছে যেন।

ভালোবাসা মানুষের দূর্বলতা। ভালোবাসলে মানুষ কোন না কোন কারণে ভয় পাবেই। সেই ভয়টা পরীর হচ্ছে। কিন্ত কিসের ভয়? হারিয়ে ফেলার নাকি অন্য কিছু? বুঝে উঠতে পারে না পরী। সে নির্দ্বিধায় শায়েরের দিকে তাকিয়ে

আছে। চোখের ভাষা এই মুহূর্তে পরী পড়তে অক্ষম। তাই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাইলো না সে। ঘুরে হাঁটা ধরতেই শাড়ির আঁচলে সজোরে টান পড়তেই সে দাঁড়িয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাতেই শায়ের বলল,'আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন না?'পরী এবার ঘুরে দাঁড়াল। শায়েরের দিকে এগোতে এগোতে

বলল,’আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। ভালোবাসা বলতে আমি ওদের কাহিনী গুলো বুঝি। এর বেশি কিছু জানা নেই আমার। পড়ালেখা শেখানোর শিক্ষক থাকলেও ভালোবাসা শেখানোর শিক্ষক কিন্ত নেই।’

-‘ভালোবাসার শিক্ষক থাকে না। দুজনের মধ্যে তৈরি করতে হয়।

তাহলেই ভালোবাসার মানে বুঝবেন।'

পরী শায়েরের আরেকটু কাছে আসলো। অন্ধকারের আবছা আলোতেই চোখ রাখলো শায়েরের চোখে। বলল,'তাই? তাহলে দুজনের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি কিভাবে করা যায় বলুন তো?'

শায়ের এবার থামলো। এবার একটু বেশিই বলছে সে। ঠান্ডাও লাগছে, সে নিজেও চাদর আনেনি। তাই সে বলল,'আজকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শিখে ফেলেছেন বাকিটা অন্য একদিন শেখাবো।'

শায়ের চলে আসতে গিয়ে থেমে গেল পেছন ফিরে বলল,'হাত ধরার অনুমতি দিবেন নাকি আঁচল ধরে

টেনে নিয়ে যাবো?’মৃদু হাসে পরী,’কোলে তুলে নিয়ে গেলে মন্দ হয়না।’

কালবিলম্ব না করে চোখের পলকেই সে পরীকে কোলে তুলে নিলো। পরী ভেবেছিলো শায়ের তাকে কোলে নিবে না। কিন্তু সে পরীকে বিষ্মিত করে দিয়েছে।

পরী আজ শাড়ি পাল্টে নিজের ঘাগড়া পড়েছে। শাড়ি পরার তেমন অভ্যাস নেই তার। তাই আপাতত বাড়িতে এটাই পরুক। শীত নিয়ন্ত্রণ করা খুবই মুশকিল হয়ে আসছে বিধায় পরী শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দে চোখটা বন্ধ করে ফেলে যাতে শায়ের বুঝতে পারে পরী ঘুমিয়ে গেছে। কিন্ত চতুর

পরী জানে না যে তার স্বামী তার থেকেও কম নয়। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে শায়ের শুয়ে পড়ল। বেলি ফুলের সুবাসে চোখ মেলে তাকালো পরী। একটু আগেও তো ফুলের ঘ্রাণ পায়নি সে। এখন কোথা থেকে আসলো? ওপাশ ফিরতেই দেখলো শায়ের ফুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। নিজের

অজান্তেই পরী ধরা দিয়ে বলে,’ফুল কোথা থেকে আনলেন?’-‘আপনি ঘুমাননি? একটু আগেই তো দেখলাম ঘুমাচ্ছেন।’

-‘ওই চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। দেখি ফুলগুলো!’

পরী হাত বাড়াতেই শায়ের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে,’দেওয়া যাবে না।’

পরী একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে বলে,’মালি সাহেব আমার রাজ্যে থাকতে হলে আমার কথা মেনে চলতে হবে যে। আপনার একটাই কাজ আমার বাগানে ফুল ফোটানো। কাজ ঠিকমতো করতে পারলেই পুরষ্কার পাবেন।’

-‘তাই নাকি? তা পুরষ্কার টা কি?’

-‘সময় হলেই জানতে পারবেন মালি সাহেব।’

-‘যথা আজ্ঞা রাজকুমারী।’

পরী হাসলো। শায়ের তাকিয়ে রইল পরীর দিকে। কপালে কিঞ্চিত ভাজ ফেলে পরী বলে,’ওভাবে দেখছেন কেন? আপনার সাহস তো কম নয়। এর শাস্তি কি হতে পারে জানেন?’প্রশ্নের জবাবে শায়ের হাত

বাড়ালো পরীর দিকে। গাল গলিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে আনে পরীকে। গভীর ভাবে প্রেয়সীর কপালে ওষ্ঠ ছুঁয়ে দেয় বলে,'শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড হলেও আমি মাথা পেতে নিবো পরীজান।'

ঈষৎ কেঁপে উঠল পরীর সর্বাঙ্গ। কর্ণকুহরে 'পরীজান' শব্দটি বার বার বাজতে লাগল। এই ডাকেও যেন

মাদকতা আছে। আফিমের মতো নেশালো। আফিমের নেশা কেটে গেলেও এ নেশা যেন কাটবার নয়। নিজের অর্ধাঙ্গিনী কে এইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে শায়ের হাসে বলে,'অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এবার কি শাস্তি দিবেন বলুন।'

আগের ন্যায় পরীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বলে,'শাস্তিটা কি দেবেন ভাবতে থাকুন। আমি ঘুমাই।'

ঊষার আলো ফুটতেই চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। ঘাসে পাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু চিকচিক করে উঠলো। সূর্য রশ্মিতে মেঘপুঞ্জের রূপবত্তা যেন দ্বিগুণ

বেড়ে গেল। শিশির ভেজা পথ পেরিয়ে মানুষ যাচ্ছে নিজ গন্তব্যে। শীত আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। দিনের বেলাতে তেমন শীত না লাগলেও রাতে শীত বাড়ে। চাষিরা দলে দলে শীতের ফসল ঘরে তুলছে। তাদের খুশি যেন আর ধরে না। বন্যার পর যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা এখনো কিছুটা রয়ে

গেছে। এবারের ফসলে বোধহয় তা মিটবে।সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে জমিদার বাড়ির আঙ্গিনা। তখনই সেখানে আগমন ঘটে শেখরের। শায়েরই প্রথমে দেখে। সে কিছুটা ঘাবড়ে গেল শেখর কে দেখে। কেননা তার হাতে মাথায় ব্যান্ডেজ করা। সারা মুখেও অসংখ্য দাগ স্পষ্ট।

শেখর শায়েরের সাথে কোন কথা না বলে বৈঠকে গিয়ে হাজির হয়। আফতাব আর আখির বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। শেখর কে আস্তে দেখে আফতাব প্রচন্ড রেগে গেলেন। বললেন,’তুমি? এখানে কি চাই? তোমার সাহস তো কম না। এতো কিছু করে আবার এখানে এসেছো!!’মুহূর্তেই বাড়ির সকলে

জেনে গেলো শেখরের আমার কথা। মালা জেসমিন ছুটে গেলেন বৈঠকে। পরী কুসুম আর জুম্মান দরজার আড়ালে কান পেতে রইল। শেখর সবার কাছে কিছু বলার অনুমতি চাইছে। আফতাব শুনতে চাইলেন। তিনিও দেখতে চান ছেলেটা কি বলে? শেখর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগল,'বিয়ের দিন

রওনা হওয়ার আগেই খবর পেলাম আমার ছোট বোন কে কেউ অপহরণ করেছে। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। পুলিশ কেও জানাতে পারিনি যদিও আমার বোনের কোন ক্ষতি করে দেয়? আমার পরিবারের সবাইকেই অপহরণকারী একটা জায়গায় যেতে বলে। কিন্ত দূর্ভাগ্য বশত গাড়ি দুর্ঘটনায় ওইদিনই সবাই

আহত হই। হঠাৎই কি হয়ে গেল বুঝিনি। পরে পুলিশই আমার বোনকে উদ্ধার করে। এর পেছনে ছিল আমার বন্ধু নাঈম। ওই এই জঘন্য কাজটা করেছে।’

আফতাব জিজ্ঞেস করলো,’সে কেন এরকম করবে?তুমি মিথ্যা বলতেছো।’-‘আমি সত্যি বলছি। নাঈম কে পুলিশে দেওয়া হয়েছে।

নাঈম নিজের মুখে সব স্বীকার করেছে। বিশ্বাস না হলে আপনি খোঁজ নিতে পারেন। নাঈমের এরকম করার কারণ সে পরীকে পছন্দ করতো।'

-'আচ্ছা দেখবো। যদি তোমার কথা মিথ্যা হয় তাহলে কঠিন শাস্তি পাবে তুমি।'

শেখর মাথা নেড়ে বলে,'ঠিক আছে। তাহলে কি এবার বিয়েটা হচ্ছে?'

শায়ের নড়েচড়ে দাঁড়াল। তার সামনে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার কথা বলছে তা মানতে পারছে না সে। আফতাব বলল,'সেকথা ভুলে যাও। কারণ আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।'

শেখর অবাক হয়ে বলল,’কি বলছেন এসব? পরীর বিয়ে হয়ে গেছে মানে! কার সাথে? আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন পরীকে আমার হাতে তুলে দেবেন!’

-‘শোন তোমার জন্য আমি আমার সম্মান হারাতে বসেছিলাম অনেক কষ্ট করে সব ঠিক করেছি। এখন বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি যেতে

পারো।’এবার শেখর রেগে আগুন। সে আফতাবের সাথেই দুএক কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেললো। শায়ের আর ওখানে থাকলো না। অন্দরে চলে গেল। শেখরের কথাগুলো বিষের মতো লাগছে। শায়ের কে ঘরে যেতে দেখে পরীও পিছু পিছু ঘরে গেল। শায়ের কে চিন্তিত দেখে

বলল,’আপনি শুধু শুধু চিন্তিত হচ্ছেন কেন?’

-‘আমি কোন কারণে চিন্তিত নই।’

-‘তাহলে এভাবে চলে এলেন যে?’

-‘ওই ছেলেটা বার বার আপনাকে বিয়ে করবে বলছে। তাছাড়া ওর সাথে আপনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আমার ওকে ভালো লাগছে না।’

মৃদু হাসলো পরী। শায়ের জ্বলছে,এতঃ খুশিই লাগছে পরীর। ওকে হাসতে দেখে শায়ের রুষ্ঠচিত্তে বলে, ‘আপনি হাসছেন?’পরী শায়েরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে,’তো কি হয়েছে? আমার তো আর বিয়ে হচ্ছে না তার সাথে।’

-‘আমি ওর মুখে আপনার নাম সহ্য করতে পারছি না।’

-‘আচ্ছা ঠিক আছে আপনার শুনতে হবে না আমিই যাই। গিয়ে শুনে আসি।’

পরীর হাত টেনে ধরে শায়ের। টানের ফলে পরী শায়েরের একদম কাছে চলে আসে। দেখে মনে হচ্ছে তার স্বামীর মনক্ষুণ্ন হচ্ছে।

-‘ওই ছেলেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন।’

-‘মালি সাহেব আপনার বউকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। আপনার কাছ থেকে তো নয়ই।’

পরীকে পালঙ্কে বসিয়ে শায়ের নিজেও ওর পাশে বসলো। পরী জিজ্ঞেস করলো,’আচ্ছা ওই ছেলেটা

এমন কেন করলো? বন্ধু হয়ে বন্ধুর এতো বড় ক্ষতি করতে পারলো? যদি মরে যেতো ছেলেটা?’

-‘আপনাকে পছন্দ করে ছেলেটা আসামীদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। যেখানে তার ডাক্তার হওয়ার কথা ছিল।’

-‘সত্যি কারের ভালোবাসা কখনোই মানুষ কে খারাপ পথে নিয়ে যায়

না। বরং একটা খারাপ মানুষ কে ভালো পথে নিয়ে আসে।’পরী শায়েরের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখে। মুহূর্তটা বেশ লাগছে পরীর কাছে। অনেকগুলো হাত পেরিয়ে পরী এক বিশ্বাসী হাত পেয়েছে। হোক নাসে নিম্নবিত্ত ছেলে। কিন্ত তার ভালোবাসায় তো

কোন খাদ নেই। ভালোবাসাটা সত্যি হলে নূন পান্তা খেয়েও সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। শায়েরের সাথেই অনায়াসে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কোন নিকষ কালো মেঘের ছায়া যেন কখনোই না আসে।

কিন্তু নাঈম নামের ছেলেটা একটু বেশিই করছে বলে মনে হলো

পরীর। ভালোবাসা তো কোন প্রতিযোগিতা নয় যে জোর করে হলেও তাকে পেতে হবে। তাহলে কেন ছেলেটা এমন করে বসলো? এখন এর জন্য কতদিন জেলে থাকতে হবে কে জানে?“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায়,দেখতে আমি পাইনি। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে

ছিলে বাহির পানে চোখ মেলেছি,বাহির পানে। আমার হৃদয় পানে চাইনি,আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি।"

রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গাইতে রুমালের সেলাই খুলছে চম্পা। তার প্রিয় ব্যক্তিকে যখন দেওয়ার অধিকার নেই তাহলে এসব রেখেই

কি হবে? খুব যত্ন করে সে এগুলো বানিয়েছিলো। সেলাইয়ের প্রতিটি ফোড়ে ছিল নিত্য নতুন অনুভুতি গাঁথা। যা সে শায়ের নামক পুরুষটির জন্য রেখেছিল। কিন্ত সে পুরুষ টি আজ অন্য কারো দখলে। অন্য কারো হাসিতে সে তৃপ্তি পায়। অন্য কাউকে নিয়ে ভাবে। আগে যদি জানতো এই পুরুষটি তার হবে না

তাহলে কোন অনুভুতি সে জমিয়ে রাখতো না। দিতো না ওই পাষাণ পুরুষ কে মন।শায়ের পরীকে বিয়ে না করলেও হেরোনা কিছুতেই শায়েরের কাছে চম্পাকে বিয়ে দিতেন না। দেখতে শুনতে তো মেয়েটা কম নয়। কোমড় ছড়ানো ঘন কালো চুল। ডাগর ডাগর চোখ,কি সুন্দর চেহারা!! এমন সুন্দর

মেয়েকে তিনি অর্থহীন এতিম ছেলের কাছে কেন বিয়ে দেবেন? তার মেয়েকে তিনি আরো বড় ঘরে বিয়ে দেবেন। তবে যখন সে শুনেছে শায়ের জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে তখন থেকেই হিংসায় জ্বলে যাচ্ছেন। রূপবতী পরীকেও তার সহ্য হচ্ছে না। তাই তিনি খুসিনার সাথেও তেমন কথা বলেন

না। কেননা খুসিনা খুব বড়াই করেন পরীকে নিয়ে। হেরোনার মেয়ের থেকেও দ্বিগুণ সুন্দরী মেয়েকে ঘরে তুলেছে শায়ের। এজন্য দুজনের মধ্যে চলে কথার প্রতিযোগিতা। চামেলি মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে বোনের কান্ড দেখতাছে। সে ভালোবাসার অর্থ বোঝে না বলেই বোনের কষ্ট বুঝতে ব্যর্থ। তাই চেয়ে

চেয়ে দেখছে শুধু। পরীদের বাড়ি থেকে এসে অনেক গল্পই বলেছে পরীর বাড়ি সম্পর্কে। চম্পা শুধু শুনেছে।

বারান্দার মাটির তৈরি সিঁড়িতে চম্পা আর বারান্দার মেঝেতে চামেলি বসে আছে। পরী সেখানে আসতেই চামেলি খুশি হলো। তবে চম্পা পরীর উপস্থিতি পেয়েও নিজের কাজ

করতে লাগলো। পরী কিছুক্ষণ চম্পার দিকে তাকিয়ে থেকে চামেলিকে বলল,’ঘরে একা একা লাগছিল তাই তোমার কাছেই ফুপু পাঠালেন।’

চামেলির বদলে চম্পা বলে,’কেন সেহরান ভাই নাই?’

-‘নাহ,উনি তো বাজারে গেছে। আসতে দেরি হবে।’

পরীর মুখে উনি শব্দটা শুনে মৃদু হাসলো চম্পা। চামেলি উঠে এসে পরীর হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল। পরীকে চৌকির উপর বসিয়ে নিজেও বসলো। তারপর বলল,’নতুন ভাবী আপার লগে কথা কইও না। আপার মন ভালা না। দেখো না সেহরান ভাইয়ের লাইগা রুমাল বানাইছে এহন আবার

খুলতাছে।’-‘উনার জন্য রুমাল বানিয়েছে কেন?’

পরী বুঝেও না বোঝার ভান করলো। যাতে চামেলি সব কথা বলে।

-‘আর কইয়ো না নতুন ভাবি। খুসিনা ফুপু মা’রে কত্ত কইলো সেহরান ভাইয়ের লগে আপার বিয়া দিতে কিন্তু মা তোর রাজিই হয়না।

আপা সেই আশায় রুমাল বানাইলো। কিন্ত দেহো শেষমেশ তোমারে ভাই বিয়া কইরা আনলো। যদি আপার লগে বিয়া হইতো তাইলে কি তোমার মতো সুন্দর ভাবি পাইতাম!!’

খিলখিল করে হেসে উঠল চামেলি। পরী আগেই বুঝেছিলো চম্পা শায়ের কে পছন্দ করে। কিন্ত পুরোপুরি সব

সে জানে না। যদি হেরোনার মত থাকতো তাহলে হয়তো পরীর জায়গায় চম্পা থাকতো। পরী সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখে একটা ছেলের ছবি আর কিছু পোস্টার টানানো। পরী জিজ্ঞেস করে,'এসব কার ছবি?'

চামেলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে বলল,'আল্লাহ গো!!

হেরে চিনো না তুমি? সালমান শাহ,অনেক বড় নায়ক হেয়।'-'নায়ক!!' পরী ঠিক বুঝলো না। ঘরবন্দি থাকাতে এসবের সাথে পরিচিত না সে। তাই বিখ্যাত নায়ককে চিন্তে পারলো না। চামেলি আবার বলল,'হ নতুন ভাবি। আমি আর আপা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়

টুনিগো বাড়িতে যাইয়া টেলিভিশন দেহি। তুমি দেখবা?’

-‘নাহ আমি দেখবো না। রাতের বেলা ফুপু বের হতে বারণ করেছে।’

-‘ওহ তুমি তো নতুন বউ। আহো আমরা তোমাগো ঘরে যাই। দেহি সেহরান ভাই আইছে নাকি?’

চামেলি গান ধরলো,’উওরে ভয়ংকর জঙ্গল দক্ষিণে না যাওয়াই মঙ্গল পূর্ব পশ্চিম দুই দিগন্তে নদী।’

চামেলি নাচতে নাচতে যেতে লাগল আর পরী হেঁটে হেঁটে। মেয়েটার দূরন্তপনা দেখতে ভালোই লাগে পরীর। কিন্ত চম্পার জন্য খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছে শায়ের। পরী মাগরিবের নামাজ শেষ করে বসেছিল। একাই ছিল সে,ফুপু পাশের বাড়িতে খোশ গল্প করতে গেছেন। চামেলি চম্পা টেলিভিশন দেখতে গেছে। পরী ঘরে সম্পূর্ণ একা। দরজার ঠকঠক আওয়াজ শুনে পরী দরজা খুলল। শায়ের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলো। পরী

খেয়াল করেছে আসার পর থেকে শায়ের কেমন যেন আচরণ করছে। পরীর থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। কোন কারণে শায়ের এরকম করছে পরী তা ভেবে পাচ্ছে না!!এতে খারাপ লাগছে পরীর। কেননা এই পুরুষটিকে যে তার ভিশন মনে ধরেছে। সেই প্রথম যেদিন সম্পানের নৌকাতে দেখা

হয়েছিল সেদিন থেকেই। শায়েরের কথা গুলো শ্রুতিমধুর মনে হতো পরীর কাছে। এত সুন্দর আর গুছিয়ে বোধহয় কেউ কথা বলতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে যখনই পুরুষটির সাথে দেখা হতো তখন সে আবারো পরীকে মুগ্ধ করতো। আর আজ সেই পুরুষই পরীর স্বামী। স্বামীর অবহেলা তো প্রতিটি

নারীকেই ব্যথিত করে। সেজন্য পরীর মনটাও ভিশন ব্যথিত। কাল থেকে শায়ের কোনো কথা বলেনি পরীর সাথে। পরী কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিয়েছে শুধু। এর বাইরে একটা কথাও সে বলেনি।

পরনের পাঞ্জাবি খুলে একটা গেঞ্জি পরছে শায়ের। পরী তাকিয়ে আছে শায়ের দিকে। নিজেকে পরিপাটি

করে পিছন ফিরতেই পরীর চোখে চোখ পড়ল। সাথে সাথেই চোখ ফিরিয়ে নিলো সে। বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই পরী বলে উঠল,'কোথায় যাচ্ছেন??'শায়ের না তাকিয়েই জবাব দিল,'কাজ আছে।'

-'আমাকে একা রেখে যাবেন না।'

থমকে দাঁড়াল শায়ের। পিছন ফিরে বলল,'কেন? ফুপু নেই?'

-‘পাশের বাড়িতে গেছে।’

-‘আপনি একা থাকতে ভয় পান??’

পরী কয়েক কদম এগিয়ে এলো। শায়েরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,’সূর্যাস্তের পর হৃদয়ের একাকীত্ব বাড়ে। তখন মানুষ সূক্ষ্ম একটা হৃদয় খোঁজে তার হৃদয়কে বাঁধার জন্য। একাকীত্ব দূর করতে চায়। ভয়ের থেকে মানুষ একাকীত্বে

বেশি ভোগে। আপনি কি আমার একাকীত্ব বোঝেননি??’

এবারও পরীর চোখে চোখ রাখলো না শায়ের। তবে চোখ দুটো যেন অনেক কথা বলতে চাইছে। নিজেকে সংযত করে শায়ের চলে এলো। বাইরে গেলো না। পরী বলল,’কিছু বলবেন না??’

এবার শায়ের মুখ খুলল। কন্ঠে গম্ভীরর্যতা এনে বলল,'আমার জন্য একাকীত্ব ভোগ করতে হবে না আপনাকে। যেখানে আমি আপনার যোগ্য নই সেখানে আমার জন্য আপনি নিজেকে দূর্বল করবেন না। যদি কখনও আফসোস হয় তাহলে বলবেন আমি সরে যাবো আপনার পথ থেকে।'পরীর মনে জানান দিলো

যে শায়ের কিছু শুনেছে। তাহলে কি রুপালির বলা কথা শায়ের শুনেছে? তাই হবে নাহলে শায়েরের এতো পরিবর্তন হতো না। বাড়ি থেকে আসার আগে রুপালি পরীকে কিছু কথা বলে। শায়ের ছোট ঘরের ছেলে,পরীর যোগ্য না,বামুন হয়ে চাঁদে হাত দিয়েছে এমনকি অনেক আফসোস করেছিল। কিন্ত পরী

তখন একটা জবাব দিয়েছিল,’যদি টাকা পয়সা সুখ দিতো তাহলে তুমি কেন সুখি হলে না আপা?’

রুপালি তারপর আর একটা কথাও বলেনি। শায়ের বোধহয় অর্ধেক কথা শুনেই এসব বলছে।

-‘আমার মনের পথে যে একবার আসে তার ফিরে যাওয়ার পথ নেই। আপনি ফিরবেন কীভাবে??’

শায়ের জবাব দিলো না। পরীর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললে নিজেকে সংযত রাখা অসম্ভব। তাই পরীর থেকে সরে গিয়ে পালঙ্কে বসলো। পরী এগোলো না শায়েরের দিকে। সে ভাবলো রুপালির মাথা খারাপ বলে কি শায়ের কেও মাথা খারাপ করতে হবে নাকি? রুপালি সবসময় পরীর সুখ চেয়েছে বিধায় এসব

বলেছে। পরী তখন ভেবেছিল সে নিজের সুখকে দেখিয়ে দেবে বোনকে। কিন্ত শায়ের নিজেই তো বুঝতেছে না কিছু। পরী এগিয়ে গেলো জানালার দিকে। হাত বাড়িয়ে খুলে দিলো জানালা। হুড়মুড়িয়ে বেলি ফুলের সুবাস ঘরে এসে ঢুকলো। পরী পেছন ফিরে শায়েরের দিকে তাকালো। শুয়ে আছে শায়ের।

অস্থিরচিত্ত নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আবারো জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।এশার নামাজ পড়েই শুয়ে পড়ল পরী। শায়ের আগেই ঘুমিয়ে গেছে। ফুপু বলে গিয়েছেন শায়ের এলে যাতে ওরা খেয়ে শুয়ে পড়ে। তার আসতে দেরি হবে। পরীর খাওয়ার জন্য শায়ের কে ডাকলো না এবং নিজেও খেলো

না। অর্ধেক রাত কাটলো এপাশ ওপাশ করে।

সকালে শায়ের আগেই ঘুম থেকে ওঠে। কালকে সে একটা কাজ যোগার করেছে। গ্রামের মাতব্বর শায়ের কে বেশ পছন্দ করেন। তিনিই তার আড়তে কাজ করতে বলেছেন শায়ের কে। আজকে সেখানেই যাবে শায়ের।

পরীও উঠে ফুপুর কাছে গেল। কাজ না পারলেও কিছু কিছু সাহায্য সে করে। রান্নাঘরে ছিলো পরী। তখনই একজন বৃদ্ধ মহিলা এলেন আজহারি করতে করতে। খুসিনা দৌড়ে গেলেন উঠোনে আর পরী বসে রইল। মিহিলাটি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ‘সেহরান কই?ওর বউ কই?’

শায়ের ও সেখানে গেলো। বাড়ির সকলেও উপস্থিত। মহিলাটি কাঁদছে আর বলছে,'হ্যারে সেহরান কোন অপয়া মাইয়া ঘরে তুললি। যে কিনা আমার পোলাডারে খাইয়া দিলো??'কথাটা বুঝলো না শায়ের তাই জিজ্ঞেস করে,'কি হয়েছে চাচি??'

-'কি হয় নাই ক?? তোরে আর তোর বউরে আইনা আমার পোলাডা মইরা গেলো!! অলক্ষী মাইয়া আইতেই আমার পোলা খাইলো। তুই থাকবি কেমনে? তোরেও খাইবো দেহিস।'

শায়েরের মনে পড়ল এই চাচির ছেলের গাড়ি করে পরীকে প্রথম এই বাড়িতে এনেছে। ছেলেটা মারা

গেছে!!সে বলে,'আপনার ছেলে মারা গেছে কখন?'

-'কাইল রাইতে ভালা পোলা ঘুমালো সকালে আর উঠলো না। অহন বউ পোলাপান খাইবো কি? সব তোর বউর লাইগা হইছে। অলক্ষি,এই সংসার টিকবো না সেহরান। টিকবো না।'শায়ের ধমকে মহিলাটিকে বের করে দিলেন। অতঃপর নিজের

ঘরের দিকে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পরী। ছলছল নয়নে সে শায়েরের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে সেখানে না দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল। শায়ের বুঝে গেল এতক্ষণের সব কথাই পরীর কানে গিয়েছে। সে দ্রুত ঘরে গিয়ে পরীর হাত টেনে ধরলো। পরী কাঁদছে দেখে ওকে নিজের বুকে

জড়িয়ে নিলো সে।নারী যখন খুব বেশি কষ্ট পায় তখন কাঁদার জন্য একটা বুক খোঁজে। যেখানে নিজের সব কষ্ট ঢেলে দিতে পারে। অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ক্ষ্যান্ত হতে পারে।

একটা বিশ্বাসী স্নিগ্ধ মানুষের বুকে অশ্রু ঢালতে পারলেই সে নারীর কষ্ট লাঘব হয়। তেমনি পরী নির্ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে শায়েরের বুকে।

শায়ের দুহাতে আগলে ধরেছে তার অর্ধাঙ্গিনীকে। মহিলাটির কথায় পরী কষ্ট পেয়েছে খুব। খারাপ লাগারই কথা। সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে। এখনো সংসার পাতানো হলো না। তার আগেই ভাঙ্গার কথা বলছে। একটা সুখি সংসার কেমন হয় তা পরী সোনালীর সেই খাতায় পড়েছে। কিভাবে সোনালী রাখালের সাথে

ছোট্ট সংসার গড়ে তুলবে তা ব্যক্ত করেছিল খাতায়। পরীর ধারণা ও সেখানকার। কিন্ত ওই মহিলাটি শুরুতেই সব চুরমার করার কথা বলছে!! এজন্য ব্যথিত হয়ে নয়ন জলে ভাসছে পরী। শায়ের কিছুক্ষণ পরীকে আলিঙ্গন করে নিজের দিকে ফেরালো। আপন হস্তে পরীর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে,’আপনি না

সাহসী?? আপনার মন না শক্ত? তাহলে এভাবে বাচ্চাদের মত কাঁদছেন কেন?’-‘উনি কি বলে গেলেন? আমি কি সত্যিই,,,’

মুখে হাত দিয়ে কথা আটকে দিলো শায়ের। তারপর গালে আলতো করে হাত রেখে বলল,’মানুষের কথায় নিজের চরিত্রকে বিচার করবেন না। নিজের মানসিকতা দিয়ে নিজের

চরিত্র কে দেখুন জানুন। পরের কথায় চোখের জল ফেলবেন না। কষ্ট পাবেন না।'

-'উনি যদি মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে আপনার আর আমার মাঝে কেন এতো দূরত্ব? বলুন!!সেটা তো আমার জন্যই তাই না!! আমিই পারি না কাউকে আপন করে নিতে।

সেজন্যই তো উনি আমাকে এসব বলে গেছেন।’

দ্বিতীয়বারের মতো পরীকে জড়িয়ে নিলো শায়ের। তার করা ভুলটা পরী নিজের মাথায় নিয়েছে। শায়েরই ইচ্ছা করে দূরে থেকেছে। আসলে রুপালির কথাগুলো শোনার পর শায়ের ভেবেছে সত্যিই সে পরীর যোগ্য নয়। তাই সে দূরে থেকেছে।

কিন্তু পরী যে তাকে অতি সন্নিকটে চায় তা শায়েরের জানা ছিল না। শায়ের বলল,'আমাকে ক্ষমা করুন পরীজান। ভুলটা আমারই। আমার থেকে আপনার দূরত্ব বাড়বে না কোনদিন। কথা দিলাম,আমি দূরে থাকলেও আমার রুহু সবসময় আপনার কাছে থাকবে।'পরী নিজেও শক্ত করে ধরে শায়েরকে। কান্না

মিশ্রিত কণ্ঠে বলে,’আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাব আপনি না থাকলে। আমাকে একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি শুধু ছোট্ট একটা সংসার চাই। এছাড়া আর কিছু চাই না আমি।’

-‘আপনি যা চাইছেন তাই হবে। এবার কান্না বন্ধ করুন।’

পরী কান্না থামালেও শায়ের কে ছাড়লো না। আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখে। পরীর এহেম কান্ড দেখে শায়ের হেসে ফেলল। বলল,’ছাড়বেন না আমাকে? আজ থেকে কাজে যেতে হবে।’

-‘আজকে যাওয়ার দরকার নেই। কাল থেকে যাইয়েন।’

-‘কেন??’

-‘আজকে আমার মন খারাপ। আপনি চলে গেলে মন আরও খারাপ হয়ে যাবে।’আবারও হাসে শায়ের। আরেকটু গভীরতার সাথে আলিঙ্গন করে পরীকে। শায়ের কিছু বলতে যাবে তখনই খুসিনার গলার আওয়াজ ভেসে আসে। শায়ের পরী দুজনেই তড়িঘড়ি করে দুপাশে সরে দাঁড়ায়। খুসিনা ঘরে এসে

বলে,’হ্যারে সেহরান তুই নতুন বউ রে লইয়া ফকিররে দিয়া ঝারা দিয়া আন।’

শায়ের গলা খাকারি দিয়ে বলে,’ফকির!!কেন?’

-‘কেউর নজর পড়ছে। দেহোস না ওই বেডি কি কইয়া গেলো? আমার ভালা ঠেকতাছে না তুই বিকালে

বউরে লইয়া উসমান ফকিরের কাছে যাইস।’

-‘আচ্ছা যাবো। তুমি এখন যাও।’

-‘তুই তো আড়তে যাবি কইলি। তা যাবি না??’

-‘আজকে না কাল থেকে যাবো।’

খুসিনা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। শায়ের আবার পরীর কাছে এসে বলল,’মন খারাপ যেন করতে

না দেখি। বিকেলে গ্রাম ঘুরতে নিয়ে যাব। দেখবেন ভালো লাগবে।’

-‘ফুপু যে ফকিরের কথা বলল!’-‘কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না। আমি থাকলেই আপনার উপর থেকে নজর কেটে যাবে।’

শায়ের পরীকে রেখে আড়তে যায়নি। ঘরে বসেই পায়চারি করেছে। সকালের নাস্তা সেরে তার

কিছুক্ষণ পরেই খুসিনার সাথে রান্না করতে গেলো পরী। প্রতিদিন রান্না করতে করতে খুসিনা তার নিজের জীবন কাহিনী শোনায়। বিয়ের কয়েক বছর পরই তার স্বামী মারা যায়। তার ছেলের বয়স তখন চার বছর। স্বামী গৃহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বড় ভাই শাখাওয়াত মানে শায়েরের বাবার কাছে আশ্রয় নেন।

বাকি তিন ভাইয়েরা বউদের কথাতে খুসিনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা'ই বা কি করবে?অভাবের সংসার নিয়ে নিজেরাই টানাপোড়েনে আছে।শায়ের তখন সাত বছরের বালক। দূর্ভাগ্য বশত শায়েরের মা মারা যান। এবং একই বছরে খুসিনার ছেলে পানিতে পরে মারা যায়। পুত্র শোক কাটাতে শায়ের কে

তিনি নিজ সন্তানের মতো আগলে রাখেন। বড় করে তোলেন শায়েরকে। সেই থেকেই শায়ের ফুপু ভক্ত। শাখাওয়াত মারা যাওয়ার পর শায়ের নিজেই পরিবারের হাল ধরে। কাজের জন্য দূর দেশে পাড়ি জমায়। প্রতি মাসে খুসিনার খরচ পাঠালেও সে আসে না। বছরে দুই কি তিনবার আসে। তবে এখন

খুসিনা ভিশন খুশি। শায়ের এখন থেকে এখানেই থাকবে। সে প্রতিদিন শায়ের কে দেখতে পাবে। এতেই তিনি খুশি।

পরী ফুপুর পাশে বসে বসে রান্না শিখছে। খুব মন দিয়ে কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। রান্না তাকে শিখতেই হবে।

রান্না শেষ হতেই ফুপু পরীকে গোসলে যেতে বলল। সিঁদূর রঙা শাড়ি আর গামছা হাতে পরী কলপাড়ে গেল। টিন দিয়ে চারিদিক বেড়া দেওয়াতে বেশ সুবিধা হয়েছে। কলপাড়ের দরজা খুলতেই চমকে ওঠে পরী। শায়ের সবে নিজের গামছা টা দঁড়িতে রেখেছে। পরী বলে উঠল,'আমি পরে

আসবো।’-‘দাঁড়ান! আপনি আগে গোসল করুন। আমি পরে করবো।’

-‘না,আপনি আগে এসেছেন আপনিই আগে গোসল করুন।’

শায়ের পরীর হাত টেনে ভেতরে এনে বলে,’আমি বালতি ভরে দিচ্ছি। আপনি আগে গোসল করুন।’

পরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শায়ের কল চেপে বালতি ভরলো। তারপর

চলে গেলো। দরজা আটকে দিয়ে গোসল করে নেয় পরী। অতঃপর গায়ে শাড়ি জড়িয়ে ভেজা চুলে গামছা পেঁচিয়ে বাইরে আসে। ধোয়া শাড়িটা রোদে মেলতে গেলো। খোলা বারান্দায় বসে আছে শায়ের। সদ্য গোসল করা পরীকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে। ফর্সা শরীরে যেন লাল রঙটা একটু

বেশিই শোভা পায়। পানিতে শাড়ির কিছু কিছু অংশ ভিজে গেছে। যেখানটা উন্মুক্ত দেখাচ্ছে। দৃশ্য টা সুমধুর লাগছে শায়েরের কাছে। অপলক দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে আছে শায়ের। নিজের কাজ শেষ করে পরী এগোলো ঘরের দিকে। শায়ের কে এখনও বসে থাকতে দেখে বলে, ‘আপনি এখন গোসলে

যান। আমার হয়ে গেছে।’-‘কিন্ত আমার হয়নি!!’

-‘কি??’

-‘আপনাকে দেখা!!’

-‘কিইই?’

পরীর মৃদু চিৎকারে হুশ ফিরল শায়েরের। চট জলদি দাঁড়িয়ে বলল,’কিছু না আমি যাচ্ছি।’

দ্রুত পদে শায়ের প্রস্থান করে। পরী কিছু বুঝলো না চেষ্টাও করলো না কারণ নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

বিকেলে সূর্যের তেজ অনেকটাই কমে আসে। পশ্চিমে ডুবতে শুরু করে উত্তপ্ত দিবাকর। শীত কমতে শুরু করছে। আর কিছুদিন পর বসন্ত এসে উঁকি দিবে। গাছের পাতা

ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজাবে। তখন প্রকৃতির আমেজটাই অন্যরকম থাকবে।

রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক দম্পতি। তারা আর কেউ নয়। শায়ের আর পরী। মন ভাল রাখার জন্য ঘুরাঘুরির প্রয়োজন। তাই পরীকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে শায়ের। নেকাবের আড়ালে থাকা

পরীর চোখ দুটো সব দেখছে। পথে অনেকের সাথে কথা বলেছে। পরীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। পরী নিজেও পরিচিত হয়েছে। এই প্রথম সে এভাবে গ্রাম দেখতে বের হয়েছে। আগে সে রাতের অন্ধকারে গ্রাম দেখতো। এখন দিনের আলোতে চারিদিক দেখতে বড়ই ভালো লাগছে।সন্ধ্যার আগেই বাড়ি

ফিরলো ওরা। চম্পা বারান্দায় বসেছিল। শায়ের কে পরীর হাত ধরে আসতে দেখে নড়েচড়ে বসে। ওই হাতটা চম্পার ধরার কথা ছিলো কিন্ত দূর্ভাগ্য বশত আজ পরী ধরে আছে। হেরোনা সারাদিনের কাজ শেষ করে পুকুর থেকে গোসল করে আসলো। চম্পাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে দৃষ্টি অনুসরণ করে

সেও তাকালো শায়েরের দিকে। ভেজা শরীর টা যেন জ্বলে উঠল ওনার। চম্পাকে ধমক দিয়ে বললেন,'সন্ধ্যার সময় এইহানে কি করস? যা ঘরে?'

চম্পা উঠে দাঁড়িয়ে বলে,'আমার জীবন শ্যাষ কইরা দিয়া এহন কথা কও তুমি?'

-‘তোরে অনেক বড় ঘরে বিয়া দিমু। তুই সুখি হবি। ওই এতিম পোলার আছে কি আর তোরে দিবো কি?’

চম্পা চাপা রাগ নিয়ে বলে,’সুন্দর একখান মন আছে তার। কিছু না দিতে পারলেও ভালোবাসা দিতে পারতো। তুমি আগে হিংসায় জ্বলতা,এহন আমি জ্বলি।’চম্পা রাগে ফুসতে ফুসতে ঘরের ভেতরে চলে

গেল। হেরোনা মেয়েকে গালমন্দ করতে করতে কাপড় বদলাতে চলে গেলেন। বারবার মেয়ের মুখে সেহরান সেহরান শুনতে ভালো লাগে না তার। ছেলেটার এখন বিয়ে হয়েছে তবুও তার নাম জবছে মেয়ে। মনে মনে শায়ের কে কটু কথা বলতে ভুললো না সে।

সন্ধ্যার আসরে গল্প জমাচ্ছেন খুসিনা। তবে আজ তিনি পরী আর শায়েরের সাথে গল্প করছেন। একথা সেকথা বাজে বকবক করছেন। পরী গালে হাত রেখে তা শুনছে। তার ফাঁকে ফাঁকে শায়েরের দিকে তাকাচ্ছে। শায়েরের চেহারায় কেমন উদাস উদাস ভাব। দেখে বোঝা যাচ্ছে সে ফুপুর কথাতে মন বসাতে

পারছে না। পরী ঠোঁট টিপে হাসলো। পাশের বাড়ির একজন মহিলা ঘরে এলো। খুসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলল,’ও ফুপু তোমারে মায় কহন যাইতে কইছে। তুমি এহনও বইয়া আছো।’তার পর তিনি শায়ের আর পরীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,’তুমিও না ফুপু!! সেহরান নতুন বিয়া করছে। কই

ওগো এট্টু একলা সময় দিবা তা না। আমি হইলে সন্ধ্যার পর দুইজনরে ঘরে তালা দিয়া চইলা যাইতাম।’

মহিলাটির লাগামহীন কথাবার্তা শুনে গুটিয়ে গেল পরী। লজ্জা অনুভূত হতেই মাথা নুইয়ে ফেলল। এখানকার মহিলারা নির্লজ্জ। সব কথা সরাসরি বলে দেয়। বড় ছোট দেখে না তারা। খুসিনা ধমকে

বললেন,'মুখে লাগাম টান। আমার ভাইর বেডা হয়। কথা কমাইয়া কইস।'

উওরে মহিলাটি হাসলো শুধু। খুসিনা ঘর থেকে বের হতে হতে পরীকে দরজা আটকে দিতে বলল। পরী উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আগের স্থানে এসে বসতেই শায়ের বলল,'ওখানে বসেছেন কেন? আমার

পাশে এসে বসুন। আমাদের তো এখন সময় কাটাতে হবে।’শায়েরের মুখের হাসি দেখে পরী বুঝলো সে মজা করছে। পরশু থেকে কথা বলেনি আজকে এসেছে সময় কাটাবে। পরী এসব ভাবতে ভাবতে পালঙ্কে গিয়ে বসে রুষ্ঠচিত্ত কন্ঠে বলল,’কাল সারাদিন এই কথা মনে ছিল কি? তখন তো দূরে দূরে

থাকতেন। এখন এসেছেন সময় কাটাতে?’

পরীর হাত ধরে টেনে কাছে এনে দুজনের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলে শায়ের। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে,’ক্ষমা তো চাইলাম পরীজান। আবারো চাইবো??’

-‘নাহ থাক,এতো বার ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। হাঁপিয়ে যাবেন।’

-'আপনাকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সব অন্যায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাজার বার ক্ষমা চাইতে আমি প্রস্তুত।'রাতের প্রহর যতো বাড়তে থাকে নিস্তব্ধতাও সমান তালে বাড়ে। থেমে যায় মানুষের কলরব। ঘুমন্ত গ্রামটাকে মৃত্যুপুরি মনে হয় তখন। তখন যে জেগে থাকে একমাত্র সেই টের পায় নিরবতা। শীত কমতে

থাকাতে এই সময়টাতে গরম লাগছে পরীর। গায়ের কম্বল টা সরিয়ে দিলো। মাথা তুলে শায়ের কে দেখে নিলো। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পরী হাতে আরেকটু জোর দিয়ে জড়িয়ে ধরে শায়ের কে। স্বামীর বুকে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল সে। হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেলো পরীর। কোন স্বপ্ন দেখেনি এমনিতেই ঘুম ভেঙেছে।

একই ভাবেই সারারাত ঘুমিয়ে থাকলে তো কষ্ট হবে শায়েরের। এপাশ ওপাশ ফিরতে পারবে না। তাই পরী সিদ্ধান্ত নিলো নিজের বালিশে ঘুমানোর। কিন্ত সে উঠতে পারলো না। শায়ের ততক্ষণে জেগে গেছে। চোখ বন্ধ রেখেই সে বলে উঠল,’এমন করছেন কেন পরীজান? আমাকে একটু ঘুমাতে দিন।’বলতে

বলতে হাতের বাঁধন আরো শক্ত করে শায়ের।

-‘আমি আবার কি করলাম? আপনার সুবিধার জন্যই তো সরে যাচ্ছি।’

-‘আমার তো আপনাকে নিয়ে ঘুমাতে সুবিধা হচ্ছে। আপনার হচ্ছে না বুঝি?’

পরী কথা বলল না। ওভাবেই রইল। কিছুক্ষণ পর পরী বলল,’শুনেছি

সত্যিকারের ভালোবাসা নাকি কাঁদায়!! ভালোবাসায় চোখের পানি না ঝরলে সেই ভালোালোবাসা পরিপূর্ণ হয় না??’

-‘আপনার কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমার ভালোবাসা আপনাকে প্রতিদিন কাঁদাবে পরীজান। নিত্য নতুন ভালোবাসায় আপনি কাঁদতে প্রস্তুত হন।’

-‘সুখের কান্না সবাই হাসিমুখে বরণ করে। আমিও হাসি মুখে নিলাম। আমার এই কান্না যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকে মালি সাহেব। সেই দায়িত্ব আপনার।’-‘যথা আজ্ঞা পরীজান।’

ভালোবাসার পরিপূর্ণ রূপ হলো চোখের জল। ভালোবাসা মানুষকে কাঁদায়। জীবন অনেকগুলো খন্ডে

বিভক্ত,কোন খন্ডে জীবনে ভালোবাসা এসে জীবনকে রঙিন করে দেয়। পরে এই রঙিন স্মৃতিগুলো বিষন্নতার পসরা সাজিয়ে মানবহৃদয়কে কাঁদিয়ে দেয়। আবার কিছু খন্ডে সে সুখ পায়। তখন সুখের কান্নায় আবেগপ্লুপাত হয়। হ্যা ভালোবাসা মানুষকে কাঁদায়। কেউ পাওয়ার খুশিতে কাঁদে আর কেউ না পাওয়ার

বেদনায়। তবে সবার চাওয়া একটাই থাকে,দিন শেষে যেন প্রিয় মানুষটার বুকে মাথা রেখে চোখের জল ফেলতে পারে।

সকাল সকাল আড়তে চলে গেছে শায়ের। আজকে ওর কাজের প্রথম দিন। পরী উঠোনে দেওয়া দরজা পর্যন্ত শায়ের কে এগিয়ে দিয়ে আসে। ঘরে এসে পরী শূন্যতা

অনুভব করে। সেটা যে তার স্বামীর জন্য। এখন থেকে রোজ শায়েরের আসার অপেক্ষা করবে পরী। কিছু অপেক্ষা অত্যন্ত মিষ্টি। যা উপভোগ করার অনুভুতি অসাধারণ।

ফুপুর সাথে কাজে কর্মে আর গল্প করেই সারাদিন কাটাতে হবে পরীকে। নিজের কাজগুলো তাই তাড়াতাড়ি শেষ করলো পরী। দুপুরে

গোসলের জন্য কলপাড়ে যেতে উদ্যত হতেই চামেলি এলো। পরীকে দেখে বলে,'নতুন ভাবি নাইতে যাও?'পরী হেসে বলল,'হ্যা।'

-'ওহহ। আমার লগে পুকুরে যাইবা?'

-'নাহ পুকুরে যাওয়া মানা আমার। তোমার ভাই যেতে বারণ করেছে।'

-'আরে নতুন ভাবি পুকুরে কেউ যায়না। আমাগো ঘরের পিছনে পুকুরটা। আমরা বাড়ির মানুষ যাই খালি। আব্বা আর কাকারা তো ক্ষেতে গেছে। আইবো সন্ধ্যার পর। আহো তুমি আর আমি যাই। মজা হইবো।'

চামেলির কথা শুনে হাসলো পরী। তারও ইচ্ছা করে পুকুরে সাঁতার

কাটতে। কিন্তু শায়ের মানা করেছে তাই সে যাবে না বলে। খুসিনাও পরীকে একবার পুকুরে যেতে বলে। শ্বশুরবাড়ির কোথায় কি আছে তা দেখতে হবে না?

পরী ভাবলো শায়ের তো এখন বাড়িতে নেই। সে কোথায় গোসল করছে তা তো শায়ের দেখবে না। একদিন পুকুরে গেলে কিছু হবে না।

বাড়িতে থাকতে স্বাধীনতা পায়নি। এখানে অন্তত মালার মতো কেউ বকবে না। কাপড় রেখে গামছা নিয়ে পরী চামেলির পিছন পিছন গেলো। বড় ঘোমটা টেনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গেল পরী। পুকুর ঘাটে গিয়ে ভালো করে চারিদিক দেখে নিলো সে। চারিদিক ঝোপঝাড়। কলাগাছ আর কলাগাছ।

তাছাড়া পুকুরে আসতে হলে বাড়ির ভেতর দিয়ে ছাড়া আসার কোন কায়দা নেই।চম্পা সবে পুকুরে গোসলে নেমেছে। পরী আর চামেলিকে দেখে অবাক হলো সে। রাগন্বিত কণ্ঠে চামেলিকে বলে,’তুই নতুন ভাবিরে এইহানে আনছোস ক্যান। সেহরান ভাই মানা করছে

না? নতুন ভাবিরে নিয়া বাইরে যাইতে?’

-‘আমাগো পুকুরে তো কেউ আহে না আপা। হের লাইগা নিয়া আইলাম।’

চম্পার ভালো লাগলো না চামেলির জবাব। পরী বেশ বুজতে পারলো যে চম্পা তাকে দেখে রাগ করছে। রাগ করাটাই স্বাভাবিক। তাই পরী কিছু বলে না। চম্পা দ্রতু উঠে চলে গেল।

চামেলি পুকুরে নামতে নামতে বলল,’নতুন ভাবি সাবধানে নামেন। ঘাট কিন্ত পিছলা।’পরী তাই সাবধানে নামলো। দুটো খেজুর গাছ পাশাপাশি রেখে ঘাট বানানো হয়েছে। বহুদিন পানিতে ডুবে থাকার কারণে গাছ দুটোতে শেওলা ধরে গেছে। যার ফলে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। তাই দেখে শুনে পা ফেলছে

পরী। পুকুরের পানিতে শরীর ভেজাতে বেশ লাগলো পরীর। বেশিক্ষণ সাঁতার কাটলো না সে। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। চামেলি আগে উঠে এলো। কিন্তু পরী উঠতে গিয়ে পড়লো বিপাকে। হাত ফসকে সাবানটা পড়ে গেল পানিতে। পরী চামেলিকে ডেকে বলল,'সাবানটা পানিতে পড়ে গেছে চামেলি। এবার

কি হবে?’-‘ডুব দিয়া খোঁজো। পাইয়া যাইবা। আমার কতবার সাবান হারাইছে। হাতরাইলে পাইয়া যাইবা। ডুব দেও।’

চামেলির কথামত পরী আবার পানিতে নামলো। ডুব দিয়ে সবান খোঁজার চেষ্টা করলো। পানির নিচে কতক্ষণ আর দম আটকে থাকা যায়!!সবান না পেয়ে

পরী পানির উপরে এসে বড় করে দম ছাড়লো। তবে সাথে সাথে দম আটকে আসার উপক্রম হলো। কারণ চামেলির জায়গাতে স্বয়ং শায়ের দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার গেঞ্জি আর লুঙ্গি। হাটু পর্যন্ত উঠিয়ে গিট্টু দেওয়া তার লুঙ্গিটা। মনে হচ্ছে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে শায়ের। সাহসী পরী স্বামীর ভয়ে

ঢোক গিললো। শায়ের পরীকে বারবার বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে। শায়ের বাড়িতে না থাকলে তো একেবারেই পরীর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। শায়েরের হাতে একটা ছোট লাঠি দেখে পরী আরও ঘাবড়ে গেল। মারবে নাকি?? শায়ের গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আপনি পুকুরে এসেছেন কেন? আমি

যাওয়ার আগে কি বলে গিয়েছিলাম মনে রাখেননি তাই না??’-‘না মানে!! আসলে আজকেই এসেছি। আর কখনো আসবো না কথা দিচ্ছি।’

-‘আমার কথা না রেখে এখন কথা দেওয়া হচ্ছে!!’

পরী করুন স্বরে বলল,’মাফ চাইছি আর হবে না।’

-‘উঠে আসুন।’

-‘সাবান পড়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না তো। আপনি একটু দেখুন না খুঁজে!!’

পরীর অসহায় মুখ দেখে শায়ের পানিতে নামলো। ডুব দিয়ে মুহূর্তেই সাবানটা খুঁজে আনলো। সাবান দেখে পরীর মুখে হাসি ফুটল। শায়েরের থেকে সাবানটা নিয়ে বলল,’যাক অবশেষে পাওয়া গেল।’

-‘এখন আর খুশি হওয়া লাগবে না। আমাকে কথা দিন আর কখনোই পুকুরে আসবেন না। আর আমি ছাড়া কারো সাথে বাড়ির বাইরে যাবেন না।’

-‘আমাকে নিয়ে এতো ভয়ের কি আছে মালি সাহেব?’

শায়ের পরীর হাতটা ধরে কাছে টেনে নিলো বলল, ‘আমার একটি

মাত্র পরীজান। আমি চাই না যে আমি ছাড়া পরীজানের দর্শন অন্য পুরুষ করুক। আপনাকে আমার কাছে খুব যত্ন করে আগলে রাখবো।'

-'আপনার হাতে লাঠি দেখে ভাবলাম মারবেন বুঝি আমাকে!'

-'ভালোবেসে কাঁদতে চেয়েছেন না? লাঠি দিয়ে মেরে কাঁদাবো।'

পরী মৃদু রাগ নিয়ে বলে,’কি????’শায়ের হাসলো অতঃপর পরীকে নিজ আলিঙ্গনে নিয়ে বলে,’ভালোবেসে কুল পাইনা আবার মারবো?’

পাড় থেকে চামেলির গলা শোনা গেল,’আরে সেহরান ভাই তোমরা অহনও উঠো নাই। ঠান্ডা লাগবো যে।’

থতমত খেয়ে পরীকে ছেড়ে দিলো শায়ের। কিন্ত চামেলির ভাবান্তর নেই। বোকা মেয়েটা অতো কিছুই বুঝলো না। শায়ের ধমকে চামেলিকে বলল,'তোর মার খেয়ে হয়নি না? দাঁড়া আবার আসছি।'

দৌড়ে চলে গেল চামেলি। একটু আগে শায়ের পুকুর পাড়ে এসে চামেলিকে দু'ঘা লাগিয়েছিল পরীকে

ঘাটে আনার জন্য। বাড়ি ফিরে এসে সে যখন দেখলো ঘরে পরী নেই তখন ফুপুকে জিজ্ঞেস করে। শায়ের কে রাগ করতে দেখে সমস্ত দোষ তিনি চামেলির উপর দিয়ে দেন। যার ফলস্বরূপ লাঠির বাড়ি চামেলির উপর পড়ে।

পরীকে নিয়েই বাড়ি ফিরে এলো শায়ের। আজকে ভালোয় ভালোয়

বেঁচে গেছে। আর এই ভূল করা যাবে না। মালার কথা মনে পড়ল পরীর। মালা শায়ের কে বলেছিল পরীকে আগলে রাখতে। শায়ের সেই চেষ্টাই করছে।

ভেজা কাপড় বদলে ঘরে এলো পরী। সে শায়ের কে জিজ্ঞেস করল,'আপনি আজ চলে এলেন যে? বলে গেলেন তো ফিরতে সন্ধ্যা

হবে।'-'আপনাকে দেখার আকাঙ্খা আমাকে টেনে নিয়ে এলো পরীজান। পারলাম না থাকতে। আপনি কি আমাকে একটুও মনে করেননি?'

-'আপনাকে তো ভুলিনি তাহলে মনে পড়বে কি? একটা মানুষ কে তখনই মনে পড়ে যখন তাকে ভুলে যায়।'

শায়ের পরীর কাছের আসার চেষ্টা করতেই খুসিনা এসে ঢুকলো। মুখটা বিকৃত করে শায়ের সরে গেল।

তাকে আবার আড়তে যেতে হবে। প্রতিদিন দুপুরে সে খাওয়ার জন্য আসবে। এই চুক্তিতে সে কাজে ঢুকেছে। এখন যাবে আবার আসবে সন্ধ্যার পর। বেশিক্ষণ থাকলো না শায়ের। দুপুরের খাবার শেষ করেই

সে চলে গেল।পরী পরবর্তী সময়টুকু শায়েরের জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগলো। অপেক্ষা করতে করতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। ফুপু বাড়িতে নেই। অভ্যাস মতো সে পাশের বাড়িতে গেছে। দরজায় টোকা পড়তেই খুশি হলো পরী। দ্রুত দরজা খুলতে গিয়েও থেমে গেলো। শায়ের বলেছিল রাতে সে যদি না

ফেরে তাহলে দরজায় আওয়াজ পেলেই যাতে সে দরজা না খোলে। তাই পরী থেমে গেলো। আগে জানা দরকার কে এসেছে?? তাই সে জিজ্ঞেস করলো,'কে??'

অপর পাশে থেকে জবাব না পেয়ে পরী বুঝে গেল যে শায়ের আসেনি। তাহলে কে এসেছে?দরজায় কান লাগিয়ে ওপাশে উপস্থিত মানুষটার

পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে পরী। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আর শব্দ শোনা গেল না। পরী ভাবল বোধহয় শায়েরই এসেছে। তাকে পরীক্ষা করছে। তাই সে পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত হলো। আবারো জিজ্ঞেস করল,’পরিচয় না দিলে দরজা খোলা যাবে না। যদি কথা না

বলেন তাহলে চলে যান এখান থেকে?'

এবার জবাব এলো। মোটা কণ্ঠস্বরে একজন পুরুষ বলে উঠল,'সেহরান ভাই আছে??'

চমকে গেল পরী। সত্যিই তো শায়ের আসেনি। তাহলে কে এলো? দরজা তো কিছুতেই খোলা যাবে না। কিন্তু ভয় সে পেলো না। শত্রুকে

প্রতিহত করতে পরী জানে। এই একজন কে শেষ করতে কয়েক মুহূর্তই যথেষ্ট। পরী দরজা থেকে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলে,’উনি বাড়িতে ফেরেনি আপনি চলে যান।’গেলো না লোকটা। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে বলে,’নতুন ভাবি আমি হইলাম পলাশ। আপনের দেবর, দরজাডা এট্টু খোলেন।

আপনের লগে সাক্ষাৎ করতে আইলাম।’

পরী জানে না আদৌ কোন দেবর আছে কি না। এটাকে তো কিছুতেই ঘরে আসতে দেওয়া যাবে না। পরী বলল,’আপনি চলে যান। আপনার ভাই আসলে তখন আইসেন। আপাতত চলে যান।’

পলাশ যাইতে চাইলো না। পরীকে বারবার দরজা খোলার অনুরোধ করতে লাগল। পরী জবাব দিতে দিতে হয়রান শেষে হাল ছেড়ে পালঙ্কে বসে রইল। পলাশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ বাদেই আবার দরজার কড়া নাড়লো কেউ। পরী বিরক্ত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই পলাশ

নামের লোকটা আবার এসেছে। সে রেগে বলে,’এতো ঘাড়ত্যাড়া কেন আপনি? এসেছেন কেনো আবার? চলে যান!!’

তবে এবারের গলার আওয়াজ পরিচিত পরীর।

-‘আপনি কি আমার উপর রেগে আছেন পরীজান?’

থতমত খেয়ে পরী দ্রুত দরজা খুলে দিলো। শায়ের কে দেখে মৃদু হাসার চেষ্টা করে ঘরে আসতে দিলো। শায়ের এখনও প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে পরীর দিকের তাকিয়ে আছে। পরী তা বুঝতে পেরে বলল,’পলাশ নামের আপনার কোন ভাই আছে?’-‘কেন বলুনতো??’

-‘সে এসেছিলো আপনার খোঁজে। ভেতরের আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমি আসতে দেইনি।’

শায়ের কপাল কুঁচকে এলো। চিন্তিত হয়ে বলল, ‘পলাশ বাড়ি এসেছে!!

-‘আপনি চিনেন পলাশকে?’

-‘চামেলির বড় ভাই পলাশ। ভালো ছেলে ও।’

পরী মাথা নাড়লো। শায়ের বলল,'কিন্ত ওর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন।'

-'কেন??'

-'ভালো ছেলেদের থেকে দূরে থাকবেন আর খারাপ ছেলেদের কথা তো বাদই দিলাম।'

-'তা আপনি কেমন ছেলে মালি সাহেব??'

-‘আমি আপনার স্বামী পরীজান। আমি যেমনই হইনা কেন আপনার বাস আমাতেই হবে।’

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফুলগুচ্ছ বের করে পরীর হাতে দিলো। আবারও সেই বেলিফুল। সাদা রঙের এই ফুলটিতে মন মাতানো সুবাস থাকে। কেমন যেন নেশা ধরে যায় পরীর।

নাকের কাছে ফুল নিয়ে ঘ্রাণ নিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

-‘আপনি ফুলের নেশায় আসক্ত আমি পরীজানের নেশায়।’

শায়েরের চোখে চোখ রেখে পরী বলে,’মালি সাহেব যে নিজ হস্তে গড়েছে বাগান। এই ফুলের নেশায় আজীবন আসক্ত থাকতে চাই।’-‘একজন মানুষের সবকিছু

পরিবর্তন হলেও আসক্তির পরিবর্তন কখনো হয়না। আপনি আমার সেই আসক্তি যা কখনোই পরিবর্তন হবে না পরীজান।'

দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টি বিনিময় হলো দুজনের। যে ঠোঁটের হাসির থেকে চোখ ফেরানো যায় না সে হাসি মারাত্মক সুন্দর। যা সামনের পুরুষটিকে প্রচন্ড বেগে আঘাত করে যাচ্ছে।

ভালোবাসা সুন্দর হলে তার দেওয়া সবকিছুই সুন্দর।

-'আপনার হাসি সুন্দর।'

-'শুধুই সুন্দর??'

হাসলো শায়ের। এই প্রশ্নটা পরী আরেকবার করেছিল তাকে। শায়ের সপ্তবর্ণে সেই উত্তর দিয়েছিল। কিন্ত এবার সে আর কিছু বলল না। তবে পরী বলল,'আপনার হাসিও কম

সুন্দর নয়। আপনার মতোই আপনার হাসি সুন্দর।’

-‘পুরুষ মানুষ কখন সুন্দর হয় জানেন?’

-‘কখন?’

-‘একজন পুরুষ সুন্দর তখনই যখন নারী তার কাছে সুখি।’

-‘তাহলে আপনি আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুদর্শন

পুরুষ।’শায়েরের মতে সব পুরুষ সুন্দর হয় না। চেহারায় মাধুর্য থাকলে কি মনটাও মাধুর্যময় থাকে? নারীকে সুখি রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপন্থা হলো পুরুষের ভালোবাসা। যাতে নেই কোন লোভ,বিদ্বেষ, হিংসা। যে পুরুষ ভালোবাসা দ্বারা একজন নারীকে সুখি রাখতে পারে একমাত্র সেই সর্বোত্তম।

সকালে পলাশ আবারো এসেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে অনবরত। তখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। পলাশ ভাবছে সে শায়ের কে ডাকবে কি না? এরই মধ্যে খুসিনা চলে আসে। চুলার ছাই ফেলার জন্য ভোরেই সে ঘুম থেকে ওঠে। রান্নাঘরের যাওয়ার সময় দেখলো পলাশ শায়েরের ঘরের দরজার

সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। তিনি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,'এই হতচ্ছাড়া!!তুই এই সক্কালে এইহানে কি করস??'

পলাশ চমকে ফিরে তাকালো। ফুপুকে দেখে একগাল হেসে বলল,'কাইল রাইতে আইলাম নতুন ভাবি দরজা খুলল না। হের লাইগা

এহন আইলাম। হেরা মনে হয় ঘূমাইতাছে।’

-‘ঘুমাইবো না তো কি করবো? তোর মতো বলদের লাহান ঘুরবো? এইহানে আইছোস ক্যান??’

পলাশ যে চামেলির মতোই বোকাসোকা তা জানে ফুপু। কেউ কোন কথা বললে তা কিছুতেই পেটে রাখতে পারে না। গড়গড়

করে সব বলে দেয়। তাই সে বলে,'মা'য় কইলো সেহরান ভাই নাকি বিয়া করছে। বউ নাকি আমাগো চম্পার থাইকা মেলা সুন্দর। হের লাইগা দেখতে আইলাম।'-'এই বলদ এতো বিয়ানে কেউ বউ দেখতে আহে? যা সর!! আর তোরে সেহরান ওর বউ দেখতে দিবো না।'

-‘ক্যান দিবো না। আমি কি মা’র মতো ঝগড়া করি?’

খুসিনা রেগে আরো দুকথা শুনিয়ে দিলো। দুজনের চেঁচামেচিতে শায়ের পরীর দুজনেই জেগে গেলো। শায়ের দরজা খুলে বের হতেই পলাশ সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল,’সেহরান ভাই উইঠা পড়ছে। নতুন ভাবি উঠছে কই দেহি।’

শায়েরের মেজাজ গরম হয়ে গেল। আরেকটু ঘুমাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পলাশের জন্য আর তা হলো না। সে বলল,'তুই এখন ঘরে যা।'

-'ফুপু কইলো তোমার বউ নাকি দেখতে দিবা না? ক্যান?'

-'সেটা তোর মা ও ভালো করেই জানে। যা গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আর এখন এখান থেকে না গেলে কানের

নিচে মারব।’পলাশ পরিমরি করে দৌড়ে পালালো। বয়সে চম্পার ছোট সে এবং চামেলির বড়। বয়স বেশি নয়। তবে বুদ্ধি কম। যে যা বলে তাই করে। শুধু মিষ্টি খাওয়ার লোভ দেখালেই হলো। বছর খানেক আগে পলাশ নদীতে যায় গোসল করতে। ওখানকার ছেলেরা ওকে মিষ্টির লোভ দেখিয়ে বলে মেয়েরা যেখানে

জামাকাপড় বদলায় সেখানে উঁকি দিতে। মিষ্টির লোভে সে তাই করে। সেদিন বেশ মার খেতে হয়েছিল পলাশকে। তার পর হেরোনা তার ভাইয়ের কাছে পলাশকে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আর বাড়িতে আসেনি। ছেলেকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হেরোনা। এই বোকা ছেলেটা কবে একটু ভালো মন্দ বুঝবে?

গ্রামের মাতব্বর ইলিয়াস আলী। খুবই ভালো একজন লোক। শায়ের গ্রামে খুব একটা আসতো না। তবুও শায়ের কে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাইতো তিনি স্বেচ্ছায় শায়ের কে কাজে নিয়েছেন। শায়েরের কাজ হলো মালপত্রের হিসাব রাখা। প্রতিদিন কতো মাল আসছে যাচ্ছে তা লিখে রাখে সে।

লোকদের নানান ধরনের পরামর্শ ও দিয়ে থাকে। শায়েরের কাজে আগ্রহ দেখে ইলিয়াস আলী ভারি খুশি হন। তার ছেলে নেই দুটো মেয়ে। এই বয়সে কাজ সামলাতে হিমশিম খান তিনি। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন জামাই তার ব্যবসা দেখবে। কিন্ত ভাগ্যক্রমে এমন জামাই তিনি পেয়েছেন যে সে

ব্যবসার কিছুই বুঝে না।অবশেষে শায়ের কে পেয়ে তিনি ভিশন খুশি। শায়ের টেবিলে বসে খাতা দেখছে। ইলিয়াস আলী ওর পাশে চেয়ার টেনে বসল। শায়ের বলল,’কেমন আছেন চাচা?’

-‘আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি বাবা। তুমি এসে বড় উপকার করলে। আমি জেনে খুব খুশি হয়েছি

যে তুমি এখন থেকে গ্রামেই থাকবে।'

-'জ্বী চাচা,আপনাদের দোয়া আমাকে গ্রামে ফিরিয়ে এনেছে।'

ইলিয়াস আলী ইতস্তত করছে। হয়তো তিনি কিছু বলতে চান। শায়ের তা বুঝতে পেরে বলল,'চাচা আপনি কিছু বলতে চাইলে নির্ভয়ে বলতে পারেন।'

-‘আসলে সেহরান, বড়ই দুঃখে আছি। বড় জামাই তো কিছুই জানে না। ভাবতাছি ছোট মেয়েকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেবো যাতে ছোট জামাই আমার ব্যবসা দেখতে পারে।’

-‘ভালো তো। আপনি চাইলে আমিও খুঁজে দেখতে পারি।’

-‘বাবা সেহরান এলিনার মা তোমাকে পাত্র হিসেবে খুব পছন্দ করে। তোমার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারলে খুশি হবে খুব।’শায়ের চমকালো না। ও আগেই কিছুটা আন্দাজ করেছিল। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সুরে সে বলতে লাগল,’চাচা আপনি হয়তো জানেন না। অবশ্য আমার বাড়ির আশেপাশের মানুষ ই

শুধু জানে আমি বিবাহিত। সেজন্য আপনিও হয়তো জানেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন।’

চমকে গেলেন ইলিয়াস আলী। সাথে হতাশাগ্রস্থ ও হলেন। কিছুক্ষণ মৌনতা পালন করে হাসি মুখে বললেন,’আমি তো জানতাম না বাবা। না জেনে বলে ফেলেছি তুমি কিছু মনে করো না।’

-'আপনি আমার বাবার মতো। কিছু মনে করব কেন?'

-'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে নতুন বউ কে নিয়ে কাল আমাদের বাড়িতে আসবে। তোমাদের দাওয়াত রইলো। না আসলে আমি বেজার হবো।'

শায়ের হেসে সম্মতি দিলো। সে পরীকে নিয়ে যাবে ওনার বাড়িতে।

ইলিয়াস চলে গেলে শায়ের নিজের কাজে মন দিলো। কাজের সময় যেন কাটে না। অথচ পরীর সাথে কাটানো সময়টা যেন দ্রুত চলে যায়।

দুপুর হতেই ফিরে এলো শায়ের। পরী তখন গোসল সেরে উঠোনে শাড়ি মেলছে। শায়ের তা কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নে পর্যবেক্ষণ করলো। পরী

পেছন ফিরে শায়ের কে দেখেই সেদিকে এগিয়ে গেলো। শায়েরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে। পরী নিজের আঁচল শায়েরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,’ঘাম ঝরছে আপনার। মুছে নিন।’-‘আপনি মুছে দিলে মন্দ হয় না।’

পরী বিনা বাক্যে ঘাম মুছে দিয়ে শায়ের কে নিয়ে ঘরে আসে। হাতপাখা এনে শায়ের কে বাতাস করতে করতে বলে,'রৌদ্রের মধ্যে ছাতাটা নিয়ে গেলেই পারেন।'

-'হুমম। আমি রোজ দুপুরে না এসেও পারতাম। কেন আসি জানেন কি?'

পরী না সূচক মাথা নাড়ায়।

-'আপনি যখন রোজ দুপুরে গোসল করে ভেজা চুলে গামছা পেঁচিয়ে কাপড় মেলতে যান। তখন আপনাকে সবচাইতে বেশি মোহনীয় লাগে। এই দৃশ্যটা আমি প্রতিদিন দেখতে চাই। আপনি নিজেও জানেন না যে তখন কতটা স্নিগ্ধ লাগে আপনাকে।'পাখা ঘুরানো থেমে গেল পরীর। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে

রইল শায়েরের পানে। শায়ের বলেছিল তার ভালোবাসা পরীকে রোজ কাঁদাবে সেজন্য কি এই মুহূর্তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে পরীর? পরী খেয়াল করলো তার চোখ থেকে এখনি নোনাজল গড়িয়ে পড়বে। শায়ের বসা থেকে চট করে দাঁড়িয়ে আগলে নিলো পরীকে। চোখের জল পড়ার আগেই তা মুছে দিলো। গালে

হাত রেখে পরম স্নেহে চুম্বন করলো পরীর গলায়। তখনই ভারি কিছু টিনের চালে পড়তেই শায়ের পরী ছিটকে দূরে সরে গেল। কি হয়েছে তা দেখার জন্য শায়ের বাইরে এলো। দেখলো উঠোনে একটা বড়সড় নারকেল পড়ে আছে। এটাই সম্ভবত চালের উপর পড়েছে। তখনই নারকেল গাছ থেকে

পলাশের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,'সেহরান ভাই সরেন। নাইলে আপনের মাথায় পড়বো।'ছোট্ট টিনের ঘরের চারিদিক দিয়ে বেড়া দেওয়া। কলপাড় রান্নাঘরের চারিদিকও ঢাকা। শায়েরের ঘরটা খুব বেশি জায়গায়া জুড়ে নয়। বেড়ার ধার ঘেষে বড় একটা নারকেল গাছ। বেশ বড়বড়

নারকেল ধরেছে তাতে। ভর দুপুরে পলাশের ইচ্ছা করছে পিঠা খাবে। হেরোনার কাছে বায়না ধরতেই তিনি বললেন নারকেল পাড়ার জন্য। হুট করেই সে গাছে চেপে বসে আর বিপত্তি ঘটায়। শায়ের বুঝতে পেরেছে এই ছেলেটা যতদিন বাড়িতে থাকবে কাউকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। খুসিনাও চলে

এসেছে। তিনি হেরোনার ঘরের সামনে গিয়ে গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন,'ও হেরো,,তোর বলদ দামড়া পোলা কি মানুষ হইবো না? এই ভর দুপুরে গাছে উইঠা কি করতাছে?'

হেরোনা ও তেড়ে এলেন ঘর থেকে,'তাতে তোমার কি? আমার পোলায় পিঠা খাইবো। তোমার এতো

বাধে ক্যান?'-'ঘরের চালে নারকেল ফালাইছে। ঘরটা তো খাইবো। পোলা নামা।'

-'নামবো না আমার পোলা। আমি দেখছি আমার পোলার ভালা তোমার সহ্য হয়না। তা দূরে যাও না। এইহানে আহো ক্যান??'

শায়ের ধমকে পলাশকে গাছ থেকে নামায়। চালের টিন দেবে গেছে

কিছুটা। এটাকে ঠিক করতে হবে নয়তো বাদল দিনে বৃষ্টির পানি পড়বে। ঝামেলা ছাড়া এই ছেলে আর কিছুই করতে পারে না। বছর খানেক আগে যে ঘটনা ঘটিয়েছে তারপর এখন বাড়িতে এসেছে। বাইরের কেউ দেখলে আস্ত রাখবে না ওকে।

কয়েক দিন পরই চলে যাবে সে। তাই হেরোনা আদর যত্ন করছেন ছেলেকে।

এই মুহূর্তে হেরোনার সাথে ঝগড়ার কোন মানেই হয় না। খুসিনা যা বলার বলুক। তাই শায়ের আর সেদিকে এগোলো না। নিজ গন্তব্যে সে চলে গেল। কিন্ত নারকেল গাছটা আর সে রাখলো না। পরের দিন

লোক দিয়ে কেটে ফেললো। হেরোনার রাগ হলেও কিছু বলতে পারলেন না। কেননা শায়েরের বাবার জমি শায়েরের চাচারা মিলে দখল করে রেখেছে। শায়েরের দাদা তার সমস্ত সম্পত্তি চার ছেলেকে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন। একমাত্র ছেলে হওয়াতে বাবার সম্পত্তি শায়ের পেয়েছে। কম করে বিঘা

দুয়েক কিংবা তার থেকে একটু কম হবে।

শায়ের কখনোই নিজের সম্পত্তি চায়নি।

এখন কিছু বললে শায়ের যদি তার সম্পত্তির অধিকার চেয়ে বসে? হেরোনা কিছুতেই তা হতে দেবে না। তাই তিনি আগ বাড়িয়ে কিছু বললেন না। বাকি দুই জা কেও চুপ

থাকতে বললেন। তবে চিন্তা হেরোনার গেলো না। কেননা শায়ের এখন বিয়ে করেছে। বাচ্চা হলেই তো শায়ের নিজের ভাগ বুঝে নেবে। এজন্য বেশ চিন্তা হয় হেরোনার। জমিদার বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছে গ্রামের শত শত মানুষ। মহিলারা আঁচলে মুখ ঢেকে অন্দরে যাচ্ছেন আবার বের হচ্ছেন। চোখের

পানি ফেলছেন কেউ কেউ। বাইরের লোকজন বাঁশ কেটে এনে রাখছেন। কয়েক জন মিলে কবর খুড়ছেন জমিদার বাড়ির পাশে থাকা কবরস্থানে। গরুর গাড়িটি এসে থামতেই আগে নামলো শায়ের। তারপর পরী। ভিড় জমানো স্রোতারা রাস্তা দিলো পরীকে ভেতরে যাওয়ার। পরী ধীর পায়ে অন্দরে

ঢুকল। অন্দরের উঠোনে আজ অনেক মহিলারা। সবাইকে এক নজর দেখে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় চলে গেল সে। সারিবদ্ধ ঘরগুলো পেরোতে লাগলো সে। শেষের আগের ঘরটাতে ঢুকতেই পরিচিত মুখগুলো দেখতে পেল পরী। মালা জেসমিন মেঝেতে বসে আছে। রুপালি পালঙ্কের উপর বসে

আছে। আবেরজানের পুরো শরীর চাদরে ঢাকা।কাল রাতে পরলোকগমন করেন আবেরজান। পরীকে রাতেই খবর পাঠানো হয়। খবর পাওয়ার পর শায়ের দেরি করেনি। তখনই নূরনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় পরীকে নিয়ে। দীর্ঘ আটমাস পর পরী নিজ বাড়িতে পা রেখেছে। কাজের জন্য শায়ের সময়

পাচ্ছিল না বিধায় আসতে পারে না। কিন্তু আবেরজানের মৃত্যুর খবর শুনে তো আর থাকা যায় না। ইলিয়াস কে না জানিয়েই আসতে হলো।

পরী রুপালির পাশে গিয়ে বসতেই রুপালি ওকে ধরে কেঁদে উঠল বলল,'দাদি আর নেই রে পরী। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

পরী শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বোনকে। তবে ওর খারাপ লাগলেও চোখে পানি আসলো না। কারণ আবেরজানের জন্য মালার জীবনটা দূর্বিষহ হয়ে গিয়েছিল। তার কটু কথাতে মালা কষ্ট পেতো। সেজন্য পরী দাদিকে খুব একটা পছন্দ করতো না। তাই তার মৃত্যুতে এতো শোক পালন করার কোন মানেই হয়

না বলে পরীর ধারণা। তবে মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না।জেসমিন আর মালা গুনগুন করে কেঁদে যাচ্ছেন। শ্বাশুড়ি যেমনই হোক না কেন মা বলে ডেকেছেন এতোদিন। সম্মান দিয়েছেন,সেই মানুষটা আজকে সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। কষ্ট তো হবেই।

মহিলারা ধরাধরি করে আবেরজান কে নিচে নামালো। গোসল করালো গরম পানি দিয়ে। তারপর সাদা কাফনে মুড়ে দিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিলো। আগরবাতি আর গোলাপজলের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে। আবেরজানকে নিয়ে যাওয়ার আগে শেষ দেখা দেখতে এলো সবাই। পরী খাটিয়ার পাশে

দাঁড়িয়ে আছে। তার স্থির দৃষ্টি আবেরজানের বন্ধ চোখে। একসময় কতোই না এই মহিলার মৃত্যু কামনা করেছে সে। তখন অতো কিছু বোঝেনি। কিন্ত এখন একটু হলেও কষ্ট হচ্ছে। নিজের রক্ত বলে কথা। রুপালি হুট করেই আবেরজানের পা জড়িয়ে বসে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,'মাফ করে দিও দাদি।

না জেনে অনেক কথা বলেছি তোমাকে। ভুল বুঝেছি, বেঁচে থাকতে বুঝতে পারিনি। মাফ করো তুমি।’

মালা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদেন। শেষ বিদায় সবাই চোখের পানিতেই দেয়। সে যত খারাপ মানুষ হোক না কেন? কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষেরও আপনজন আছে।

কারো না কারো ভালোবাসা সেও পায়। বিদায় নিয়ে চলে গেল আবেরজান।

পুরো অন্দর শান্ত এখন। ঘুর্ণিঝড়ের তান্ডব শেষ হওয়ার পর যেমন শান্ত হয় পরিবেশ। ঠিক তেমনি।

মানুষ জন একে একে চলে গেছে নিজ গৃহে। অন্দরের বারান্দায় বসে আছে সবাই। কুসুম আর শেফালি

ভাত ডাল ঘরে নিচ্ছে। কেউ মারা গেলে সে বাড়িতে তিনদিনের মধ্যে চুলায় আগুন জ্বালানো নিষেধ। তাই প্রতিবেশীরা রান্না করে দিয়ে যাচ্ছে। যারা কবর খুড়ছেন এবং বাকি কাজ করেছেন তাদের খাইয়ে বিদায় করা হয়েছে।

ঘরের মহিলারা শুধু বাঁকি আছে। কুসুম কাউকে খেতে ডাকার সাহস

পাচ্ছে না। কারো মন তো ভালো নেই। কেউ তো খাবে না বলে মনে হয়। কুসুম পরীর অভিব্যক্ত বুঝতে পেরে সেদিকে এগোয়। গিয়ে জিজ্ঞেস করে,’কি হয়েছে কুসুম?’কুসুম অত্যন্ত নিচু গলায় বলে,’কাইল রাইত থাইকা সবাই না খাওয়া আপা।’

-‘আচ্ছা চল রান্নাঘরে। সব গুছিয়ে আমি সবাইকে খেতে ডাকছি।’

কুসুম আর পরী রান্নাঘরে গেলো। সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। পরী কুসুমের হাতে হাত লাগিয়ে সব গোছাতে লাগলো।

-‘গেরামে যে কি হইলো খালি মানুষ মরতেই থাহে। আল্লাহ কোন গজব ফালাইলো তা তিনিই ভালো জানে।’

-‘আল্লাহ যাদের পছন্দ করেন তাদের সবসময়ই পরীক্ষা করেন। কি জানি আমাদের উপর এতো পরীক্ষা কেন করছেন?’

পরী একটু চুপ থেকে কুসুম কে জিজ্ঞেস করে,’বিন্দুর খুনিদের কি খবর কুসুম? আমি দূরে থাকি বিধায় কোন খবর পাই না। তুই জানিস?’

হঠাৎ করেই মনমরা হয়ে গেল কুসুম। মনে হচ্ছে রাজ্যের কষ্ট তার ভেতরে চাপা পড়েছে। সে বলে,’কি কমু আপা? বিন্দু তো গেলো লগে তার সম্পানরেও নিয়া গেলো।’পরীর হাত থেমে গেলো। ডালের বাটিটা রেখে বলল,’সম্পান মাঝি!! কি বলছিস কুসুম? ভাল করে বল।’

-‘আপনে জানবেন কেমনে আপা? আপনে তো অনেক দূরে থাহেন। আপনে এই বাড়ি থাইকা যাওয়ার সাতদিন পর সম্পান গলায় দড়ি দিছে আপা। বিন্দুরে যেই গাছে ঝুলাইছিলো হেই ডালেই ফাঁসি দিছে। সম্পানের মা পাগল হইয়া গেছে আপা।’

পরী নিশ্চুপ রইলো কিছুক্ষণ। সম্পান যে এভাবে আত্মহুতি করবে তা ভাবেনি পরী। সম্পানের জন্য খারাপ লাগছে। বিন্দুকে ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন বলেই ছেলেটা নিজেকে শেষ করে দিলো!! ওদের ভালোবাসার পরিণতি এতোটা কঠিন না হলেও পারতো। কেন জানি আজ

পরীর কষ্ট হলো না। কষ্ট পেতে পেতে সে হাঁপিয়ে গেছে।

পরী আর ভাবতে পারলো না সম্পান কে নিয়ে। সে বাটিতে ডাল তুলতে তুলতে বলল,’আর কিছু নেই কুসুম? শুধু ডাল?’-‘হ আপা। আর কিছু নাই। সক্কাল সক্কাল সবাই তাড়াতাড়ি কইরা ডাল রান্না করছে।’

পরী চুপ থাকলো,ভাবলো শায়ের তো ডাল পছন্দ করে না। ও বাড়িতে শুধু পরী আর ফুপুই ডাল খেতো। কিন্তু আজকে শায়ের খেয়েছে তো? পরী চোখ তুলে কুসুমের দিকে তাকালো বলল,'উনি কি খেয়েছে কুসুম?'

-'শায়ের ভাই? খাইছে তো।'

-'তুই দেখেছিস?'

-'আমি নিজে খাওয়াইছি তারে।'

-‘ওহ।’

আর কোন বাক্য ব্যায় করলো না কেউ। পরী সবকিছুই গুছিয়ে বাইরে এলো। প্রথমে কেউ খেতে না চাইলেও পরী জোর করেই সবাইকে নিয়ে গেল। তবে পেট ভরে কারো খাওয়া হলো না। সবাই কোনরকম খেয়ে নিজ ঘরে চলে গেল। পরী ও ঘরে গেল। শায়ের জানালার ধারে

দাঁড়িয়ে আছে। পরী একবার ওকে দেখে নিয়ে আলমারি খুলে একটা শাড়ি বের করলো। আলমারি খোলার শব্দে শায়ের ফিরে তাকালো। পরীর চোখে চোখ পড়তেই পরী সেদিকে এগিয়ে গেলো। বলল,'গোসল করেছেন?'-'হুম।'

-'খেয়েছেন?'

-‘আপনি খেয়েছেন??’

-‘হ্যা খেয়েছি।’

শায়ের নিঃশব্দে হাসলো। পরীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,’আমি না খেলে কখনো খেয়েছেন আপনি? জেনেও প্রশ্ন করছেন?’

পরী প্রসঙ্গ পাল্টে বলে,’আপনি কি জানেন সম্পান মাঝির কথা??’

-‘সম্পান!!না তো,কোথায় সম্পান?’

-‘সম্পান মাঝি আত্মহত্যা করেছে।’ চমকালো শায়ের। পরীর দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। পরী বলল,’আমিও আজকে শুনলাম। কুসুম বলেছে। আমার বিন্দুর জন্য নিজের জীবনটা দিয়ে দিলো সে।’-‘জীবন উৎসর্গ করে কি ভালোবাসা প্রমাণ করা যায় পরীজান?’

-‘আমার থেকে তা আপনি ভালো জানেন। আপনার থেকেই তো ভালোবাসা শিখছি আমি। প্রতিদিন আপনার ভালোবাসার নতুন রূপের সাথে পরিচিত হই আমি। আপনিই বলুন।’

-‘আমি যদি আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করি তাহলে আপনাকে ভালোবাসবে কে

পরীজান?’জীবন দিয়ে ভালোবাসা প্রমাণ করা যায়??তাহলে শাজাহান কেন তাজমহল বানিয়ছিলো?? সেও তো পারতো তার প্রিয়তমার জন্য জীবন দিয়ে দিতে। সবার ভালোবাসা প্রকাশের ধরন এক হয় না। ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য কেউ জীবন দেয় আর কেউ হাতে হাত রেখে সারাজীবন একসাথে চলার

অঙ্গীকার করে। ভালোবাসা সম্পর্কে সবার চিন্তাধারা ভিন্ন হলেও ভালোবাসার কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় সময় এবং পরিস্থিতি। সময়ের বেড়াজালে আটকে যায় সব। পাল্টে যায় ভাগ্য লিখন।

গামছা আর শাড়ি হাতে নিয়ে ধৈর্যহীন চোখে শায়ের কে দেখছে পরী। সবসময় অদ্ভুত লাগে শায়ের

কে। যখন শায়ের কথা বলে তখন ওর চোখ থেকে চোখ ফেরানো দায়। পরী আটকে যায় সুরমা পরিহিত ওই চোখে। পরী বলে ওঠে,’আপনার পরীজান কে ভালোবাসতে হলে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে মালি সাহেব। আপনার ভালোবাসা ছাড়া পরীজান আর কিছু চায় না।’-‘সম্রাট

শাজাহান তার স্ত্রীর জন্য তাজমহল বানিয়েছে। জানেন কি??’

পরী মাথা নেড়ে বলে,’হুমম।’

-‘ভারতের সম্রাট শাজাহান। তার স্ত্রীর নাম মমতাজ। স্ত্রীকে তিনি এতোটাই ভালোবাসতেন যে তার জন্য বিশাল বড় তাজমহল বানিয়েছেন। ইতিহাস সেরা সে

মহল। তিনি তার ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য তাজমহল বানিয়েছেন।’

-‘আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন?’

শায়ের মৃদু হেসে জবাব দিলো,’শাজাহানের মতো তাজমহল বানাতে পারবো না বলে কি আমার ভালোবাসা মিথ্যা পরীজান?’

-‘এখন সারা বিশ্ব দেখলেও মমতাজ কিন্ত তাজমহল দেখেনি। আমি চাই

না আমার অনুপস্থিতিতে আপনি আপনার ভালোবাসা প্রমাণ দিন। কারণ আপনার চোখে আমি প্রতিদিন প্রমাণ পাই। শুধু এটুকুই আমার পাওয়া। তাজমহলেই কি শুধু ভালোবাসা হয়? কুঁড়ে ঘরে হয়না বুঝি??

শায়ের উত্তর না দিয়ে হাসলো। পরী আর সময় ব্যায় করে না। শায়ের

কে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে সে গোসলে চলে যায়।রুপালি তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। পরী তখন রুপালির ঘরে গেলো। মনমরা হয়ে বসে আছে রুপালি। পরীকে দেখে সে হাল্কা হাসার চেষ্টা করে। পরী হাত বাড়িয়ে দিলো ছোট্ট পিকুলের দিকে। পিকুল এখন বসতে পারে। পরীকে দেখে সে এক

পলক মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার পরীর দিকে তাকায়। পরী অবিকল তার মায়ের মতো সুন্দর। মায়ের থেকে একটু বেশি বলা চলে। তবে পরীর হাসিটা যেন রুপালির মতোই। পিকুল ঝাঁপিয়ে পড়ে পরীর কোলে। পরীর বুকের সাথে মিশে থাকে সে। রুপালি বলে,’দেখ,জন্মের পর তো

তোকে পায়নি বলতে গেলে। কি সুন্দর খালামনিকে চিনে নিয়েছে।’

-‘কেন চিনবে না? আমাদের রক্ত না? আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে যাবে?’

-‘তাই তো দেখছি।’

-‘দাদিকে কি ভুল বুঝেছো আপা? কোন ভুলের মাফ চাইছিলে তুমি?’হঠাত করেই রুপালি চুপ করে

গেলো। এদিক ওদিক পলক ফেলে চোখ আড়ালে ব্যস্ত হলো সে। পরী আবারো জিজ্ঞেস করতেই সে বলে,'অনেক কটু কথা শুনিয়েছি তাকে। বুড়ো মানুষ, আমার ঠিক হয়নি দাদির সাথে খারাপ আচরণ করা। তাই মাফ চাইলাম।'

পরী পিকুলের গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,'সেজন্য এভাবে বলার

মানুষ তুমি নও আপা। আমি জানি তুমি দাদিকে কতটা অপছন্দ করতে। কিন্তু সে কি এমন মহান কাজ করলো যে তার কাছে এভাবের মাফ চাইবে? তোমার চোখ বলছে তুমি মিথ্যা বলছো।'

রুপালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,'সত্যিই আমি দাদিকে চিনতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। মানুষের বাইরের

সত্ত্বা দেখা গেলেও ভেতরের সত্ত্বা বোঝা কঠিন। তুইও বুঝবি পরী। সময় এলেই বুঝবি।’

-‘সময়ের অপেক্ষা করতে পারবো না। তুমিই বলো।’

-‘কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর সময়ের থেকে নিতে হয়। তাহলে সেই উত্তর থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এখন বল একটা প্রশ্নের উত্তর নিবি নাকি

অনেক প্রশ্নের?’জবাব না দিয়ে রুপালির দিকে তাকিয়ে রইল পরী। এই মুহূর্তে বোনের ভাবমূর্তি বুঝতে অক্ষম সে। সবকিছু ধোয়াশা মনে হচ্ছে। পরীর মনে হচ্ছে ওর সামনে যা কিছু আছে তা শুধুমাত্রই আবছা,মেঘে ঢাকা সবকিছু। মেঘ কেটে গেলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনদিন পর মিলাদের

আয়োজন করা হয়। হুজুর ডেকে এনে ঘরেই সবকিছু সম্পন্ন করা হয়। এই তিনদিন পরী আর শায়ের জমিদার বাড়িতে থাকলেও এখন তাদের চলে যেতে হবে। পরী কেন যেন থাকতে ইচ্ছা করলেও থাকা হয়ে ওঠে না। শায়ের তাকে ফেলে যেতে নারাজ। তাই স্বামীকে ফেলে তার থাকা হয়ে ওঠে না। যাওয়ার

আগে আবেরজানের কবর দর্শনে গেলো সে। ইতিমধ্যে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়ে গেছে। একদিন মাটির নিচে সবাইকে যেতে হবে। আগে কিংবা পরে,যেতে হবেই। তবে ঈমানের সাথে যাওয়াই শ্রেয়। পরী জানে না কি এমন ভালো কাজ আবেরজান করেছে যার জন্য রুপালি আজ এতো আফসোস

করছে তার জন্য। বোনের কথামতো সে সময়ের থেকে সব জবাব নেবে বলে মন স্থির করেছে।শায়ের পরীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে,’আমাদের যেতে হবে পরীজান চলুন।’

পরী শায়েরের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার কবরের দিকে তাকালো বলল,’কবরস্থানের দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবীর সব

আয়োজন বৃথা। সব শত্রুতা,বিরোধীতা,হিংস্রতা এমনকি ভালোবাসাও এখানে স্থির। তাহলে কেন এতো দ্বন্দ্ব মানুষের মাঝে?কেন সবাই কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় না?’

-‘সবার মস্তিষ্ক একই রকম দেখতে হলেও চিন্তাধারা এক নয় পরীজান। সবাই যদি আপনার মতো ভাবতো

তহলে সবাই ভালোবাসাতে পূর্ণ থাকতো। ঠিক আপনার মতো।’

অতঃপর পরীর হাত ধরে নিয়ে গেলো শায়ের। যাওয়ার আগে বাড়িটাকে ভালোভাবে দেখে নিলো পরী। এই কি সেই বাড়ি যে বাড়িতে পরী ছিলো? সবকিছুই স্বাভাবিক থাকলেও পরীর কাছে সবকিছু অস্বাভাবিক লাগছে। পরীকে

অন্যমনস্ক দেখে শায়ের জিজ্ঞেস করে,’আপনি কি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?’

পরী জবাব দিলো,’আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই জমিদার বাড়িতে কিছু একটা হচ্ছে। যা আমার অজানা। কিন্তু আম্মা,আপা,কুসুম,শেফালি,দাদি এবং জুম্মান জানে। কি এমন হয়েছে

সবার??’-‘হয়তো আপনার দাদির মৃত্যুতে সবাই কষ্ট পেয়েছে তাই এরকম লাগছে সবাইকে।’

-‘নাহ!!আমি কুসুম কে দেখেছি,রান্নাঘরে ওর সাথে খাবার বাড়ার সময় ওর হাত অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছিল। এমনকি পুরো শরীর ও। সামান্য বিষয় নিয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিল। ওর ঘাড়ে একটা ক্ষত

ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছিল পড়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত কেউ ওকে আঘাত করেছে। আর জুম্মান কে তো এই তিনদিনে দেখলামই না। যে ছেলেটা আমার এতো পাগল সেই ছেলেটার মুখ আমি তিনদিনে দেখলামই না। কিছু তো একটা হয়েছে। আম্মা,আপা,বাকি সবাই আড়াল

করছে আমার থেকে।'-'আপনার যদি সেরকম কোন সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে আপনি থাকতে পারেন। আমি বাধা দেবো না।'

পরী নিশ্চুপ রইলো। শায়ের কে একা ছাড়তে ওর মন সায় দিচ্ছে না। কেননা মানুষ টা তাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। পরী যে তার

অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া পরী নিজেও থাকতে পারবে না।

যে মানুষটির ঘুমন্ত চেহারা দেখে ঘুম ভাঙে,যার স্পর্শ না পেলে সারা রাত্রি বিনা নিদ্রায় পার হয় তাকে ছাড়া থাকার কোন প্রশ্ন আসে না। তাই সব অজানা রহস্য নূরনগরে ফেলে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি।

পরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,’ওবাড়ি থেকে চলে আসার পর সবকিছু বদলে গেছে। আপাকে রেখে আসার পর থেকে ভয়ে আছি আমি। না জানি কোন হিংস্র পশু থাবা মারে। আপা যে বড়ই দূর্বল প্রকৃতির। আঘাত সে সহ্য করতে পারে না।’

শায়ের পরীর হাত চেপে ধরে বলল,’আপনি চিন্তা করবেন না

পরীজান। অন্দরের সব নারীরা সুরক্ষিত। তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।'-'যেখানে ঘরের মানুষ থাবা মারে সেখানে বাইরের লোক কিছু না।'

-'আমাকে বলবেন কি হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে আপনি সব কথা বলছেন না। আপনিও কিছু লুকিয়ে যাচ্ছেন।'

পরী আর কথা বলল না। গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইল। কি বলবে সে শায়ের কে? আখির ওর নিজের কাকা। এই লোকটা যে ওদের তিন বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলো। শায়ের তা জানলে কি করবে? হয়তো কিছু করতে পারবে না। আখির কে দেখতে শান্তশিষ্ট মনে হলেও সে একজন ভয়ানক মানুষ।

নাহলে ভাতিজিদের দিকে কে এমন কুৎসিত নজর দেয়!! অতীত টানতে চায় না পরী। আর না শায়ের কে বলতে চায়।সূর্য যখন দিগন্ত থেকে বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই নবীনগর পৌঁছালো ওরা। ঘরে ফিরতেই চম্পা এসে হাজির হলো। পরী মুচকি হেসে চম্পাকে ঘরে আসতে বলে। পরীর সাথে চম্পার

এখন ভাব হয়েছে। চম্পা নিজেই এসেছে। পরী তাতে বেশ খুশি,সে চায় না সম্পর্কে মনোমালিন্য থাকুক। সবাই একসাথে হাসিখুশি থাকাটাই জীবনের বড় পাওয়া। তাই পরী সহজেই এবাড়ির সবার সাথে মিশছে। চম্পা আর চামেলি প্রতিদিন আসে পরীর সাথে গল্প করার জন্য। রাতে শায়ের এখন একটু দেরি করে

ফেরে সেজন্য ওরাও থাকে। কখনো আম,জাম্বুরা,তেঁতুল মেখে তিনজনে কাড়াকাড়ি করে। কখনও ঘরে বসে নায়ক নায়িকার কাহিনী বলে। টেলিভিশন না দেখলেও চম্পা আর চামেলির মুখে অনেক সিনেমার কাহিনী শোনা হয়ে গেছে পরীর। ওদের সাথে সময় কাটাতে বেশ ভালোই লাগে পরীর।

আজকেও চম্পা এসেছে পরীর সাথে গল্পগুজব করতে। সে জলপাইয়ের আচার এনেছে পরীর জন্য। পরী হাসি মুখে তা গ্রহণ করে। আচার খেয়ে বেশ প্রশংসা করলো। এর আগেও হেরোনার দেওয়া অনেক কিছুই খেয়েছে সে। তার রান্নার হাত খুব ভালো।চম্পা পরীর থেকে বিদায় নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলো। ঘরে

ঢুকতেই হেরোনার মুখোমুখি হলো সে। কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েকে কিছুক্ষণ দেখে হেসে ফেলল হেরোনা। চম্পাও হাসলো বলল,’সব কিছু ঠিকঠাক হইবে তো মা?’

-‘আমার কথা হুনলে সব ভালা হইবো তোর। বাটিডা দে।’

মেয়ের হাত থেকে আচারের খালি বাটিটা নিয়ে হেরোনা চলে গেল।

চম্পা নির্বাক চোখে শায়েরের ঘরের দিকে তাকালো। এই ঘরটাতে সে থাকতে চায়। শায়েরের বধূ হতে চায় তার আকুল মন। তাইতো মায়ের সাথে এক নোংরা খেলায় মেতেছে সে। এতে যে হেরোনার লোভ ও আছে তা জানে চম্পা। তবুও ভালোবাসার মানুষ কে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা এই কাজ

করতে বাধ্য করছে চম্পাকে। ওর মতে প্রিয় মানুষ কে পাওয়ার জন্য যা কিছুই করুক না কেন তা পাপ না।‘লোভ’ মানুষ কে ধ্বংস করে দেয়। সাম্রাজ্য থেকে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের লোভ তৈরি করে ধ্বংসলীলা।

লোভ কারী ব্যক্তিদের শাস্তিও ভয়ানক। আল্লাহ লোভীদের পছন্দ

করেন না। তাইতো খোদা হওয়ার লোভ ফেরাউনকে বিশাল সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে অতি আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে ফেরাউন তার নিজের শাস্তি নিজেই লিখে দিয়েছিল জিব্রাঈল (আঃ) এর কাছে। নীলনদে পানি আনার জন্য ফেরাউন যখন দোয়া করেন তখন আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নীলনদে পানি

ফিরিয়ে দেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) পাঠিয়ে দেন। তিনি ফেরাউন কে প্রশ্ন করেন,’যদি কোন মনিব তার ভৃত্য কে দুনিয়ার সমস্ত সুখ দেয়। তবুও সেই ভৃত্য তা উপেক্ষা করে নিজেই মনিব সাজতে চায় তাহলে তার কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত?’উত্তরে ফেরাউন

বলেছেন,’ওই অকৃতজ্ঞ কে এই নীল নদের পানিতে ডুবিয়ে মারা উচিত।’ ফেরাউনের উক্তিটি কাগজে লিখিয়ে নিয়ে চলে যান জিব্রাঈল (আঃ)। সেরকম মৃত্যু দেওয়া হয় ফেরাউন কে। সমুদ্রের গভীরে ডুবিয়ে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেন।লোভ কখনোই মানুষ কে শান্তিতে বাঁচতে দেয় না। হেরোনা যার কারণে সবসময়ই

আতঙ্কে থাকে। শায়েরের ভাগে যেটুকু সম্পদ রয়েছে তা হাতিয়ে আনতে পারলে বেশ হবে। হেরোনার সাথে তার স্বামী আকবর ও আছেন। সাথে বাকি দুই ভাই আর তার বউয়েরাও। তাদের পরিকল্পনার প্রধান হাতিয়ার বানিয়েছে হেরোনার মেয়ে চম্পাকে। শায়ের বলতে পাগল সে এখনও। এখনও সে শায়েরের

চরণ তলে একটু ঠাঁই চায়। যার দরুন মায়ের অন্যায় আবদার সে মেনে নিয়েছে। পরীর সাথে ভাব জমিয়েছে। কথা বলার ছলে এটা ওটা খাওয়ায়। যার সাথে এক বিশেষ ধরনের ওষুধ মেশানো থাকে যা দূর গ্রামের একজন কবিরাজের কাছ থেকে আনিয়েছেন হেরোনা। পরী যাতে সন্তান জন্ম দিতে না

পারে এবং সেই সুযোগে চম্পাকে শায়েরের সাথে বিয়ে দিবেন হেরোনা। এই সামান্য সম্পদের জন্য এখন মেয়েকেও উৎসর্গ করেছেন তিনি। চম্পাকে বুঝিয়েছে শায়ের তো পুরুষের জাত। বাচ্চা না হলে মেয়ে মানুষের দাম থাকে না। সে যতোই রূপবতী হোক না কেন!! তেমন করে পরীকেও সে ছুড়ে

ফেলে দিবে। তার পর চম্পার সাথে শায়েরের বিয়ে দেবেন। চম্পাও খুশি মনে তা মেনে নিয়েছে। মায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে সে। কিন্ত শায়েরের পরীজান সম্পর্কে অবগত নন বলেই এসব কাজ করছে হেরোনা। যদি জানতো তাহলে এরকম জঘন্য চিন্তা মাথায় আনতো না।শায়ের দুপুরের খাবার

খেতে এসেছে। উঠোনে পরীর পরনের শাড়ি দেখে দেখে অবাক হলো সে। কেননা শায়ের ফেরা না পর্যন্ত পরী গোসল করে না। শায়ের যেদিন তাকে বলেছিল তার সবচেয়ে মোহনীয় রূপ হচ্ছে যখন সে গোসল করে কাপড় মেলতে যায়। সেই দৃশ্যটা শায়ের কে উপভোগ করানোর জন্য দুপুরে শায়ের ফেরার

পর পরী গোসলে যায়। তাহলে আজকে হলো কি পরীর?? ঘরে আসতেই দেখলো পরী নামাজ পড়ছে। শুক্রবার বিধায় আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছে শায়ের। সে ভাবছে এখনও তো নামাজের সময় হয়নি। পরক্ষণে ভাবলো হয়তো নফল নামাজ পড়ছে। তাই শায়ের ও চলে গেল গোসলে। তারপর সেও

চলে গেল মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে। শুক্রবারে দুপুরের পর বাড়িতেই থাকে শায়ের। নামাজ শেষে ফিরে এসে দেখে পরী অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে। শায়ের পরীর পাশে বসে বলে,'আপনার কি মন খারাপ পরীজান?'

হঠাৎ শায়েরের কথায় চমকে ওঠে পরী। কোন এক ধ্যানে মগ্ন ছিলো

সে। শায়েরের কথাতে ধ্যান ভঙ্গ হলো তার।-‘আপনি কি বাড়ির জন্য চিন্তিত?’

-‘নাহ তেমন কিছু না।’

-‘আপনার চোখ দেখে মনের ভাবনা কিছুটা বুঝতে পারছি। আপনি কি বাড়িতে যেতে চান? তাহলে নিয়ে যাবো।’

-'নাহ!!বাড়িতে আমি যাবো না। ক'দিন হলো তো এসেছি। আমার কিছু হয়নি।'

-'তাহলে আপনার মুখে হাসি নেই কেন পরীজান? আমি যেই হাসিটা দেখার জন্য ছুটে আসি সেই হাসিটা আজ কেন দেখতে পেলাম না? আপনি কি আমার কাছে সুখি নন পরীজান?'

পরী তৎক্ষণাৎ শায়েরের হাত মুঠোয় নিয়ে বলে, ‘আপনি ছাড়া আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কাছেও সুখি থাকতে পারবো না। তাই এই প্রশ্ন আপনি কখনোই করবেন না।’

পরম যত্নে স্ত্রীর গালে হাত রাখলো শায়ের। তারপর বলল,’তাহলে আমার থেকে কিছু লুকাবেন না। সব

বলুন ভালো লাগবে।’পরী শায়েরের হাত জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখে। বলে,’আপার বাচ্চাকে দেখেছেন??কি সুন্দর তাই না?’

পরীর মনোভাব সব বুঝে গেল শায়ের। সেও হাত ধরে পরীর তারপর বলল,’আপনার চাই তাই তো?’

-‘ফুপু বলেছিলেন একটা বাচ্চার কথা,কিন্তু??’

একটু চুপ থেকে পরী বলে,’আচ্ছা আমি কি মা হতে পারবো না?’

-‘আল্লাহ চাইলে সব পারেন পরীজান। আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ আপনার সাথে আছেন। কখনো আর এই চিন্তা করবেন না।’

-'অনেক দিন তো পার হয়ে গেল। আমার কিছু ভালো লাগছে না। আর ফুপু,,'

-'বুঝেছি ফুপু আপনাকে চাপ দিচ্ছে তাই তো।'

-'নাহ,ফুপুর ও তো মন চায় তাই না?তাছাড়া আমিও চাই।'

-'এতো চিন্তা করবেন না। আপনাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে ভালো

লাগেনা আমার। আমার পরীজান কে সবসময়ই হাসিখুসি দেখতে চাই।’পরীকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শায়ের। নাজানি এখন একটা বাচ্চার জন্য পরীকে কথা শুনতে হয়। ভাবনাটা সেটা নিয়ে নয়। ভাবনা হলো পরী তখন কীভাবে নেবে বিষয়টা?

নিশ্চয়ই কঠিন ভাবে প্রতিবাদ করবে। তখন না অশান্তির সৃষ্টি হয়। মন ভাল করার জন্য পরীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো শায়ের। গ্রামের পথে প্রায়শই যায় ওরা। তবে আজকে রাতে বের হয়েছে ওরা। সুধাকরের আলোতে তখন ঝলমল করছে ধরণী। রাস্তাঘাট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই সাথে হাতে হাত রেখে

হেঁটে চলছে শায়ের পরী। আলতো করে পরীর বাহু ধরে জড়িয়ে ধরেছে পরীকে। রাতে তো কেউ রাস্তাঘাটে খুব একটা আসেনা। ফাঁকা রাস্তাটা দুজনে বেশ উপভোগ করছে। সাথে পরীর মনটাও ভালো হয়ে গেছে। শায়ের বলে,'কিছু ভালোবাসা আর কিছু অনুভূতি গোপনে সুন্দর জানেন

কি?’-‘না তো!!আপনার কাছে প্রথম শুনলাম।’

-‘আপনার প্রতি আমার সকল অনুভূতি ভালোবাসা সবই ছিলো গোপন। কখনোই ভাবিনি আপনি আমার ভাগ্যে আছেন। আমি চাঁদের আশা করিনি,চাঁদের আলোতেই খুশি ছিলাম। কিন্ত বিধাতা যে আকাশসহ চাঁদটাকেই আমাকে দিয়ে দিলেন।’

চাঁদের থেকে চোখ সরিয়ে পরীর দিকে তাকিয়ে শায়ের বলে,’যে রাতে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম খুব দীর্ঘ একটা রাত ছিলো। আপনাকে দেখার পর কাকভেজা চোখ নিয়ে শুধু অস্থিরতায় ছটফট করেছিলাম বাকি রাতটুকু। আপনাকে আরেকটিবার দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম কিন্ত সেই দেখা দিলেন

বিয়ের রাতে। কত অপেক্ষা করিয়েছেন আমাকে ভাবতে পারছেন?'

-'কিন্ত আপনার চোখে কখনোই সেই অনুভূতি দেখিনি মালি সাহেব। কীভাবে এতোসব গোপন রাখেন আপনি?'

-'আমার সবচেয়ে গোপন জিনিস টা কি জানেন?'

মাথা নেড়ে না বুঝায় পরী। শায়ের তখন পকেট থেকে কিছু একটা বের করে। চাঁদের রুপালি আলোতে চিকচিক করে উঠলো নূপুর টা। পরী এবার ভিশন অবাক হলো!!এই সেই হারিয়ে যাওয়া নূপুর। যেটা পাগলের মতো খুজেছে পরী। আর সেটা কি না শায়েরের কাছে ছিলো!!সে বুঝতেই পারেনি। পরী জিজ্ঞেস

করে,’এটা আপনার কাছে ছিলো? তবে আপনি তখন বলেননি কেন?’-‘তখন তো জানতাম না যে এই নূপুরের মালিক আমার হবে। তাই যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এখন বুঝতে পারছেন তো আমার ভালোবাসা কতটা গোপন ছিলো!!’

বিনিময়ে হাসলো পরী। শায়ের হাটুমুড়ে বসে নূপুরটা পরিয়ে দিলো

পরীকে। শায়ের উঠে দাঁড়ানোর আগেই কারো সাথে ধাক্কা লাগে পরীর। ধাক্কাটা খুব জোরে লাগতে সরে আসে সে। পেছন ফিরে কাউকে দ্রুত পদে চলে যেতে দেখলো পরী। শায়ের উঠে দাঁড়াল পরীকে ধরে বলল,’আপনার লাগেনি তো?’

পরী আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ছিলো তখনো। শায়ের বলল,'এই যে দাঁড়ান? চোখে দেখেন না? এভাবে ধাক্কা দিলেন!!'-'মেজো কাকি।'

শায়ের অবাক হলো বলল,'মেজো কাকি!! আপনি চিনলেন কীভাবে?'

পরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিনার দিকে তাকিয়ে বলে,'তার চাল চলন আমি খুব ভাল করে চিনি। সে যেই সুগন্ধি

তেল মাখে তার গন্ধটাও পেয়েছি। কিন্তু মেজো কাকি এতো রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?’

শায়ের নিজেও তা খেয়াল করে। সত্যিই তো কোথায় যেতে পারে সে? এসব চিন্তা করতে করতে বাড়িতে চলে আসে ওরা। শায়ের কিছু না ভাবলেও পরী ভাবছে। কেননা ইদানীং পরী শায়েরের মেজ কাকি

রিনা আর হেরোনাকে কথা বলতে দেখে। কিন্ত বিষয়টা এখন বেশ বুঝেছে সে। সাথে খুসিনাকে ঘরে ডেকে নিয়ে কিছু বলে। পরী এতদিন এসবে পাত্তা দিতো না। ওরা যা বলে বলুক ওর কি তাতে। কিন্ত যখন বিষয়টা খুসিনা পর্যন্ত গিয়েছে তখন পরী ভেবেছে কিছু তো ঘাপলা আছে। পরীর ধারণা

সঠিক হলো যখন খুসিনা পরেরদিন এসে শায়ের কে ডাকলো।

কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে শায়ের। খুসিনা তখন শায়ের কে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকলো,’কামে যাস তুই?

‘

-‘হুমম কিছু বলবে তুমি??’

-‘হ কইতাম। কি কমু? তুই আমার পোলা, তোর ভালার লাইগা কইতে হইবো। তোর বউয়ের তো পোলাপান হইবো না। বংশধর তো আনোন লাগবো। নাইলে তোর হইবো কি? তাই কইছিলাম তোর বউও থাক। তুই চম্পারে বিয়া কর।’

পরী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ফুপু যে এতো সহজে কথাটা বলে ফেলবেন

তা জানা ছিলো না পরীর। এতোদিন কতই না ভালোভাবে দিন কাটছিল এই ফুপুর সাথে। আর আজকে এই মানুষ টা এতো সহজ ভাবে কথাগুলো বলে দিলো? পরী কিছু বলল না। শুধু শায়েরের জবাবের আশাতে চেয়ে রইল। শায়ের শান্ত স্বরেই বলে,'আজ বলেছো,তবে দ্বিতীয়বার যেন তোমার মুখে একথা

না শুনি ফুপু।'-'ক্যান কমু না সেহরান। তোর কি বাপ হবার ইচ্ছা করে না? দেখ সব ভাইবা দেখছি আমি। তাই তোর বউর সামনেই কইলাম। তুই বিয়া কর। দেখবি সব ঠিক হইয়া যাইবো।'

শায়ের এবার খুব রেগে গেলো। রাগন্বিত কণ্ঠে বলল, 'পরীজান থাকলেই চলবে আমার। চাই না

আমার বাচ্চা। আর তোমাকে কে বলল আমার বউয়ের বাচ্চা হবে না?’

খুসিনা জবাব দিলেন না। জবাব দিলো পরী,’বড় কাকি বলেছে তাই না ফুপু?’

এবার ও জবাব দিলেন না তিনি। কথাটা তো হেরোনা বলেছে খুসিনাকে। খুসিনা আগেও চেয়েছিল

চম্পা শায়েরের বউ হোক। এখন যখন পরী মা হতে পারবে না জেনেছে তখন চম্পার সাথে শায়েরের বিয়ে হলেই ভাল হবে। এই ভেবে খুসিনা রাজি হয়েছেন।-‘বড় কাকি কিভাবে জানলো আমি মা হতে অক্ষম? তিনি এতোটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে?’

খুসিনা এবার মুখ খুললেন,’চম্পা তোমাগো কইতে হুনছে।’

শায়ের পরী একে অপরের দিকে তাকালো। ওরা কবে এসব নিয়ে আলোচনা করলো?আর চম্পা শুনলোই বা কীভাবে? পরীর মাথাটা ঘুরে গেল। ভালো ব্যবহার করাটা কি তাহলে চম্পার নাটক ছিলো? রাগে পরীর চেহারাটা লাল বর্ণ ধারণ

করলো। ওর জীবনে বিশ্বাসঘাতকের জায়গা এক চুল ও নেই।অন্যায় কারী কেই পরী কখনোই ক্ষমা করেনি আজও করবে না। দোষীদের সে শাস্তি দেবেই। শায়ের কিছু বলুক বা না বলুক পরী বলবেই। এতদিন চুপচাপ থাকা পরীকে দূর্বল ভেবে তারা যে ভুল করেছে তার মাশুল এবার পাবে তারা। তার আগে

সবকথা জানতে হবে। তাই পরী খুসিনাকে আবারও জিজ্ঞেস করে, ‘চম্পা আর কি কি বলেছে ফুপু? আপনি সব বলুন। সব সত্য বলবেন।’

কিছু একটা ষড়যন্ত্র আছে তা বুঝতে পারে খুসিনা। তাই তিনি বলতে লাগলেন,’চম্পা কইলো তুমি নাকি পোলাপান হওয়াইতে পারবা না।

কোন ফকিররে দেখাইছো। চম্পা সব হুনছে,হের লাইগা হেরোনা কইলো বউর যহন পোলাপান হইবো না তাইলে চম্পার লগে বিয়া দিলেই ভালো হইবো। পোলাপানের সুখ পাইবো সেহরান।'

-'আপনাকে সাদাসিধে পেয়ে যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছেন ফুপু কিন্তু আমি সঠিক টাই বুঝেছি। চম্পা

অনেক বড় চাল চেলেছে ফুপু যা আপনি টের পাননি।'ক্রমাগত রাগ বেড়ে চলছে পরীর। শায়ের বুঝলো এবার পরী নিজেও নিজেকে থামাতে পারবে না। পরী পালঙ্কে গিয়ে বসে। মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে লাগল সে। খুসিনা নিঃশব্দে প্রস্থান করে। পরীকে এমন শান্ত হতে দেখে শায়ের ওর পাশে গিয়ে বসে।

নিমজ্জিত কণ্ঠে সুধায়,'চম্পা আর চামেলিকে আমি সবসময় নিজের বোনের চোখে দেখতাম। কখনোই অন্য চিন্তা ওদের নিয়ে মাথাতে আসতো না। কিন্ত চম্পার মনে যে অন্য কিছু থাকবে তা আমি জানতাম না। শুধু এই জেদ ধরে এতবড় মিথ্যা ও বলল কেন??'

পরী চোখ তুলে তাকালো শায়েরের দিকে। মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেছে।

-‘চম্পা শুধু এই কাজটাই করেনি। আরো একটা জঘন্য কাজ করেছে জানেন কি?’

শায়ের মুখে কিছু না বললেও চোখের মাধ্যমে বোঝালো সে জানতে চায়। পরী বলল,’কাল রাতে

ওটা মেজ কাকিই ছিলো। আমার সাথে ধাক্কা লাগতে তিনি অনেকটা ভয় পান। সেটা আমি তখনই বুঝেছি। কিন্তু কারণটা আমি আজ সকালে বুঝলাম।'বালিশের তল থেকে একটা কাচের শিশি বের করে পরী। সেটা শায়েরের দিকে তুলে ধরে বলে,'মেজ কাকি কাল এটা ফেলে গিয়েছিল। আপনি খেয়াল না

করলেও আমি করেছি। এটার মধ্যে একটা ওষুধ আছে,কিন্ত তা কিসের সেটা জানতাম না। তাই চামেলিকে দিয়ে উসমান ফকিরের কাছে পাঠিয়ে জানতে পারি সব। আমি যাতে মা না হতে পারি সেজন্য একটু একটু করে আমাকে খাইয়েছে চম্পা। আমি অনেক আগেই খেয়াল করেছি সব কাকিরা আমাকে নিয়ে

কিছু বলেন। আমার ক্ষতি করতে চান। কিন্ত এসবে যে চম্পারও হাত আছে তা জানতাম না। ফুপু যখন এলো আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি তিনি কি বলতে এসেছেন।’

-‘কেয়ামত হলেও আমি আপনার হাত ছাড়বো না পরীজান। কিন্ত তার আগে চম্পাকে ওর কাজের হিসাব দিতে হবে।’

শায়ের উঠতে নিলে পরী হাত ধরে থামিয়ে দেয় বলে,'হিসেব টা আমি নিজেই নেবো মালি সাহেব। পরীর কাজ পরীকে করতে দিন। আরেকটা কথা শুনে রাখুন। বিশ্বাস ঘাতকের বুকে ছুরি চালাতে আমার বুক কাঁপবে না। আপনি চেয়েও আমার থেকে দূরে যেতে পারবেন না। আপনাকে আমার হয়ে থাকতে হবে

ইহকাল এবং পরকাল। ভালোবাসা সহজ নয়।’-‘সত্যিকারের ভালোবাসাকে কোন ঝড় আলাদা করতে পারেনা পরীজান। দেহ আলাদা করলেও মনকে আলাদা করা যাবে না। আমি আপনার সব বিপদের ঢাল হয়ে দাঁড়াবো কথা দিলাম। বিপদকে আপনাকে ছোঁয়ার আগে আমাকে ছুঁতে হবে।’

হুট করেই জড়িয়ে ধরে শায়ের কে। শায়ের নিজেও বক্ষে ঠাই দিলো পরীকে। পরীর এতো বড় ক্ষতি হয়ে গেল অথচ পরী শান্ত। ভিশন শান্ত,এরমানে পরী ভয়ানক কিছু করবে। শায়ের পরীকে আজ একা ছাড়লো না। কাজে না গিয়ে পরীর কাছেই থেকে গেল। কিন্ত দুপুরের পর পরীকে ফেলে যেতে হলো।

ইলিয়াস লোক পাঠিয়েছিল। জরুরি তলবে শায়ের কে যেতেই হলো।পরী তখন ঘরে একা। সারাদিন কোন কথা সে মুখ থেকে বের করেনি। এমনকি শায়েরের সাথেও কথা বলেনি। রাগটা একটু কমে এলেও বিকেলে তা দ্বিগুণ বাড়লো। চামেলি চম্পা দুজনেই এসেছে। এবারও খালি হাতে আসেনি ওরা। পায়েশ

হাতে চামেলির। পরী বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলো। পায়েশের বাটিটি হাতে নিয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে বলল,’আমাকে তো অনেক খাইয়েছো চম্পা আজকে তুমি একটু খাও।’

চম্পার ভয় লাগলো একটু। সে চামেলির দিকে তাকালো। চামেলি বোকাসোকা হলেও আজ সে পরীর পক্ষে। পরীর এতোই ভক্ত সে, যে

পরী যা বলবে সে তাই করবে। তবে পুরো বিষয়টা চামেলি নিজেও জানে না। পরী এগিয়ে গেলো চম্পার দিকে বলল,’একটু খাও চম্পা!!’-‘না ভাবি,আপনের লাইগা আনছি আপনে খান।’

-‘আমার জন্য এতো দরদ কেন তোমাদের? এতো খাওয়াচ্ছো কেন আমাকে? কি মিশিয়েছো পায়েশে?’

চম্পা ঘামতে শুরু করেছে। পরী জানলো কিভাবে?পরী চম্পার গাল চেপে ধরে বাটি সুদ্ধ মুখে ঢেলে দিলো চম্পার। চম্পা পরীর থেকে ছিটকে সরে গেলো। দৌড়ে বাইরে এসে সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে দিলো। পরী নিজেও বাইরে চলে এসেছে। চম্পা পিছনে ফিরতেই একহাতে গলা টিপে ধরে চম্পার। পরীর শক্ত

হাতের বাঁধন শত চেষ্টা করেও পরীর থেকে ছাড়াতে পারলো না। পরীর চোখে রাগ দেখে ভিশন ভয় পাচ্ছে চম্পা। হিংস্র মানবীর ন্যায় চোখ দিয়ে ভষ্ম করে দিচ্ছে চম্পাকে।

-‘আমার হিংস্রতা দেখোনি তুমি চম্পা। আজ দেখবে, এই হাতে অনেক পুরুষদের কাবু করেছি। আর

তুমি তো একজন নারী মাত্র।’চম্পা মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারলো না। শ্বাস আটকে আসছে ওর। চোখে ঝাপসা দেখছে। সে হাত নাড়িয়ে চামেলিকে বলছে তাকে বাঁচাতে কিন্ত চামেলি নিজেই ভয় পেয়েছে। হঠাত করে পরীর হলো কি তা সে নিজেও জানে না। পরী আবারো বলল, ‘আমার স্বামী

একান্তই আমার। তুমি কি ভেবেছো বাচ্চা জন্ম না দিতে পারলে আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দেবো? এতোই সহজ? আমার স্বামী আমার ভালোবাসা। কষ্ট পেলে দুজনে একসাথে পাবো আর হাসলে একসাথে হাসবো। আমাদের দেহ আলাদা হলেও আত্মা কিন্ত এক।

পারলে আমাদের আলাদা করে দেখাও।'

ঝটকা মেরে চম্পাকে ফেলে দিলো পরী। মাটিতে শুয়ে কাশতে লাগল সে। চামেলি দ্রুত বোনকে ধরে ওঠায় বলে,'কি হইছে ভাবি? তুমি এমন করতাছো ক্যান? আপা কি করছে?'

-'তুমি বুঝবে না। কিন্ত এটা জেনে রাখো তোমার মা এবং বোন জঘন্য অপরাধ করেছে।'

পরী নিজের ঘরে চলে গেল। যতক্ষণ চম্পার সামনে থাকবে ততক্ষণ ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। চামেলি তার বোনকে ঘরে নিয়ে গেল। এবং সাথে সাথেই সব বলে দিলো। হেরোনা কিছুটা

বিচলিত হলেও তেমনভাবে নিলেননা বিষয়টা। পরী আর কিইবা করতে পারবে। আর সেহরান তো তার সাথে কথাই বলে না। তবুও রাতে তিনি দুই জা কে ঘরে ডাকলেন গভীর পরামর্শ করতে। হেরোনা বললেন, 'সেহরান তো সব জাইনা গেলো। এহন তো সবদিক গেলো। কি করি এহন?'ছোট জা কনক

বললেন,’ভাবি আমি কই বাদ দেন এইসব। ওই জমি আমরা পামু না।’ কনককে ধমক দিলেন হেরোনা,’তুই চুপ থাক। এতোদিন জমি আমরা খাইলাম অহন তো আমাগো হইয়া গেছে। আমরা দিমু না জমি। তোর ভাইয়ের লগে এই নিয়া কথা কইতে হইবো। কোন ঝামেলায় পড়লাম রে।’

দরজার ঠকঠক আওয়াজে চম্পা গিয়ে দরজা খুলে দিলো। কিন্তু সে অবাক হলো পরীকে এসময় দেখে। শান্ত চোখে চম্পাকে দেখে নিলো পরী। আজ যেন পরীকে ভয়ানক সুন্দর লাগছে পরীকে। লাল শাড়িতে পরীর মতো লাগছে। স্মিত হাসলো পরী। পরীর সবকিছুই আজকে ভয়ানক মনে হচ্ছে চম্পার কাছে।

পরী বলল,'ভেতরের আসতে দিবে না?'

চম্পা দ্রুত দরজা হতে সরে দাঁড়ালো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে দরজাটা আটকে দিলো পরী।

হেরোনা বলল,'দরজা আটকাও ক্যান তুমি?'

জবাব না দিয়ে পরী চম্পাকে বলে,’আমাকে বসতে দাও। সবকথা দাঁড়িয়ে বলবো নাকি?’

জলচৌকি এনে বসতে দিলো পরীকে। পরী শান্ত স্বরেই বলল,’আমাকে ওই ওষুধ খাওয়ানোর পিছনের কারণটা কি শুধুই চম্পা নাকি আরো অন্য কারণ আছে?’

কথাটা বলে হেরোনার চোখে চোখ রাখে পরী। হেরোনা জবাব দিল,'তোমারে এতো কথা কমু না। ঘরে যাও। রূপ দিয়া সেহরান রে বশ করলেও আমাগো পারবা না।'

পরী হাসলো বলল,'নারীর রূপে পুরুষ বশ হয় আর নারীরা ঈর্ষান্বিত হয়। আমি সত্য জানতে চাই বলে ফেলুন। নাহলে,,,'-'এই মাইয়া কি

করবা তুমি? মারবা নাকি? সাহস তো কম না।’

পরী সোজা হয়ে বসে। তারপর বলে,’আমি যখন খুন করি তখন আমার বয়স তেরো বছর। তাহলে ভেবে দেখুন তের বছরে একটা খুন করেছি আর এখন চারটা খুন করার সাহস আছে আমার মধ্যে।’

হেরোনা নড়েচড়ে বসলো। পরী কি সত্যি বলছে নাকি ভয় দেখাচ্ছে। অতটুকু মেয়ে মানুষ মারবে কীভাবে? সে বলে,’মশকরা করতাছো আমাগো লগে?’

-‘আমি কি আপনার বেয়াই লাগি যে মজা করবো। এই হাতে দা তুলে নিয়েছিলাম সেদিন। শুয়ো*র বাচ্চাটার ঘাড়ে এক কোপ মারতেই

সে শেষ। ওর রক্তে ভিজেছি সেদিন।’

পরীর কথা শেষ করার আগেই বজ্রপাতের শব্দ এলো। পরী বাদে কেঁপে উঠল সবাই। বিকাল থেকেই আকাশে মেঘ ছিলো। এখন হয়তো বৃষ্টি হবে। সেই আভাস দিচ্ছে প্রকৃতি। পরী আবারো বলতে লাগল, ‘তবে আমার সবচেয়ে খারাপ

লেগেছিল কেন জানেন? ওর ঘাড় থেকে মাথাটা আলাদা করতে পারিনি বলে। মেজাজ টাই খারাপ হয়ে গেলো।’পরীর কথাগুলো সবাইকে ভয় পাইয়ে দিলো। তবে কেউ কোন কথা বলল না দেখে পরী আবারও বলে, ‘আপনাদের এসব কেন বলছি তার কারণ জানতে চাইবেন না? কারণ হলো এবারের মতো

আপনাদের ক্ষমা করলাম। কিন্তু পরের বার কিছু করার আগে নিজের ঘাড়ের কথা চিন্তা করবেন। এখন বাকি কারণটা কি ভালোভাবে বলবেন নাকি শ্বাসনালী চেপে ধরে কথা বের করতে হবে।'

কনক খুনখারাবি ভয় পায় খুব। পরীর কথাটা সে বিশ্বাস করে ফেলেছে সে। তাই সব সত্য গড়গড়

করে বলে দেয়। হেরোনা চেয়েও আটকাতে পারে না। হেরোনা এখনও পরীর কথা পুরোপুরিই বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু চম্পার কেন জানি মনে হচ্ছে পরী সত্যি বলছে। পরী আজ যেভাবে ওর গলা চেপে ধরেছিল মনে হচ্ছে আজ সে মরেই যাবে। ওই হাতে নিশ্চিত কাউকে মেরেছে পরী। কনকের কথা

শুনে পরী বলে,'এটুকু সম্পদের জন্য আপনারা একটা মেয়ের মাতৃত্ব কেড়ে নিলেন। বাহ খুব ভালো। এর থেকে আরো বেশি সম্পদ পাবেন আপনারা। আমি দেবো,তবে তার সাথে আমার মাতৃত্ব ফিরিয়ে দিতে পারবেন?'ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই চুপ করে আছে। শুধু বৃষ্টি পড়ার শো শো শব্দ ভাসছে

চারিদিকে। পরী সবার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার সে দরজার শব্দে সেদিকে তাকায়। দরজা খোলে চম্পা। বাইরে থেকে শায়েরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,’ঘরে চলুন পরীজান।’

পরী কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঘরে যেতে যেতে অনেকটাই ভিজে গেল পরী। শায়ের

আরও বেশি ভিজে গেছে। আড়ত থেকে ফিরতে ফিরতে ভিজে জুবুথুবু সে। পরীকে ঘরে না দেখে শায়ের বুঝে গেছে সে কোথায় থাকতে পারে। ঘরে

আসতেই শায়ের বলল,'আপনি ওই ঘরে কেন গিয়েছিলেন? আর কখনোই যাবেন না।'

পরী কথা বলল না। চুপচাপ গামছা এনে শায়েরের মাথা মুছতে লাগল সে। শায়ের নিজেও চুপ রইল। একটু পরে বলে উঠল,’আপনি কাকে খুন করেছেন পরীজান?’-‘আপনি সব শুনেছেন দেখছি।’

-‘এটা বলবেন না যে আপনি ভয় দেখানোর জন্য বলেছেন। আমি

আপনার কথাতে বুঝেছি আপনি সত্য বলছেন।’

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে পরী। বলে,’সুরমা পড়লে আপনাকে এতো ভালো লাগে কেন মালি সাহেব?? আপনার সব সৌন্দর্য কেন ওই চোখে ঢেলে দিয়েছেন বিধাতা? আমার যে নেশা ধরে যায়।’

-‘আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি।’-‘আমাকে আজ ভালোবাসা দিবেন মালি সাহেব!! আগের থেকে আরো বেশি ভালোবাসা চাই আমার।’

পরীকে কেমন যেন উন্মাদ মনে হচ্ছে শায়েরের। আজকের ঘটনাটা ওকে কেমন যেন ঘোরে ফেলে দিয়েছে। শায়ের বলল,’আপনার কি

হয়েছে পরীজান? শরীর খারাপ করেছে?’

-‘আপনার ভালোবাসার অসুখ আজীবন থাকবে আমার। আমাকে সুস্থ করতে কোনদিন পারবেন না আপনি।’

কথা শেষ করতেই শায়েরের বুকে ঢলে পড়ে পরী। শায়ের পরীকে কোলে তুলে নিলো সাথে সাথেই।

এইবার সে খেয়াল করলো পরীর সম্পূর্ণ চুল ভেজা। শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।সন্ধ্যাবেলা কলপাড়ে গিয়ে ইচ্ছামতো ভিজেছে পরী।

মাতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে সে,এটা কিছুতেই মানতে পারছে না। আর কি কখনো মা হওয়া সম্ভব কি পরীর পক্ষে??বেশি ভেজার কারণে শরীরে জ্বর নেমে এসেছে। তারপর

আজকের ঘটনা পরীর মস্তিষ্কে বেশ গভীর ভাবে আঘাত করেছে। যার জন্য উল্টাপাল্টা বকছে। পরীকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে কাথা টেনে দিলো শায়ের। সে নিজে উঠতে গেলে পরী হাতটা টেনে ধরে। হারিকেনের টিমটিম আলোতে শায়ের খেয়াল করে অস্থিরচিত্ত নয়নে তাকিয়ে আছে পরী। জ্বরে

ফর্সা মুখখানা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। অসম্ভব ভাবে কাঁপছে ঠোঁট দুটো। পরী কম্পিত কন্ঠে বলে,'আপনার সব ভালোবাসা আমাকে দিন না মালি সাহেব যাতে আপনার কাছ থেকে আর কেউ ভালোবাসা না চায়। সবাই যেন খালি হাতে ফিরে যায়। আপনার সব

ভালোবাসা শুধু আমার কাছে থাকবে।’

পরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো শায়ের বলল, ‘আপনার শরীরে জ্বর এসেছে পরীজান। আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।’পরী হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে বলে,’নাহ আমি ঠিক আছি।’

-‘কেন পাগলামি করছেন? আমি কখনোই আপনাকে ছেড়ে যাবো না। একটু শান্ত হন।’

-‘আপনাকে ছেড়ে যেতে কখনো দিলে তো যাবেন।’

শায়ের পরীর থেকে হাত ছাড়িয়ে পরনের ভেজা পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে। ভেজা পোশাক বদলে আবার পরীর পাশে এসে বসে। পরীর

কপালে হাত রেখে দেখে জ্বর ক্রমাগত বেড়ে চলছে। শায়ের জলপট্টি দিতে চাইলে পরী বারণ করলো। পরীর বারণ উপেক্ষা করতে শায়ের পারলো না। পরী জেদ ধরে বসে আছে। শায়ের পড়লো বিপাকে। পরী উঠে বসে জড়িয়ে ধরে শায়ের কে। উত্তাপে কেঁপে উঠল শায়ের,'আপনি

ভিজেছেন কেন পরীজান? এখন তো কষ্ট পাচ্ছেন।'-'আপনি পাশে থাকলে আমার কোন কষ্ট হবে না। বহু কষ্ট পার করে আপনার কাছে সুখের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। আমার আর কষ্ট হবে না।'

-'আমার কাছেই তো আপনার সব কষ্ট। আপনার মতো চাঁদের গায়ে

আমার মতো কলঙ্ক মানায় না পরীজান।’

-‘আকাশের চাঁদের গায়ে যে কলঙ্ক আছে তা চাঁদের সৌন্দর্য বহন করে। তেমনি আপনিও আমার কলঙ্ক এই কলঙ্ক ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই।’বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরীকে বুকে জড়িয়ে ধরে

বসে আছে শায়ের। পরী ঘুমায়নি,সে শায়ের কে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে আর শায়ের উত্তর দিচ্ছে। শায়ের বুঝতে পারছে পরী কেন এরকম করছে। সে মা হতে পারবে না কখনো। কষ্ট তো হবেই। নিজের কাছের মানুষ যে এমন বিশ্বাস ঘাতকতা করবে তা শায়ের ভাবেনি। সে তো ওদের কোন ক্ষতি করেনি

তাহলে তারা কেন এরকম করলো। পরীকে অনেক মেহনত করে ঘুম পাড়াতে হলো। পরীর জ্বর নামা না পর্যন্ত শায়ের জেগে ছিলো। জলপট্টি দিয়েছিল।

সকাল হলো,কিন্তু বৃষ্টি কমলো না। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামতেছিল। বৃষ্টি মাথায় শায়ের কোথায় যেন বেড়িয়ে গেলো। ফিরলো ঘন্টা দুয়েক পর।

হাতে তার কিছু কাগজপত্র। পরী চুপচাপ শায়েরের কাজ দেখতে লাগলো। সবকিছু ঠিকঠাক করে বের হতে নিলে পরী জিজ্ঞেস করে,'আবার কোথায় যাচ্ছেন? আর ওসব কিসের কাগজ??'

শায়েরের মনে হলো এবার পরীকে সব জানানো উচিত। সে পরীর কাছে এসে বসে বলে,'আমার

ভাগের যেটুকু জমি আছে তার দলিল এগুলো। আমি সব ওদের দিয়ে দিবো। বিনিময়ে আমি আপনাকে নিয়ে একটু শান্তিতে থাকতে চাই।’পরী কথা বলল না। শুধু শায়েরের দিকে তাকিয়ে রইল। শায়ের পরীর গালে হাত রেখে বলল,’নিজের সাধ্যের মধ্যে রাণীর মতো করে রাখবো আপনাকে। রাজা

হতে পারবো না কখনো তবে কোন রাজার সাধ্য নেই আমার মতো হওয়ার। আমার মতো করে আপনাকে কেউ আগলে রাখতে পারবে না পরীজান।'

শায়েরের হাতে হাত রাখে পরী। স্মিত হেসে বলে, 'আপনার মনের রাজ্যের রাণী হতে পারলেই হবে। আপনি সব দিয়ে দিন ওদের।

আপনার ভালোবাসাতেই বেঁচে থাকতে পারবো।’

পরীর সম্মতি পেয়ে শায়ের ছুটলো হেরোনার ঘরের দিকে। চম্পা তখন মন খারাপ করে বসেছিল। শায়ের কে আসতে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। শায়ের বলল, ‘তোর মা কোথায়??’চম্পার গলা দিয়ে কথা বেরোলো না। গলাতেই সব কথা

আটকে গেল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে হেরোনা এলো। শায়ের দলিলটা হেরোনার হাতে দিয়ে বলে,'এই নিন আপনাদের জমি। এটুকু সম্পদের জন্য আমার সবকিছু তো কেড়ে নিলেন। এবার আশা করি শান্তিতে থাকবেন। আপনাদের কারো ছায়া যেন আমার পরীজানের উপর না পড়ে। আমার ধৈর্যের বাধ

ভাঙ্গার সময় কিন্ত এসে পড়েছে। তাই সাবধান।'

ঘর থেকে বের হওয়ার আগে শায়ের চম্পাকে উদ্দেশ্য করে বলে,'যে মানুষ টা তোকে এতো কাছে টানলো তার এতোবড় ক্ষতি করতে তোর বুক কাঁপলো না? তোর মুখ যেন দ্বিতীয়বার আমি না দেখি।'

শায়ের চলে গেল। চম্পা কাঁদতে লাগল মাটিতে বসে। হেরোনার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল,'তোমার সম্পদ তো তুমি পাইছো মা। আমি ক্যান আমার সম্পদ খোয়াইলাম? তুমি পারলা না আমার সম্পদ আইনা দিতে।'

হেরোনার মুখ গম্ভীর দেখলেও সে মনে মনে ভিশন খুশি। শায়ের যে

ওকে সব দিয়ে গেছে। তিনি এও ভাবলেন এবার চম্পাকে বড় ঘরে বিয়ে দেবেন। তাহলেই ওনার ষোলকলা পূর্ণ হবে।দিন মাস পেরিয়ে বছর ঘোরে। পরী মন খারাপ করে বসে থাকে বাড়ির জন্য। কিন্ত সময়ের অভাবে শায়ের পারে না পরীকে নিয়ে যেতে। কিন্ত তার ভালোবাসার কোন কমতি

রাখেনি শায়ের। পরী কখনো প্রশ্ন করতে পারেনি শায়ের কে। জিজ্ঞেস করতে পারেনি শায়ের তাকে ঠিক কতখানি ভালোবাসে। তার প্রমাণ সে পদে পদে পেয়েছে। শায়েরের ছোট ঘরটাকে রাজপ্রাসাদ মনে হয় পরীর। সারাদিন রাত ঘরে বসে কাটে ওর। সেদিনের পর থেকে পরী সম্পূর্ণ একা থাকে। চম্পা তো

আসেনা, এমনকি চামেলিকেও আসতে মানা করেছে। কেননা চামেলি সহজ সরল মানুষ। কখন কি বুঝিয়ে পাঠাবে কে জানে? তবে মাঝেমধ্যে চামেলি উঠোনের দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দুয়েক কথা বলে। আবার চলে যায়।

এমনই একদিন চামেলি এসে বলল,’ভাবি আপার বিয়া ঠিক হইছে।’-‘তাই নাকি? কোথায়?’

-‘পাশের গেরামের সুজনের লগে। মায় কইলো এই শুক্রবার বিয়া।’

পরী কথা বলল না। একটু চুপ থেকে চামেলি আবার বলে,’আমার ভালো লাগে না ভাবি। তুমি তো

আইবা না বিয়াতে। আমি একলা একলা কি যে করমু?’

-‘কিছু করার নেই চামেলি। তোমার ভাই চায় না আর আমিও চাই না।’

-‘আপা আর মা একটুও ভালা না ভাবি।’

শায়ের আসার সময় হয়ে গেছে। তাই পরী বলল, ‘তুমি এখন যাও চামেলি। তোমার ভাই এখুনি চলে

আসবে। তোমাকে দেখলে বকবে।’চামেলি মন খারাপ করে প্রস্থান করলো। পরীও নিজের কাজে চলে গেল। সবকিছু জানার পর খুসিনাও তার ভাইয়ের বউদের সাথে কথা বলে না। তিনি পরীকে নিয়ে ছোটেন নানা ফকিরের কাছে। মাতৃত্বের স্বাদের জন্য পরী নিজেও যায়। কিন্ত কোন লাভ হয় না। কত

ওষুধ খেয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। দিন শেষে পরী হতাশই হয়েছে। তবুও আল্লাহর উপর ভরসা রাখছে। শায়ের ফিরলে ওর মন খারাপ কখনোই তাকে বুঝতে দেয়নি। পরী জানে ওর হাসি মুখ দেখলে শায়েরের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। চম্পার বিয়েতে শায়ের কে দাওয়াত করে যায় আকবর। কিন্তু সাথেই

সাথেই তা প্রত্যাখ্যান করে শায়ের। আকবর কিছু বলার সুযোগ ও পেলো না। শায়ের সে সুযোগ কখনো দেবে না। পরী নিজেই শায়ের কে বলে,’ফিরিয়ে না দিলেই পারতেন। নিজের লোকই তো। অন্তত বিয়েতে নাহয় থাকুন।’

-‘আমি শুধু আপনার সাথে বাকি জীবনটুকু কাটাতে চাই। এছাড়া অন্য

কাউকে আমাদের মাঝে আনতে চাই না। ওদের ক্ষমা করলেও আমার ক্ষোভ কিন্ত যায়নি। আপনি ওদের হয়ে কিছু বলতে আসবেন না।’

আর কোন বাক্য পরী উচ্চারণ করে না। সে শায়ের কে যতটা চায় তার চেয়েও গভীর ভাবে শায়ের পরীকে চায়। এভাবেই দুজনের ছোট্ট সংসারে সময় কেটে যাচ্ছে খুব।

চম্পার বিয়ের আগের দিন খুসিনাকে ধরেবেধে সবাই নিয়ে গেল। যতই হোক তার তো যাওয়া উচিত। একমাত্র ফুপু বলে কথা। শায়ের নিজেই খুসিনাকে যেতে বলেছে।

শায়ের তাই সন্ধ্যা হতেই বাড়িতে এসে পড়েছে। নাহলে পরী একা হয়ে যাবে। হঠাৎই চম্পা ছুটে আসে এবং ঝাপটে ধরে শায়ের কে।

আকস্মিক ঘটনাতে শায়ের নিজেকে ছাড়ানোর বদলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চম্পা কাঁদতে কাঁদতে বলে,'মাফ করো সেহরান ভাই। আমি মা'র কথায় সব করছি। আমি তো ইচ্ছা কইরা কিছু করি নাই। আমিতো তোমারে চাই। এমনে ছাইড়া দিও না। আমি বিয়া করতে চাই না। মইরা যামু আমি।'

হাতে টান লাগতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সে। পরী এক ঝটকায় চম্পাকে শায়েরের থেকে ছাড়িয়ে আনে। ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে বলে,’তোমার মুখটা আমি দেখতে চাই না চম্পা। আমার স্বামীকে ছোঁয়ার সাহস দ্বিতীয়বার দেখিও না। আমি কিন্তু অতো ভালো মেয়ে না।

যে বারবার তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবো।’

চম্পাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পরী ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলো। শায়ের চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে চম্পাকে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু তার কথাটা পরীই বলে দিয়েছে। পরী যে একা কতো লড়াই করছে তা ধারণার

বাইরে।চম্পার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত শায়ের আর বাড়িতে আসলো না। তবে বিকেলে একটা চিঠি এসেছে শায়েরের নামে। চামেলি খামটা এসে পরীকে দিয়ে যায়। চিঠিটা ওলট পালট করে দেখে পরী। চিঠির উপরে দেওয়া ঠিকানা দেখে সে। নূরনগর থেকে এসেছে চিঠিটা। পরী একবার ভাবল খুলে দেখবে। যেহেতু

চিঠিটা শায়েরের নামে তাই অন্যের চিঠি খোলা ঠিক নয় ভেবে পরী খুলল না।

রাতে শায়ের ফিরতেই চিঠিটা দিলো পরী এবং বলল,’নূরনগর থেকে আপনাকে কে চিঠি পাঠিয়েছে? নামটা লেখেনি। খুলে দেখুন তো?’শায়ের চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার রেখে দিলো বলল,’এখন

পড়তে ইচ্ছা করছে না। পড়ে পড়বো।’

পরী ভাবলো শায়ের ক্লান্ত। তাই চিঠিটা আগের স্থানে রেখে দিলো। তবে শায়ের কে বিচলিত দেখাচ্ছে খুব। কোন ঝামেলা হয়েছে? রাতে তেমন ঘুম হলো না পরীর। ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল সে। গ্লাসের সবটুকু পানি খেয়ে ক্ষ্যান্ত

হলো পরী। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শায়েরের দিকে তাকালো। একটু আগেই সে স্বপ্নে দেখেছে কয়েক জন কালো মুখোশধারী লোক তার কাছ থেকে শায়ের কে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ওর হাত পা বেঁধে রেখেছে। একজন হাতে করে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে যেই না শায়েরের গলায়

বসাতে যাবে ঠিক তখনই ঘুম ভাঙে পরীর। সে ঘামছে খুব,এমন বাজে স্বপ্ন সে কখনোই দেখেনি। শায়ের যাতে টের না পায় তাই সে আবার শুয়ে পড়ল। শক্ত করে শায়ের কে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলল,'আপনাকে কখনো হারাতে দেবো না। আমাকে বিলীন করে হলেও আপনার অস্তিত্ব আমি টিকিয়ে

রাখবো।'সে রাতখানা আর ঘুমাতে পারল না পরী। শায়ের কে জড়িয়ে ধরেই শুয়ে রইল। ভোর বেলাতে ঘুমালো পরী। ততক্ষণে শায়ের উঠে পড়েছে। পরীকে ঘুমাতে দেখে সে আর ডাকলো না। ফুপুকেও ডাকতে মানা করে দিলো।

পরী ঘুম থেকে উঠে শায়ের কে পেলো না। সে বুঝলো তার স্বামী

নিজ কাজে চলে গেছে। শায়ের জানে পরী প্রায় রাতই নির্ঘুমে কাটায়। তার কারণ পরীর বিষন্নতা। পরী আজও তার মাতৃত্ব নিয়ে মন খারাপ করে। রাতে ঘুম হয় না তার। এজন্য প্রায়শই দেরিতে ঘুম ভাঙে পরীর। তাই শায়ের ওকে বিরক্ত করে না।রাতের স্বপ্ন টা পরীকে বেশ ভাবায়। কিন্তু পরমুহূর্তে

যখন শায়েরের সান্নিধ্য পায় তখন সব ভুলে যায়। পরী শায়েরকে চিঠির কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলে নূরনগরে ওর একজন বন্ধু আছে। ওর মা অসুস্থ তাই টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে। সেজন্য শায়ের কে টাকা নিয়ে নূরনগরে যেতে হবে। পরী বলে সেও যাবে কিন্তু শায়ের রাজি হয়না। তার আড়তে কাজ আছে।

তাই সে একদিনের ছুটি নিয়ে সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে আবার চলে আসবে। এবং পরে বেশ কিছুদিন ছুটি নিয়ে পরীকে ওর গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাবে। পরী তাতেই রাজি হলো।

তারপর কেটে গেলে কয়েক মাস। শায়ের ছুটির জন্য চেষ্টা করেও ইলিয়াসের থেকে ছুটি পেলো না।

পরী নিজেও অপেক্ষা করে ছুটির জন্য। ঈদ ছাড়া শায়ের বোধহয় আর ছুটি পাবেনা তাই পরীর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।এমনি একদিন দুপুর বেলা,শায়ের দুপুরের খাবার খেয়ে বেড়িয়ে গেছে। পরী উঠোনের কোণে বসেছিল। হঠাৎই সে থমকে গেল পরিচিত একটা মুখ দেখে। ‘জুম্মান’

বলে সে দৌড়ে গেলো তার কাছে। খুশি হয়ে বলে,'জুম্মান কেমন আছিস? আমি খুব খুশি হয়েছি তোকে দেখে।'

জুম্মানের হাবভাব দেখে পরীর ভালো লাগলো না। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে আছে মুখটা। পরী জিজ্ঞেস করল,'কি হয়েছে জুম্মান? সব

ঠিকঠাক আছে তো? বাড়ির সবাই ভাল আছে?’

থমথমে গলায় জুম্মান বলে,’বড় আম্মার অসুখ করছে আপা। ডাক্তার কইছে বাঁচবো না। তোমারে নিয়া যাইতে কইছে। তুমি যাইবা না?’

পরী মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেলো। অবিশ্বাস্য লাগল জুম্মানের কথাগুলো। তবে পরমুহূর্তে মায়ের

জন্য মনটা কেঁদে উঠল পরীর। চোখ থেকেও নোনাজল গড়িয়ে পড়ল। সে বলল,’কি হয়েছে আম্মার? তুই এসব কি বলিস জুম্মান?’-‘তোমারে দেখতে চাইছে আম্মা। আহো আমার লগে।’

-‘তুই একা এসেছিস?’

-‘নাহ আব্বা গাড়ি আর লোক পাঠাইছে। তুমি আহো তাড়াতাড়ি।’

-‘আমি যাবো জুম্মান। কিন্ত উনি আসুক একসাথে যাবো।’

-‘শায়ের ভাই পরে যাইবোনে। তুমি আগে আহো। বড় আম্মা মনে হয় আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না। মরার আগে তোমারে দেখতে চায়।’

মায়ের মরার কথা শুনে পাগলপ্রায় পরী। তাছাড়া রাত ছাড়া শায়ের ফিরবে না। কাকে দিয়ে শায়ের কে

খবর পাঠাবে তাও মাথায় আসছে না পরীর। তাই সে খুসিনা কে সবটা খুলে বলে। ফুপু পরীকে আশ্বস্ত করে। সে পরীকে জুম্মানের সাথে যেতে বলে। শায়ের আসলে সে নিজ দায়িত্বে শায়ের কে নূরনগর পাঠিয়ে দেবে। পরী কিছু না ভেবেই জুম্মানের সাথে নূরনগরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। সারা রাস্তা কাঁদতে

কাঁদতে গেলো পরী। বারবার আল্লাহর কাছে মায়ের জন্য সময় ভিক্ষা চাইতে লাগল। পরী যাওয়া অবধি যেন মালা বেঁচে থাকে। চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে পরী পৌঁছালো জমিদার বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল। বৈঠক পেরিয়ে মহিলা অন্দরে

ঢুকতেই কুসুমের মূখোমুখি হলো সে। পরীকে দেখা মাত্রই কুসুমের হাতের থালাবাসন ঝমঝম শব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। চোখের কোণে জল দেখা দিলো তার। কুসুম দৌড়ে পরীর কাছে এসে বলল,’পরী আপা আপনে এইহানে ক্যান আইছেন?’

পরী জবাব না দিয়ে বিচলিত হয়ে মালার ঘরের দিকে এগোলো। কুসুম

ওর হাত টেনে ধরে বলে,'আপনে চইলা যান আপা। বাড়িতে অহন কেউ নাই। আপনে পলাইয়া যান তাড়াতাড়ি।'

পরী অবাক হলো কুসুমের কথা শুনে বলল,'কি যা তা বলছিস কুসুম? আম্মা অসুস্থ আমি দেখতে আসছি। আম্মা কোথায়? আম্মা আম্মা,,,'

জোর গলায় পরী মালাকে ডাকতে লাগল। রুপালি ঘর থেকে ছুটে এলো। পরীকে দেখে সে পরীর হাত চেপে ধরে বলল,’পরী তুই এখানে এসেছিস কেন?’-‘তোমরা এমন করছো কেন আপা? আমি এসেছি তো কি হয়েছে? আম্মা অসুস্থ আমি আম্মাকে দেখতে এসেছি।’

রুপালি ধমকে বলল,’কে তোকে বলেছে আম্মা অসুস্থ?’

-‘জুম্মান গিয়েই তো আমাকে বলল। তারপর আমি জুম্মানের সাথে চলে এলাম।’

রুপালি ভয় পেয়ে গেলো। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল ওর। সে বলল,’তারমানে শায়ের তোর সাথে

আসেনি। একা কেন এসেছিস তুই? এখন কি হবে?’

রুপালি ভিত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ভয়ে রীতিমত কাঁপছে সে।

এমন সময় মালাকেও দেখা গেল। সে পরীর গলার আওয়াজ পেয়ে এসেছে। মালাকে দেখে পরী দ্রুত পদে তার কাছে গেলো। মালার দুই

বাহু ধরে মালাকে দেখতে দেখতে বলল,'আম্মা আপনি ঠিক আছেন তো? আপনার কিছু হয়নি তো?'

রুপালির মতো মালাও কাঁদছে। সে পরীকে বলল, 'তুই এখান থাইকা চইলা যা পরী। ওরা আহার আগে তাড়াতাড়ি যা।'পরী আর পারছে না। সবাই কেন ওকে চলে যেতে

বলছে? মালাকে দেখে তো সুস্থ মনে হচ্ছে। তাহলে জুম্মান কেন ওকে মিথ্যা বলে আনলো? পরী চিৎকার করে বলল,'তোমরা সত্যিটা বলবে? কি হয়েছে? আম্মা যখন সুস্থ তাহলে জুম্মান মিথ্যা বলে আমাকে আনলো কেন? আর এখন আমাকে পালাতে বলছো কেন? এই বাড়িতে হচ্ছে কি?'

রুপালি পরীর হাত টেনে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে,’পরে শুনিস ওসব কথা। আগে নিজের জীবন বাঁচা। তুই এক কাজ কর ছাদে গিয়ে যেভাবে আগে বাড়ির বাইরে যেতিস সেভাবে চলে যা। বাইরে এখন অনেক কড়া পাহারা।’

রুপালি পরীর হাত টানতে লাগল। কিন্তু পরী এক পা ও নড়লো না।

সে আজকে সব জেনেই ছাড়বে। সে বলে উঠল,'আমি যাবো না আপা। আগে তোমরা আমাকে সব বলো। নাহলে আমি কোথাও যাবো না।'

-'বেশি কথা না বলে নিজের ঘরে যাও পরী।'আফতাবের কণ্ঠস্বর শুনে পিলে চমকে গেল সবার। শুধুমাত্র পরীই স্থির দাঁড়িয়ে রইল। কুসুম থালাবাসন উঠিয়ে চলে গেল। মালা

আর রুপালি আগের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। পরী আফতাবের নিকটে গিয়ে বলে, ‘আমাকে বলুন কি হয়েছে? আম্মা তো সুস্থ আছে। তাহলে জুম্মান মিথ্যা বলল কেন? সব সত্যি আমি জানতে চাই?’

-‘তোমাকে সব বলা হবে। এবং আজ রাতেই সব জানতে পারবে

তুমি। সব জানতে হলে এখন ঘরে যাও।’

পরী নিজ ঘরে গেলো না। আজ তার সব প্রশ্নের জবাব চাইই চাই। তাই সে কড়া গলায় বলল,’আমি কোথাও যাবো না। আমাকে বলুন কি হয়েছে?’

আফতাব এগিয়ে গেলো মালার দিকে। একহাতে গলা চেপে ধরে

মালার বলে,’মেয়েকে থামা। শেষ সময়ে ওর এতো কথা সহ্য হচ্ছে না।পরী বিষ্মিত নয়নে তাকালো নিজের জন্মদাতার দিকে! এ কোন রূপ দেখাচ্ছে আফতাব!!রুপালি দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে কাঁদতেছে। মালার শ্বাস আটকে আসছে। পরীর এতক্ষণে হুশ ফিরল। সে দৌড়ে গিয়ে নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে ধাক্কা

দিলো আফতাব কে। ছিটকে দূরে সরে যায় আফতাব। মালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,'আম্মা আপনি ঠিক আছেন তো?'

মালা ঘনঘন শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা নাড়লো। পরী আফতাবের দিকে তাকিয়ে বলে,'আপনার হয়েছে কি আব্বা? আম্মার গায়ে হাত তুলছেন কেন?'

আফতাব কথা বলে না। পরীর সাথে এখন তিনি পেরে উঠবেন না তাই তিনি অন্দর ত্যাগ করলেন। আফতাব যেতেই রুপালি মালার কাছে এসে জোরে জোরে কাঁদতে লাগল। আর বলতে লাগল,'কোন অভিশাপ লাগলো আম্মা? আমাদের জীবনটা এমন কেন হলো? সত্যি

গুলো চোখের আড়ালে থাকলে কিই বা হতো আম্মা?’

রুপালি কাঁদছে আর পরী দেখছে। সে প্রশ্ন করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে। তাই অবুঝ নয়নে মা আর বোনকে দেখছে সে। রুপালি হঠাৎ কান্নার বেগ কমিয়ে পরীকে বলে,’তুই না প্রশ্ন করেছিলি কি হয়েছে? সবচেয়ে সত্যি কথাটা আজ

তোকে বলবো।'পরীর চাহনিতে রুপালি চোখের পানি মুছলো তারপর বলল,'যে সুখান পাগল কে তুই চিনিস সে আর কেউ নয়,সে হচ্ছে রাখাল। পরী আমাদের সোনা আপার রাখাল।'

মালাকে আলতো করে ধরে বসেছিল পরী। রুপালির কথা শুনে শরীরের

সম্পূর্ণ ভর ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল।

-'সোনা আপা রাখালের সাথে পালাতে পারেনি পরী। আর না পেরেছে সংসার করতে। সোনা আপা তো রাস্তার ধারের কদম গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছে পরী। আপার রাখাল ওকে এখনও পাহারা দিচ্ছে। আব্বা তার নিজের হাতে

তার মেয়ের ভালোবাসা আর মেয়েকে কবর দিয়েছে।’কথা বলার শক্তি পরী হারিয়ে ফেলেছে। ওর জানামতে সোনালী রাখালের সাথে দূর অজানায় চলে গেছে। কিন্ত সোনালীর গল্প টা যে এখনও নূরনগরের রয়ে গেছে তা আজ জানতে পারলো পরী। বারবার ওর চোখের সামনে সোনালীর হাসি

মুখটা ভেসে উঠল। পরী সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছিল সোনালীকে। তাই ওর মৃত্যুর খবর টা আঘাত হানছে পরীর বুকে। সে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল,'ওই কবরটা সোনা আপার!!আর সুখানই রাখাল!!'

রুপালি পরীর কথাটা শুনে মালাকে জড়িয়ে ধরে। মালাও একসাথে দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। তবে কিছুক্ষণ

কেউ কোন কথা বলে না। সন্ধ্যা নেমে এসেছে ততক্ষণে। তখনই অন্দরে ছয় সাত জনের মতো পুরুষ প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে আফতাব ও আখির আছে। আফতাব কে দেখে মালা পরীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। চিৎকার করে বলে,’দোহাই লাগে আপনের। আমার পরীরে ছাইড়া দেন? ও আপনের

কোন ক্ষতি করবো না। ওরে আমি শায়েরের কাছে পাঠাইয়া দিমু। ও কোনদিন এই গ্রামে আসবো না।’-‘হুম তোর মেয়েকে ছেড়ে দেই আর ও আমাদের কে শেষ করুক? আমি কি আর ভুল করি?’

আফতাব হুকুম করলো পরীকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে। পরী শুধু হতবিহ্বল হয়ে সব দেখতে লাগল। ওর

নিজেরই পিতা ওকে মারার জন্য লোক এনেছে! কিন্ত ওর অপরাধ টা কি?? মালা শক্ত করে পরীকে ধরে আফতাবের কাছে অনুরোধ করছে। রুপালি বাবার পা ধরে মাফ চাইছে বারবার। দুজন লোক এগিয়ে এসে মালার থেকে পরীকে ছাড়িয়ে নিলো। তারপর হাতদুটো দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো। বাধা দিলো না পরী।

সে একবার মালাকে দেখছে আরেকবার রুপালিকে ও আফতাব কে। লোকটা টেনে তুলল পরীকে। পরী এবার বাধা দিলো বলল, ‘আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।’পরী মালার সামনে গিয়ে বলে,’কাঁদবেন না আম্মা। জানিনা কোন কারণে আপনার স্বামী আমাকে মারতে

চাইছে? আজ তো সব উত্তর আমি পেয়ে যাবো। আমি আসি।'

যাওয়ার আগে পরী রুপালিকে ওর নেকাব টা নামিয়ে দিতে বলে। রুপালি তাই করে এবং জড়িয়ে ধরে পরীকে। লোকগুলো সময় না দিয়ে পরীকে নিয়ে গাড়িতে তোলে।

গাড়ি থেকে নামার পর পরী বুঝতে পারে এটা ওদের বাগান বাড়ি। বড়

বড় পাঁচিল দেওয়া চারপাশে। বাইরেও কড়া পাহারা। ভেতরে সাধারণ কারো ঢোকা নিষেধ। পরী এও বুঝতে পারল যে আজ এই বাড়ির ভেতর থেকে ওর জীবিত ফেরা অসম্ভব। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভেতরে পা রাখে পরী।

একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো পরীকে। তারপর একটা চেয়ারে

বসিয়ে দেওয়া হলো। পরী চারিদিকে চোখ বুলায়। ঘরটাতে একটা লম্বা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ব্যতীত আর কিছুই নেই। নিশ্চুপ রইল পরী।লাঠির ঠকঠক শব্দে চোখ তুলে সামনে তাকালো পরী। নওশাদ কে সামনে দেখে অবাক হলো না। সব চাইতে অবাক হওয়ার কথা হলো ওর বাবা ওকে মারতে চায়। সেখানে

নওশাদ কি? নওশাদ চেয়ার টেনে পরীর মুখোমুখি বসলো। হাতের লাঠিটা মেঝেতে রাখলো। তার পর পরীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,'বাহ এখনও দেখছি মুখটা ঢেকে রেখেছো। রূপটা কি শুধু শায়ের কে দেখাবে? আমিও তো অপেক্ষা করছি। আমাকে একটু দেখাবে না? নাহ থাক,একটু পর

আমি এমনিতেই দেখতে পাবো। তোমার লাশটা তো আমাকেই কবর দিতে হবে!!’

পরীকে চুপ থাকতে দেখে নওশাদ মাথা চুলকে বলল, ‘সাহসী পরী!! আজকে চুপ কেন? খুন করবে না? শশীল কে তো এক নিমিষেই শেষ করে দিলে। সাহস আছে তোমার। কিন্তু তোমার বড় বোন সোনালীর

খুনিকে শাস্তি দেবে না? শুধু সোনালীর খুনি কেন? পালক আর বিন্দুর খুনিকে শাস্তি দেবে না?’পরী সোজা হয়ে বসে। বলে,’পালক!! ডাক্তার আপা পানিতে ডুবে মরেনি?’ ঘর কাঁপিয়ে হাসে নওশাদ বলে,’তুমি কি বোকা পরী। কিছুই দেখছি জানো না। ঠিক আছে আমি সব বলছি। অন্তত মরার আগে তোমার সব

জানার অধিকার আছে। পালকের কথা পরে বলি। আগে আসি বিন্দুর কথায়। বিন্দুর মৃত্যুর রহস্য কিছুটা তো জানা তোমার।'

পরী বসা থেকেই গর্জে ওঠে বলে,'কারা মেরেছে বিন্দুকে?'

-'কারা নয় বলো কে মেরেছে? কে মেরেছে জানো!!

সম্পান মাঝি।'

-'মিথ্যা কথা,সম্পান মাঝি আমার বিন্দুকে ভালোবাসতো। সেজন্য সে আত্মহত্যা করেছে।'

এবার নওশাদ আরো হাসতে লাগল যেন কোন কৌতুক বলেছে পরী। হাসি থামিয়ে সে বলে,'ওহ আচ্ছা!! সম্পান আত্মহত্যা করেছে বুঝি??'পরীর সামনে দিয়ে কেউ একজন ঢুকলো ঘরটাতে। হাতে

থাকা ব্যাগটা থেকে ছোট ছোট কতগুলো ছুরি বের করে লম্বা টেবিলে রাখলো। তার পর কতগুলো বড় বড় ছুরি রাখে। পরী ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটিকে দেখতে লাগল। কালো মুখশধারী লোকটা ঠিক পরীর স্বপ্নের মতো। অস্ত্র গুলো ও সেরকম লাগছে পরীর। কিন্ত শায়েরের জায়গায় পরী নিজে বসা। হঠাৎই

শায়েরের কথা ভীষন মনে পড়ল পরীর। আজ যদি সে মারা যায় তাহলে শায়ের বাঁচবে কীভাবে? সেও কি পাগল হয়ে যাবে রাখালের মতো? করুন অবস্থা হবে শায়েরের!!ভাবতেই অস্থিরতা কাজ করছে পরীর ভেতর। মৃত্যু নিয়ে তার ভয় নেই কিন্তু শায়ের কে নিয়ে সে চিন্তিত।-‘স্বাগতম জমিদার কন্যা

পরী। আপনাকে তাসের ঘরে স্বাগতম।’

আবারও পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চোখ বন্ধ করে ফেলে পরী। কবির এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে নওশাদের পাশে বসলো। পরীকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখে সে বলে উঠল,’ভয় পেলে নাকি পরী? ভয় পেয়ো না। তোমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারবো

না। শুধু শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলবো ব্যস। বেশি কষ্ট তোমার হবে না।'

কবিরকে থামিয়ে নওশাদ বলে,'আরে ভাই থামো। আগে পরীকে সব সত্য জানাতে দাও। মরার আগে সব জানা পরীর দরকার তো।'

নওশাদ পরীর দিকে তাকিয়ে হাসলো বলল,’আমি যেন কি বলছিলাম হ্যা সম্পান!! না থাক,শুরুটা শুরু থেকেই করি তাহলে?’লম্বা শ্বাস নিলো নওশাদ তারপর বলতে শুরু করে, ‘শুরুটা হোক ফুলমালাকে নিয়ে মানে তোমার মা। তোমার কাকা তোমার মায়ের সাথে আদৌ কি করেছে তা

আমার জানা নেই তবে এটা জানি সে মোটেও ভালো কাজ করেনি। আসলে বলো তো কি,নারীর সৌন্দর্য সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করে পুরুষ কে। যেমনটা ফুল আকর্ষিত করে নারীকে। দুটো একই হলো। তোমার বাবা তোমার মায়ের ওই সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে বিয়ে করে ঘরে তোলে। ভোলা ভালা মেয়েটাকে

যেভাবে ঘোরাতো ঠিক সেভাবেই ঘুরতো। তোমার মায়ের এই সৌন্দর্য তার কাল হয়ে দাঁড়াল। সেই কাল আর কেউ নয় স্বয়ং তোমার কাকা। কিন্তু মানতে হবে তোমার মা ঠিকই নিজেকে বারবার বাঁচিয়ে নিয়েছিল। এটা তোমার আর রুপালি ভাবির চোখে না পড়লেও সোনালীর চোখে ঠিকই ধরা পড়তো। তখন তোমরা

ছোট ছিলে বিধায় কিছু বুঝতে না। তবে সোনালী বুঝতো। তাই সে বারবার আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতো। এমনকি তোমার কাকাকে অনেক বার মারার চেষ্টাও করেছিল। আর তোমার বাবা সব জেনেও এর কোন প্রতিবাদ করতে পারতো না। কেননা তারা দুজনেই মরণ নেশায় আসক্ত হয়ে আছে। সেটা পরে বলব। এখন

আসি সোনালীর কথায়। কোমল মেয়েটার মৃত্যুটা যে ভয়ানক ছিল পরী।’নওশাদ কে এবার কবির থামিয়ে দিলো। সে হেসে বলল,’আমার সোনালীর গল্প টা আমিই বলি তুই থাম।’

চমকালো পরী, আমার সোনালী বলতে কি বোঝাতে চাইছে কবির তা বোঝার চেষ্টা করলো। কিন্ত সে

বুঝতেই পারছে না। পরীকে চিন্তিত দেখে কবির বলে,’আরে পরী এতো ভাবছো কেন? আমি তো সব বলছি। আমার সোনালী বলেছি কেন জানো? কারণ সোনালীর সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছিল তোমার বাবা। কিন্তু সে তো পালিয়ে গেলো। মনটা আমার ভেঙে গিয়েছিল তখন।

সোনালীর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল এই বুকে।'

বুকে হাত দিয়ে কান্নার অভিনয় করে কবির। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলো পরী। বলল,'আসল রূপ টা যখন প্রকাশ্যে এনেই ফেলেছেন তাহলে এতো ভনিতা না করে সব বলে ফেলুন।'-'ঠিকই বলেছো। তবে কি বলোতো সোনালী না বড্ড বোকা

ছিল। তাইতো ধরা পড়ে গেল। তার পর কি হলো জানো পরী? রাখাল কে ইচ্ছা মতো মারলো তোমার বাবার গোলামরা। সাথে আমিও ছিলাম। আমার মনের মানুষ কে আমার থেকে যে কেড়ে নিলো তাকে কীভাবে এমনি এমনি ছেড়ে দেই? সোনালীকে তোমার বাবা'ই নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছিল

সেদিন। আমি আর নওশাদ হাত পা চেপে ধরেছিলাম শুধু। তারপর আমার আর নওশাদের উপর দায়িত্ব পড়ে সোনালীকে কবর দেওয়ার। রাখাল কে জীবিত রাস্তার ধারের কদম গাছের সাথে বেঁধে রাখি। ওর তখনও জ্ঞান ছিলো। তবে মারার ফলে নেতিয়ে পড়েছিল রাখাল। সোনালী কে ওর চোখের সামনেই

হত্যা করা হয়। ছেলেটা অনেক বার অনুরোধ করেছিল যেন সোনালীকে ছেড়ে দিতে। তাহলে ও অনেক দূরে চলে যাবে। কখনও সোনালীর ছায়াও মাড়াবে না। কিন্ত এতো ভালোবাসা তো সহ্য হলো না তোমার বাবার। তাই মেরে দিলো।

তবে মানতে হবে পরী,সোনালী অসম্ভব রূপবতী ছিলো। রুপালির

থেকেও সোনালী বেশি সুন্দর ছিলো। এমন সৌন্দর্যে ডুব না দিলে কি হয় বলো!!মরে যাওয়ার পর সোনালী যেন আরো আবেদনময়ী হয়ে উঠেছে! তাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

নিজের ইচ্ছা মিটিয়ে নিলাম সোনালীর থেকে। তাও রাখালের সামনেই। কিন্ত সে দেখা ছাড়া

কিছুই করতে পারেনি। বেচারা রাখাল,তবে নওশাদ ও কিন্ত সেদিন সোনালীকে ছাড় দেয়নি! যাকে এতো ভালোবাসালো তাকে না পাওয়ার বেদনায় সে পাগল হয়ে গেল রাখাল। তারপর রাখাল কে পদ্মার ওপারে রেখে এলাম যাতে সবাই এটা জানতে পারে সোনালী রাখালের সাথে পালিয়ে গেছে। কিন্ত রাখাল

পাগল প্রেমিক হয়ে মরা মেয়েটার টানে ফিরে এলো। তবে ওর চেহারা চেনার উপায় নেই। জঙ্গলে ভরে গেছে পুরো মুখে।'কবির আর নওশাদ হাসছে। পরীর চোখ থেকে জল পড়ছে। ঠোঁট কামড়ে রাগ দমন করার চেষ্টা করছে সে। হাতের বাঁধন এই মুহূর্তে খোলা থাকলে সে এখুনি দুটোকে শেষ করে দিতো।

পরক্ষণেই মনে হলো ওর পা দুটো তো খোলাই রয়েছে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে নওশাদের বুক বরাবর লাথি মারতেই চেয়ার থেকে সে পড়ে গেল। কিন্তু কবিরকে লাথি মারা ধরতেই কবির পরী পা ধরে ফেলে এবং দড়ি দিয়ে পরীর পা দুটো ও বেঁধে ফেলে। নওশাদ কে টেনে তুলে আবার চেয়ারে বসায়। পরী

চিৎকার করে বলে,'কাপুরুষের দল,একটি মেয়ের সাথে লড়াই করার জন্য এতো মানুষ এসেছিস। ভয়ে তার হাত পা বেঁধে রেখেছিস। সাহস থাকলে হাত পা খুলে দে।'

রাগে ফুসছে পরী। জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস উঠানামা করছে ওর। খুনের নেশা ধরে গেছে। নওশাদ চেয়ারে বসে বলল,'শালির দম

আছে। ইচ্ছে করছে সব ঝাল মিটিয়ে দেই। আমাদের জন্য বিপদজনক বলেই জমিদার ওকে মারতে বলেছে। একটু পর কথা বলার মতো অবস্থায় থাকবে না।’রাগটা নওশাদেরও বেড়ে গেল। কিন্তু কবির ওকে থামিয়ে বলল,’তুই থাম,পরীকে তো একটু পরেই পাওয়া যাবে।’

-'যদি পুরষত্ব দেখাতে হয় তাহলে আমার হাত খুলে দেখা।'

কবির আদুরে স্বরে বলে,'নাহ,বাঘীনিকে সবসময় খাঁচায় বন্দি করে রাখতে হয়। নাহলে যে আক্রমণ করে বসে। তুমি জানো না বুঝি?'

মুখ ফিরিয়ে নিলো পরী। ওর চোখভরা ঘৃণা। আজকে যদি পরী

কোনরকম বেঁচে ফেরে তাহলে এদের একটাকেও ছাড়বে না। নিজের জীবন যায় যাক। অন্তত দু চারটাকে শেষ করে শান্তি পাবে তো?

কিন্তু এখান থেকে বাঁচবে কীভাবে পরী? মনে মনে সে প্রার্থনা করতে লাগল আল্লাহ যেন এই শয়তানের শাস্তি দিতে ওকে বাঁচিয়ে রাখে।

কবির নিজের চেয়ার টাতে বসে পড়ল। পরীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল,'এটুকুতে উত্তেজিত হলে চলবে পরী? আরো অনেক কিছু শোনা বাকি তোমার। রুপালির কথা তো এখনও বললামই না।'কবির নিজের চেয়ার টা টেনে পরীর আরেকটু কাছে গিয়ে বসে। তারপর বলে,'রুপালির জন্যই তো তুমি

শশীল কে মেরেছিলে। তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্ত শশীলের হাতে রুপালিকে তোমার কাকা তুলে দিয়েছিলো। তিনিই চিঠি পাঠিয়েছিল রুপালির কাছে। তিনি খুব ভাল করেই রুপালি আর সিরাজের সম্পর্কের কথা জানতেন। তাই শশীলের সাথে চুক্তি করেই তিনি সব করেছিলেন। আর তারপর

তোমার হাতে সব শেষ। আমরাই শশীলের লাশটা গায়েব করেছিলাম। অন্দর থেকে যেহেতু মহিলাদের বের হওয়া নিষেধ তাই তোমার দুই মা আর কাজের লোকেরা আমাদের চিনতো। কিন্ত তোমরা তিন বোন চিনতে না আমাদের কে। তোমার কাকা আখিরের হাত আছে এই কথাটা তুমি জানতে পারলে রুপালি

আর আমার বিয়ের দিন। এবং সেদিনই তুমি তাকে আঘাত করে বসলে। মরতে মরতে সে বেঁচে গেলেও তোমার জহুরি নজর থেকে সে বাঁচলো না। বারবার তুমি তাকে মারার পরিকল্পনা করলে। কিন্তু বরাবরের মতই ব্যর্থ হলে। সেজন্যই এখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা আর যাবে না। মরতে তোমাকে হবেই।

সাপকে যতোই দুধ কলা খাওয়াও না কেন সে ছোবল দিবেই। তোমার বাবা বেশ বুঝেছে যদি তুমি কোনদিন জানতে পারো যে সোনালীর মৃত্যুর কারণ তিনি তাহলে তাকে মারতে তোমার দ্বিধাবোধ হবে না। এজন্য বারবার তোমাকে মারার পরিকল্পনা সে করেছে।’-‘আর

বিন্দু??বিন্দুকে কে মেরেছে সত্যি করে বলুন?’

এবার নওশাদ বলে উঠল,’সে তো তোমাকে প্রথমেই বললাম। তোমাদের প্রিয় সম্পান মাঝি তোমার প্রিয় বিন্দুকে মেরেছে।’

-‘আমি বিশ্বাস করি না। বিন্দুকে একজন নয় অনেক গুলো লোক মেরেছে। আমি নিজে উপস্থিত

ছিলাম সেদিন ওই জঙ্গলে। অনেক লোকের উপস্থিতি আমি সেদিন পেয়েছিলাম।’

নওশাদ হো হো করে হেসে উঠল। বিশ্রী সেই হাসি দেখে গা গুলিয়ে ওঠে পরীর। হাত পা ছুটোছুটি করেও বাঁধন ছিড়তে পারে না।

–‘চোখের সামনে যা দেখো তা কি সব সত্য পরী? তুমি হয়তো জানো

না ওইদিন বিন্দুর সাথে তোমাকেও মারার পরিকল্পনা ছিলো। যাই হোক শুরু থেকেই বলি। নাহলে তূমি কিছু বুঝতে পারবে না। কানাইকে মনে আছে তোমার? মনে করে বলতো?’

-‘হুমম,বন্যার সময় আমাদের বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল,,,,’পরীকে বাকিটা বলতে না দিয়ে নওশাদ বলে,’আর তুমি

তাকে ধরেছিলে। শুধু তা'ই নয়, কানাই কে চুরির সাজা থেকে বাঁচিয়ে ছিলে। কিন্ত পরী এখানেও তুমি বোকার পরিচয় দিয়েছো। কানাই সেদিন চুরি করতে না, তোমাকে খুন করার জন্য গিয়েছিল। তোমার বাবা ওকে পাঠিয়েছিল। কিন্ত তুমি তাকে ধরে ফেললে। এবং তোমার বাবা বিচারের নাটক

সাজালো। তারপর তুমি এসে কানাইকে বাঁচালে। আহ কি বুদ্ধি তোমার!! তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় পরী। এবার আসি সম্পানের কথায়। শুধুমাত্র তোমাকে মারার জন্য তোমার প্রাণপ্রিয় সখির সাথে ভালোবাসার নাটক করেছে সম্পান। ওহ পরী তোমাকে তো আসল কথা বলাই হয়নি।’

নওশাদ কিছুক্ষণ ভাবার অভিনয় করে বলল,'শেখর কে সরিয়ে তোমাকে শায়েরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কেন জানো? শুধুমাত্র তোমাকে খুন করার জন্য। কিন্ত শায়ের তো ভীষন ধূর্ত। সে তোমাকে হত্যার পরিবর্তে ভালোবেসে সংসার শুরু করে দিলো!!'বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে পরীর কোমল মন। বিষাক্ত

ধোঁয়া যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে যার দরুন শ্বাস নিতে ভিশন কষ্ট হচ্ছে পরীর। আর কতভাবে সে আজ ভাঙবে?? শায়ের ও শেষমেশ এর সাথে যুক্ত ছিলো! বিশ্বাস করতে চাইছে না পরীর মন। যাকে এতোটা ভালোবাসলো এবং যার থেকে এতো ভালোবাসা পেলো সে'ই কিনা পরীকে খুন করার জন্য বিয়ে

করলো!!পরক্ষণে পরীর মনে হলো শায়ের ওকে সত্যি ভালোবেসেছে তো? নাকি ওটাও ওর অভিনয় মাত্র? শায়েরের কথা ভেবে কেঁদে উঠল পরী। নিজেকে আর দমন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। একসময় সে সাহসি ছিলো। কিন্ত ওই পুরুষ টার জন্য যে একজন নরম এবং ভালোবাসাময় নারীতে পূর্ণ হয়েছিল।

সে ভালোবাসার কাছে যে পরী আজ প্রতারিত। এতো ষড়যন্ত্রের মধ্যে শায়েরের নামটা থাকা কি খুব জরুরী ছিল? এই নামটা বাদ দিলে খুব কি ক্ষতি হতো? কোন যুদ্ধ তো হতো না! পৃথিবী ধ্বংসও হতো না। সবশেষে কেন এই নামটা নিলো নওশাদ?? সব ভাবনার মাঝে চোখের পানি ফেলছে পরী। মনে

হচ্ছে ওরা মারার আগেই পরী দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। এমন আপনজন থাকার থেকে মরে যাওয়াই উত্তম।পরীকে এবারে কাঁদতে দেখে নওশাদ আর কবির কোন কথা বলে না। চুপ থেকে পরীকে একটু সময় দিলো। পরী কান্না শেষ করে বলল,’আর কি কি

বাকি আছে? সব জানতে চাই আমি।'

নওশাদ আফসোসের সুরে বলে,'তোমাকে এভাবে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে পরী। কতো ভালোবাসলে তুমি শায়ের কে। কিন্তু সে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে মোটেও ভালো করেনি।'

-'আমি সব জানতে চাই??তারপর কি হয়েছিল?'-'সবকিছুতে সম্পানের হাতটা বেশি ছিলো। সে বিন্দুর সাথে ভালোবাসার নাটক করে তোমার সব খবর আমাদের কাছে দিতো। তোমাকে সর্বপ্রথম হত্যা করার দায়িত্ব পড়ে শায়েরের উপর। সম্পান আর বিন্দুর সাথে রাত্রি বেলা তুমি নদীতে ঘুরতে যেতে সেটাও

সম্পান শায়ের কে বলেছিল। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী তোমাকে মারতে শায়ের সেদিন গেলো। কথা ছিল সেদিন বিন্দু আর তোমাকে খুন করে নদীতে ভাসানোর। কিন্তু শায়ের পারলো না তোমাকে মারতে। সে পরিষ্কার বলে দিলো তার পক্ষে তোমাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। কারণটা সেদিন

শায়ের বলেনি। তবুও তোমার বাবা শায়ের কে কড়া হুকুম দেন তাতেও লাভ হলো না। শেষে ঠিক হলো আমার সাথে বিয়ে হবে তোমার। আর তারপর আমিই তোমাকে হত্যা করবো। এছাড়া তোমাকে হাতে পাওয়ার কোন উপায় ছিলো না। সেটাও ভেস্তে দিলো শায়ের। কেন জানি আমার মনে হয়েছিল শায়ের

তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমার সন্দেহ টাই ঠিক হলো। আমি কলপাড়ে এমনি এমনি পড়িনি শায়ের পরিকল্পনা করেই সাবান মেখে রেখেছিল আর আমি পা পিছলে পড়ে যাই। পরে সব জানাজানি হলে আমার আর শায়েরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় অনেক। তোমার বাবা নিশ্চুপ

থাকলেও তোমার কাকা শায়ের কে অনেক বকাবকি করেন। যেদিন তোমরা কবির ভাইয়ের বাড়িতে গেলে ওইদিন সব কিছুই পরিকল্পনার মতো হয়েছে। আমাদের মাঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঝগড়া হয়। এবং সেদিন তোমাদের গাড়ির সামনে আমাদের লোকই যায়। ওইদিন কথা ছিল শায়ের ওদের

হাতে তোমাকে তুলে দিবে। কিন্ত নাহ শায়ের আবারও পাল্টি খেলো। তোমাকে বাঁচিয়ে নিলো। ইচ্ছে করছিল শায়ের কে তখনই শেষ করে দেই কিন্ত পারলাম কই?এর মধ্যেই আরেক ঝামেলা ঘাড়ে এলো। শহরের ডাক্তার তিনজন এসে হাজির হলো। তখন তোমরা ঠিক করেছিলে পশ্চিমের জঙ্গলে বিন্দু

আর সম্পানের বিয়ে দেবে। সব ঠিক করা ছিলো সেদিন। সেবার আর শায়ের কে পাঠানো হলো না। শহরের ডাক্তারদের দিয়ে যাত্রা দেখতে পাঠানো হলো। কিন্ত এখানেও গন্ডগোল হয়ে গেল। বিন্দু যখন তোমাদের অপেক্ষা করছিল আমরাও দূর থেকে ওত পেতে ছিলাম। কিন্ত আমাদের ছেলেদের

তখন বাসনা হলো বিন্দুর প্রতি। কি আর করার? সবার ইচ্ছা পূরণ করতেই হলো। তবে সম্পান তখন ছিলো না। ও যখন এলো বিন্দু তখন মরণ যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিলো। বিন্দুর ওই অবস্থা দেখে সেদিন সম্পানের ভয়ংকর রূপ দেখেছিলাম। তখনই আমাদের দলের দুজনকে ছুরির আঘাতে শেষ করে দিয়েছিলো। পরে

বুঝতে পারলাম সম্পান মিথ্যা না সত্যি সত্যি বিন্দুকে ভালোবাসতো। অভিনয় করতে গিয়ে বিন্দুকে সে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছিলো। এজন্য সম্পান বারবার বলেছিল বিন্দুর যাতে ক্ষতি না হয়। ওরা যেন শুধু তোমাকেই হত্যা করে। তবে বিন্দু রাতের আঁধারে থাকা মানুষ গুলোর কথা জানতেও পারলো না।

সম্পান বিন্দুকে নিজ হাতে খুন করে। যাতে পরবর্তীতে বিন্দুর নিজের প্রতি ঘৃণা না হয়। বিন্দু যাতে জানতে না পারে সম্পানও এসবের মধ্যে ছিলো।তারপর খড়ের গাদায় কেরোসিন ঢালা হলো। হিন্দু রীতিমত পোড়ানো হবে। এর মাঝে তুমি চলে এলে। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম জঙ্গলের

সামনে থেকে। কিন্তু তুমি এলে পেছনের দিক দিয়ে। এবং পালিয়েও গেলে। আমাদের সব পরিকল্পনা আবারও বিফলে গেলো। পরে খবর পেয়ে শায়ের ছুটে এলো। এবং বিন্দুকে যারা ধ*র্ষ*ণ করলো তাদের সবাইকে মেরে দিলো তোমাদের ওই বাগান বাড়িতে নিয়ে। শায়ের বেশি বাড়াবাড়ি করেছিল সেদিন। তাই

তোমার বাবা শায়ের কে অনেক কথা শোনায়। এর মধ্যে আরেকটা ভুল হয়ে গেল। শায়েরের পিছু নিয়ে শেখর সব সত্য জেনে গেল। পরের দিন তোমাকে দেখে সে তোমার প্রেমে পড়ে গেল। এবং তোমার বাবাকে এক প্রকার হুমকি দিলো যাতে তোমার সাথে শেখরের বিয়ে দেয়। এটা তোমার বাবা মেনে নিতে

চায়নি। তখন গ্রামে এমনিতেই বিন্দু খুন হয়েছে। পুলিশ এসেছে তাই শেখর কে যেতে দেওয়া হলো। সময় নেওয়া হলো বিয়ের জন্য। বিয়ের দিন ওদের গাড়ি দূর্ঘটনা আমরাই করেছি। এবং ফাঁসিয়ে দিয়েছি নাঈম কে। বেচারা নির্দোষ কিন্তু তবুও জেল খাটছে।শেখর যেদিন জমিদার বাড়িতে এলো

তারপর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি। জানতাম শহরে ফিরে শেখর সব পুলিশ কে বলে দেবে। তাই ওর কিচ্ছা খতম করে দিলাম। তবে এরপর বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্পান। সে পুলিশ কে সব বলতেই যাচ্ছিল কিন্তু তা পারেনি। বিন্দুকে যে ডালে ঝুলিয়ে ছিলাম ঠিক সেই ডালেই সম্পান কে মেরে ঝুলিয়ে

দেই। সবাই ভাবলো সম্পান আত্মহত্যা করেছে। ব্যাস এভাবেই একটা ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটলো। কিন্ত পালক!! ওই মেয়েটা নির্দোষ ছিলো। কি দোষ ছিল ওর? একটু ভালোবাসাই তো চেয়েছিল শায়েরের কাছ থেকে কিন্ত শায়ের তাকে মৃত্যু উপহার দিলো। কানাইকে মারার পরিকল্পনার করছিল সেদিন শায়ের।

কেননা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে কানাই ওত পেতে ছিল সময় মতো তোমাকে সব সত্য বলে দেবে। তাই সত্য গোপন করতে কানাইকে মারার কথা চলছিল। ওইদিন পালক সব শুনে ফেলে। তবে সেও শেখরের মতো ফায়দা ওঠালো। শায়ের কে বলল ও যদি পালককে বিয়ে করে তাহলে কাউকে এই সত্যি বলবে

না। শায়েরের আবার মাথা গরম ছিল খুব।তোমাকে খুন করতে না পারায় সেদিন অনেক কথা শুনতে হয়েছিল ওকে। তাই মাথা গরম করে শায়ের নিজ হাতে পালক কে পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলে। কিন্তু সমস্যা হলো যখন জানতে পারলাম পালক সাঁতার জানতো।

তাই আমরা আগেই পালকের বাবা মায়ের কাছে যাই এবং তাদের হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করি। কিন্ত কতদিন আর ওদের চুপ করানো যায়? তাই তাদের কেও মরতে হলো। আমি তখন সচল ছিলাম তাই খুন গুলো আমিই করি। জানোতো পরী,শায়েরের থেকে খুন করার

নেশা আমার অনেক বেশি। রক্ত দেখার মজাই আলাদা।

শায়েরের সাথে তোমার বিয়ে দেওয়ার কোন কথাই ছিল না। কিন্তু শায়ের নিজেই বিয়ের দিন বলে সে তোমাকে বিয়ে করবে এবং ওর গ্রামে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। আমি বিশ্বাস করিনি ওর কথা। তোমার বাবাকে বারণ করেছিলাম কিন্তু তিনি

শুনলেন না। বিয়ে দিয়ে ওই রাতেই তোমাদের পাঠিয়ে দিলো নবীনগর। এরপর দিনের পর দিন যায় কিন্তু শায়ের তোমাকে মারে না। অনেক চিঠি যায় শায়েরের কাছে সে উত্তর দিতো না। শেষ চিঠি পেয়ে শায়ের এখানে আসে এবং বলে দেয় সে তোমার সাথে থাকতে চায়। আমাদের সাথে সে আর কাজ করবে

না।আমাদের ধোকা দিয়ে শায়ের তোমাকে নিয়ে সুখে থাকবে এ'তো মানা যায় না। তাই জুম্মান কে দিয়ে মিথ্যা বলে তোমাকে এখানে আনলাম। এবং আজ তোমাকে মরতে হবে পরী। শায়ের কে শাস্তি দিতে হলে তোমাকে মরতে হবে। আমি জানি শায়ের নিজ থেকে তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে

না। তাই ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেই হলো।'

পরী চোখ বন্ধ রেখেই সব শুনছিলো এতক্ষণ। এখনও চোখ খুলছে না সে। মনে হচ্ছে চোখ খুললেই শায়েরকে দেখতে পাবে এবং শায়ের এসেই ওর গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে। পরী সেই মৃত্যুটা নিতে পারবে না। বিন্দুকে এই

মুহূর্তে মনে পড়ছে। না জানি ওই রাতটা ওর কিভাবে কেটেছে? নিজের প্রিয় মানুষটার খারাপ রূপ টা দেখে মরতে পারেনি বিন্দু। কিন্তু পরী তো শায়েরের আসল রূপ টা জেনে গেছে। মরতে ওর ভিশন কষ্ট হবে। পরী চোখ খুলে নওশাদের দিকে তাকিয়ে বলল,'আমার হাতের বাঁধন খুলবেন না। আমাকে মারার

সময় ভুলেও আমার হাত খুলবেন না। তাহলে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আর কার মৃত্যু হবে তা বলা মুশকিল।'

-'বাহ তোমার তেজ দেখছি বেড়ে গেছে। তোমাকে তো ছাড়া যাবেই না। নওশাদ চল এখন। পরীকে পরওপারে পাঠানোর সময় এগিয়ে আসছে।'নওশাদ লাঠি ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে পড়লো। খোড়াতে খোড়াতে সে চলে গেল। কবির ও চলে গেল। আর কিছু জানানোর নেই পরীকে। এখন এখানে না থাকাই ভাল। পরীকে একা ছেড়ে দিলো ওরা।

আফতাব আর আখির বাগান বাড়িতে এসে পৌঁছালো মাত্র। ওদের জন্যই সবাই অপেক্ষা করছিল। আফতাবের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত পরীর গায়ে

ফুলের টোকাও কেউ দিতে পারবে না। বাহিরে কড়া পাহারা,বাগান বাড়িটার চারপাশে জঙ্গলে আবৃত। আশেপাশে কোন ঘরবাড়ির নিশানাও নেই। তাছাড়া মোঘল আমলের এই বাড়ির ভেতরের কোন শব্দ শোনা কারো পক্ষে সম্ভব না। আফতাব আসতেই কবির এগিয়ে গেলো বলল,'যা করার তাড়াতাড়ি

করতে হবে। পরীকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। ওই মেয়েটা চতুর বেশি। কি জানি কখন আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে।'

-'ডাক্তার আসতে একটু সময় লাগবে। তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

নওশাদ গর্জে উঠে বলে,'হোক দেরি, আগে পরীকে শেষ করে দেই

তারপর ডাক্তার আসুক সমস্যা নেই।'

-'বেশি বোঝো না তুমি? আগে ডাক্তার আসুক। পরে সমস্যা হলে তুমি সামলাবে?'

-'আপনি এখনও আমার কথা শুনছেন না। আমার কথা শুনলে আজ এই দিন দেখতে হতো না। পরীকে আরো আগেই শেষ করে

দিতাম।'-'এই খোড়া পা নিয়ে কি করবে তুমি? চুপচাপ বসে থাকো।' অপমানিত হয়ে নওশাদ চুপ করে গেলো। আফতাব প্রায়ই এই কথা বলে অপমানিত করে ওকে। কিন্তু এজন্য তো নওশাদের কোন দোষ নেই। শায়েরের জন্য সব হয়েছে তাই ওর ক্ষোভ এখনও রয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে ক্ষতি

হবে তাই আফতাব সব সময়ই সবাইকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। সবার কথার মাঝে একজন রক্ষী এসে খবর দিলো শায়ের এসেছে। মুহূর্তেই সবার চোখে মুখে আতঙ্ক দেখা দিলো। এতো তাড়াতাড়ি তো শায়েরের আসার কথা না!! সে ব্যবস্থা আফতাব করেই রেখেছে। তাহলে শায়ের এখানে পৌঁছালো

কিভাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। নওশাদ রেগে আগুন। সে বলল,’এজন্যই বলেছিলাম সব তাড়াতাড়ি করতে। সব কিছু বিফলে গেলো।’কবির ছুট লাগালো পরীর কাছে। দড়িটা নিয়ে ফাস লাগালো পরীর গলাতে। হঠাৎ কবিরের এহেম কান্ডে অবাক হলো না পরী। মৃত্যুর জন্য সেও প্রস্তুত ছিলো। কিন্ত

কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানেই শায়ের সেখানে প্রবেশ করে। এবং কবিরকে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারতে থাকে। কয়েক মুহূর্তে কি হয়ে গেল পরী বুঝে উঠতে পারলো না। গলায় ফাঁস লাগার আগেই শায়ের তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। শায়ের টেবিল থেকে একটা ছুরি এনে চেপে ধরে কবিরের গলায়। চোখ তুলে

শায়েরের চোখে চোখ রাখে কবির। যেন অগ্নেগীরির লাভা ওই চোখে। কবির বুঝলো এই মুহূর্তে যদি শায়ের ওকে শেষ করেও দেয় কেউ ওকে কিছু বলতে পারবে না। শায়েরের ভয়ংকর রূপ কবির দেখেছে কিন্ত এতোটা ভয়ানক হতে সে দেখেনি। শায়ের রুষ্ঠচিত্ত কণ্ঠে বলল,'সাহস অনেক দেখিয়েছিস

তুই। তোকে মারলে কেউ আমার গায়ে সূচ ও ছোঁয়াতে পারবে না এটা জেনেও আমার পরীজানের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস তোর হলো কীভাবে??’

ধারালো ছুরির সামান্য ছোঁয়াতেই কবিরের গলার চামড়া কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। সবাই ততক্ষণে চলে এসেছে। আফতাব হুংকার

ছাড়লো বলল, ‘শায়ের!!! কবিরকে ছাড়ো!!’হাত থেকে ছুরি ফেলে দিলো শায়ের। আফতাবের দিকে না তাকিয়ে সে এগোলো পরীর দিকে। হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বলতে লাগল, ‘আমার সাথে গলাবাজি করবেন না। আপনার মতো শত জমিদারের মস্তিষ্ক এই সেহরান হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘোরে।

আমার সাথে চালাকি করার চেষ্টাও করবেন না। যদি আমার পরীজানের কিছু হয়ে যেতো তাহলে আপনারা ভয়ংকর কিছুর সম্মুখীন হতেন। তাই মুখটা বন্ধ রাখুন।’

আফতাব চোখ বুজে শায়েরের কথাগুলো হজম করে নিলো। শায়েরের কথা আফতাব কে মানতেই হবে। কেননা আফতাবের

দূর্বল স্থানগুলো শায়েরের জানা। নাহলে শায়ের কে সে কবেই মেরে দিতো।

পরীর বাঁধন খুলে হাত ধরে পরীকে দাঁড় করালো শায়ের। পরী শায়েরের থেকে হাত সরিয়ে পিছিয়ে গেল। লম্বা টেবিলের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল পরী। শায়ের সাথে সাথেই পরীর কাছে গিয়ে বলল,’আপনি ঠিক

আছেন পরীজান? চিন্তার কারণ নেই আমি এসে গেছি। চলুন আমরা ফিরে যাই।'

পরী মৃদু ধাক্কা দিয়ে শায়ের কে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিলো। বলল,'ছোঁবেন না আমাকে আপনি। যে হাতে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন সেই হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন না আমাকে।'শায়ের নওশাদের দিকে

তাকালো। সাথে নওশাদের চোখের ভাষাও বুঝে গেল। নওশাদ পরীকে সব সত্য জানিয়ে দিয়েছে। তাই শায়ের শান্ত স্বরেই বলল,'যা বলার বাড়িতে গিয়ে বলবেন। আপাতত এখান থেকে চলুন।'

এবার পরী প্রতিক্রিয়া করে না। চুপচাপ পা বাড়ায় শায়েরের সাথে। কবির বসা থেকে উঠে দাঁড়াল।

গলায় হাত দিয়ে রক্ত দেখে সে রেগে গেল ভিশন। কিন্তু এই রাগটা যেন চিরকালের জন্য থেমে গেল। কারণ আচমকাই কবিরের গলার ভেতরে ছুরি গেঁথে দিয়েছে পরী। শ্বাস টেনে নিতেও পারলো না কবির। মেঝেতে ধপাস করে পড়ে গেলো। গলা দিয়ে বয়ে গেলো

রক্তস্রোত।পরী শান্ত মেজাজে কবিরের গলায় ছু*রি বসিয়েছে। যা কারো মাথাতে আসেনি। এমনকি শায়েরের ও না। নওশাদ ভেবেছিল এতো কিছু জানার পর পরী ভেঙে পড়বে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে পরী নিজেকে আরো শক্তিশালী করে দাড় করিয়েছে। যখন টেবিলের পাশ ঘেষে পরী

দাঁড়িয়েছিল তখনই ছু*রিটা হাতে নিয়েছিল এবং সুযোগ বুঝেই কাজে লাগিয়েছে। কবিরকে আঘাত করে পরী আর এক মুহূর্তেও দেরি না করে পা বাড়ালো নওশাদের দিকে। তবে নওশাদ একটু দূরে থাকার কারণে সে সতর্ক হয়ে গেল। শায়ের নিজেও পরীকে ঝাপটে ধরে। টেনে সবার থেকে দূরে নিয়ে আসে। কিন্তু

পরী হাত পা ছুটোছুটি করছে। শায়ের বলল,'ছুরিটা ফেলে দিন পরীজান আপনার লেগে যাবে। একটু শান্ত হন।'-'ছাড়ুন আমাকে,ওকে না মারতে পারলে আমার রক্ত ঠান্ডা হবে না।'

আফতাব চেঁচিয়ে বলে,'এখনও সময় আছে শায়ের, পরীকে শেষ করে

দাও। নাহলে ও তোমাকেও ছাড়বে না।'

আফতাবের কথাতে পরী স্থির হয়ে গেল। হাত থেকে ছু*রিটা আপনাআপনি পড়ে গেল। সে বলল,'কেমন পিতা আপনি যে নিজ কন্যাকে হত্যা করতে চাইছেন? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি

করিনি তাহলে আমার উপর আপনার কিসের ক্ষোভ?’

-‘মেয়ে হয়ে যদি বাবাকে খুন করার ইচ্ছা পোষণ করো তাহলে আমি বাবা হয়ে কেন পারবো না?’

-‘আমি কবে আপনাকে খুন করতে চাইছি? আমি তো আপনাকে হত্যা করার কথা কখনও চিন্তাও করিনি।’

-‘এখন তো করতে চাইবে। সেটা আমি জানি। সোনালীর মতো তুমিও আমাকে মারতে চাইবে তাই তোমাকে আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।’-‘সোনা আপা আপনাকে মারতে চেয়েছিল? কিন্ত কেন??’

আফতাব কথা বলল না। তবে নওশাদ বলে উঠল, ‘তোমার বাবার যে সাম্রাজ্যের লোভ পরী। তা পেতে

সে নিজের আপনজনদের বিসর্জন দিতেও পিছপা হবে না।’

আফতাব রাগন্বিত চোখে নওশাদের দিকে তাকালো। নওশাদ সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। পরী তো সব জেনেই গেছে, এটুকু জানলে ক্ষতি কি?

-‘কি এমন লোভ আপনার যে নিজের মেয়েদের হত্যা করতে হবে?

অল্প কিছু নিয়ে কি সুখে থাকা যায় না?

যে লোভে এতো পাপ করছেন, পরকালে কি জবাব দিবেন?’-‘ইহকালে সুখ পেলে পরকালেও পাবো আমাকে নিয়ে তুমি এতো ভেবো না।’

-‘মূর্খ পিতা আপনি। ইহকাল পরকালে আকাশ পাতাল তফাত।

তবে একটা কথা শুনে রাখুন, যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আপনি বাঁচবেন না। সাম্রাজ্যের লোভে আপনি, আর আমার প্রতিশোধের আক্রোশ। কার জয় হয় দেখা যাবে। আমি নিশ্চিত এই যুদ্ধে আমার প্রাণ হারাবো আমি। কিন্ত রক্তারক্তি ছাড়া আমি মরবো না। ভুলে যাবেন না

আপনার রক্ত আমার শরীরে আছে। তাই আপনার মতো তলো*য়ার আমিও চালাতে পারি। আর আমার লক্ষ্য কখনো বিফলে যাবে না।’

আফতাব গর্জে ওঠে। তার সামনেই মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে তার মেয়ে। আর তিনি শুনছেন। শায়ের কে সে বলে,’পরীকে রেখে চলে যাও শায়ের

নাহলে আজ তোমাকেও শেষ করে দেবো।'

আফতাবের কথা শুনে শায়ের হাসলো। একহাতে পরীকে জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার কোন চামচার সাহস নেই আমাকে ছোঁয়ার।এসব বলে নিজেকে হাসির পাত্র বানাবেন না। চলুন পরীজান। আমাদের যেতে হবে।'

শায়ের পরীর হাত ধরে সবার সামনে দিয়ে বাগান বাড়ি ত্যাগ করলো। সব রক্ষিরা শায়ের কে আটকানোর পরিবর্তে তাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিলো। কিছুটা দূর এসে পরীর শক্তি যেন সব শেষ হয়ে গেল। সে মাটিতে বসে পড়ল। শায়ের পরীর হাত ছেড়ে দিলো। পরী চিৎকার করে কাঁদছে,বোরখার

নেকাব টা টেনে খুলে ফেলেছে সে। জীবনের এতগুলো বছর সে ভুল মানুষদের সাথে কাটিয়েছে সেটা ভাবতেই ঘৃণা বাড়ছে ওর। মাটিতে বসে সে হাত পা ছুড়ছে আর কাঁদছে।জ্যোৎস্নার আলোতে ভরে গেছে চারিদিক। চাঁদের আলো সবারই প্রিয় কিন্ত সময় যেন সবকিছুতে আজ বিষ ঢেলে দিয়েছে।

নিঃশ্বাস ছাড়তেও কষ্ট হচ্ছে পরীর। কিছুক্ষণ ওভাবে বসে থেকে উঠে ছুট লাগালো পরী। শায়ের পরীকে দাঁড়াতে বলছে আর ছুটছে। পরী ছুটে গেলো সোনালীর কবরের কাছে। কবরের মাটি আঁকড়ে ধরে মাথা রাখে মাটিতে। এই রাস্তা দিয়ে কতো চলাফেরা করেছে অথচ পরী জানতেও পারলো না এই কবরটা

ওর প্রিয় মানুষটার। রাখাল কদম গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিল। পরীকে এইভাবে কাঁদতে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে এসে পরীর পাশে বসে ওকে দেখার চেষ্টা করে। পরী আগের মতোই কাঁদছে। রাখাল পরীকে মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে বলে,'এই ওঠ, কান্দস ক্যান এতো। রানীর ঘুম ভাইঙা

যাইবো।’পরী মাথা তুলে রাখালের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ভেঙে আবারো কেঁদে উঠল। সে বলল,’আপার ঘুম কখনোই ভাঙবে না। যদি কাঁদলে ঘুম ভাঙতো তাহলে বিশ্বাস করো আমি অনেক কাঁদতাম। তুমি কেন আপাকে বাঁচাতে পারলে না? আমার আপা কত কষ্ট নিয়ে দুনিয়া ছাড়লো।’

রাখাল পরীর কথার অর্থ বুঝলো না। বোঝার চেষ্টাও করলো না। সে আপন হস্তে সোনালীর কবরে হাত বুলাচ্ছে।

-'কোন পাপের শাস্তি তুমি পেলে আপা? ওই পিশাচ গুলো তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমি তোমার কবরের মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ

পর্যন্ত আমি ওদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যাই হোক না কেন নওশাদ কে না মারা পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না। তোমার মৃ*ত্যুর প্রতিশোধ আমি নিবোই। মৃ*ত্যুর পরেও বিধাতার কাছে আর্জি জানাবো তোমার হ*ত্যাকারীর শাস্তির জন্য।’চোখের পানি দুহাতে মুছে নিলো পরী। শক্ত কণ্ঠে

বলল,’দোয়া করো আপা,তোমার পরী যেন সব কাজে সফল হয়। তোমার ছোট্ট পরী আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। ভালো খারাপ আজ বুঝেছে। প্রতিশোধের মানে জানে। তোমার পরী কখনো ভেঙে পড়েনি আর ভাঙবে ও না। তোমার পরী হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে।’

আবার চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল পরী। পেছন ফিরতেই সে শায়ের কে দেখলো। শায়ের এতক্ষণ পরীর কথা শুনছিলো। পরীর চাহনি স্থির। শায়ের তা অন্ধকারে উপলব্ধি করতে পারলো না। তবে শায়ের এটা বুঝতে পারল যে আজকের পরী সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈরি। শায়েরের জন্য তার মনে এটুকুও ভালোবাসা

নেই। শায়ের পরীর দিকে এগোলো না পরী নিজেই আসলো। জমিদার বাড়ির দিকে যাচ্ছে পরী। শায়ের বলে উঠল,'ওখানে যাবেন না পরীজান। আমার সাথে ফিরে চলুন।' ফিরে তাকালো পরী,'আপনার ভাবনা অসাধারণ। কিন্তু আমি ফিরে যাবো না। আমার প্রতিশোধ না নিয়ে আমি কোথাও যাবো না।'-'আপনি একা

একটা মেয়ে হয়ে ওদের সাথে কিছুতেই পারবেন না।’

-‘সেটা আমি জানি তবুও প্রতিশোধ না নিয়ে আমি পিছপা হবো না। আপনি চলে যেতে পারেন।’

-‘আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না পরীজান।

চলুন আমরা অনেক দূরে চলে যাই!! আমরা ভালো থাকবো সেখানে।’

-‘বাহ!! কত সহজে কথাগুলো বলে দিলেন। আপনার মতো পাপিষ্টরা সব কিছুকে সহজ ভাবেই নেয়। কিন্ত আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব না। আমার ভালোবাসা দেখেছেন কিন্ত এবার আমার ঘৃণা দেখবেন। আপনার পরীজান আপনাকে কতটা ঘৃণা করে তা এবার আপনি দেখবেন।’

শায়ের পরীর কাছে আসলো। পরীর হাতদুটো নিজের বুকে চেপে ধরে বলল,’আমি দোষী, আমি পাপী, আমি শাস্তির যোগ্য। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে জড়িয়ে ধরেই শাস্তি দিন। আমি সব মাথা পেতে নেবো। কিন্ত আমার থেকে দূরে সরে যাবেন না।’পরী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো শায়ের কে। চিৎকার করে

বলল,'আপনার ছোঁয়া বিষাক্ত লাগছে আমার কাছে। আমি মানতে পারছি না আপনিও সবার মতো আমাকে মারতে চেয়েছিলেন। যদি আমাকে মারতেই চান তাহলে আগেই মেরে ফেলতেন। কেন আমার ভেতরে ভালোবাসার জন্ম দিলেন? আমার অনুভূতির সাথে নোংরামো করলেন?'

-'অনুভূতি ভালোবাসা কখনো নোংরা হয় না পরীজান। নোংরা হয় মানুষ। আমার ভালোবাসা নোংরা না পরীজান।'

শায়েরের কথার পিঠে কথা না বলে পরী হেটে চলল।

শায়ের ও পরীর পিছু নিলো। অন্দরের উঠোনে এসেই বোরখা টা ছুড়ে ফেলে দিলো পরী। মালা

এখনও বারান্দায় বসেছিল। পরীকে নিয়ে যাওয়ার পর মালা আর নিজ ঘরে যায়নি। পরীকে দেখে মালা ছুটে এলো। মেয়ের দুগালে হাত রেখে সারামুখে চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে ধরলো। মায়ের উষ্ণতা পেয়ে পরী চোখের জলে বুক ভাসালো। মালা কেঁদে যাচ্ছেন পরীকে জড়িয়ে ধরে।রুপালি নিজ

ঘর থেকে দৌড়ে এসে মালাসহ পরীকে জড়িয়ে ধরে। তিনজন মিলে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। ভারি হয়ে উঠেছে সারা অন্দর। রুপালি নিজের চোখ মুছে বলে,’পরী তুই শায়েরের সাথে চলে যা ভালো থাকবি।’

-‘আমি যাবো না আপা। ওদের শাস্তি না দিয়ে যাবো না। কার সাথে যেতে

বলছো আমাকে? যে কিনা আমাকে খুন করার জন্য বিয়ে করেছে।'

-'আমি জানি সব। কিন্তু বিশ্বাস কর শায়ের তোকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে তোকে বিয়ে করেছে। ও তোকে ভালোবাসে অনেক। তুই ওর সাথে ভলো থাকবি।'

পরী রুপালির কথার পিঠে কথা না বলে কুসুম কে ডাকলো। কলপাড়ে

গিয়ে কুসুম কে বালতি ভরতে বলে নিজ কক্ষে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর পরী কলপাড়ে গিয়ে বসলো। কুসুম তখনও ছিল ওখানে। পরী কুসুমের দিকে তাকিয়ে বলল,'আমি না বলা পর্যন্ত তুই এখানেই থাকবি।'কুসুম মাথা নাড়ে। পরীকে আজ ভয়ংকর সুন্দর লাগছে কুসুমের কাছে। ভেজা চুলগুলো লেপ্টে আছে ঘাড় গলা

দিয়ে। ঠান্ডা পানি শরীরের পড়তেই কেঁপে কেঁপে উঠছে পরী। ঠোঁট দুটো নীল হয়ে আসছে। তবুও ইচ্ছামতো পানি ঢেলে শান্ত হলো পরী। ভেজা কাপড় ছেলে সিঁদূর রাঙা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঘরে গেল। শায়ের এতক্ষণ পরীর আসার অপেক্ষায় ছিলো। পরীকে দেখে সে থমকে গেল। পরীর নুতন সৌন্দর্য প্রতিদিন

আবিষ্কার করে সে। আজও করলো। তবে আজ যেন ভয়ানক সুন্দর লাগছে পরীকে। চুল মুছেনি,শাড়িটা ভিজে গেছে পানিতে। শায়ের গামছা এনে পরীর কাছে এগিয়ে আসতেই হাত উচিয়ে থামিয়ে দিলো পরী। বলল, 'আমার থেকে দূরে থাকবেন। আমার সহ্য হয়না আপনাকে।'

-‘তবুও আমি আপনার কাছে আসবোই। আপনার কাছে আসা আটকাতে পারবেন না আপনি। যদি আমাকে মেরে ফেলেন তাহলে আমাদের দূরত্ব বাড়াতে পারবেন।’

-‘বলা বাহুল্য যে আপনাকে আমি ক্রোধের তাড়নায় মেরে ফেলতেও পারি। কিন্ত আমি নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখার চেষ্টা করব। আপনাকে

বাঁচতে হবে। দুনিয়াতেই আপনি বেঁচে থাকার শাস্তি পাবেন। আমার আপনার দূরত্ব আপনাকে শাস্তি দিবে।’শায়ের কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরীর দিকে। কোন ভালোবাসা নেই আজকের পরীর মাঝে। পাপ সবকিছু দিয়ে আবার কেড়ে নেয়। শায়ের আজকে তার প্রমাণ পেলো। কাছে থেকেও আজ পরী যেন

অনেক দূরে। শায়ের জানে না আদৌ কোনদিন এই দূরত্ব মিটবে কিনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শায়ের বলে,’আমি খু*ন করে যদি পাপী হই তাহলে আপনিও পাপী। শশীল কে হ*ত্যা করে আপনিও পাপী। মানতে পারবেন এটা?’-‘একটা নরপিশাচ কে শাস্তি দেওয়া পাপ না। পৃথিবীর

বুক থেকে একটা জানো*য়ার তো বিদায় হলো।’

-‘বিন্দুর ধ*র্ষ*ণ কারিদের হত্যা করে তাহলে আমিও পাপ করিনি তাহলে।’

-‘তাহলে পালক??এবার বলবেন এটাও পাপ নয়?’নিস্তব্ধতা গ্রাস করছে পুরো জমিদার বাড়িতে। কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝিঁ ঝিঁ

পোকারাও মুখ বন্ধ করে রেখেছে। তারাও বুঝেছে এই পুরোনো আমলের বাড়িটি একটা মৃ*ত্যুপুরি। এই বুঝি কোন শব্দ হলো! এই বুঝি লা*শ পড়লো। নতুন খেলা শুরু হয়েছে যেন! বাঁচা ম*রার খেলায় জয়ী হবে কে? তা বলা বাহুল্য।

পরীর দিকে তাকিয়ে আছে শায়ের। পালককে কেন মেরেছে তার উত্তর

সে দেয়নি এখনও। দিবে কিনা তাও শায়েরের ভাবান্তর দেখে বোঝা যাচ্ছে না। সে শুধু পরীকে দেখছে। প্রিয়তমার সৌন্দর্যে ঝলসে যাচ্ছে হৃদয়,চোখ জ্বলছে তবুও মন ভরছে না। পরীর নতুন রূপের দগ্ধ হচ্ছে সে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে পরীর। সে পারছে না স্বামীর কাছে কঠোর হতে। এতো কিছু জানার পরেও ওর

মনে হচ্ছে কোথাও একটা কিন্ত রয়ে গেছে। যা পরী এখনও জানে না। নওশাদ যে সম্পূর্ণ সত্য বলছে তার তো কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র নওশাদের কথার উপর ভিক্তি করে সে শায়ের কে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? এটা হতে পারে না। পরী অশ্রুসিক্ত আঁখি মেলে শায়েরের দিকে তাকালো। কথার প্রসঙ্গ পাল্টে

বলে,’আমাকে ভালোবাসবেন মালি সাহেব?’চমকে তাকালো শায়ের। পরী আবার তার মত বদলে ফেলেছে। খানিকটা দূরে দাঁড়ানো পরী। শাড়ির আঁচল টা বুক থেকে নামিয়ে পরী শায়েরের দিকে এগোতে লাগল,’আমার শরীরে অনেক ক্ষত মালি সাহেব। আপনার ভালোবাসা দিয়ে সব সারিয়ে দিন।

আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। আর সহ্য করতে পারছি না।’

দড়ি দিয়ে বাঁধার কারণে পেটে লম্বা দাগ হয়ে আছে। উ*ন্মুক্ত সেই স্থান নীলচে বর্ণ ধারণ করেছে। ফর্সা শরীরে তা জ্বলজ্বল করছে। এক পলক সেদিকে তাকিয়ে পরীর মুখ মণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শায়ের। পেটের ক্ষতের থেকে পরীর চোখের

ক্ষত আরো গভীর। যা সারানোর ক্ষমতা ওর নেই। পরীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল শায়ের। শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে দিয়ে পরীর চোখে চোখ রাখলো,'আপনি আমাকে ভালোবাসেন?'

হঠাৎই পরী শায়েরের বুকে সামুদ্রিক ঢেউ এর মতো আছড়ে পড়লো। শায়ের নিজেও কালবিলম্ব না করে

শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তার পরীজানকে। অল্প সময় আলাদা ছিলো দুজনে অথচ মনে হচ্ছে বহুকাল আলাদা ছিলো দুজনে। পরী নিজেও সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরেছে শায়ের কে। ওরা দুজনেই খুব ভাল করে জানে ওরা একে অপরের থেকে দূরে থাকতে পারবে না কখনোই। শায়ের যত অন্যায় করুক

না কেন পরী ওকে ছাড়তে পারবে না।-‘আপনি কি পালককে সত্যিই হ*ত্যা করেছেন?’

শায়েরের বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠল পরী। শায়ের দেরি না করেই জবাব দিলো,’আপনাকে মিথ্যা বলার সাহস আমার নেই পরীজান। হ্যা আমিই পালককে মে*রেছি।’

শায়েরের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পরী। চোখের জল মুছে বলে,’কেন মে*রেছিলেন তাকে? সে কি ক্ষতি করেছিল আপনার?’

-‘আপনার আমার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি আমি পছন্দ করি না। তাই পালককে মরতে হয়েছে। শুধু তাই নয় শেখরকেও রাখি নি। ভবিষ্যতেও কাউকে আসতে দেবো না।’

বেশ শান্ত স্বরেই জবাব দেয় শায়ের। এতে কিছুটা রেগে গিয়ে পরী বলে,’এজন্য আপনি পালককে মারবেন কেন? ভালোবাসা চাওয়া কি অপরাধ? আপনিও তো বলেছিলেন মেয়েরা ফুলের মতো। তাদের শুধু ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লড়াই করার জন্য নয়। তাহলে আপনি কেন মারলেন তাকে?’-‘আমি

তার সাথে লড়াই করিনি। তাকে তার প্রাপ্যটুকু দিয়েছি। ভালোবাসা নিয়ে নোংরা খেলা আমি পছন্দ করি না।'

-'কি এমন খারাপ দেখলেন তার মাঝে আপনি?'

-'আপনার আমার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন আমি হতে দিবো না। আপনি ওই প্রসঙ্গ বাদ দিন।

আমি আর এই বিষয়ে কোন কথা বলবো না।’

পরী মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছে মনটা।

সে আর শায়েরের দিকে তাকালো না। তখনই শায়ের কক্ষ ত্যাগ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। হাতে করে সে একটা মলমের কৌটো নিয়ে এসেছে। কাছে

এসে পরীর হাত ধরে বলে,’এদিকে আসুন মলম লাগিয়ে দিচ্ছি।’

যত রাগ শায়েরের উপর পরী দেখাক না কেন দিন শেষে শায়েরের স্পর্শ পেলে পরীর রাগ মিলিয়ে যায় নিমিষেই। এই পুরুষটিকে সে ফেরাতে পারে না কিছুতেই। পরীকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে আঁচল সরিয়ে দেয়। শক্ত করে বাঁধার কারণে

দাগটা হয়েছে। শায়ের হাত বুলায় নীলচে দাগে। তারপর মলমটা লাগাতে থাকে,'আপনাকে বেঁধেছিলো কে? নওশাদ??'-'নাহ কবির।'

-'ওকে মে*রে ভালো করেছেন। নাহলে ওকে আমিই মে*রে দিতাম।'

-'কেন?'

-'আপনাকে ছুঁয়েছে সে। ওর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

মৃদু হাসে পরী,’আমাকে ছুঁয়েছে বলে আপনি কবিরকে মা*রতে চান। আর কবির আমার আপাকে ছুঁয়েছে বলে আমি তাকে মে*রে দিয়েছি। আপনার আমার মাঝে অনেক তফাত তাই না?’

-‘আপনার আমার মাঝে তফাত আছে পরীজান। আপনি পবিত্র একটা ফুল। আর আমি ভুল,ভুল

মানুষদের প্রিয় থাকতে নেই। তাই তো আমার প্রিয় আমার থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।'

-'বলুন না পালক কি এমন পাপ করেছিল যে আপনি তাকে এই শাস্তি দিলেন?'

শায়ের দাঁড়িয়ে গেল,'বারবার একই প্রশ্ন কেন করছেন? এই প্রসঙ্গ বাদ দিন।'

-'তাহলে বের হয়ে যান এখান থেকে।'শায়েরের উত্তরের আশা না করে ওর হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা আটকে দিলো পরী।

দরজা ঘেষে মেঝেতে বসে পড়ল পরী। হাঁটুর উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে নিলো। পানিতে ভিজে উঠল ঘন পাপড়ি গুলো। পরী বলে

উঠল,'আপনার সাথে আর যেন কখনও না দেখা হয় মালি সাহেব।'

-'আপনার জন্য আর কেউ আসুক বা না আসুক আমি আসব পরীজান। আমার ভালোবাসা একটুও কমবে না পরীজান।'

সারারাত ওভাবেই কেটে গেলো দুজনের। পরী দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। সকাল হতেই সে

ঘর থেকে বের হয়। দরজার পাশেই শায়ের কে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে। চোখ বন্ধ শায়েরের, বোঝাই যাচ্ছে সে ঘুমাচ্ছে। পরী ওখান থেকে চলে এলো। অন্দরের উঠোনে এসে পুরো বাড়িতে চোখ বুলালো।

পরীর মনে পড়ল সোনালীর কথা। কতো কানামাছি খেলেছে সে বোনের

সাথে। সোনালীর চোখ বেঁধে পরী চারপাশে ছোটাছুটি করতো। সাথে রুপালিও এসে যোগ দিতো। তিন বোন মিলে মাতিয়ে রাখতো জমিদার বাড়ি। কিন্তু আজ সেই বাড়িকে মৃত্যুপুরি মনে হচ্ছে। সময়ের ব্যবধানে কতকিছু বদলে গেলো!

পরী রুপালির ঘরে গেল। পিকুল ঘুমাচ্ছে রুপালি বসে আছে। পরী

ঢুকতেই রুপালি সোজা হয়ে বসে। পরী কিছুক্ষণ রুপালিকে দেখে বলে,'আব্বা কেন আমাকে মারতে চায় তা আমি পুরোপুরি জানি না আপা। তুমি কি জানো?'-'হুম।'

-'আর কিছু না লুকিয়ে সব বলো আমাকে।'

-'কাছে আয়,বস এখানে!'

পরী বসলো রুপালির পাশে।

-‘বড় আপা প্রাণবন্ত ছিলো জানিস পরী। সে না বলা কথা বুঝে যেতো। আম্মার মনের কথা সবচেয়ে বেশি বুঝতো বড় আপা। আপা যখন ছোট তখন সে দেখতো কাকা আম্মার সাথে খারাপ আচরণ করে। কিন্তু আব্বা কিছুই বলে না। সব জেনেও কেন আব্বা কিছু বলে না এটা আপার ভালো লাগেনি। সবসময়

এসব চিন্তা করতো আপা। তবে তার উত্তর পেতো না। রাখালের সাথে প্রেম করার পর ওর প্রশ্ন গুলো চাপা পড়ে যায়। কিন্ত আবার সেই প্রশ্ন সামনে আসে যেদিন কাকা আম্মাকে বৈঠকে একা পেয়ে সুযোগ নেয়। ওইদিন আপা আম্মাকে বাঁচায়। সেদিন আব্বার সাথে আপার অনেক ঝগড়া হয়। যার ফল ভোগ

করে আম্মা। আব্বা এখনও আম্মার গায়ে হাত তোলে। এজন্যই আম্মার শরীর সবসময় অসুস্থ থাকে। আমি এখানে না থাকলেও জানি,যে পালক সব জানতে পেরেছিল। আম্মার শরীরের দাগ গুলো দেখে পালকের বুজতে বাকি থাকে না এসব কিছু আব্বার কাজ। পরী আমাদের আম্মার ঘরে ঢোকা নিষেধের

একটাই কারণ ছিলো তা হলো আমরা যেন এটা জানতে না পারি আব্বা একটা নর*পিশাচ। আমরা কোন ভুল করলে আব্বা আম্মাকে প্রচুর মারতো। ছোট আম্মাও কম মার খায়নি। জুম্মান কে আব্বা সাথে করে নিয়ে গেছে পরী। ওকেও আব্বা নিজের মতো তৈরি করবেন। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছোট

আম্মা এখন নিজেই ঘরে বসে আছেন।'-'কি হয়েছে ছোট আম্মার?' -'জুম্মানকে সে খারাপ হতে দিবে না। এই প্রতিবাদই তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আব্বা আঘাতে রক্তাক্ত করেছে তাকে। আম্মা এখন তার কাছেই আছেন। যাই হোক পরের কথায় আসি। পালক সব পুলিশকে

বলে দিতো বিধায় তাকে মে*রে ফেলা হয়েছে।’

-‘আর সোনা আপাকে কেন মে*রেছে?’

-‘সোনা আপা সব সত্য জেনে গিয়েছিল। তুই জানিস বন্যার সময় অনেকে মারা গিয়েছিলো?’

-‘হুম।’

-'ওরা অসুখে মারা যায়নি। ওদের মেরে ফেলা হয়েছিল। তারপর ওদের দামি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলো চড়া দামে বিক্রা করে দেন আব্বা। এইকাজ অনেক আগে থেকেই করে আসছেন তিনি। ডাক্তারদের ও নিজ আয়ত্বে রেখেছেন তিনি। ইতিহাসের কোন জমিদারের চরিত্র ভালো ছিল না। আজও নেই। তাদের দু চারটে

র*ক্ষিতা না থাকলে চলেই না। আম্মা যে কি কষ্ট করেছে তা আমি বুঝেছি কবিরকে বিয়ে করার পর। মেয়েরা সবকিছুর ভাগ দিতে পারলেও স্বামীর ভাগ দিতে পারে না। এতে স্বামী যতোই খারাপ হোক না কেন? কবির যখন অন্য নারীর কাছে যেতো তখন আমি ওই রাতটা কীভাবে কাটাতাম তা তুই বুঝবি না

পরী। তুই এমন একজন পুরুষ কে স্বামী হিসেবে পেয়েছিস যে শুধু তোর উপরেই আসক্ত। অন্য কোন নারীর দিকে সে চোখ তুলে তাকায়নি কখনো স্পর্শ তো দূরের কথা।আব্বার এইসব জঘন্য কাজে আপা প্রতিবাদ করে। কিন্ত আব্বা তা মেনে নেয় না। তিনি আম্মার উপর জুলুম করে আপাকে থামাতে।

এতে আপা ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাকে খুন করতে যায়। আরও অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন। আম্মা তখন আপাকে দমিয়ে রাখে। তোর তখন চার বছর বয়স। কি বুঝবি অতটুকু বয়সে। আম্মা বুঝতে পেরেছিল যদি আপা বেশি কথা বলে তাহলে আব্বা আপাকে মারতেও দ্বিধা বোধ করবে না। তাই আম্মা আপাকে বাঁচানোর

জন্য চুপ থাকতে বলে। কিন্তু তা আর হলো কই? রাখালের সাথেই পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যায়। রাখাল কে অনেক মারে তখন। আপা সেটা দেখে আব্বার উপর আক্রমণ করে। তাই আব্বা সেদিন আপাকে মেরে ফেলে। কিন্তু গ্রামের সবাইকে এটা বলে যে আপা পালিয়ে গেছে।

তুই প্রতিশোধ প্রবণ সেটা তুই ভালো করেই জানিস। আপাকে তুই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস। অস্ত্র হাতে নেওয়ার সাহস তোর আছে। আব্বা সেটা ভাল করেই জানে। শশীল কে তুই মেরেছিস সেটা জানতে পেরে আব্বার মনে ভয় ঢুকেছে। কারণ সে জানতো তুই একদিন না একদিন ঠিকই আপার

মৃ*ত্যুর কথা জানতে পারবি। আর সেদিন আব্বাকেও ছাড় দিবি না তুই। এজন্য তোকে আগেই মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্ত আম্মা তোকে এই বাড়ির ভেতর আগলে রেখেছেন বলে তোর কোন ক্ষতি হয়নি। আম্মা সবসময়ই অসুস্থ থাকে কি জন্য জানিস? তোকে বাড়ি থেকে বের করার জন্য বলতো আব্বা।

কিন্তু আম্মা তা করতো না সেজন্য আব্বা খুব মারতো আম্মাকে। আমরা যাতে না জানতে পারি তাই আমাদের আম্মার ধারে কাছেও ঘেষতে দিতো না।দাদীকে তুই খারাপ ভাবতি পরী। আমিও ভাবতাম কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি দাদী কেন এমন করতেন? দাদী নিজেও জমিদারের স্ত্রী ছিলেন।

তাহলে সেও আম্মার মতোই কষ্ট পেয়েছেন। দাদী সবসময় আম্মাকে কাকার থেকে বাঁচিয়েছেন। শুধু কাকা নয় আরও খারাপ মানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সবার সামনে কঠোর থাকলেও আম্মার কাছে তিনি নিজের মা হিসেবে থেকেছেন। আমরা ভুল বুঝেছি দাদীকে।

জানি না এর শেষ কোথায়? আমার ছেলের ভবিষ্যত কি? কিন্তু পরী এখনও সময় আছে। শায়েরের সাথে চলে যা। তুই ওর সাথে ভালো থাকবি।'

পরী উঠে দাঁড়াল বলল,'একটা অপরাধীর সাথে আমি যেতে পারবো না। আব্বার সাথে সেও অপরাধ করেছে। শাস্তি তো তারও

প্রাপ্য।'-'শায়ের অতোটা পাপ করেনি যা ক্ষমার অযোগ্য। তুই পারবি ওকে ক্ষমা করতে।'

-'তাকে শাস্তি পেতে হবে তাহলেই সে ক্ষমা পাবে।'

কক্ষ ত্যাগ করে পরী। যাওয়ার সময় জেসমিনের ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসে। খুব বাজে ভাবে সে মেরেছে

জেসমিন কে। যা দেখে রাগ দমাতে পারে না

পরী। তাই নিজ ঘরে চলে যায়। শায়ের কে সে আগের মতোই দেখে। তবে এবার সে জেগে ছিলো। পরীকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। সারারাত বিনা নিদ্রায় পার করে ভোরের দিকে চোখ লেগে এসেছিল

শায়েরের। পরী ঘর থেকে বের
হতেই
ঘুম ভেঙে যায় ওর। তাই সে পরীর
ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। পরী
ফেরামাত্রই সে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করলো। সেই দৃষ্টি উপেক্ষা করে
ঘরে ঢুকলো পরী। শায়ের বাইরে
দাঁড়ানো। পরীর অনুমতি ব্যতীত সে
ঘরে প্রবেশ করবে না। পরীর কাছে

ঘরে ঢোকার অনুমতি সে চাইলোও না। পরী সেটা খেয়াল করে। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর পরী অধৈর্য হলো। সে ভেবেছিল শায়ের তার সাথে কথা বলবে। কিন্তু তা যখন হলো না পরী নিজেই গেল শায়েরের কাছে। রাতে যেভাবে ওকে বের করে দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই

ভেতরে নিয়ে আসে। বলে,'আপনার সমস্যা কি?'

-'আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরবো?'কন্ঠে এতোটাই মাদকতা ছিল যে পরীকে ভিশন টানছে। শায়েরের চোখে সে না তাকিয়ে পালঙ্কে বসে পড়ল। শায়ের পরীর পায়ের কাছে বসে পড়ল। হাঁটুর উপর হাত রেখে বলল,'চলুন না

আমরা চলে যাই? আমি আপনাকে হারাতে চাই না। নিজেকে নিয়ে আমার ভয় কোন কালেই ছিল না। আমি শুধু আপনাকে চাই। দয়া করে ফিরে চলুন?’

-‘আমিও চেয়েছিলাম আপনার সাথে ছোট্ট সংসার সাজাতে। আপনি আমি একসাথে সুখে থাকতে। আপনার আলিঙ্গনে ঘুমাতে। সকালে আপনার

উষ্ণ পরশে ঘুম থেকে উঠতে। আপনার ফেরার অপেক্ষা করতে। একটা মিষ্টি ভালোবাসায় জীবন কাটাতে। কিন্ত তা বোধহয় বাকি জীবনে আর হবে না।'

-'আমাকে বেঁচে থাকতে একটু ভালোবাসা দিন পরীজান। মরার পর আল্লাহ আপনাকে আমার থেকে আলাদা করে দেবে।'

বিচ্ছেদের কথা শুনে পরী দৃষ্টি মিলায় শায়েরের সাথে। বুকে অদৃশ্য ব্যথা অনুভব করলো সে। এই খারাপ মানুষ টা তার থেকে দূরে থাকবে? পরী বলল,’পাপীরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা পায়। আপনি কেন পাবেন না? পারবেন না তার কাছ থেকে ক্ষমা এনে আমার সাথে থাকতে?’-‘আমি তো আপনার ক্ষমা

পাচ্ছি না। আল্লাহ কি আদৌ ক্ষমা করবে?’

-‘আমার থেকে হাজার গুন বেশি দয়ালু তিনি। ক্ষমা তিনি অবশ্যই করবেন।’

শায়ের পরবর্তী কথা বলতে পারল না। তার আগেই কুসুমের গলার স্বর ভেসে আসে। আফতাব শায়ের কে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই শায়ের

বৈঠকে গেলো। সেখানে শুধু আফতাব নয় আখির,নওশাদ ও আছে। শায়ের ঘরটাতে চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর নিজের চেয়ারে বসল। নিরবতা ভেঙে আফতাব বলে উঠল,’তুমি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো শায়ের। আমাদের সাথে কাজ করে

আমাদেরই বিরুদ্ধে গেছো। এখন তুমি বলো এটা কেন করলে?’

-‘আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আপনারাই নিজেদের মুখোশ খুলে সামনে এসেছেন। কেন আমাকে না জানিয়ে পরীজান কে এখানে নিয়ে এসেছেন আপনারা? কেন সব সত্য জানিয়েছেন? এখানে আমার কোন হাত ছিলো না।’

-‘তার কারণ তুমি খুব ভাল করেই জানো।’ভারি হয়ে উঠলো শায়েরের কণ্ঠস্বর। মৃদু চেঁচিয়ে বলে উঠল,’আমি বলেছিলাম না যে আমার স্ত্রীর থেকে দূরে থাকবেন। তার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। আমি তো তাকে নিয়ে ভালোই ছিলাম। তাহলে আপনাদের এতো সমস্যা কোথায়?’

শায়েরের কথায় নওশাদ ও চিৎকার করে,'গলা নামিয়ে শায়ের। তুমি নিজেই পরীকে মা*রার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করেছিলে। তাহলে তুমি মা*রলে না কেন?'

-'তুমি আমি কেউই ভাল মানুষ নই। তাই আমার প্রতিশ্রুতি সত্যি ভেবে তুমি ভুল করেছো। আমি নই।'

-‘তাহলে এখন কি হবে? পরী তো আমাদের মা*রতে মরিয়া হয়ে উঠবে।’

শায়ের হাসলো,’একটা মেয়ের ভয়ে এতো কাবু তুমি?’

-‘পরী কতোটা ভয়ানক তা তুমি জানো শায়ের। পরী চাইলে তোমাকেও মা*রতে পারে।’

-‘আমি সেই মৃত্যু হাসিমুখে বরণ করে নেবো।’

এবার আখির মুখ খুলল,’তুমি পারলেও আমরা পারবো না। তুমি যাই বলো না কেন নিজেকে বাঁচাতে যদি পরীকে শেষ করতে হয় তাহলে আমরা তাই করবো।’-‘আমার পরীজানের গায়ে একটা টোকাও

আমি পড়তে দিবো না। প্রয়োজনে শতশত লা*শ পড়বে।’

-‘তাহলে আমরা কি করব? কবিরের মতো জীবন দেব?’

-‘আপনাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমি নিলাম। আপনাদের কোন ক্ষতি আমি হতে দিব না। তারপরও পরীজানের কোন ক্ষতি আপনারা করবেন না।’

নওশাদ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল,’বড়ই অদ্ভুত প্রেমিক তুমি শায়ের। তোমার স্ত্রী আমাদের মা*রতে

চায় আর আমারা তোমার স্ত্রীকে। মাঝে তুমি ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে পারছো? পারবে পরীর সাথে লড়াই করতে?’

শায়ের জবাব দিল না। বের হয়ে গেল সেখান থেকে।

নওশাদ বলল,’দেখছেন কেমন দাম্ভীকতা দেখালো? ইচ্ছা করছে ওকেও শেষ করে দেই।’-‘নাহ,তা করা যাবে না। শায়েরের কাছে এমন প্রমাণ আছে যা আমাদের পতনের একমাত্র উপায়।’

আফতাবের কথায় বিরক্ত হলো নওশাদ বলল,’ও জীবিত থাকলে তো আমাদের ফাসাবে।’

-‘এমনি এমনি তোমাকে মূর্খ বলি না আমি। তোমার থেকে দ্বিগুণ বুদ্ধি শায়েরের। শায়ের খুব ভাল করেই জানে আমাদের কার্যসিদ্ধি হলেই আমরা লোকদের মে*রে ফেলি। শায়ের ও নিস্তার পেতো না। তাই

সব কিছু তৈরি রেখেছে সে। ওর মৃত্যু হলেও সব প্রমাণ প্রকাশ্যে আসবে।’

নওশাদ চুপ করে গেল। আখির বলল,’পরীকে ছাড়লে চলবে না। আমি জানি পরী থেমে থাকবে না। শায়েরের উপর আমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই।’

-‘তাহলে আমাদের পরিকল্পনা সাজিয়ে পরীকে মা*রতে হবে। শায়ের যেন টের না পায়। যদি শায়ের জানতে পারে তাহলে সে আমাদের ছাড়বে না।’

নওশাদ আখির আর আফতাব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।শায়ের ঘরে ঢুকতেই পরীকে দেখতে পেলো। হাতে তার একটা

ছু*রি। সেটাকেই পরী গভীর ভাবে দেখছে। হাত ঘুরিয়ে পরিচর্যা করছে কীভাবে এটা চালাবে সে। শায়ের কে দেখে হাত থেমে গেল ওর। এগিয়ে এসে শায়েরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে,'কি কাজ করে এলেন? আমাকে মা*রার নতুন কোন পরিকল্পনা করেছেন কি?'

মৃদু হাসে শায়ের,'আপনি তো সব শুনেছেন তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

কথা বলল না পরী। ভাবলো শায়ের কি কোনভাবে ওকে দেখে ফেলেছিল? পরী ওদের কথা লুকিয়ে শুনছিল। শায়ের দেখলো কীভাবে?

-'আপনার উপস্থিতি আমি চোখ বন্ধ করে বুঝতে পারি। আপনার

শরীরের প্রতিটা লোমের সাথে আমি পরিচিত। কখনোই আমার থেকে নিজেকে লুকাতে পারবেন না।’-‘আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়,যে মানুষ টা এতো ভালোবাসতে পারে সে কি করে প্রাণ নিতে পারে?’

-‘ভালোবাসা মানুষ কে সব করাতে পারে।’

কথাটার বলে আরেকটু কাছে এলো শায়ের। পরীর যে হাতে ছু*রি সে হাতটা উঁচু করে ধরে বলে,’আপনি ঠিক এই ছুরির মতো ধারালো পরীজান। আমার হৃদয়ে গেঁথে আছেন। সেই ধারালো ছু*রির ফাঁক গলিয়ে চুয়ে পড়ছে আমার ভালোবাসা। যা শুধু আপনার জন্য বরাদ্দ। না পারছি আপনি নামক

ছু*রিটা বের করতে আর না পারছি ধরে রাখতে। বুকে থাকলে ব্যথা হয় আর বের করে দিলেই মৃ*ত্যু।

এখন আমার করণীয় কি পরীজান? আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে।’

হাত থেকে ছুরিটা আপনাআপনিই পরে গেল। উৎকণ্ঠা হয়ে পরী বলে,’আমাকে দূর্বল করার চেষ্টা করবেন না। আমি কঠোর হতে

চাই। আমি তাদের শেষ করতে চাই যারা আমার শ*ত্রু। আমি জানি আপনি এর মাঝে আসবেন। তবে একটু সাবধানে থাকবেন।'

-'আপনি তো বললেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন। আমরা দূরে কোথাও গিয়ে আল্লাহর কাছে আর্জি জানাই?'-'বারবার একই কথা বলছেন কেন? আমি তো

আপনাকে বলেই দিয়েছি আমি কোথাও যাবো না। প্রতিশোধ না নিয়ে আমি যাবো না।'

শায়ের থামলো। এসব নিয়ে আর কথা বলল না। সে কিছুক্ষণ পর বলে উঠল,'আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরব পরীজান? অনেক তৃষ্ণা পেয়েছে আপনাকে আলিঙ্গন করার।'

পরী শায়েরের বুকে মাথা রাখে। আর শায়ের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে নিজের তৃষ্ণা মেটায়। এ যেন বহুক্ষণের পিপাসা।

-'আমার হাতে যদি ছুরি থাকতো আর সেটা যদি আপনার বুকে গেঁথে দিতাম তাহলে কেমন হতো মালি সাহেব?'

-‘সেটা আমার পরম সৌভাগ্য হতো পরীজান। আপনাকে বুকে নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করতে চাই আমি।’

-‘আর আমি আপনাকে এই দুনিয়া আরও দেখাতে চাই।’

আর কেউ কোন কথা বলল না। অনুভূতির সাথে মিশে গেল দুজনে। একদিকে ভালোবাসা আরেক দিকে প্রতিশোধ! কীভাবে সামলাবে পরী?

আর শায়ের!! খারাপ মানুষ গুলোকে বাঁচাতে গিয়ে ওর কি হবে? পরী যদি নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে? যদি সে শায়ের কে আঘাত করে? যতোই সে শায়ের কে দূরে সরিয়ে দিক না কেন,শায়ের ছাড়া পরী অচল।

নিষ্ঠুর এই নিয়তি ওদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। আলাদা করে

দিলো দুজনকে। সময় কাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে তা কেউই জানে না। কার ভাগ্যে কি আছে তাও জানে না। তবে শুধুমাত্র প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।রুপালি পিকুলকে কোলে নিয়ে উঠোনের এক কোণে বসে আছে। খুশি গ্রাস করে নিয়েছে এক অজানা কালো

মেঘ। যার দরুন হাসি নেই কারো মুখে। তখনই অন্দরের দরজা পেরিয়ে একজন যুবক প্রবেশ করল। তাকে দেখেই কেঁপে উঠল রুপালির সর্বাঙ্গ। পিকুলকে শক্ত করে ধরে সেই পুরুষের দিকে তাকিয়ে রইল সে। পুরুষটি রুপালির নিকটে এসে বলল,'কেমন আছো রুপালি?'

ঈষৎ কেঁপে উঠল রুপালি। কতদিন পর এই কন্ঠস্বর সে শুনতে পেলো! সিরাজের চোখে চোখ রেখে দাঁড়াল রুপালি। কম্পিত কন্ঠে বলল,’ভাল। আপনি কেমন আছেন?’

সিরাজ হেসে বলে,’ভাল। তোমার ছেলে?’

পিকুলের দিকে তাকিয়ে রুপালি বলে,’হুম।’

-‘দেখতে তোমার মতোই হয়েছে। গায়ের রঙ ও তোমার মতোই সুন্দর।’

-‘এতোদিন পর কি মনে করে এলেন? সেই যে গেলেন তারপর আর তো দেখা দিলেন না।’

-‘জীবনের সবকিছু চলে যাওয়া মানেই তো জীবন যাওয়া। তাহলে দেখা দেই কীভাবে বলো?’

-'তাহলে আজ দেখা দিলেন যে?'

-'জানি না কেন এসেছি!! তবুও এসেছি।'দোতলায় দাঁড়িয়ে পরী রুপালি আর সিরাজকে দেখছে। ভাবছে ওদের মিল হলে কত না সুন্দর হতো।

কবির নামক খারাপ মানুষের সাথে জীবন জড়াতো না রুপালির। এখন

রুপালি সম্পূর্ণ একা। সবাই থেকেও নেই।

সেই মুহূর্তে শায়ের ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। সিরাজ কে দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বলে উঠল,'সিরাজ!

এখানে কেন?'

পরী পেছন ফিরে তাকালো বলল,'মনে হয় আপার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

-'ভুল ভাবছেন আপনি পরীজান।'

ভ্রু কুঁচকালো পরী,'ভুল ভাবছি মানে?'-'সব যখন জেনেছেন তাহলে এটুকু অজানা থাকবে কেন? সিরাজের থেকে আপনার বোনকে দূরে রাখুন।

এখন আপনার সাথে বিপদ অন্দরের সবার। তাই যথাসম্ভব অন্দরে থাকার চেষ্টা করুন সবাই।'

-'কি বলতে চাইছেন আপনি? সিরাজ ভাইও!!'

-'সেও আমার মতোই আপনার বাবার সাথে কাজ করত। বাকিটা আপনি বুঝে নিন।'

পরী ঘাড় ঘুরিয়ে সিরাজের দিকে তাকালো। বিশ্বাস হলো না ওর। কিন্তু শায়ের তাকে মিথ্যা বলেনি। সিরাজ ও ছলনার আশ্রয় নিলো! পরী এতে খুব বেশি অবাক হলো না। তবে ওর ভয় হলো রুপালিকে নিয়ে।কুসুম আর শেফালি মিলে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে। দুজনেই ভয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়ে আছে।

কথা বলতেও তাদের গলা কাঁপছে। ওরাও জমিদার বাড়ির এই পরিণতি মানতে পারছে না। কখনও ভাবেও নি এসব ব্যাপারে। যেদিন আফতাব জেসমিনের গায়ে হাত তোলে ওইদিনই সব পরিষ্কার হয় ওদের কাছে। আফতাবের মুখোশ উন্মোচন হয় সকলের সামনে। কিন্তু ওদের তো করার কিছু নেই। ওদেরও প্রাণ

সং*শয়ে। কখন জানি আবার মৃ*ত্যুর খেলা শুরু হয়ে যায়!

পরী জেসমিনের ঘর থেকে বের হয়ে নিজ ঘরে যাচ্ছিল। পথে কুসুম আর শেফালির কথোপকথনে থেমে যায়। এগিয়ে যায় ওদের কাছে,'কি হয়েছে কুসুম?'কুসুম চট করেই জবাব দিলো,'কিছুনা আপা।'

-‘আমার থেকে কিছু লুকাবি না। তাহলে তোদেরই বিপদ। এই বাড়িতে একমাত্র আমিই তোদের সুরক্ষা দিতে পারব। বল কি হয়েছে?’

শেফালি বলা শুরু করে,’সবাই সবার আসল রূপ দেখাইছে আপা। ওই নচ্ছার বেটা এহন সুযোগ লইয়া

আমার গায়ে হাত দেয়। আমি ডরে কিছু কইতে পারিনা আপা।’

-‘কে নওশাদ?’

-‘হ আপা।’

রাগ হওয়ার পরিবর্তে পরীর মুখে হাসি ফুটল। মাথায় যেন মুহূর্তেই বুদ্ধি খেলে গেল। পরীকে এভাবে হাসতে

দেখে চমকে গেল ওরা দুজনে। কুসুম জিজ্ঞেস করে, 'কি হইলো আপা আপনের?'

-'তোরা দুজনেই পারবি আমার উদ্দেশ্য সফল করতে। পারবি তো?'

দুজনের একজনও কিছু বলে না এমনকি কিছু বোঝেও নি পরীর কথা। পরী আবার বলে,'কুসুম শেফালি তোদের যা বলব তোরা

তাই করবি। ওই নর*পিশাচদের দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য তোরা থাকবি না আমার সাথে?'

-'আপনে সাহসি আপা। ত*লো*য়া*র চালাইতে আপনে পারবেন কিন্তু আমরা তো পারমু না। ওগো সামনে গেলেই ডর করে।'পরী কুসুমের বাহু ধরে বলে,'মৃ*ত্যু*র ভয় করলে ওরা বারবার মৃ*ত্যু*র

ভয় দেখাবে। তোকে দূর্বল করে দেবে। সাহস রাখতে হবে কুসুম। তোকে ত*লো*য়া*র

চালাতে হবে না। শুধু আমার কথামতো কাজ করবি।’

দুজনেই রাজি হলো পরীর কথায়। পরীও খুশি হলো। দৌড়ে চলে গেল নিজ ঘরে। সোনালীর ঘরের চাবি নিয়ে সেদিকে ছুটলো। বহুদিন পর

সোনালীর ঘরের তালা খুলল পরী। ঘরের আনাচে কানাচে মাকড়সার জালে ভর্তি হয়ে গেছে। বন্ধ থাকার কারণে ভ্যাপসা গন্ধ বের হচ্ছে। পুরো ঘরে চোখ বুলায় পরী। বিশাল বড় পালঙ্ক ঘরের অর্ধেক দখল করে আছে। আলমারি,টেবিল চেয়ার একপাশে পড়ে আছে। ধুলো

জমে আছে প্রতিটা আসবাবপত্রে। নিজের ঘরটা বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতো সোনালী। ব্যক্তিগত কিছুতেই কাউকে হাত দিতে দিতো না সে। আজ সেই ঘরটার এই অবস্থা। পরী আলমারি খুলে দেখলো বোনের পোশাক গুলোতে ইঁদুরের বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে। ওরা যেন উঠে পড়ে লেগেছে সোনালীর স্মৃতি

নিশ্চিহ্ন করতে। পরী বন্ধ করে দিলো আলমারি। তারপর উঁকি দিলো পালঙ্কের নিচে। বড় একটা টিনের বাক্স বের করলো। ঢাকনা খুলতেই বাতাসে তার ভেতরের কাগজগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। লেখাগুলো সোনালীর নয় রাখালের। তার দেওয়া চিঠিগুলো যত্ন করে রেখেছে সোনালী। কিন্তু চিঠির প্রায়

জায়গা কেটে ফেলেছে ইঁদুরগুলো। পরী বাক্স হাতড়ে কাপড় পেচানো একটা বস্তু বেরে করলো। সপ্তবর্ণে কাপড় সরাতেই সেটি মৃদু আলোয় চকচক করে ওঠে। হাতের ত*লো*য়া*র খানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখে। বহুদিনের পুরনো ত*লো*য়া*রে থেকে থেকে মরিচা ধরেছে। তাই পরী তাতে শান দিতে

নিচে নিয়ে গেল। পাথরে ঘষে ঘষে ত*লো*য়া*রে ধার দিচ্ছে পরী। সেই শব্দে মালা আর রুপালি ঘর থেকে বের হয়ে এলো। এমতাবস্থায় মেয়েকে দেখে মালা এগিয়ে গিয়ে বললেন,'কি করস পরী তুই?'-'শত্রু থেকে রক্ষা পেতে হলে অ*স্ত্র প্রয়োজন।'

মালা বসে পড়ল মেয়ের পাশে। আতঙ্কিত হয়ে বলে, ‘আমি বড় মাইয়াডারে হারাইছি। তুই কি চাস তোরেও হারাই আমি?’

পরীর হাত থেমে গেল,চোখ তুলে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল,’আপনার মেয়ে শহীদ হলে আপনার মাথা সবার সামনে উঁচু হবে আম্মা। এতে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই।’

-‘তুই একটু থাম পরী।’

-‘ভয় পাবেন না আম্মা। শয়তানের শাস্তি না দিয়ে আমি মরব না।’

মালা চোখের জল ফেলেন। অন্দরের দরজা খোলার আওয়াজে পরীসহ সবাই সেদিকে তাকায়। আফতাব কে ভেতরে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায় পরী। পা চালিয়ে উঠোনে

এসে বলে,’কোন সাহসে অন্দরে এসেছেন?’

-‘সাহস আছে বলেই এসেছি। আমার বাড়ি আমি যখন খুশি তখন আসবো।’

পরী হাসল বলল,’ভেতরে আসলে প্রাণ নিয়ে ফেরা মুশকিল হবে আপনার পক্ষে। তাই যেভাবে

এসেছেন ঠিক সেভাবেই ফিরে যান।’

আফতাব গর্জন করে বলে,’এতো সাহস আসে কোথা থেকে তোর? আমার মুখের উপর কথা বলিস? মালা!!’

কেঁপে উঠলেন মালা। আফতাব এবার তার উপর অত্যাচার করবেন নিশ্চিত হলো মালা। আঁচলে মুখ

ঢেকে কাঁদতে লাগলেন তিনি। আফতাব বলল,'তোমার মেয়ের সাহস বেড়েছে বুঝলাম। ওর কি জানের মায়া নাই? না নিজের মায়ের প্রতি ভালবাসা নাই?'-'খবরদার আমার আম্মার গায়ে হাত দিবেন না। এক আম্মাকে ঘরে ফেলে রেখেছেন কিছু বলিনি। এবার চুপ থাকব না। আপনার হাত হাতের

জায়গাতে থাকবে না বলে দিলাম। ত*লো*য়া*র চালাতে আমি জানি!!'

-'চুপ থাক পরী। অনেক হয়েছে,শুধু শায়েরের জন্য তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি। তোকে তো তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব।'

পরী গলা উচিয়ে বলে,'বের হন অন্দর থেকে নয়তো লা*শ পড়ে যাবে।'

পরীর চিৎকারে শায়ের সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তবে পরীকে সে থামালো না। আফতাব শায়ের কে বকতে লাগল। কারণ শায়েরের জন্যই পরী বেঁচে আছে। আর এখন বাঘিনী হয়ে উঠেছে পরী। যখন তখন থাবা মারতে পারে। পরী বলল,'সবাই শুনে রাখো আজকের পর থেকে আমার অনুমতি ব্যতীত

অন্দরে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ। কোন পুরুষ আসতে পারবে না। সে যদি আমার স্বামীও হয় তাও না।’

কথাটা বলে আফতাবের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো পরী। সে দৃষ্টি এতোটাই ধারালো ছিল যে আফতাবের সর্বাঙ্গে অদৃশ্য ক্ষতের দেখা দিলো। কিছু না বলে সে অন্দর থেকে প্রস্থান করে। শায়ের

কিছু পল পরীকে দেখে চলে গেল। পরীর হুকুমে কুসুম দরজা বন্ধ করে দিলো।প্রথম পরিকল্পনা সম্পন্ন হলো। পরী এটাই চেয়েছিল।পরীর আসল উদ্দেশ্য শায়ের কে অন্দর থেকে সরানো। অতি চতুর শায়ের পরীর পরিকল্পনা বুঝতে সময় নেবে না। তাই আফতাবের সাথে সাথে শায়েরের আসাও বন্ধ করে দিয়েছে।

পরী শেফালিকে ডাকল। শেফালি আসতেই সে বলল,'যা বলেছি মনে আছে তো?'

মাথা নাড়ে শেফালি। পরী আবারও নিজের কাজে মন দেয়। ঘষে ঘষে চকচকে করে ত*লো*য়া*র টা। যেটা সূর্যের আলোতে চিকচিক করে ওঠে। এটাই পরীর শেষ হাতিয়ার

যেটা দিয়ে পরী শত্রুদের দমন করতে পারবে।

সিরাজ আর নওশাদ বসে আছে বৈঠকে। আফতাব রেগে আখিরের সাথে বের হয়ে গেছে। শায়েরের দেখাও নেই। আপাতত ওরা দুজন বসে আছে। নওশাদ বলে উঠল,'অনেক দিনের সফর শেষে আসলে। তা ব্যবসা কতদূর?'

সিরাজ আড়মোড়া ভেঙে বলে,’আরে ভাই কত কিছু দেখলাম কিন্ত সোনালীর মতো কাউকেই পেলাম না।’

দুজনে একসাথেই হাসলো। নওশাদ বলল,’আমি কিন্ত ভাই তোমার নাম পরীকে বলিনি। সব চেপে গেছি। যাতে তোমার উপর পরীর একটু বিশ্বাস থাকে।’-‘আরে আস্তে বলো।

পরীর কানে গেলে সব শেষ। যাই হোক আমার এখানে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। পরীর সন্দেহ হবে।’

ওদের কথার মাঝখানে শেফালির আগমন ঘটলো। সিরাজের জন্য নাস্তা এনেছে সে। শেফালিকে দেখে ওরা চুপ করে যায়। চোখের ইশারায় একে অপরকে সতর্ক করে। শেফালি চলে যেতে গিয়েও থেমে যায়।

নওশাদ কে দেখে ঘৃণা হচ্ছে ওর। আজ সকালেই কু প্রস্তাব রাখে নওশাদ। শেফালি পরিমরি করে নওশাদের থেকে পালায়। ভয় করছে শেফালির কিন্ত পরীর কথা মনে আসতেই সাহস পেল সে। হঠাৎই নওশাদের পা ধরে বসে পড়ল শেফালি। কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আমারে মারবেন না ভাই!!

আমি আপনের সব কথা শুনব। দরকার পড়লে অন্দরের সব খবর দিমু। তাও আমারে মারবেন না। আমার ডরকরে অনেক। মারবেন না আমারে!’

শেফালির কান্না দেখে ভড়কে গেল নওশাদ। বোঝার চেষ্টা করল শেফালির মতলব। নওশাদ পা ঝারা দিয়ে বলে,’পা ছাড় আমার। তোর

মতলব আমি বুঝি না ভেবেছিস? আমি জানি এসব পরী তোকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে।'

-'আল্লাহ গো ভাই কন কি?? আমার কি পরী আপার মতো সাহস আছে? জানের মায়া হের না থাকলেও আমার আছে। আমি বাঁচতে চাই ভাই। আপনে বড় কর্তারে কইলেই হেয় হুনব। ভাই আমারে রক্ষা

করেন। তার লাইগা আমারে যা কইবেন তাই করমু।’

নওশাদ সন্দেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শেফালির দিকে তাকিয়ে রইল তার পর বলল,’আচ্ছা তুই এখন যা। যখন বলব তখন আসবি। পরী কি করে না করে সব বলবি এসে!!’

শেফালি দৌড়ে চলে গেল। নওশাদ বিশ্রী গালি দিলো শেফালিকে। সে

বিশ্বাস করেনি শেফালির কথা। সে সিরাজ কে উদ্দেশ্য করে বলে,’মা** ঢেমনা আছে। ভেবেছে ওর কথা বিশ্বাস করে বসে আছি। যতসব ফকিরের দল।’

সিরাজ মাথা ঝুকে আস্তে করে বলে,’ওদের থেকেও সাবধান থেকো। কখন কি করে বসে কে জানে? আমি আসি আজ। সময় হলে

ঠিকই আসব।’সিরাজ চলে গেল। নওশাদ রয়ে গেল। এখানে পরী ওকে কিছু করতে আসবে না। বৈঠকে কয়েক জন রক্ষি আছে। পরী এখানে আ*ক্র*ম*ণ করতে পারবে না। তবুও আতঙ্কে থাকে নওশাদ। ভয়ে ঘুমাতে পারে না। কবিরকে সে বারবার স্বপ্নে দেখে। বিভৎস সেই চেহারাটা চোখের

সামনে ভাসে ওর। এতদিন কোন ভয় ছিল না ওর। সেদিন পরীর হ*ত্যা*কাণ্ড দেখে ভয়ে আছে সে। তাই সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করে। এমনিতেই সে পঙ্গু। ওকে মা*রতে পরীর এতটুকু শক্তির প্রয়োজন হবে না। তাই সর্বদা রক্ষী দের সাথে রাখে সে।

শেফালি অন্দরে ফিরে গিয়ে সব বলে দিল পরীকে। পরী জানতো নওশাদ এতো সহজে শেফালির কথা বিশ্বাস করবে না। তাই কীভাবে নওশাদ কে সব বিশ্বাস করাবে তাও ভেবে নিয়েছে পরী। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এমন সময় রুপালির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সে ডাকছে পরীকে। তাই শেফালির

সাথে দ্রুত কথা শেষ করে পরী রুপালির কাছে গেল।

বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছে রুপালি। দেখে মনে হচ্ছে বহুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার জন্যই এই অবস্থা হয়েছে মেয়েটার। পরী নিঃশব্দে বোনের পাশে বসে বলল,'কি হয়েছে আপা?'মুহূর্তেই চোখমুখ শক্ত করে নিল রুপালি। রাগে লাল হয়ে এলো

ফর্সা চেহারাখানা। বোনের হঠাৎ রেগে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারে না পরী। তবে কিছু জিজ্ঞেস ও করে না। যা বলার রুপালি নিজ থেকেই বলবে। নিজেকে যথাসম্ভব ধাতস্থ করে রুপালি বলে,'অনেক হয়েছে পরী আর না। আমি একজনকে নিজ হাতে খু*ন করতে চাই। তুই দিবি

তোর ত*লো*য়া*র টা? আমি তাকে মে*রে আবার তোকে ফিরিয়ে দেব!'

-'কাকে মা*র*বে আপা? কি হয়েছে তোমার?'

-'বড় আপার আরেক খু*নি যার নাম তোর অজানা পরী।'

-'কে সে?'

-'সিরাজ!! আমাকে ঠকিয়েছে সিরাজ। ভালোবাসার ছলনায়

আমাকে ফেলেছে পরী। সেইদিন কাকার সাথে হাত মিলিয়ে সিরাজই আমাকে শশীলের হাতে তুলে দিয়েছিল। সিরাজ বড় আপাকে পছন্দ করতো। তাই আপা মরার পর নওশাদ আর কবিরের সাথে সেও,,,'কথা শেষ না করে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে রুপালি। ঘৃণায় গা গুলিয়ে আসছে ওর। পরী অবাক

হলো। তাহলে নওশাদ ওকে একটা মিথ্যা কথা বলেছে। ওদের সাথে সিরাজ ও ছিলো। সে বোনকে বলে,'কেঁদো না আপা শক্ত হও। আমার ভালো লাগছে তোমার কথা শুনে। সিরাজ কে আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। নিজের ক্ষোভ মেটাও। তবে আমি ঠিক যেভাবে বলব সেভাবেই করবে সব।'

-‘কিন্তু পরী আমার পিকুলের কি হবে? এতটুকু বাচ্চা!আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ওকে কে দেখবে?’

-‘সেই চিন্তা তুমি করো না। আমি শীঘ্রই ওর একটা ব্যবস্থা করব। তুমি শুধু তোমার ভেতরে রাগ জন্ম দাও। দেখবে শত্রুদের প্রতিহত করতে পারবে। আর ভয় পাবে না।’

রুপালির ঘর ত্যাগ করে পরী। ওর ভিশন খুশি লাগছে আজ। পরী ভেবেছিল সিরাজের আসল চেহারা সামনে এলে রুপালি নিজেকে সামলে নিতে পারবে না। কিন্তু রুপালি যে এভাবে নিজেকে সামলে নিবে তা পরী কল্পনাও করেনি। সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে সফল হওয়া সম্ভব।পরেরদিন সকাল

বেলা। কুসুম ভয়ে ভয়ে পা রাখে বৈঠকে। পিঠা আর শরবত দিয়ে আসে সবাইকে। ওই

খারাপ লোকগুলোর সামনে গেলে মনে হয় এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের উপর। তাই সে দৌড়ে পালিয়েছে। শায়ের বাদে সকলেই উপস্থিত সেখানে। নওশাদ যেই না শরবত খেতে যাবে তখনই শেফালি

চিৎকার করে বলে,’শরবতে বিষ মেশানো আছে কেউ খাইয়েন না!!’স্টিলের গ্লাসটা সশব্দে পড়ে গেল হাত থেকে। নড়েচড়ে ভিত চোখে তাকালো শেফালির পানে। তারপর পড়ে যাওয়া গ্লাসের দিকে তাকালো। তখনই একটা বিড়াল মিঁয়াও বলে সামনে দিয়ে দৌড় দিলো। ভয়ে আত্মা কেঁপে উঠল

নওশাদের। সে খেয়াল করলো তার গলা শুকিয়ে এসেছে আর ঘামছে। শেফালি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। উপস্থিত সবাই তার দিকে তাকিয়ে। আফতাব বললেন,'শরবতে বিষ!! কে বলল তোকে?'

শেফালি কাচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল,'বড় কর্তা আমি কুসুম রে দেখছি বিষ মিশাইতে।'-'দেখছেন

ভাই আপনার মেয়ে এখনই আমাদের মা*রার পরিকল্পনা সেরে ফেলছে। শেফালি না বললে তো আমরা শরবত খেয়েই ম*রে যেতাম।’

আখির কথাটা আফতাব কে উদ্দেশ্য করে বলে। এতে চুপ থাকে আফতাব। কিছুক্ষণ ভেবে বলে,’সত্যি তো শরবতে বিষ মেশানো আছে?’

শেফালি চটপচ উত্তর দিলো,’হ,আমি নিজের চোক্ষে দেখছি। পরী আপার কথায় তো কুসুম এই কাম করছে। আপার যেই রাগ। কথা না হুনলে আমাগো মা*ইরা ফালাইতে পারে। কি করমু কন?’

-‘তুই এখন যা।’

-‘বড় কর্তা আমি আপনাগো কইছি আপা যেন না জানে। তাইলে আমারে জানে মাইরা ফালাইব।’

-‘আচ্ছা বলব না। তুই যা,আর পরী যা করে সব এসে আমাদের বলবি।’

শেফালি মাথা নেড়ে চলে গেল। আফতাবের মুখ গম্ভীর। সে একজন রক্ষিকে দিয়ে শায়েরের কাছে খবর পাঠালো।

-‘ভাই তাড়াতাড়ি পরীর একটা ব্যবস্থা না করলে হবে না।’

-‘ভুলটা আমারই হয়েছে। সেদিন সোনালীকে না মা*রলে এসব হতো না। পরীও এত ভয়ানক হয়ে উঠতো না।’

-‘কিন্তু ভাই সোনালী তো আপনাকেও মারতে চাইতো।তাহলে

আজ পরী আর সোনালী এক হয়ে আমাদের আ*ক্র*ম*ণ করতো।’

আফতাবের মাথা কাজ করছে না। সত্য লুকানো খুবই কঠিন। দশ হাত মাটির নিচেও যদি সত্য কে লুকিয়ে রাখা হয় একদিন না একদিন সবার সামনে আসবেই। সে চেয়েছিল নিজের সব অপকর্ম লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু লুকাতে পারে না। সর্বপ্রথম

জানতে পারে মালা। তখন সোনালী দুই বছরের শিশু। স্বামীর অপকর্মের কথা জানতে পেরে ভেঙে পড়েন তিনি। অনুরোধ করে আফতাব যেন এই অপকর্ম থেকে ফিরে আসে। কিন্ত খারাপ মানুষের ভালো হওয়া কি সহজ? যেখানে আফতাবের পূর্ব পুরুষদের রক্তে মিশে আছে খা*রাপ কাজ। আফতাব ও পারেনি ফিরে

আসতে। তাকে কালো ব্যবসা শিখিয়েছিলেন তার দাদা। ছোট থেকেই হাতে ধরে ধরে সব শেখাতেন। ছোট বয়সেই নর্তকিদের সামনে হাজির করাতো। তখন থেকেই লালসা আফতাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। তবে পরিবার পরিচালনার জন্য বিয়ে করতে হয় তাকে। মালার সৌন্দর্য দেখেই

আফতাব মুগ্ধ হয়েছিল। তারপর বিয়ে। ভালোই কাটছিল সব, কিন্তু যখন মালা সব জেনে গেল তখনই আফতাবের অবহেলা দেখতে পেল মালা। একে একে মুখোশ উন্মোচন হলো সবার। তখন মালার পাশে দাঁড়িয়েছিল আবেরজান। তিনি মালাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।কিন্তু কেউই প্রতিবাদ

করেনি। বহুবছর পর সোনালী বাবার করা অ*ন্যায়ের প্রতিবাদ করে। বাবা হলেও সে অ*প*রা*ধী। শাস্তি তার প্রাপ্য। তবুও সে বাবাকে বারণ করে। ফিরে আসতে বলে এসব অপকর্ম থেকে।

আফতাবের কোন হেলদোল নেই। তবুও সোনালী চুপ ছিল। কিন্তু আফতাব যখন রাখালের সাথে তার

সম্পর্ক জানতে পেরে রাখালের দিকে হাত বাড়ায়। তখন সোনালী হুমকি দেয় আফতাব কে,যে সে সব সত্য সবাইকে বলে দেবে। মূলত সোনালী রাখালের সাথে আগে পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিল তারপর ওরা পালিয়ে যেতো। কিন্তু বিপত্তি ঘটে যায় পথেই।

এখন আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছে পরী। কিন্ত পরী সোনালীর থেকেও ভয়ানক। র*ক্ত যেন ওর নেশা। শায়ের আসতেই সবার দৃষ্টি সেদিকে গেল। আফতাব বললেন,'তোমার কথা রাখা কঠিন শায়ের। পরী আজ আমাদের মারতে চেয়েছিল। এখন তুমিই বলো কি করবে?'শক্ত কন্ঠে শায়ের জবাব

দিলো,’আমার পরীজানের কিছু করতে আপনারা পারবেন না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে।’

-‘তাহলে আমরা মরব নাকি?’

-‘আল্লাহ যেভাবে যার মৃ*ত্যু লিখেছেন তার মৃ*ত্যু সেভাবেই হবে। এতে ঘাবড়ানোর কি আছে? নিজেদের রক্ষা করতে শিখুন।’

-‘তোমার যুক্তি তোমার কাছেই রাখ শায়ের। আমরা আর বসে থাকব না। দেখি পরীকে তুমি কীভাবে বাঁচাও?’

আফতাব উঠে চলে গেল। শায়ের কিছু না বলে বৈঠকে নিজের বরাদ্দ ঘরটাতে চলে গেল। তার একটুও ভাল লাগছে না। কাল সারারাত সে ঘুমাতে পারেনি। পরীকে ছাড়া এই

প্রথম রাত তার। শ্বাস রুদ্ধকর লাগছে ওর। কারো সাথে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। সকাল থেকে তাই শায়ের চুপচাপ ছিল। বুকের তৃষ্ণা বাড়ছে,পরীকে একবার সে চোখভরে দেখতে চায়। খোদা যেন ওর কথা শুনেছে। শেফালি এসে বলে গেছে পরী তাকে অন্দরে যেতে বলেছে।দেরি করে না শায়ের।

বহুক্ষণের তৃষ্ণা মেটাতে ছুটে যায় অন্দরে। পরীর ঘরে গিয়ে হাপাতে লাগলো সে। শায়ের কে দেখে পরী পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। সম্মুখীন হলো স্বামীর। এক রাতেই কেমন শুকিয়ে গেছে শায়ের। পরী এটা হঠাৎই আবিষ্কার করে। আলতো করে গালে হাত বুলায় শায়েরের। চোখের পলক ফেলে না শায়ের।

পরী বলল,’আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মালি সাহেব আপনার বুকে একটু জায়গা দিবেন? কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি।’

করুন কণ্ঠ পরীর। শায়ের আরও কাছে এগিয়ে আসে পরীর,’আপনি চোখ বন্ধ রাখবেন পরীজান? আপনাকে মন ভরে দেখব। কেন জানি আপনার চোখের দিকে

তাকালে নিজেকে আরো বড় অ*পরাধী মনে হয়।’

তাই করে পরী। আর শায়ের তার পরীজান কে চোখ ভরে দেখে। তার এ দেখার শেষ নেই। চক্ষু মুদন করার ইচ্ছা নেই শায়েরের। পরীর কপালে গাঢ় চুম্বন করে সে। পরী চোখ মেলে তাকায়,’আপনি কেন এতো নিষ্ঠুর হলেন? কেন এতো

পাপ করলেন? কি দরকার ছিলো? একটু ভালো হলে কি হতো? যুদ্ধ তো হতো না!! র*ক্তা*র*ক্তি ও হতো না। তাহলে আপনি এমন হলেন কেন? আর যদি খারাপই হতেন তাহলে আমাকে কেন এতো ভালোবাসলেন?'

-'আমি কি আপনাকে কলঙ্কিত করলাম পরীজান?'কথা বলে না

পরী। শায়ের আবার বলে,'আপনি চাঁদ আর আমি কলঙ্ক। কলঙ্ক ছাড়া চাঁদ যেমন অসুন্দর তেমনি আমি ছাড়া আপনিও বেমানান। সেহরান নামক কলঙ্ক পরীজানের গায়ে আজীবন থাকবে।'

শায়েরের বুকে মাথা রাখে পরী। কালবিলম্ব না করে শক্ত করে পরীকে জড়িয়ে ধরে সে।

বলে,’আপনার আমার ভালোবাসা হয়তো কোন ইতিহাস গড়বে না পরীজান। পৃথিবীর কেউ জানবে না আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি। তবে এই ভালোবাসা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারবেন না।’

-‘আমি কেন আপনাকে চেয়েও শাস্তি দিতে পারছি না? কেন বারবার আপনার কাছে আসতে ইচ্ছা করে?’

এর জবাব শায়ের ও জানে না। সে গভীর আলিঙ্গনে ব্যস্ত তার পরীজান কে। সারা রাত্রি দুজনেই বিনা নিদ্রায় পার করেছে। এখন কাছাকাছি হয়ে দুজনেই একটুখানি শান্তির নিদ্রায় যেতে চায়। তাই শায়ের পরীকে নিজ বক্ষে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

রুপালি রন্ধনশালায় গিয়ে দেখল মালা খাবার বাড়ছে জেসমিনের

জন্য। আজ কতদিন হলো সে বিছানায় পড়ে আছে। নড়াচড়া করতে পারে না। পুরো শরীর প্রচন্ড ব্যথা। একটু নড়লেই ব্যথায় কাতরায়। এই কষ্ট দেখতে পারে না রুপালি তাই জেসমিনের ঘরে সে যায় না। মালা খাবার নিয়ে চলে যেতেই রুপালি কুসুম কে বলে,'আজকের কাজটা ঠিকমতো

করেছিস কুসুম?’-‘হ আপা। পরী আপা যা কইছে তাই করছি।’

-‘ঠিক আছে। অন্দর থেকে তুই বের হবি না। শেফালি কোথায়?’

-‘পরের কাম করতে গেছে।’

-‘আমার মনে হয় ওরা শেফালিকে বিশ্বাস করেছে। তবে এই বিশ্বাস আরো জোরালো করতে হবে। পরী কি নিজের ঘরে?’

কুসুম মাথা নাড়ে। রুপালি পরীর ঘরে যায় কিন্তু ওদের দুজনকে একসাথে ঘুমাতে থেকে বের হয়ে আসে। মনে মনে হাসে রুপালি। পরী শায়ের কে অনেক বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ওর জীবনটা ভিন্ন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। সিরাজ ওর সাথে বেঈমানি করেছে। তা সে মালার কাছ থেকেই জেনেছে। সব জানার

পর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে মনটা। তবে রুপালি নিজেকে সামলে নিয়েছে। পরীকে দেখে শক্ত হতে শিখেছে সে।

অনেক ধোঁকা খেয়েছে। আর পারছে না। এবার সময় এসেছে রুখে দাঁড়ানোর। এবার চুপ থাকলে অন্যায় হবে ভেবেই রুপালি রুখে দাঁড়িয়েছে। ওদের প্রথম পরিকল্পনা

হলো সবার বিশ্বাস অর্জন করবে শেফালি। তারপর পরবর্তী পরিকল্পনা করবে।সেই অনুযায়ী শেফালি ওদের গিয়ে বলেছে যে রুপালি সিরাজের সম্পর্কে সব জেনে গেছে। আর সিরাজকে সে শীঘ্রই হ*ত্যা করবে। এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি করবে। ওনারা সবাই যেন সতর্ক হয়ে যায়। এই কথা

শুনে সিরাজ সহ সবাই সতর্ক হয়ে গেল। পরীর জন্য অন্দরে ঢুকতে পারছে না কেউ। শুধু শায়ের কেই পরী ঢুকতে দিচ্ছে। কিন্ত শায়ের তো ওদের কথা শুনবে না। এজন্য আফতাব বেশ চিন্তায় আছে। শায়ের ওনার কথা শুনলে এতদিনে পরীকে শেষ করে দিতো। কিন্ত এখন সব উল্টো হয়ে গেল।নওশাদ ভয়ে

জড়সড় হয়ে বসে আছে। কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ টা তার পঙ্গুত্ব। এর আগে যখন সে সুস্থ ছিল তখন এতো ভয় ওর করেনি। এখন অনেক বেশিই ভয় করছে ওর। এমন সময় শেফালি ওর সামনে এলো। এক গ্লাস পানি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,'পানি

নেন ভাই! দেইখা মনে হইতাছে আপনে ভয় পাইতাছেন।'

নওশাদ ছোঁ মেরে পানির গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিল। সত্যিই তার খুব ভয় লাগছে।

-'আমি একখান কথা কই ভাই। পরী আপা আপনেরে আগে মারব কইছে।'

কথাটা নওশাদের ভয় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলো। সে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

-'আপনে যদি বাঁচতে চান তো পরী আপারে আগে মা*রেন। তাইলেই হইব। আমি আপনেরে সাহায্য করমু আপারে মা*রার।'বাঁচার তাড়নায় সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে।সে বলল,'তুই কীভাবে সাহায্য করবি?'

-'আমি কমু না। আগে আপনে কন আমারে মা*রবেন না তাইলে কমু।'

রাগন্বিত হলো নওশাদ,'তুই বল,আমি তোকে বাঁচাব।শুধু তাই না অনেক টাকাও দেব।'

শেফালি এমন ভান করলো যেন সে ভিশন খুশি, 'তাইলে তো তো আরও ভালা। হুনেন তাইলে,আপনে আমারে ঘুমের ওষুধ আইনা দেন। পরী

আপারে খাওয়াই দিমুনে। আপা আমারে মেলা বিশ্বাস করে। তারপর রাইতে আপনে অন্দরে যাইয়া আপারে মা*ইরা ফালাবেন। তয় একটা কথা কই,আপনের আমার কথা কাউরে কইবেন না। তাইলে এক কান দুই কান কইরা পরী আপার কানে চইলা যাইবো। আর

আপনে যদি কাজটা করতে পারেন তাইলে বড় কর্তা খুব খুশি হইব।’

-‘ঠিক বলেছিস তুই। কাউকে বলা যাবে না। তাহলে শায়েরের কানেও কথাটা চলে যেতে পারে। আচ্ছা তোকে আমি ঘুমের ওষুধ এনে দেব।’নিজের কথা শেষ করে চলে গেল শেফালি। মনে মনে হাসল ও। কারণ নওশাদ ওর জালে ফেসে

গেছে। এখন শুধু অন্দরে আসার পালা। সে দৌড়ে গিয়ে পরীকে সব বলে দিল। পরী হেসে বলে,’শিকার ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে এখন শুধু ফাঁদে পড়ার পালা।’নওশাদ শেফালিকে ঘুমের ওষুধ এনে দিলো। সন্ধ্যার পর শেফালি নওশাদ কে জানালো যে সে পরীকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। রুপালিকেও খাইয়ে

দিয়েছে যাতে সে টের না পায়। শেফালির বুদ্ধির তারিফ করলো নওশাদ। রাত যখন গভীর হয় তখন সবার চোখের আড়ালে নওশাদ ঢোকা দিল অন্দরের দরজায়। শেফালি যেন ওর অপেক্ষাতেই ছিল। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি নওশাদ কে ভেতরে ঢোকালো। নওশাদ তার লাঠির সাহায্য দোতলায় উঠতে

লাগল। শেফালি সোনালীর ঘরটা দেখিয়ে বলেছে ওখানেই পরী থাকে। তাই নওশাদ সেদিকেই যাচ্ছে। শেফালি নওশাদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলে,'আইজ তোর এমন মরণ হইব যা তুই চিন্তাও করস নাই।'একজন নারী যোদ্ধার সাজ যেমন হয় ঠিক তেমনি করেই সেজেছে পরী। চোখ গাঢ় কাজলে

ঢেকে ফেলেছে আর মুখটা কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করলো নিজেকে। তারপর পালঙ্কের নিচ থেকে ধারালো সেই ত*লো*য়া*র খানা বের করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা দেখতে লাগল বারংবার। ঠিক সেই মুহূর্তে কুসুম খবর দিলো শি*কার চলে এসেছে বাঘিনীর গুহায়। মুচকি

হেসে পরী সোনালীর ঘরের দিকে পা বাড়াল। নওশাদ নিজের খোড়া পা নিয়ে আস্তে আস্তে সোনালীর ঘরে ঢুকে পড়ল। বিছানায় সে কাউকে শুয়ে থাকতে দেখে নিঃশব্দে হাসে। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে,'বাঁচার জন্য মানুষ কত কিছুই না করে পরী। আমাকে বাঁচতে হলে তোমাকে যে ম*রতে হবে।'ছু*রি*টা নিয়ে

পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল নওশাদ। ইচ্ছামতো ছু*রি চালালো শুয়ে থাকা ব্যক্তির শরীরে। নওশাদ ভাবছে নিশ্চয়ই পরীর শরীর এতক্ষণে ক্ষ*ত বি*ক্ষ*ত হয়ে গেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পারছে না। সে নিজে নিজেকে সুধালো,'র*ক্ত ছিটকে আসছে না কেন?'

-‘তুই র*ক্ত দেখতে চাস? আমি তোকে আজ র*ক্ত দেখাব। তোর শরীরের যত র*ক্ত আছে আজ তুই সব দেখবি।’

নওশাদ ফিরে তাকায়। কুসুম হারিকেনের আঁচটা বাড়িয়ে দিতেই পরীর বদনখানা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্তিমা কালো অশ্রুতে টলমল চোখ দেখে নওশাদের আত্মা যেন বেরিয়ে

গেল। সে চিৎকার দিতে চাইল মুহূর্তেই কিন্ত ভারি কিছু মাথায় পড়ায় চোখ বন্ধ হয়ে এলো যেন। তবে সম্পূর্ণ জ্ঞান সে হারালো না। মেঝেতে বসে পড়ল সে। আ*ঘাতটা পেছন থেকে রুপালি করেছে। সে এতক্ষণ এই ঘরেই লুকিয়ে ছিল। নওশাদ যাকে পরী ভেবে আঘাত করেছে তা বালিশ ছিল যা চাদরে

ঢাকা ছিল।রুপালি রুষ্ঠচিত্ত কণ্ঠে বলল,'ওর গলার আওয়াজ বন্ধ কর কুসুম।'

তৎক্ষণাৎ শেফালির আগমন ঘটে সে বলে,'ওর আওয়াজ আমি বন্ধ করতাছি।'

নওশাদ অবাক হয়ে গেল কিন্ত কথা বলার আগেই কুসুম ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে। নিজেকে

ছাড়ানোর সেই শক্তিটুকু কেড়ে নিয়েছে রুপালি। তাই নড়তে পারছে না। শেফালি হাতের গামছা টা নওশাদের মুখে ঢো*কানোর চেষ্টা করছে কিন্ত নওশাদ মুখ খুলছে না। শেষে উপায়ন্তর না পেয়ে নাক টিপে ধরে। শ্বাস নিতে পারে না নওশাদ। তাই শ্বাস নেওয়ার জন্য মুখ খুলতেই শেফালি ওর মুখে গামছা

ঢু*কিয়ে দেয়। নওশাদের লাঠি দিয়ে গুতো মেরে মেরে অর্ধেক গামছা গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো সে। পরী এগিয়ে একটা চেয়ার আনলো। ওরা ধরে নওশাদ কে চেয়ারের সাথে হাত পা বেঁধে ফেলে। ছুটোছুটি করছে নওশাদ কিন্তু পারছে না। পরী ত*লো*য়াবর হাতে নিয়ে নওশাদের মুখোমুখি বসে।

ত*লো*য়া*র দেখে ভয়ে নওশাদের আত্মা যেন বেরিয়ে আসছিল। পরী বলে,’তোর চোখে আমি ভয় দেখতে পাচ্ছি। আমার এতে খুব আনন্দ হচ্ছে।

আরো ভয় পাবি তুই।’-‘এতো কথা বলিস না পরী। ওকে শেষ করে দে।’

পরী ঘাড় কাত করে নওশাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এতো সহজে?? তাহলে তো আসল মজাটাই মাটি হয়ে যাবে।’

পরী একটানে নওশাদের মুখ থেকে গামছা বের করে আনলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে নওশাদের। তৃষ্ণায় পানি পানি করতে লাগল। গামছা মুখে থাকায় দম প্রায় বেরিয়ে

আসছিল। পরী জিজ্ঞেস করল, ‘পানি খাবি?’

মাথা নাড়ে নওশাদ। কুসুম কে ইশারা করতেই সে একটা ছোট বাটি নিয়ে আসে পরী বাটিটা দেখিয়ে বলে,’পানি তো নেই। তোর মতো পি*শাচের তৃষ্ণায় পানিও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন কি করি?’

একটু ভাবল পরী। হাতের তলোয়ার মেঝেতে রেখে কোমড়ে গোঁজা ছোট্ট ছু*রিটা বের করে। পরপর তিন চারটা দা*গ কেটে দেয় নওশাদের হাতে। ব্যথায় নওশাদ আ*র্তনাদ করে উঠলেও মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো না। ওর হাত দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে র*ক্ত ঝরছে আর পরী তা বাটিতে সংগ্রহ করছে। কিছুটা র*ক্ত

নিয়ে সে নওশাদের মুখের সামনে ধরে বলে,’নে তোর পিপাসা মেটা।’এবার নওশাদ তার বাক শক্তি কিছুটা ফিরে পেল। র*ক্ত দেখে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে,’আমাকে ছেড়ে দাও পরী। আমি অনেক দূরে চলে যাব।’

-'আমার আপাকে ছেড়েছিস তোরা? আপাও তো অনেক দূরে যেতে চেয়েছিল ছেড়েছিস কি?'

নওশাদের গাল দুটো চেপে ধরে রক্ত ওর মুখে ঢেলে দিল পরী। সাথে সাথেই বমি করে দিল নওশাদ। এটা দেখে কুসুম আর শেফালির ও বমি পেল। মুখে কাপড় দিয়ে বমি আটকালো ওরা।পরী তাতেও ক্ষ্যান্ত

হলো না। বাকি রক্ত টুকু আবারও মুখে ঢেলে দিলো। এবারও তা ফেলে দিল নওশাদ।

-'এই হাত দিয়ে আমার আপাকে স্পর্শ করেছিলি তাই না?'

বলতে বলতেই নওশাদের তর্জনী আঙুল টা কে*টে নিলো পরী। এবার চিৎকার করে উঠলো নওশাদ কিন্তু ওর চিৎকার কারো কানে পৌঁছায় না

তার আগেই পরী আবার ওর মুখে গামছা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কুসুম আ শেফালি মৃদু চিৎকার করে উঠল। ভয়ে কাঁপতে লাগল দুজনেই। পরী যে এতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে তা ওরা চিন্তাও করেনি। ওরা দুজন বাইরে চলে যেতে চাইলে পরী বলে ওঠে,'কোথায় যাচ্ছিস তোরা? এখানেই থাক। ওর যন্ত্রণা তোদের

দেখতে হবে।’কুসুম ভয়ে ভয়ে বলে,’আমার ডর করতাছে আপা আমি যাই। আর এইহানে থাকতে পারমু না।’

বলতে বলতে কুসুম দৌড়ে চলে গেল। ওর দেখাদেখি শেফালিও পালালো। বাকি আছে রুপালি। ওর ভয় লাগলেও শক্ত চোখে সবটা দেখছে। ও বলল,’আমি দেখতে চাই

পরী। আমার আপার হ*ত্যা*কারীদের শাস্তি কেমন তা আমি নিজ চোখে দেখতে চাই। ভয় আমি পাব না।’পরী মুখোশের আড়ালে হাসে। তারপর ছু*রি দিয়ে নওশাদের পরনের শার্ট টা কেটে খুলে ফেলে। বুকে ছু*রি চালিয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওর কলিজাটা আজ কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে।

নওশাদের বুকের ক্ষ*তটা বেশ গাঢ় ফলে র*ক্তের বন্যা বয়ে গেল মুহূর্তেই। রুপালি খানিকটা শুকনো মরিচের গুড়া সেখানে লাগিয়ে দিতেই ছটফট শুরু করে নওশাদ। গ*লা কা*টা মুরগির মতো ছুটো ছুটি করছে সে। এর থেকে বুঝি আর কোন যন্ত্রণা হয় না। পরী প্রশান্তির স্বরে বলে,'সারা শরীরের

যন্ত্রণা সহ্য করা যায় কিন্ত বুকের যন্ত্রণা সহ্য করা খুবই কঠিন নওশাদ। আজ তোকে আমি ভ*য়া*নক মৃ*ত্যু দেব। তুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার সময়ও পাবি না। তোকে আমি জীবিত দা*ফন করব। জানাযা ও হবে না তোর। শশীলের লা*শ তো তোরা পেয়েছিলি কিন্ত তোর লা*শ কেউ

পাবে না।’ব্যথায় ভয়ে কাঁপছে নওশাদ। শরীরে জ্বলন হলেও নড়ার শক্তি নেই। এরই মধ্যে পরী ওর আরেকটা আঙুল কে*টে নিল। এবার আর রুপালি থাকতে পারে না। অনেক সাহস দেখালেও আর সাহসে কুলায় না ওর। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরী রুপালিকে

বাঁধা দিলো না। শুধু বলে কুসুম আর শেফালি যেন গরম পানি দিয়ে যায়।

পরী নওশাদের দিকে তাকিয়ে বলে,'দেখ মৃ*ত্যু যন্ত্রণা কতটা কষ্টের!! তুই চিন্তা করিস না! তোর দাফন খুব ভাল করেই হবে। তোকে গোসল করাব,আগরবাতি জ্বলবে,গোলাপ জল দেওয়া হবে,কবর খোড়া হবে।

কিন্ত তোকে সাড়ে তিন হাত জায়গা দেওয়া হবে না। তুই তো মানুষের মধ্যেই পড়স না। তাহলে তোকে মানুষের মতো দাফন করাটা উচিত হবে না।’নওশাদ গোঙ্গাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলছে।পরী নওশাদের আরেকটু কাছে এগিয়ে তা শোনার চেষ্টা করে,’আমাকে

তাড়াতাড়ি মেরে ফেল। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।’

ভাঙা ভাঙা গলায় নওশাদ বলছে। কুসুম আর শেফালি তখন গরম পানির পাতিল নিয়ে ঘরে এলো। পরী ওদের দেখে বলল,’তুই কি নওশাদের একটা আঙুল কা*টবি কুসুম?’

মুখে না বলে মাথা নেড়ে না বলে কুসুম। ভয়ে সে কাঁপছে এখনও। শেফালিকেও একই কথা জিজ্ঞেস করে পরী সেও না বলে দেয়। ওদের ভয় দেখাতে পরীর ভিশন ভাল লাগছে। সে বলে,’গোসল করানোর পর কিন্ত ওর গায়ে আর হাত দেওয়া যাবে না।’

-‘না আপা থাক। আমরা অহন কি করমু?’

-‘গোসল করা।’কুসুম পাতিলের সব পানি নওশাদের গায়ে ঢেলে দিল। পানি এতটাই গরম ছিল যে সাথে সাথে ফোসকা পড়ে গেল নওশাদের শরীরে। শেফালি আগরবাতি জ্বালিয়ে ঘরে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিল। পরী নাক টেনে গোলাপ জলের সুগন্ধিটা

নিল। খুব ভাল লাগছে ওর। ওরা তিনজন ঘর ত্যাগ করে নওশাদ কে একা রেখে। উঠোনের এক কোণায় খড়ের গাদা সরিয়ে সেখানে গর্ত খুড়ছে। পরীও সাথে যোগ দিয়েছে। তিনজন নারী মিলে কবর খুড়ছে। কবর বললে ভুল হবে গর্ত খুঁড়ছে। রুপালি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় সেখানে মালা চলে আসে।

ওদের গর্ত খুঁড়তে দেখে বলেন,'কি করস পরী? সবাই এইহানে ক্যান?'

পরী কো*দাল ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে উপরে উঠে এসে বলে,'আপনি ঘরে যান আম্মা। পিকুলের কাছে যান।'

-'নওশাদরে ধইরা আনছোস তাই না?'

-'হুমম।'

-‘তোর বাপ জানি এইসব জানতে না পারে। তাইলে কিন্তু হেয় খারাপ কিছু করব।’

পরী অবাক হলো মায়ের কথায়। তবে সে বুঝতে পারল মালাও ওকে সমর্থন করছে। মালা এতদিনে এটা বেশ বুঝেছে যে সে যতই বলুক না কেন। পরী তার সিদ্ধান্ত বদলাবে না। এখন মালা সাবধান করা ছাড়া

আর কিছুই করতে পারবে না। তাই মালা চলে গেল।মাটি মেখে তিনজন বড় একটা গর্ত খোঁড়ে। তারপর সোনালীর ঘরে যায়। পরী নওশাদকে ভাল করে দেখে। এখনও বেঁচে আছে। শরীরের অনেক র*ক্ত বের হয়ে গেছে। যার ফলে নেতিয়ে পড়েছে। ওর প্রতিটি নিঃশ্বাস এখন শেষ নিঃশ্বাসের প্রহর গুণছে। বড়

একটা চাদরে শুইয়ে সেটা ধরে চারজন মিলে নওশাদ কে গর্তের কাছে নিয়ে এল। নওশাদ তখনও নিভু নিভু দৃষ্টিতে ওদের দেখছে আর মনে মনে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। তারপর জীবিত পুঁতে ফেলে নওশাদ কে। মাটির নিচে শ্বাস নেওয়া যায় না। সেখানে অক্সিজেন ও পৌঁছায়

না। কাজ শেষ করে পরী কলপাড়ের দিকে এগোয়।

মধ্য প্রহরের কিছুটা সময় পর যখন পুরো গ্রাম ঘুমানো। এমনকি ঝিঁ ঝিঁ পোকা গুলো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন শুধু আকাশের চাঁদ খানা জেগে আছে। পুরো গ্রামটাতে নজর বুলাচ্ছে। তবে কিছু না দেখলেও নওশাদের শেষ পরিণতি গাছের

ফাঁক দিয়ে ঠিকই দেখেছে। সম্পূর্ণ কালো রঙের শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে পরী। গোসল সেরে শরীর মুছেনি এমনকি মাথাও না। পরনের শাড়িটা অর্ধেক ভিজে আছে। সেই অবস্থাতেই ঘরে গেল পরী। সেখানে শায়ের ওর জন্য অপেক্ষা করছে। পরীই তাকে খবর পাঠিয়েছে।

এমতাবস্থায় পরীকে দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল শায়ের। তবে কথা বলল না। পরীর এমন সৌন্দর্য শায়ের কে আটকে দিল। হাসল পরী যা শায়েরের কাছে ভয়ংকর লাগল। নিজের শীতল হাতটা শায়েরের গালে রাখে পরী। যার দরুন হালকা কেঁপে ওঠে সে।তা দেখে আবারও হাসে পরী। দ্বিতীয় হাত অপর গালে

রেখে টেনে তাকে নিচু করে। তারপর পায়ের পাতা উঁচু করে চুম্বন করে স্বামীর কপালে। আদুরে গলায় বলে,’আমি ছাড়া অন্য কোন নারীকে ছুঁয়েছেন কখনো?’

-‘জীবনে দুজন নারীকে আমি গভীর ভাবে ছুঁয়েছি। তার মধ্যে আপনি দ্বিতীয়। প্রথমত আমি আমার মা’কে ছুঁয়েছি আর দ্বিতীয়ত আপনাকে।

আর কোন নারীকে চোখ দিয়েও স্পর্শ করিনি।'

-'এজন্যই কি আপনার স্পর্শে জাদু আছে? যার জন্য আমি এত উতলা হয়ে উঠি?'

-'আপনার শরীর ঠান্ডা অনেক। কাথাটা গায়ে জড়িয়ে বসুন। নাহলে জ্বর আসবে।'

পরীর হাত ধরে ওকে পালঙ্কে বসায় শায়ের। কাথাটা গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলে,’আপনি দিন দিন আরও অদ্ভুত আচরণ করছেন। এরকম করলে আপনার শরীর খারাপ করবে।’জবাব না দিয়ে পরী শায়ের কেও টেনে নিলো কাথার ভেতরে। শায়েরের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে।

ভিশন শান্তি লাগছে পরীর। শায়ের বলে উঠল, 'আপনি ভালোবাসা বিশ্বাস করেন?'

-'শুধু আপনার ভালোবাসা বিশ্বাস করি। বাকি সব মিথ্যা।'

-'সম্পানের ভালোবাসা কিন্তু মিথ্যা ছিল না পরীজান। ও সত্যিই বিন্দুকে ভালোবাসতো। শুধু আপনাকে মারতে চেয়েছিল বলে কি ওর

ভালোবাসা মিথ্যা?’পরী মাথা তুলে শান্ত চাহনিতে শায়েরের দিকে তাকালো। শায়ের নিজেও পরীর দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অভিব্যক্ত পড়ার বৃথা চেষ্টা করছে পরী। তা উপলব্ধি করতে পারে শায়ের। সে বলে,’সম্পান কিন্তু খারাপ হয়ে জন্ম নেয়নি পরীজান। তাকে খারাপ

বানানো হয়েছে। টাকা এমন একটা বস্তু যার নেশায় ধনী গরীব সবাই পড়ে। এবং এই নেশাই সম্পান আর আমার মতো শত পুরুষ খারাপ কাজে লিপ্ত হয় আর ধনীরা পাপ করেও সকলের আড়ালে থেকে যায়।''আপনার বাবা বেছে বেছে তাদেরই নিজের দলে টানে যাদের পরিবারে খুবই অভাব। খেয়ে পড়ে

বাচাঁ মুশকিল। কেননা একমাত্র তারাই বোঝে টাকার কতটা মূল্য! তারা পরিবারের সবাইকে সুখি রাখতে সবকিছু করতে রাজি থাকে। সম্পান, সিরাজ আর আমি!! এই তিনজনই আপনার বাবার শিকার মাত্র। কিন্ত আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আপনার বাবার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। নিজেকে অনেক চতুর মনে

করে আপনার বাবা। কিন্ত শেষে সে নিজের জালে নিজেই ফেসেছে। যারা যারা আপনার বাবার কর্মচারী ছিলো তাদের কোন না কোনভাবে হ*ত্যা করেছেন আপনার বাবা। কারণ আপনার বাবার সব অ*প*কর্মের স্বাক্ষী ছিল তারা।আমাকেও এতদিনে মে*রে ফেলতেন কিন্ত পারেনি। কেন জানেন? কারণ আপনার বাবার

কু*কৃ*র্তির সব প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি যদি মা*রা যাই তাহলে সব প্রমাণ পুলিশের হাতে চলে যাবে এজন্যই আপনার বাবা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর সম্পান কে মে*রে ফেলেছেন। সিরাজ কে বাঁচিয়ে রেখেছেন কারণ ও আপনার বাবার মতোই নির্দয়। টাকার বিনিময়ে ও সব করতে পারে।

এজন্য আপনার বোনকেও ফা*সিয়েছে। শুধুমাত্র টাকার জন্য মানুষ ভুলে যায় সে একজন মানুষ।’

শায়ের দম ফেলে পরীর দিকে তাকাল। পরী এখনও শায়েরের বুকে মাথা রেখে আছে। শায়ের বলল, ‘আপনি কি শুনছেন পরীজান?’

‘হুম শুনছি। আপনিও তো টাকার জন্য খু*ন করেছেন।’

‘ভুল পরীজান। টাকার জন্য আমি সব করলেও খু*ন করিনি। আমি প্রথম খু*ন করি পালককে।’

পরী মাথা তুলে শায়েরের দিকে তাকালো,’কেন খু*ন করলেন তা সম্পূর্ণটা এখনও আপনি আমাকে বললেন না। আজ অন্তত বলুন!!’পরী

অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। শায়ের আবার বলতে শুরু করে,'পালকের কোন দো*ষ নেই অন্তত আপনার দৃষ্টি থেকে। পালকের ধর্ম ভিন্ন তা কি আপনি জানেন? তবুও সে আমাকে পেতে চেয়েছিল। এতে আমি ওর কোন দো*ষ দেখি না। মানুষ জাতি বড়ই অদ্ভুত পরীজান। কখন কার দৃষ্টিতে

কে আটকে যায় তা বলা মুশকিল। সেজন্যই পালক আমাতে আটকে ছিল। আমি পালককে হ*ত্যা করতাম না। কিন্ত শেষে সে সবকিছু জেনে গেল। শুধু তাই নয় সে আমাকে হু*মকি দিল যে সে আপনাকে সব বলে দিবে। যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে চুপ থাকবে। সুযোগের

সদ্ব্যবহার,তবে তার দো*ষ আমি দেখি না। ভালোবাসা পেতে আমি নিজেই খু*ন করেছি আর সে তো হু*মকি দিয়েছে মাত্র। তখন কানাইকে নিয়ে ঝা*মেলা চলছিল তার মধ্যে পালক চলে আসে। মাথা কাজ করছিল না তাই ওর মুখ বন্ধ করার জন্য মে*রে দিয়েছি।

তারপর আরো পাঁচজন কে মে*রেছি আমি। চারজন ছিল বিন্দুর ধ*র্ষ*ণ*কা*রী। মেয়েদের সম্মান না করলেও অসম্মান করি না আমি। সম্পান ও। ওইদিন বিন্দুকে মা*রা*র কোন পরিকল্পনা ছিল না। সম্পান কে প্রথমে আপনার বি*রুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল। কিন্ত সে আপনার আর বিন্দুর ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ।

এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম নারীর ভালোবাসা হিং*স্র মানবকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। সম্পান নিজে থেকে আপনার বাবার কাজ ছাড়তে চেয়েছিল কিন্ত আপনার বাবা আপনাকে মা*রার পর তাকে যেতে বলেছিল। কিন্ত সম্পান তা নাকচ করে দেয়। তারপর বিন্দুকে মা*রার হুমকি দেন আপনার

বাবা। নিজের ভালোবাসা বাঁচাতে সম্পান আমার ভালোবাসা কেড়ে নিতে চাইল। কিন্তু সে জানতো আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমাকে পরিকল্পনা করেই যাত্রা দেখতে পাঠানো হয় যাতে আমি কিছু জানতে না পারি। তবে সেদিন সম্পান ওখানে গিয়ে আমাকে খবরটা দেয়। আমাদের আসতে

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে সব শেষ। সম্পান নিজের ভালোবাসাকে ওইভাবে দেখতে পারেনি তাই ছয় জনের মধ্যে দুজনকে ওখানেই মে*রে দেয়। আর বাকি চারজনকে আমি মা*রি। বিন্দু যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সম্পানের বধূ হয়ে আজ ওর ঘরে থাকতো। কিন্তু বিধাতার কি লিখন। দুজনকেই

তিনি টেনে নিয়েছেন। আমি আর সম্পান হিং*স্র*তাকে জিততে দেইনি পরীজান। ভালোবাসাকে জয়ী করেছি। ভালোবেসে ওরা দুজন প্রা*ণ দিয়েছে আর আমরা দুজন একসাথে রয়েছি।'-'আর নাঈমকে কেন মিথ্যা আ*সামী বানালেন?'

-'মিথ্যা আ*সামী তাকে বানিয়েছে নওশাদ। আপনার বিয়ে ভাঙার সব

পরিকল্পনা নওশাদের ছিল। আমি জানতাম আপনাকে আমি শেখরের মতো করে সুখি রাখতে পারব না। তাই আপনার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্ত মাঝপথে জানতে পারলাম যে বিয়েটা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আপনার বাবা পরিকল্পনা করে আপনাকে মে*রে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেবে আর

গ্রামের লোকেরা ভাববে বিয়ে ভাঙার কষ্টে আপনি আ*ত্ম*হ*ত্যা করেছেন। আমি তা হতে দেইনি। আপনার বাবাকে বলেছি আমি আপনাকে বিয়ে করব এবং আমার গ্রামে নিয়ে গিয়ে হ*ত্যা করব। কিন্তু বিশ্বাস করুন পরীজান আমি আপনার সাথে সুখে থাকতে চেয়েছি শুধু। কিন্তু সেই সুখটাও ওরা কেড়ে

নিল। আমি মানছি আমি পাপ করেছি।'

কথাগুলো শেষ করে পরীর দিকে তাকালো শায়ের। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে পরীর। সে মুচকি হেসে বলে,'আমি জীবনে অনেক পা*প করেছি কিন্তু পূণ্য করেছি আপনাকে ভালোবেসে। এর চেয়ে পবিত্রতা বুঝি দুনিয়াতে নেই।'-'এজন্যই তো

এতো ভালোবাসা আমার কপালে সইলো না মালি সাহেব। যু*দ্ধে নামতে হয়েছে আমাদের। সেখানে আপনি আমার শ*ত্রু*পক্ষ।’

-‘শত্রুপক্ষ যে আপনাকে ভিশন ভালোবাসে। ত*লো*য়া*রের আঘাতে নয় শ*ত্রু*র ভালোবাসায় আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে পরীজান।’

-‘আমি যে এই যুদ্ধে প্রাণ হারাব মালি সাহেব। তখন আপনি কি করবেন?’

-‘আপনাকে রক্ষা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করব।’

-‘আমি মারা গেলে আমার কবরের পাশে একটা বেলি ফুল গাছ লাগাবেন মালি সাহেব!! আমার দেহটা পঁচে সার হয়ে মিশে যাবে

ওই গাছে। আর প্রতিটি ফুলের ঘ্রাণে আপনি আমাকে পাবেন।’

এই প্রথম শায়ের পরীর কথার জবাব দিতে পারল না। সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল পরীজানের পানে। পরী দেখতে পেল ক্ষত বিক্ষত চোখদুটো। ওই চোখে কত ভালোবাসা দেখেছে সে। আর আজ ওই চোখজোড়া সে নিমিষেই রক্তাক্ত

করে দিয়েছে। আচমকা পরীকে শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ করে শায়ের। বলে ওঠে,'আপনাকে এভাবেই ধরে রাখব আমি পরীজান। আপনি আর কোথাও যেতে পারবেন না। আচ্ছা,চলুন না আমরা ফিরে যাই আমাদের গ্রামে? আমরা ভাল থাকব।'-'কিন্তু আমার মা বোন ভাল

থাকবে না। ওদের শেষ করে দেবে ওই জঘন্য লোকগুলো।'

-'সবাইকে নিয়ে যাব আমরা। তাহলেই তো হবে।'

-'এসব বাদ দিন। আমি আপনাকে একটু কাছে পেতে চাই। এই মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখতে চাই।'

পরী আঁকড়ে ধরে স্বামীকে। শায়ের আজ নিজে থেকে সব সত্য স্বীকার

করেছে অথচ পরীর রাগ হচ্ছে না। কারণ সে নওশাদের বিনাশ করতে পেরেছে তাই আজকে সে খুশি থাকবে। এই মধুরতম রাতটা শায়ের কে দিবে। ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশ এঁকে দিবে। তাইতো সে এতো রাতে স্বামীকে তলব করে এনেছে।

সকাল হতেই ঘুম ভাঙে শায়েরের কিন্ত তার এই মুহূর্তে উঠতে একদম

ইচ্ছে করছে না। পরীর উষ্ণ আলিঙ্গনে তার আরো থাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্ত সে ইচ্ছা ভঙ্গ করে পরীই উঠে দাঁড়াল। আলমারি থেকে একটা শাড়ি বের করে কলপাড়ের দিকে এগোলো। কিছুক্ষণ বাদে শায়ের নিজেও গেল কিন্ত উঠোনে আসতেই সে দেখতে পেল শেফালি আর কুসুম গোবর দিয়ে উঠোন

লেপছে। বিষয়টা শায়েরের সন্দেহজনক মনে হল কিন্ত সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। কারণ আর কিছুক্ষণ বাদে তাকে অন্দর ত্যাগ করতে হবে। এটা পরীর হুকুম। তাই সে বিনা বাক্যে প্রস্থান করে। বেলা দশটা বাজতেই ডাক পড়ল নওশাদের। তাকে বৈঠক ঘরের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্দরে নওশাদ যাবে না এটা সবাই শতভাগ নিশ্চিত। তবে গেল কোথায়। সবাইকে খুঁজতে পাঠালো আফতাব। কিন্ত নওশাদের হদিস পাওয়া গেল না। আখির তাতে ক্ষেপে গিয়ে বলে,'নিশ্চয়ই পরী কিছু করেছে ভাই। সে'ই নওশাদ কে গুম করেছে। নাহলে রাতারাতি ছেলেটা উধাও হয় কীভাবে?'

-‘সত্যিই যদি পরী কিছু করে থাকে তাহলে ওর আজকেই শেষ দিন। শায়েরের কোন কথাই আমি শুনব না। এতে যা হয় হোক।’

আফতাব তার দলবল নিয়ে অন্দরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্ত দরজা পর্যন্ত যেতেই শায়ের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আফতাব বিক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে,’সামনে থেকে সরে যাও শায়ের। আজ পরী

বাঁচবে না। তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো।'-'পরীজান কিছু করেনি। সে জানে না নওশাদ কোথায়!'

-'তুমি এতটা নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

-'কাল সারাদিন নওশাদ আমাদের চোখের সামনেই ছিল। এমনকি রাতে আমার সামনে দিয়েই নিজের ঘরে গেল।'

-‘ঘুমানোর পর হয়তো পরী ওকে ধরে নিয়ে গেছে।’

-‘নাহ! কারণ কাল রাতে আমি পরীজানের সাথে ছিলাম।’

-‘তুমি ছিলে পরীর কাছে! কেন গিয়েছিলে?’

সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে শায়ের। রাগন্বিত হয়ে বোকা একটা প্রশ্ন করে ফেলেছে সে। শায়ের

আবারও সবার দিকে চোখ বুলিয়ে বলে,'আপনি বড়ই নির্লজ্জ। একজন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে কেন যায় সেটা কি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে জমিদার মশাই? আচ্ছা বাদ দিলাম আমার কথা। আপনি নিজ স্ত্রীকে ফেলে পর নারীর কাছে কেন যেতেন? সেটা কি আমি একবারও জিজ্ঞেস করেছি?'শায়েরের কথা

পুরোপুরি না শুনে রক্ষিরা সব চলে গেছে। এই মুহূর্তে শুধু আখির আর আফতাব দাঁড়িয়ে। শায়েরের কথা শুনে বিড়ম্বনায় পড়ল আফতাব। ভাইকে কিছু বলতে না দেখে আখির বলে উঠল,’তুমি মুখে মুখে তর্ক করো খুব। তুমি জানো কাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছো তুমি?’

-‘হুম! আমি মস্তিষ্কহীনদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কেন একথা বলছি জানেন? কারণ আপনাদের কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। যারা আপনাদের সাহায্য করে তাদের কেই মে*রে ফেলেন আপনারা। তাহলে আপনাদের তো মস্তিষ্কহীন বলা উচিত তাই না?’

বিপরীতে আখির পাল্টা জবাব দিলো না। শায়ের আবার বলল,’পরীজানের দিকে নজর বুলাবেন না বলে দিলাম। নাহলে ফল খারাপ হবে।’চলে গেল শায়ের। ক্ষোভে ফেটে পড়ে দুই ভাই। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা সব শায়ের নষ্ট করে দিচ্ছে বারবার। আফতাব নিচুস্বরে বলে,’সিরাজ কে খবর দে। শায়ের

কে আগে সরাতে হবে তারপর পরীকে সরাব। পুলিশ কে হাতের মুঠোয় নিতে আমার সময় লাগবে না। আগে একটা আপদ সরাই তারপর আরেকটাকে সরাব।’কথাটা শেফালির কর্ণগোচর হয়ে গেল। সে দৌড়ে পরীকে গিয়ে খবর দিল। ওর বাবার সব পরিকল্পনা জানিয়ে দিলো। পরী চুপ থেকে সব শুনল।

তারপর বেশ শান্ত ভাবেই নিজ ঘরে চলে গেল। শেফালি বুঝল যে ঝড় আসতে চলেছে। পরীর চুপ থাকা মানেই ঝড়ের পূর্বাভাস। কিছুক্ষণ বাদে পরী ঘর থেকে বের হয়ে আসে। শেফালিকে বলে,'তোরা তৈরি থাক পরবর্তী শিকার সিরাজ।'সময়কাল ২০০৮,

সিমেন্টের মলাটে আবৃত খাতাটা বন্ধ করে মুসকান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায়। চোখের চশমাটা খুলে খাতাটা আগের জায়গায় রেখে কক্ষ ত্যাগ করে রান্নাঘরে আসে। শোভন এসে মায়ের কাছে আবদার করে সে নুডুলস খাবে। তাই সে চুলায় গরম পানি করতে দিল। অপর চুলাতে চা

বসিয়ে দিল। আগে নুডুলস রান্না করে তারপর চা বানিয়ে ছেলের কাছে নিয়ে এল। একটু ফুসরত পেল না সে। কলিং বেলের শব্দে সে আবার সেদিকে গেল। দরজা খুলে দেখতে পেল ঘর্মাক্ত ক্লান্ত পুরুষটিকে। হাতের এপ্রোন টা মুসকানের হাতে দিয়ে পুরুষটি ঘরে ঢোকে। বাথরুম থেকে পরিপাটি

হয়ে বের হতেই মুসকান প্রশ্ন ছোঁড়ে,’নূরনগর গ্রামটিকে তুমি চেনো নাঈম?’

সচকিতে তাকালো নাঈম,’কেন বলতো?’‘গত সপ্তাহে আমি একটা ইন্টারভিউ নিতে জমিদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে একটা ঘরে একটা খাতা পেলাম। সেটাই আজ সময় করে পড়েছিলাম।’

ঘাবড়ালো নাঈম। চোখ লুকানোর চেষ্টা করল মুসকানের থেকে। সেটা বুঝতে পেরে মুসকান নাঈমের হাত ধরে টেনে তার পাশে বসলো,’ক্লান্ত তুমি,এই বাহানা দিও না। আমাকে বলো জমিদার কন্যা পরী এখন কোথায়? আর তার স্বামী সেহরান শায়ের ই বা কোথায়? কি হয়েছিল তার পরিবারের?’

-‘আমি জানি না মুসকান।’

-‘জানতাম মিথ্যা তুমি বলবে। নাঈম তুমি সব জানো। ওই খাতায় সর্বশেষ পরী তোমার নাম লিখেছে। তুমি কি সব বলবে নাকি কাল আমার নিউজ পেপারে আমি পরীর লেখা খাতাটা পাবলিশ করব?’

-‘এটা করো না মুসকান। পরীর নিষেধাজ্ঞা আছে।’

-‘তাহলে সব বলো আমাকে?’-‘তোমাকে সব শায়ের বলতে পারবে। পরী একমাত্র শায়েরকেই সব সত্য বলার অনুমতি দিয়েছে।’

-‘সে এখন কোথায়? তার সাথে দেখা করব কীভাবে?’

নাঈম চুপ রইল কিছুক্ষণ। দেখে মনে হল সে অনিচ্ছুক কথাটা

বলতে। অতঃপর নিরবতা ভেঙে সে বলে,’আর তিনদিন পর তার ফাঁ*সি হবে।’

নির্বাক হয়ে গেল মুসকান। সে কি সত্যি শুনছে? নাকি তার শ্রবণশক্তি লোপ পেয়েছে?তিনদিন পর শায়েরের ফাঁ*সি!! এতকিছু কীভাবে হল? এর মধ্যে হয়তো কোন সত্য লুকানো আছে। সে জিজ্ঞেস

করে,'কি বলছো তুমি নাঈম? সত্যি তার ফাঁ*সি? কিন্ত কেন?'

-'তুমি সব প্রশ্ন তাকে করলেই পাবে। আমি সব জানলেও আমার হাত পা বাঁধা।'

-'সেহরান ভালোবাসে পরীকে!! আর সেই সেহরানের ফাঁ*সি হবে? কোথাও ভুল হচ্ছে নাঈম। তুমি তো সব জানতে তাহলে তুমি কেন কিছু

করলে না?’-‘আমার জানা নেই সেহরান কেমন ভালোবাসে পরীকে।’ কথাটাতে মিশে আছে হিং*সা। তা বুঝতে বেগ পেতে হলো না মুসকানের। তবে এই হিং*সার কারণটা কি?

নাঈমের পুরুষালী মনে কেন এই হিংসার সৃষ্টি?

-‘তুমি না জানলেও আমি বুঝতে পারছি। নাঈম মেয়েটার চেহারা ঝলসে গিয়েছিল আগুনে!! তারপরও সেহরানের ভালোবাসা একটুও কমেনি। সৌন্দর্য তার কাছে কোন কিছু না। মানুষ টাই সব। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি এতে বেশ বুঝতে পারছি পরী আর সেহরানের সাথে অতীতে ভাল কিছু হয়নি।

আমাকে তিনদিনের মধ্যে সব সত্য জানতে হবে। আমি সেহরান কে বাঁচাব এবং তার পরীর কাছে ফিরিয়ে দেব।'

নাঈম এবার রেগে গেল ভিশন। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,'সেহরান সেহরান সেহরান,মাথা খারাপ করো না। যা বলার সেই বলবে তোমাকে। সাভার থানায় গিয়ে দেখা করে নিও। ওর

হাতে বেশি সময় নেই।'মুসকানের হাত পা কাঁপতে লাগল। না জানি শায়ের এখন কোন পরিস্থিতিতে আছে। পেশায় মুসকান একজন সাংবাদিক। সেই সুবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে

যায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। যা পরবর্তীতে ওদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নূরনগরের পরিত্যক্ত জমিদার

বাড়ির তথ্য সংগ্রহ করতে সে গত সপ্তাহে গিয়েছিল। মুসকান জানতে পারে নাঈম প্রায় দশ বছর আগে সেখানে গিয়েছিল। এজন্য মুসকানের আগ্রহ বেশি ছিল। তাই নিজের দলের সাথে অভিযানে নেমে পড়ে সে। সেখানে পরীর ঘরে একটা খাতা তার চোখে পড়ে। খাতাটা খুলে সে সোনালীর লেখা গুলোর কিছুটা

পড়েছিল তবে সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি। তাই খাতাটা লুকিয়ে সে নিয়ে এসেছে। শুধু সোনালী নয়,রুপালি এবং পরীর লেখাও আছে। যা সম্পূর্ণ পড়তে গিয়ে অসংখ্যবার চোখ মুছেছে সে। সে ভেবেছিল নাঈম এই ঘটনার আংশিক জানে কিন্তু সে ভুল। নাঈমের কথা শুনে এখন সে বুঝতে

পারছে নাঈম নিজেও এই বিষয়ে জড়িত। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য শায়েরের সাথে তার দেখা করা জরুরি। শায়ের ঠিক কতটা দো*ষী তা সে জানতে চায়।

শোভন মুসকানের কাছে এসে বলে,'আম্মু আমার ঘুম পেয়েছে।'

মুসকান শোভন কে নিয়ে তার ঘরে গেল। খুব যত্নে শোভন কে ঘুম

পাড়িয়ে দিয়ে সে নিজ ঘরে ফিরে এলো। কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে নাঈম। ঘুমায়নি সে। মুসকান তার পাশে গিয়ে বসে,'শোভন কে নাঈম?'

হঠাৎই কারো গলার স্বর শুনে চমকে তাকায় নাঈম। মুসকানের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। মুসকান আবার বলে,'পিকুলই কি আমাদের শোভন?'

নাঈম মাথা নাড়ল। শান্ত দৃষ্টি মুসকানের,’একটা মানুষ এতো ভালোবাসতে পারে তা আমার ভাবনায় কখনও আসেনি নাঈম!!! সোনালীর জীবন দূর্বিষহ ভাবে কেটেছে। রুপালির ও তাই কিন্ত পরী তার জীবনে সবচেয়ে সেরা মানুষ টাকে পেয়েছে। এতো নিখুঁত

ভালোবাসা আমি এই প্রথম দেখেছি।’

নাঈমের রাগ যেন কমে এলো,’শায়েরের কথা শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে তো?’

-‘এই সেই পুরুষ যে কথা দ্বারা নারীর মন ভাঙতে সক্ষম কিন্তু পরীর মন সে শুধু গড়েছে নতুন ভাবে। আমার দেখা করা উচিত তার

সাথে।’নাঈম বিপরীতে কথা বাড়ায় না। মুসকান সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। কখন সে শায়েরের সাথে দেখা করতে যাবে সেই আশায়। রাতটা যেন কয়েক যুগ মনে হচ্ছে তার কাছে। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটে সূর্যের আগমন ঘটলো ধরণীতে। তৈরি হয়ে সে শোভন কে সাথে

নিয়ে বের হলো। পথে শোভনকে স্কুলে দিয়ে আসবে।তারপর সাভার যাবে। নাঈম নিজেও চেম্বারে যাওয়ার জন্য বের হলো। মুসকান কে দেখে সে বলল,'সেহরান কে তোমার পরিচয় দিও। নাহলে কিন্তু তোমাকে সে কিছুই বলবে না।'

কথা শেষ করে নাঈম চলে গেল। মুসকান শোভন কে স্কুলে দিয়ে

সাভারের উদ্দেশ্য রওনা হলো। এই সকালেও রাস্তায় জ্যাম। কর্মজীবিরা নিজ নিজ কর্মে বেরিয়ে পড়েছে। রোদের তাপে ঘেমে একাকার হয়ে সাভার থানায় পৌঁছালো সে। একজন কনস্টেবল কে ডেকে জিজ্ঞেস করল শায়েরের কথা। অপেক্ষা করতে বলে কনস্টেবল চলে গেল ভেতরে। মুসকান বসে

রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর তার ডাক পড়ল। নিঃশব্দে সে অফিসারের কেবিনে প্রবেশ করল। মুসকান বুঝতে পারে অফিসারের নাম নুরুজ্জামান শেখ। নেইমপ্লেট দেখে বুঝল সে। অফিসার হাতের ফাইল টেবিলে রেখে মুসকানের দিকে তাকাল, ‘আপনি কেন একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর সাথে দেখা

করতে চান? কি হয় সে আপনার?’-‘আসলে আমি একটা আর্টিকেল লিখতে চাইছি যেটা নূরনগরের জমিদার বাড়ি নিয়ে। তো সেই বাড়ির সাথে সেহরানের সম্পর্ক আছে তাই আমি তার সাথে দেখা করতে চাইছি।’

-‘কিন্তু আমাদের তো অনুমতি নেই তার সাথে কারো দেখা করতে দেওয়ার।’

-‘আমি একজন সাংবাদিক তাই আপনাদের উচিত আমাকে আমার কাজটা করতে দেওয়া। নাহলে জানেনই তো নিউজ পেপারে ভুলভাল তথ্য ছাপাতে আমরা একদমই সময় নেই না। হতে পারে

কালকের ব্রেকিং নিউজ আপনাকে ঘিরেই হতে পারে।’

অফিসার হাসে। সত্যিই এই সাংবাদিকদের কোন তুলনা হয় না। বাড়িতে যদি চুলায় ভাত বসানো হয় তাহলে তারা সেটা খবরের কাগজে ফুটিয়ে প্লেটে পরিবেশন করে দেবে। তবে মুসকান তার পূর্ব পরিচিত। কোন এক ইন্টারভিউ তে দেখা

হয়েছিল তার। তাই তিনি বেশি কিছু বললেন না। মুসকান কে নিয়ে চলল যে সেলে শায়ের কে রাখা হয়েছে। চোখের চশমাটা ঠিক করে চারিদিক দেখতে দেখতে সে নুরুজ্জামানের পিছন পিছন গেল। চলতে চলতে সে জিজ্ঞেস করে,'ঠিক কি কারণে সেহরানের ফাঁ*সি হচ্ছে?'-'জমিদার আফতাব তার ভাই আখির,তাদের

কয়েক জন কর্মচারী এবং আফতাবের কন্যা রুপালিকে হ*ত্যা*র দায়ে তার ফাঁ*সি হচ্ছে।’

পা দুটো আপনা আপনিই থেমে যায় মুসকানের

মুসকান আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। মনের সব প্রশ্ন সে শায়েরের জন্য সাজাতে লাগল। সে আবার হাটতে লাগল। কয়েকটি গলি

পেরিয়ে নুরুজ্জামান একটি সেলের সামনে এসে দাঁড়াল। যেখানে আলো বাতাস কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। ভেপসা গন্ধ আসছে সেখানে। মুসকান ও সেখানেই দাঁড়াল। নুরুজ্জামান লোহার শিকে হাত রেখে শায়ের কে ডাকে,'সেহরান তোমার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে।'

কিন্তু সে কোন প্রকার সাড়া দিল না। নুরুজ্জামান কয়েক বার ডাকল কিন্তু শায়ের আসল না। দরজার তালা খোলা নিষিদ্ধ। তাই মুসকানকে সে বলে উঠল, ‘এর বেশি আমি কিছু করতে পারব না। শায়ের ইচ্ছা হলে আসবে নাহলে নাই।’-‘তাহলে আপনি চলে যান আমি সব সামলে নেব।’

নুরুজ্জামান থাকতে চাইলেন কিন্তু মুসকান তাতে বাঁধা দিল। অতঃপর তাকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিল। মুসকান অন্ধকারে শুধু শায়েরের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। সে নিম্নস্বরে বলল,'দেখুন আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি মুসকান,নাঈমের স্ত্রী। আমি পরীর ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই। দয়া করে

সামনে আসুন। আপনার সাথে জরুরী কথা আছে।’এবার ও আশানুরূপ কোন জবাব সে পেল না। হতাশ হয়ে মুসকান দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর লোহার শিকল টানার শব্দ পেল সে। দেখার চেষ্টা করলো ভেতরের দৃশ্য। শায়ের এগিয়ে এসে শিকে হাত রাখে। মুসকান অবাক চোখে শায়ের কে

দেখে। এটা সেই প্রেমিক পুরুষ যে তার ভালোবাসার জন্য পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। পুরো পৃথিবীকে পায়ে ঠেলে সে পরীর সামনে হাজির থাকে। যার কাছে পরীর সৌন্দর্যের থেকে পরীই ঊর্ধ্বে। মুসকান ভাবতেও পারেনি সে এই পুরুষ টির সামনে আসবে তাও এত তাড়াতাড়ি!! পরীর খাতায়

লেখা তার মালি সাহেবের বর্ণনা মনে পড়ল মুসকানের। সেই মায়াময় চেহারা। সুদীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট আঁখি যুগল যা সুরমা দ্বারা এখনও বেষ্টিত। মুসকান কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগে শায়ের কে। লোহার শিকল দিয়ে আবৃত দেহখানা ধুলো বালিতে পরিবেষ্টিত। চুলগুলো উসকো খুসকো। মুখ ভর্তি দাড়ি।

অদ্ভুত প্রাণীর মত দেখাচ্ছে তাকে। শায়ের মুসকান কে বলে,'ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলেই আপনাকে একটুখানি দর্শন দিলাম। তবে এখন আপনি আসতে পারেন।'

মুসকান বাঁধা দিয়ে বলে,'দয়া করে যাবেন না। আমি পরীর খাতায় ওর লেখা পড়েছি। সবকিছু সেখানে লেখা নেই। সম্পূর্ণটা আপনিই ভাল

বলতে পারবেন। আমি জানতে চাই মুখ আগুনে ঝলসানোর পর কি হয়েছিল পরীর সাথে!’

-‘পরীজানের খাতা আপনার কাছে?’মুসকান শায়েরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে, ‘সেহরান শায়ের!! পরীর মালি সাহেব!! কিন্তু সেহরানের পরীজান! সে কোথায়

এখন? তার মালি সাহেবের এই অবস্থায় সে আসবে না।’

মৃদু হাসে শায়ের। মুসকান সেই হাসির মর্মতা বুঝতে পারে না। এতক্ষণ চুপ থেকে শায়ের মুখ খোলে,’পরীজানের ব্যাপারে কতটুকু জানেন আপনি?’

-‘তাহলে সে কেন আপনার কাছে আসল না?’

-‘সে তো আমার কাছেই আছে। আমার অস্তিত্বে মিশে আছে সে। স্বয়ং আল্লাহ ও চায় না আমাকে পরীজানের থেকে আলাদা করতে।’

-‘দুনিয়াতেই তো আপনারা আলাদা রয়েছেন। এখন তো আপনার কাছে পরী নেই।’

আবারও হাসে শায়ের। তবে তার এবারের হাসির প্রগাঢ়তা অনেক। সে বলে,’হাসছেন যে?’

-‘আমরা দুনিয়াতে আলাদা নই,আমাদের দুনিয়াই আলাদা।’

নড়ে দাঁড়ায় মুসকান। পরী ঠিকই বলেছে, এই পুরুষটির সাথে কথায় হার মানতে হবে। মানুষ কে কথার

জালে আটকাতে পারে সে।-‘কেমন দুনিয়াতে আছেন আপনারা?’

-‘একটা ছোট্ট দুনিয়া। যেখানে নেই কোন বিশাল সাম্রাজ্য নেই কোন হিং*স্র*তা। যেখানে হবে না কোন যু*দ্ধ র*ক্তা*র*ক্তি। থাকবে শুধু সেহরান আর পরীজানের ভালোবাসার সংসার। ছোট্ট একটা কুটির থাকবে যেখানে দিন শেষে

ফিরে পরীজানের দর্শন পাব আমি। একটা পবিত্র মুখের দর্শনের আশায় আমি যে সবসময় ছটফট করি। আমরা এখন যে দুনিয়ায় বসবাস করছি তা এখন বারবার অপবিত্র হচ্ছে। সামনে আরও হবে। শুধু আমার পরীজানের দুনিয়া পবিত্র। তাহলে বুঝুন আমাদের দুনিয়া কেমন আলাদা?'অন্ধকার কুঠুরির

সামনে মেঝেতে বসে আছে মুসকান। তার দৃষ্টি শেকলে বন্দি পুরুষটির দিকে। ধুলো বালি ওর গায়ে মাখছে তবুও তার হুস নেই। সে শায়েরের দিকে বিষ্মিত নয়নে তাকিয়ে আছে। শায়েরের মুখটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না আদৌ সে সব বলবে কি না? মুসকান নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আপনি পরীকে খুব

ভালোবাসেন তাই না? সেই ভালোবাসার সাথে কি এমন হয়েছিল? আপনি কি খু*ন গুলো সত্যিই করেছেন?’

-‘একটা আওয়াজ,যা আমার কানে সবসময় বাজে। একটা চেহারা যা আমার চোখে সবসময় ভাসে। একটা সময় ছিল যখন সেই মানুষ টা আমার খুব কাছে ছিল। এখনও

আছে। আমি চোখ বন্ধ করলেই তাকে দেখতে পাই।'

-'দয়া করে বলুন না অতীতের সেই ঘটনা? আমি আপনাদের ভালোবাসার স্বাক্ষী হিসেবে থাকতে চাই।'

-'আমি আপনাকে বলব সব। কিন্তু একটা কথা আপনাকে দিতে হবে। কাউকে কোনদিন সত্যিটা বলতে

পারবেন না আপনি।'-'কথা দিলাম আমি কাউকে কিছু বলব না। আপনি বলুন।'

শায়ের দৃষ্টি মেলে সামনের রঙ ওঠা কালচে দেয়ালের দিকে। কত যত্নহীনে এই দেয়াল টা এরকম হয়েছে তা বেশ বুঝেছে সে। তার অতীতের মতো এই দেয়ালের

অতীত ও যে ভাল কাটেনি। সে তার রঙহীন অতীতে ডুব দিল,

বৈঠকে হন্তদন্ত হয়ে আসল সিরাজ। আফতাবের জরুরি তলবে তার আসতে হলো। জমিদার বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ মনে করে না সে। এখানে থাকলে নওশাদের মতো সেও গায়েব হয়ে যেতে পারে। কেননা এখন পর্যন্ত তার কোন খবর

পাওয়া যায়নি নওশাদের। প্রথমত সবাই ভেবেছিল পরীর ভয়ে সে জমিদার বাড়ি ত্যাগ করেছে। কিন্তু যখন সবাই জানতে পারে যে নওশাদ নিজ বাড়িতেও যায়নি তখন সবার সন্দেহ বাড়ে। কাজটা কি পরী করেছে? তার যথাযথ কোন প্রমাণ পায়নি কেউই। শায়ের যেহেতু রাতে পরীর সাথেই ছিল সেহেতু পরীর

দিকে আঙুল তোলা অসম্ভব। শায়ের বাদেই ওরা গুরুত্বপূর্ণ সভা বসিয়েছে। শায়ের কে কিভাবে হ*ত্যা করা যায় সেই পরিকল্পনার করছে সবাই। সিরাজ গম্ভীর গলায় আফতাব কে বলে,'এই মুহূর্তে শায়ের কে মা*রা কি ঠিক হবে? আমাদের মুখোশ খোলার হা*তিয়ার কিন্ত একমাত্র শায়েরের কাছে

আছে। ও ম*রে গেলেও কিন্তু আমাদের জেলে যেতে হবে! সেই ব্যবস্থা কিন্তু শায়ের করেই রেখেছে।'আফতাব জবাব দিলো না বিধায় আখির বলে উঠল, 'পরের টা পরে দেখা যাবে। শায়ের বেঁচে থাকলে আমরা পরীর হাতে ম*র*ব। ভাই কথা বলেন আপনি।'

-‘তা ঠিক। পরী এখন হিং*স্র হয়ে উঠেছে। যাকে সামনে পাবে তাকেই থাবা মা*রবে।’

সিরাজ বলে উঠল,’আর রুপালি?’

-‘রুপালি আবার কি? সে পরীর মতো আমাদের মা*রতে আসবে না। মায়েদের সাথে ও বেঁচে থাকুক। কিন্ত যেদিন দেখব রুপালিও পরীর মতো সেদিন সেও শেষ হবে। ওরা

মেয়ে হয়ে যদি বাপকে মা*রতে চায় তাহলে আমিও ওদের অস্তিত্ব রাখব না।’

-‘জুম্মানকে কি করবেন ভাই?’-‘ও থাকুক বাগান বাড়িতে। যেদিন ও পুরোপুরি সব কাজ শিখে যাবে তখন নাহয় আসবে।’

-‘তাহলে আজকে শায়ের কে বাগান বাড়িতে নিয়ে যাই? তারপর নাহয় মে*রে ফেললাম।’

-‘সিরাজ,তুমি শায়ের কে নিয়ে আজ রাতেই বাগান বাড়িতে যাবে। তারপর আমরা যাব।’

সভা ওখানেই শেষ হলো। তবে শায়ের জানতেই পারল না যে ওর বিরুদ্ধে কত বড় ষ*ড়*য*ন্ত্র করা

হয়েছে। তবে সব কথা শেফালির কানে চলে গেছে।পরীর আদেশে শেফালি সর্বদা বৈঠকে নজর রাখে। তাই সে খবরটা পরীকে জানিয়ে দিল। খা*রা*প স্বামীকে বাঁচানোর জন্য পরী মরিয়া হয়ে উঠল। শেফালি তা বুঝতে পেরে বলল,'আপনি শায়ের ভাইরে অনেক ভালোবাসেন তাই না আপা? হেয়

খা*রাপ কাম করলেও কিন্ত আপনেরে অনেক ভালোবাসে। হের লাইগাই আপনের এতো টান।'

-'খু*ন করে সে পাপ করেছে শেফালি কিন্ত এই পাপের ক্ষমা আল্লাহ করবেন যদি সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ বলেছেন তুমি যদি বিচার করো তাহলে আল্লাহ তার বিচার করবে না।

এজন্য আমি তাকে শা*স্তি দেব না। আমি চাই তার বিচার আল্লাহ করুক। আমি শুধু তাকে ভালোবাসব। সেই ভালোবাসায় সে নিজেকে সুধরাবে।’

চলে যাওয়ার আগে পরী আবারও পেছন ফিরে বলে,’আজকেও তোকে সব কাজ করতে হবে। পারবি তো?’

শেফালি মাথা নাড়ল। সে বুঝলো আজকে ভ*য়ানক কিছু হতে চলেছে। পরী শায়ের কে বাঁচানোর জন্য কিছু একটা তো করবেই। কিন্ত তারপর পরীর কি হবে তা ভেবে ভয়ে আছে শেফালি।পরী রুপালি ঘরে গেল। পিকুল কে নিয়ে বসে আছে সে। কালবিলম্ব না করেই পরী

বলে,'সিরাজ কে মা*রবে না আপা? আজকে সে সময় এসে গেছে।' রুপালির চেহারায় ভয় দেখতে পেল পরী। নওশাদ কে মা*রা*র সময় ভয় পেয়েছিল। এখনও সেই ভয়ের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। পরী রুপালির মনে রাগ জন্মানোর জন্য বলে,'এতো সহজে তাকে ছেড়ে দেবে? যে তোমাকে মিথ্যা

ভালোবাসার জালে আটকিয়েছিল! যে তোমাকে শশীলের হাতে তুলে দিয়েছিল। ভাবতে পারো সেদিন আমি না থাকলে তোমার কি হতো? কবিরকে তো আমি শেষ করেই দিয়েছি। এখন সিরাজ কে তুমি ছেড়ে দিবে?’রুপালির মনে পড়ে গেল জঘন্য অতীতের কথা। পরী না থাকলে সেদিন শশীল তার ই*জ্জ*ত

হরন করতো। বেঁচে থাকতে পারত না সে। আর সিরাজ ওকে ধোঁকা দিয়েছে একথা মাথায় আসতেই রাগে জ্বলে ওঠে সে। র*ক্ত টগবগিয়ে ফুটতে থাকে সারা শরীরে। এতো কিছুর পর সিরাজ কে ছাড়া যাবে না। কিছুতেই না। পরীর দিকে তাকিয়ে সে ইশারা করল। পরী মুচকি হেসে চলে গেল।

সূর্য ডুবতেই সকল দিক থেকে সবাই তৈরি হতে লাগল। ওদিকে আফতাব আখির আর সিরাজ পরিকল্পনা করছে আর এইদিকে পরী। পরী শায়ের কে তলব করে এবং শায়ের সাথে সাথেই চলে আসে।

তবে এবার পরী শায়ের কে সোনালীর ঘরে নিয়ে যায়। শায়ের

পুরো ঘরে চোখ বুলিয়ে নিলো। পরী কাঠের চেয়ার টেনে শায়ের কে বসতে দিলো। বসলো শায়ের।-'এই ঘরেই নওশাদ কে মেরেছি আমি!'

অবাক হলো না শায়ের,'আপনি নওশাদ কে মেরেছেন এটা আমি সেই রাতেই টের পেয়েছি।'

-‘কিভাবে টের পেলেন? আমি তো সাবধানে ঠান্ডা মাথায় ওকে মারলাম?’

-‘র*ক্তে*র গন্ধের সাথে যে আমি পরিচিত পরীজান।

তাছাড়া সকালে শেফালি আর কুসুম কে উঠোন লেপতে দেখেই আমার সন্দেহ সত্যি হয়। ওরা রক্তের দাগ ঢাকতেই এটা করেছে। আপনি

আমার চোখে কিছুই ফাঁকি দিতে পারবেন না।’

পরী হেসে শায়েরের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে একটা দড়ি নিয়ে শায়েরের হাত চেয়ারের সাথে বাঁধতে বাঁধতে বলতে লাগল,’প্রথমে এইভাবেই নওশাদ কে চেয়ারের সাথে বেঁধেছিলাম। তারপর ওর মুখের ভেতর গামছা ঢুকিয়ে ছিলাম

যাতে ও শব্দ না করতে পারে। তারপর ওর দুটো আঙুল কে*টে*ছিলাম।'

-'তারপর কি করলেন?'

পরী এবার শায়েরের পা দুটো বাঁধতে লাগল,'তারপর ওর বুকে ছু*রি চালিয়ে ছিলাম তারপর উঠোনের কোণে জীবিত পুঁতে দিয়েছি। আর তারপর

আপনাকে অন্দরে ডেকেছি।’-‘আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তা এখন আমাকেও সেভাবে মারবেন নাকি?’

শায়েরের কথা শুনে হাসল পরী। গামছা টা হাতে নিয়ে বলল,’নাহ,আপনি এখানে চুপটি করে বসে থাকবেন আর আমি

বাগান বাড়িতে গিয়ে সিরাজ কে মে*রে চলে আসব।’

কথাটা শোনা মাত্রই শায়েরের চেহারার ভাবভঙ্গি বদলে গেল। সে বিনয়ের স্বরে বলে,’ওখানে যাবেন না পরীজান। আপনার বিপদ হবে। আমার হাত খুলে দিন। দয়া করে যাবেন না।’

পরী শায়ের কে আর কথা বলতে দিলো না। গামছা দিয়ে ওর মুখ বেঁধে দিলো। মাথা নেড়ে শায়ের পরীকে যেতে নিষেধ করে বারবার কিন্তু পরী সেসবে পাত্তা না দিয়ে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে চলে যায়। শায়ের ছটফট করছে ছাড়া পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। শক্ত করেই বেঁধেছে পরী।

মুখ বাঁধা থাকায় কাউকে ডাকতেও পারছে না। নিজ কক্ষে গিয়ে পূর্বের ন্যায় পোশাক পড়ে নিল পরী। মুখটাও কাপড় দিয়ে ঢেকে নিল। রুপালিও পরীর মতো পোশাকে নিজেকে তৈরি করেছে। পরী কুসুমের হাতে ওর ত*লো*য়া*র দিয়ে অন্দরে ঢোকার দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। যদি কেউ

জবরদস্তি করে ভেতরে আসতে চায় তাকে যেন আঘাত করে। কুসুম জানে সে এটা করতে পারবে না তবুও সাহস করে দাঁড়িয়ে রইল। রিতিমত কাঁপতে লাগল সে।রুপালি আর পরী ছাদে চলে গেল। আম গাছ বেয়ে দুজনেই মাটিতে নামল। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল বাগান বাড়ির

উদ্দেশ্যে। বাগান বাড়িতে চারজন রক্ষি আছে শুধু। আর সবগুলো জমিদার বাড়ি পাহারা দেয়। কারণটা অবশ্য পরী। কখন কি হয়ে যায় সেজন্য আফতাব এতো পাহারার ব্যবস্থা করেছে।

অন্ধকারের পথ ধরে জমিদার বাড়ির দিকে আসছে সিরাজ। পথে হুট করেই শেফালি এসে দাঁড়াল।

সিরাজ চমকে গেল শেফালিকে দেখে। সে বলে উঠল,’তুই এতো রাতে এখানে কি করস?’

-‘একখান কথার আপনেরে কইতে আইছি। নওশাদ রে পরী আপার খু*ন করছে। আমি নিজের চোখে দেখছি।’

-‘একথা আগে বললি না কেন? আর এখানে এসেছিস কেন তুই?’

-‘পরী আপার ডরে কই নাই। বড় কর্তা আপনারে বাগান বাড়ি যাইতে কইছে। শায়ের ভাইরে নিয়া হেরা বাগান বাড়িতে চইলা গেছে। তাই আমারে পাঠাইছে আপনেরে খবর দিতে। আপনে অহনই যান।’

সিরাজ কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে শেফালির দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল,’আমি জানি না আপনেরে ক্যান

যাইতে কইছে। আমি গেলাম।'দ্রুতপদে শেফালি প্রস্থান করল। সিরাজ ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল ওর আসতে দেরি বিধায় হয়তো শায়ের কে নিয়ে ওনারা চলে গেছে। তাই সিরাজ বাগান বাড়ির পথ ধরে। কিন্ত আফতাব আর আখির যে এখনও সিরাজের অপেক্ষা করছে তা সিরাজ

জানতেই পারল না। বাগান বাড়ির বাইরে দুজন পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় দূরের ঝোপের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে আসে। কিন্তু হচ্ছে তা দেখার জন্য একজন সেখানে যায়। সাথে সাথেই তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল পরী আর রুপালি। মাথায় আঘাত করে জ্ঞানহীন করে দেয়। এবং দাড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়। দ্বিতীয়

জন প্রথম জনের খোঁজে যেতে তাকেও একই অবস্থা করে ফেলে রাখে। তারপর দুজনে একসাথে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। পরী সাবধানে পা ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।সেই ঘরটাতে যায় যেখানে পরীকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে পরী অবাক হয়। কেননা সেখানে জুম্মান বসা। মাথা

নিচু করে জুম্মান বসে আছে। একজন রক্ষি ওকে খাবার খাওয়ার জন্য বলছে কিন্ত সে খাচ্ছে না। কাঁদছে আর বলছে সে মায়ের কাছে যাবে। বছর তেরোর ছেলেটা আর কি বুঝবে? পরী আর রাগ ধরে রাখতেই পারে না হনহন করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পরীকে দেখে চমকে গেল লোকটা তবে চিনতে

পারে না। তবে জুম্মান ঠিকই চিনে ফেলে পরীকে। সে বলে উঠল,’পরী আপা! আমারে এইহান থাইকা নিয়া যাও। আমি থাকমু না।’লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো লোকটা পরীর নাম শুনে। কিন্ত পরী কায়দা করে তার লাঠি কেড়ে নিল এবং তাকেই আঘাত করে বসে। কিন্ত পরমুহূর্তে পেছন থেকে কেউ পরীকে লাঠি

দ্বারা আঘাত করতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। তাকিয়ে দেখে রক্ষি এসে পড়েছে। সে আবার পরীকে মারতে যাওয়ার আগেই তার রক্ত ছিটকে এসে পরীর মুখে পড়ে। কারণ রুপালি তাকে আঘাত করে বসেছে। বড় একটা ছুরি লোকটার পিঠে গেঁথে দিয়েছে। লোকটা সাথেই মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

অন্যজন ভয়ে গুটিয়ে যায়। বুদ্ধি করে ওরা চারজন কে কাবু করে ফেলেছে। এখন শুধু সিরাজের আসার পালা।পরী দ্রুত পায়ে জুম্মানের কাছে গেল। এসব মা*রা*মা*রি দেখলে ভয় পায় জুম্মান। আর সেই ছেলেটাকে দিয়েই খারাপ কাজ করাতে চায়!! এটা ভেবে আরও রাগ হচ্ছে পরীর।

রুপালি দা হাতে বেঁচে যাওয়া রক্ষির দিকে এগোয়। লোকটা ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তবে রুপালি তাকে বাঁধল দড়ি দিয়ে।

এবার জুম্মান কে ওরা বাড়িতে পাঠাবে। সিরাজ এখুনি চলে আসবে। এখন জুম্মান কে বাইরে পাঠানোটা ঠিক হবে না। পরী জুম্মান কে উদ্দেশ্য করে বলে,’এখুনি সিরাজ

এখানে আসবে। তুই লুকিয়ে বাড়িতে যাবি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকবি না। গাছ বেয়ে ছাদে উঠবি তার পর ঘরে যাবি। সবার আগে সোনা আপার ঘরে যাবি। সেখানে তোর শায়ের ভাইকে আমি বেঁধে রেখেছি। তুই আগে তার বাঁধন খুলে দিবি। আমার শ্বশুরবাড়ির পথ জানা আছে তোর? রাতের বেলা যেতে

পারবি তো?’কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না জুম্মান। তবে এটুকু বুঝতে পারছে যে পরীর কথামত ওকে কাজ করতে হবে। তাই সে মাথার নাড়ল। পরী বলল,’শেফালিকে বলবি ও যেন পিকুলকে নিয়ে বাইরে তোর কাছে দিয়ে যায়। তারপর পিকুল কে নিয়ে আমার শ্বশুর

বাড়িতে চলে যাবি। আমি পরে তোকে চিঠি পাঠাব কেমন?’

জুম্মান কাঁদছে আর মাথা নাড়ছে। সে বলে,’আব্বা একটুও ভাল না আপা। আম্মারে খুব মা*রে। ওইদিন আমারে কইলো আমি যদি মিথ্যা কইয়া তোমারে বাড়িতে না আনি তাইলে আম্মারে মা*ইরা ফালাইব।’এরেই মধ্যে সেখানে

সিরাজের আগমন ঘটল। পরী আশেপাশে রুপালিকে দেখলো না। জুম্মান দৌড়ে পালিয়ে গেল। সিরাজের বুঝতে বাকি রইল না কিছুই। লাঠি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল পরী। সিরাজ বলল,'তুমি এখানে?'

-'বাহ চিন্তা শক্তি দারুণ তোমার। আমাকে চিনে ফেললে! তবে আজ

পরী হয়ে নয় তোমার জম হয়ে এসেছি।’

পরনের পাঞ্জাবির হাতাটা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে এলো সে। ঠোঁটের কোণে তার ঝুলে আছে হাসি। আশেপাশের সবকিছুই সে ভাল করে দেখে নিল। আসার সময় রক্ষিদের না দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যই সে

ভেতরে আসে। ঘরের এক কোণে রক্ষিকে বাঁধা দেখে সেদিকে পা বাড়াল সে। কিন্ত মাঝপথে লাঠি উচিয়ে পরী তাকে থামিয়ে দেয়,'ভুলেও ওদিকে পা রেখো না। আগে নিজের দিক ভাবো।'সিরাজ আবার হাসে,'তুমি আমার সাথে লড়াই করতে এসেছো? পরী? এটা হাস্যকর পরী। বাঁচতে চাও তো

ফিরে যাও। এই মুহূর্তে তোমাকে মা*রার কোন ইচ্ছা আমার নেই। তোমাকে ধীরে সুস্থে মা*রব। যাও ফিরে যাও।'

নিজের কথা শেষ করে সিরাজ আবারও সামনে এগিয়ে চলল। কিন্ত এবার সে প্রতিহত হলো পরীর লাঠি দ্বারা। সিরাজের পিঠে জোরে আ*ঘাত করেছে পরী। রাগন্বিত হয়ে

ঘুরে দাঁড়াল সিরাজ। মুখে বিশ্রী ভাষা তুলে এগিয়ে গেল পরীর দিকে। সিরাজের সাথে হাতাহাতি শুরু হলো পরীর। সিরাজ খালি হাতে আর পরী লাঠি হাতে। সিরাজ বুঝে গেল এভাবে খালি হাতে পরীর সাথে লড়াই করা যাবে না। তাই সে ফাঁক বুঝে কক্ষ ত্যাগ করে দৌড়ে গেল অন্য একটা কক্ষে যেখানে

ধারালো অ*স্ত্র রাখা আছে। পরী নিজেও ছুটছে সিরাজের পিছু পিছু। সিরাজ দৌড়ে একটা ঘরে ঢোকে। তার জানা মতে এই ঘরে অ*স্ত্র আছে। এবং সে পেয়েও গেল। পরীকে উদ্দেশ্য করে বলল,’এখনও সময় আছে পরী তুমি চলে যাও। নাহলে কঠিন মৃ*ত্যু দেব আমি তোমায়।’

-‘তুমি ভুল সিরাজ। আজ সে মৃ*ত্যু আমি তোমাকে দেব। আমি জানি মৃ*ত্যুর দুয়ারের কাছে আমি পৌঁছে গেছি। আমি ভয় পাই না মৃ*ত্যুকে।’সিরাজ বুঝলো আজ লড়াই করতেই হবে তাকে। তাই সে এগিয়ে এসে অস্ত্র চালায় পরীর উপর। পরী নিজেকে রক্ষা করে ঘুরে গিয়ে আরেকটা অ*স্ত্র হাতে

নেয়। কিছুক্ষণ দুজনে অ*স্ত্র যুদ্ধ করার পর দুজনেই একটু আধটু জখম হয়। একটা সময় পরীর হাতের অ*স্ত্রখানা ছিটকে দূরে পড়ে গেল। একজন পুরুষের সাথে তো পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সেখানে সিরাজ শক্তিশালী পুরুষের মধ্যে একজন। তারমধ্যে রুপালি এখনও আসছে না। পরী তাও থামে না।

কক্ষের দেয়ালের সাথে মশাল ঝুলানো ছিল। তাতে আগুন জ্বলছে। পরী দ্রুত পদে আগুনের মশাল টা হাতে নিলো। সিরাজের দিকে উঁচিয়ে ধরল। এভাবে কয়েকবার নিজেকে রক্ষা করে পরী। কিন্ত সিরাজ মশাল সহ পরীর হাত ধরে ফেলে। অন্যহাত দিয়ে অ*স্ত্র ধরে পরীর

গলায়। পরী নড়াচড়া বন্ধ করে কিছু একটা ভাবতে থাকে।

সিরাজ বলে,'রূপের দেমাগ তোমার তাই না? এর জন্যই তো শায়ের এতো পাগল। তবে আজকের পর সেই পাগলামি তুমি দেখবে না। রূপ না থাকলে শায়ের তো তোমার ধারে কাছেও আসবে না।'সিরাজ মশাল টা চেপে ধরে পরীর মুখের উপর। অগ্নি

লাভায় মুখটা ঘুরিয়ে নেয় পরী। মুখে কাপড় বাঁধা ছিল,আগুন লেগে গেল কাপড়ে। পরী সাথে সাথেই লাথি মারে সিরাজের পশ্চাৎ এ। এবং ছিটকে দূরে সরে যায়। পরী হাত দিয়ে বৃথা চেষ্টা চালায় আগুন নেভানোর। কিন্ত পারে না। আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে মুখের চারিদিক এবং গলাতে। পরী কাপড়টা খুলতে চাইল

কিন্তু ওর হাতে জখম হয়েছে তাই ব্যাথায় ঠিকমত খুলতেও পারছে না। কাপড় পুড়ে পুড়ে পরীর মুখের সাথে লেগে গেল। ভিশন জ্বালাপোড়া হতে লাগল পরীর।সিরাজ আবার উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল পরীর দিকে। পরমুহূর্তে ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। পেছন থেকে একটা ত*লো*য়া*র এসে ভেদ করে

সিরাজের বুক। পেছন ফিরতে পারে না সিরাজ। শুধু নিজের বুক ভেদ করে বের হওয়া ত*লো*য়া*রে*র র*ক্ত*মাখা মাথাটার দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেশ। রক্তের স্রোত বইতে লাগল সিরাজের বুক থেকে। রুপালি এক টানে বের করে নিল ত*লো*য়া*র খানা। তারপর দ্বিতীয়বারের মতো আবারও একই

স্থানে আঘাত করে। সিরাজ আর শরীরের ভর ধরে রাখতে পারে না। লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। রুপালিকে দেখে ওর চোখজোড়া শান্ত হয়ে যায়। মুখের কাপড়টা সরিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। সিরাজের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বলে,'পেছন থেকে আঘাত করার পদ্ধতি আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছি সিরাজ। দেখো

আজ কাজে লেগে গেল।’কিন্তু রুপালি আর কিছু বলতে পারে না সিরাজ কে। পরীর আর্তনাদে সেদিকে ফিরে তাকায়। আগুন পরীর শরীরের একটু একটু করে ছড়াচ্ছে। রুপালি দৌড়ে পরীর কাছে গেল। নিজের মাথায় বাঁধা কাপড়টা খুলে সেটা দিয়ে চেপে ধরে পরীর মুখ। ঠিক তখনই শায়েরের আগমন ঘটে

সেখানে। প্রিয়তমার এরকম অবস্থা দেখে দৌড়ে গেল সে। রুপালির হাত থেকে কেড়ে নিল কাপড়টা। নিজেই নেভালো আগুন। কিন্তু ততক্ষণে পরীর মুখের অর্ধেক ঝলসে গেছে আগুনের তাপে। শায়ের ছুটে গেল বাইরে। খানিক বাদে মাটির কলস ভর্তি পানি এনে ঢেলে দিল পরীর মুখে। মুখটা

জ্বলছে খুব। পরী শক্ত মুখে বসে আছে। এখন মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না ওর। ইতিমধ্যে বাইরে হইচই শোনা যাচ্ছে। শায়ের আতঙ্কিত হয়ে বলল,’সবাই চলে এসেছে। এখান থেকে পালাতে হবে। চলুন তাড়াতাড়ি।’পরী উঠতে পারলো না। শায়ের বিলম্ব না করে কোলে তুলে নেয় পরীকে।

রুপালিকে সাথে করে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয় ওরা। আফতাব সহ বাকি সবাই ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছে। সিরাজ ই তাদের খবর পাঠিয়েছিল। আসার পথে রক্ষিদের দেখতে না পেয়ে সিরাজের চতুর মন বুঝতে পারে এখানে কিছু হয়েছে। আশেপাশে খুঁজে সেই রক্ষিদের বাঁধা অবস্থায়

দেখতে পায়। একজনের জ্ঞান ছিল না। আরেকজনের বাঁধন খুলে তাকে জমিদার বাড়িতে খবর দিতে পাঠায়। এজন্যই আফতাব তার দলসহ চলে এসেছে। সিরাজের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। র*ক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। কে মা*র*ল সিরাজ কে? অন্য কক্ষে বেঁধে রাখা সেই রক্ষিকেও রক্তাক্ত

অবস্থায় দেখতে পায় সবাই। সেও মৃ*ত।

আফতাবের সন্দেহ পুরোটাই পরীর উপর গিয়ে পড়ে। সে চারিদিকে লোক পাঠায়। পরী নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে।কিন্তু ততক্ষণে শায়ের পরীকে নিয়ে চলে যায়। পরীর শরীরের শক্তি খুবই কম। শায়ের কি করবে ভেবে পাচ্ছে

না। রুপালি বলে উঠল,’পরীকে এখুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওর কষ্ট হচ্ছে।’

শায়ের রুপালিকে বলে উঠল,’আপনি বাড়িতে ফিরে যান। আপনার বাবা আপনাদের খোঁজ করতে বাড়িতে যাবে। বাড়ির কেউই আমাদের খবর জানে না। আপনি থাকলে সব সহজ হবে।’

-‘কিন্তু পরী?’

শায়ের খানিকটা ধমকে ওঠে বলে,’আপনি যান। পরীজান কে আমি সামলে নিব।’

রুপালি দেরি করে না। দৌড়ে চলে গেল জমিদার বাড়ির রাস্তা ধরে।

শায়ের উপায়ন্তর খুঁজতে লাগে। এই মুহূর্তে পরীকে শহরের ভাল কোন ডাক্তার দেখাতে হবে। এই রাতের

বেলা গাড়ি পাওয়া মুশকিল। কিন্তু পরীকে তো নিতেই হবে। রাতের বেলাতে গাড়িওয়ালা চাচাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে শহরের পথে রওনা দিলো সে। সারারাস্তা পরীকে সে বুকে চেপে ধরে রাখে।-'আমার কথা না শুনে কেন গেলেন আপনি সেখানে পরীজান? আমি যে এখন

আপনার কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।’

পরী ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্ত পোড়া স্থানে টান ধরায় ব্যথা অনুভব করতেই থেমে যায় সে।শায়ের বলে,’আপনি কথা বলবেন না পরীজান। দয়া করে চুপ থাকুন। চিন্তা করবেন না। আপনি

শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবেন। আমি থাকতে আপনার কিছুই হবে না।'

গাড়ি থেকে নেমে নৌকার খোঁজ করে শায়ের। পেয়েও যায়। শহরে যেতে হলে পদ্মা পাড়ি দিতে হবে। এখন কোন ট্রলার পাওয়া যাবে না। জেলে দের নৌকা দেখা যাচ্ছে শুধু। তাদেরই এক নৌকায় করে পরীকে নিয়ে রওনা হয় শায়ের। পদ্মা পার

হওয়া চারটেখানি কথা না। বৈঠা বেয়ে যেতে অনেক সময়ই লেগে গেল। এতো রাতে তো আর কোন ডাক্তারের দোকান খোলা থাকবে না। সরকারি হাসপাতাল গুলোও মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে শায়ের নিজেকে ভিশন অসহায় লাগছে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন সে কখনোই হয়নি। একটা

হাসপাতালের সামন গিয়ে সেটা খোলা পেলো।অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। দুজন মহিলা ডাক্তার পরীর চিকিৎসা শুরু করে। আর শায়ের চিন্তিত হয়ে বাইরে বসে থাকে। ঘেমে একাকার হয়ে গেছে শায়ের। এই মধ্যরাতে এতকিছুর সাথে যুদ্ধ করে এতদূর এসেছে সে। তবুও শায়ের পরীকে বাঁচাতে

পেরেছে এটাই অনেক তার কাছে। তার করা পা*পে*র শাস্তি পরী পাচ্ছে। এজন্য শায়েরের অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে। সিরাজ কে জীবিত পেলে শায়ের ওর যে অবস্থা করতো তা সে নিজেও ভাবতে পারছে না। মাথা নিচু করে সে বসে আছে। হঠাৎই চোখের সামনে একজোড়া পা থামতেই চোখ তুলে তাকায় শায়ের।

মানুষ টা তার অতি পরিচিত। যদিও তার সাথে অল্প দিনের জন্য পরিচয় হয়েছিল তবুও মানুষ টা তো পরিচিত। শায়ের দাঁড়িয়ে পড়ল।

নাঈম বিষ্মিত কণ্ঠে বলে উঠল,'আপনি এখানে? এতো রাতে?'

এতক্ষণ যে শায়ের চোখের পানি ফেলছিল তা শায়েরের চোখ দেখেই

নাঈম বুঝতে পেরেছে। ভেজা ভেজা গলায় শায়ের বলল,’পরীজান!!!’ বাকি কথা গলাতেই আটকে গেল ওর। তবে নাঈম বুঝে নিল তার উল্টো। সে ভেবেছিল পরী বোধহয় মা হতে চলেছে সেজন্যই শায়ের তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।-‘তো সেদিন নাঈমের সাথে আপনার আর পরীর আবার দেখা

হয়! কিন্তু আপনি যে বললেন পিকুল কে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল পরী। তাহলে পিকুল নাঈমের কাছে কীভাবে আসল?’

শায়ের এতক্ষণ কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গিয়েছিল বিধায় একটু দম নিচ্ছে। হঠাৎই মুসকানের প্রশ্নে চোখ তুলে তাকায় সে। ঠোঁট জোড়া প্রশ্বস্ত করে হাসে শায়ের। অদ্ভুত লাগে

শায়েরের এই হাসি ওর কাছে। মনে হচ্ছে এই চাহনি আর এই হাসি তার পরিচিত। কিন্ত মুসকান ঠিক মনে করতে পারছে না যে এর আগে সে শায়ের কে কোথাও দেখেছে কি না! মুসকান কে চিন্তিত দেখে শায়ের হেসে বলে,'এই চিন্তা শক্তি নিয়ে আপনি সাংবাদিক হয়েছেন? আমি তো ভাবতেই পারছি না।'কথা শেষ

করতে করতেই আবার হাসে শায়ের। মুসকানের ভিশন অস্বস্তি লাগছে। এই হাসিটা ওর চেনা কিন্তু মনে পড়ছে না সে কোথায় দেখেছে? কিছুক্ষণ গভীর ভাবে ভাবার পর ওর মনে পড়ল শোভনের কথা। কিন্তু কেন মনে এলো তা সে বুঝতে পারছে না। শোভনের চোখদুটো যেন একদম শায়েরের মতো। এমনকি

হাসিটাও। কিন্তু শোভন তো রুপালির ছেলে। নাঈম ই তো ওকে বলেছে। তাহলে শায়েরের সাথে শোভনের এতো কেন মিল? মাথা ঘোরাচ্ছে মুসকানের। এ কোন গোলক ধাঁধায় আটকে গেল সে। তবে সে নিশ্চিত শায়ের এই বিষয়ে মুখ খুলবে না। শায়ের আগের মতোই হাসছে। মুসকান ভেবে

পাচ্ছে না এরকম একটা সময়ে আদৌ কোন লোক হাসতে পারে!! দুদিন পর তার ফাঁ*সি। পরীর মতো সেও হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করতে চাইছে!!মুসকানের মনে পড়ে গেল পিকুলের কথা। হিসেব অনুযায়ী পিকুলের জন্ম ১৯৯৯ তে। তাহলে পিকুলের বর্তমান বয়স দশ বছর। কিন্তু শোভনের বয়স মাত্র

ছয়। তার মানে শোভন পিকুল নয়। সে অন্য কেউ। তাহলে শোভন শায়ের পরীর সন্তান!!

এসব কথা মাথায় আসতেই চট করে দাঁড়িয়ে পড়ে মুসকান। শায়েরের সাথে আর কোন কথা না বলে দৌড়ে থানা থেকে বের হয়ে যায়।দিনের মধ্যপ্রহরে সূর্য মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে কিরণ দেয়।

জ্যামের মধ্যে রিকশায় বসে ঘামছে মুসকান। বারবার রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছে সে। অর্ধেক রাস্তা এসে সে জ্যামে আটকে গেছে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে সে। তাই ভাড়া মিটিয়ে ওখানেই নেমে পড়ে এবং ঠিক করে বাকি রাস্তাটুকু সে হেঁটেই পাড়ি দেবে। হাটতে হাটতে শোভনের

স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। কিন্তু স্কুল এখনও ছুটি হয়নি। ধৈর্যহীনা নারীটি দৌড়ে শোভনের ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ল। তখন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছিল। মুসকান কে অনুমতি ব্যতীত ক্লাসে ঢুকতে দেখে তিনি অবাক হন। কিন্তু মা'কে দেখে ছোট্ট শোভনের ঠোঁটে হাসি দেখা দিলো। মুসকান যেন স্পষ্ট শায়ের কে

দেখছে শোভনে মধ্যে। অপলক চোখে শোভনের দিকে এগোতে থাকে সে। তারপর শোভনের ব্যাগ পত্র গুছিয়ে বাইরে চলে আসে সে। শোভন বলে ওঠে,'আম্মু আজকে কি কোন অনুষ্ঠান আছে?'-'কেন বলোতো?'

-'ক্লাস তো শেষ হলো না আর তুমি আমাকে নিয়ে এলে?'

-‘তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল তাই এসেছি।’

-‘ওহ!!তুমি আমাকে সবসময় মিস করো তাই না?’

-‘হুমম। তোমার বাবা মাও তোমাকে মিস করে!’

-‘কি??’

ধ্যান ভাঙে মুসকানের। সে বলে,'কিছু না,চলো তোমাকে চকলেট কিনে দেব।'

শোভন কে সাথে নিয়ে সোজা নাঈমের চেম্বারে গেল মুসকান। নাঈম তখন রোগী দেখছিল। কিছু সময় অপেক্ষা করতে হলো ওদের। দুপুরের বিরতিতে নাঈম বাইরে আসতেই মুসকান আর শোভন কে

দেখতে পেল সে। মুসকান উঠে দাঁড়িয়ে নাঈমের কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল,’তুমি আমার থেকে একটা কথা লুকিয়েছো নাঈম। এটা তুমি ঠিক করলে না।’নাঈম জবাব দিল না কেননা সে জানত মুসকান তাকে এই প্রশ্ন করবেই। মুসকান আবার জিজ্ঞেস করে,’শোভন,পিকুল এই নাম দুটো আলাদা মানুষের।

পিকুল রুপালির ছেলে আর শোভন পরী আর শায়েরের সন্তান তাই তো?'

-'সত্য তো জানোই। আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?'

-'এই সত্যি টা অন্তত তুমি আমাকে জানাতে পারতে নাঈম!!'

-'পরী চায়নি তার সন্তানের পরিচয় কেউ জানুক। তাই আমিই বলিনি।

আর তাছাড়া তোমাকে তো বলেছি আমি,আমার কিছু বলা নিষিদ্ধ। শায়ের ই তোমাকে সব বলবে।'মুসকান নিরাশ হলো নাঈমের গা ছাড়া ভাব দেখে। ছেলেটা যে এখনও তাকে বুঝলো না। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে নাঈমের এমন উদাস ভাবটা। বিয়ের দিনই শোভন কে

মুসকানের হাতে তুলে দিয়েছিল নাঈম। একজন আদর্শ মা হতে বলেছিল মুসকান কে। তখন ছোট্ট শোভনের বয়স মাত্র আটমাস। ছোট ছোট হাতে যখন সে মুসকান কে স্পর্শ করতো তখন ভিশন ভাল লাগতো ওর। মাতৃত্বের স্বাদ পেতো সে। কিন্ত আফসোস এই যে এত বছর পর শোভনের আসল পরিচয়

জানতে পারে ও। নাঈম শুরুতেই বলেছিল মুসকান যেন তাকে শোভনের বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে। মুসকান তাই করে। কেননা এতো সুন্দর একটা শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য কারো নাই। অসম্ভব সৌন্দর্যের অধিকারী এই শিশুটিকে দেখলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় মুসকানের। তাই তো বাবা মায়ের

অমতে এই বিয়েতে সে রাজী হয়। মুসকান নাঈমকে ফিরিয়ে দিলে সে হয়ত অন্য কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। যদি সেই নারী শোভনের মা না হয়ে উঠতে পারে? ভালোবাসতে না পারে? এই জন্যই মুসকান শোভন কে আপন করে নিয়েছিল। একটা সুখি পরিবার গড়ে তুলেছে।শোভন কে নিয়ে বাসায়

ফেরে মুসকান। দুপুরের খাবার শেষ করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় শোভন কে। মুসকান ভাবতে লাগে শায়েরের কথা। শায়ের কি শোভন কে দেখেছে? আর দুদিন পর তার ফাঁ*সি তবুও শায়ের একটাবার শোভনের সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করেনি। কেন?? এর মধ্যে কি কোন রহস্য আছে? নাহ ওকে

আবার যেতে হবে শায়েরের কাছে। আজকেই যাবে সে। শোভন কে বুয়ার কাছে রেখে বিকেলে আবার সাভারে যায় সে। কিন্ত এবার নুরুজ্জামান তাকে দেখা করতে দিতে চায় না। তিনি বলেন,’দেখুন আপনাকে একবার দেখা করতে দেওয়া হয়েছে কিন্ত বারবার একজন ফাঁ*সি*র আ*সা*মীর সাথে দেখা

করতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

মুসকান তার প্রতিবাদ করে বলে,’আর যদি আ*সামী সম্পূর্ণ নির্দোষ হয় তাহলে?’

চমকে গেলেন নুরুজ্জামান,’কি বলছেন আপনি? সমস্ত স্বাক্ষী শায়েরের বিরুদ্ধে। শায়ের নিজের মুখে সব সত্য স্বীকার করেছে।

আমরা সব তদন্ত করে দেখেছি।’-‘আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে আমার মনে হচ্ছে শায়ের নির্দোষ। একটা খু*নও সে করেনি। সব জানতে হলে আমাকে শায়েরের সাথে কথা বলতে হবে। দয়া করে আমাকে যেতে দিন।’

অতঃপর মুসকান শায়েরের সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে তা সব বলে দিল

নুরুজ্জামান কে। সব শুনে নুরুজ্জামান বললেন তিনিও সব শুনবেন তবে আড়াল থেকে। কারণ শায়ের নুরুজ্জামানের সামনে একটা কথাও বলবে না। দুজনেই শায়েরের সেলে গেল। মুসকান সামনে এলো নুরুজ্জামান দেওয়ালের ওপাশে রয়ে গেল।

মুসকান কে দেখে এগিয়ে এলো শায়ের। মুচকি হেসে বলল,’কি রহস্য ভেদ করে এলেন সাংবাদিক মেডাম?’

-‘আপনাকে বোঝার সাধ্য পরী ছাড়া কারো নেই। এজন্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনাকে।’

-'আমার বা পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি সে। মনে কথা সে বুঝবে না তো কে বুঝবে?'

শায়ের একটু চুপ থেকে বলে,'পরীজান আমাকে একটা কথা বলেছিল জানেন! বলেছিল,"এটা পৃথিবী বেহেস্ত নয়!!এখানে চক্ষু মুদন করে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত না।" কথাটা ঠিকই বলেছে

সে। তাই তো পরীজান এই পৃথিবীতে শুধু আমাকে বিশ্বাস করেছে।'মুসকান বারবার বিষ্মিত হচ্ছে শায়েরের কথায়। পরী ঠিকই বলেছে এই ছেলের প্রতিটা কথায় জাদু আছে।মুসকান বলে,'আপনার কি শোভন কে দেখতে ইচ্ছা করে না?অন্তত ফাঁ*সির আগে ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে চান না?'

-‘ওর কথা আমার সামনে বলবেন না।’

-‘আচ্ছা বলব না। তবে এটা বলুন শোভন কে কেন নাঈমের কাছে রেখেছেন? এত বিশ্বাস নাঈমকে কেন করলেন? অন্য কেউ ছিল না?’

-‘ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করি বলেই নিজ সন্তানকে তার হাতে তুলে

দিয়েছি। শুধু তাই নয় দশটা মাস আমার পরীজান তার কাছেই ছিল।’

হাসপাতালে শায়ের নাঈম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। নাঈম এখনও জানে না পরী কে কেন এখানে আনা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস ও করেনি পরীর কি অবস্থা। শায়ের চিন্তায় কোন কথাও বলতে পারছে না। এমন সময় ডাক্তার রেবেকা বের

হয়ে এলেন। শায়ের কে উদ্দেশ্য করে বললেন,’আপনার স্ত্রীর অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। মুখটা অতোটাও পুড়ে যায়নি তবে শরীরের আঘাত গুলো একটু বেশি। এরকম অ*স্ত্রেরআঘাত সে পেল কীভাবে?’

শায়ের জবাব দিতে পারে না। তবে নাঈম বেশ অবাক হয়। ও

রেবেকাকে জিজ্ঞেস করে,’কি হয়েছে আপু?

পরীর মুখ পুড়েছে মানে কি?’

শেষ কথাটা শায়ের কে উদ্দেশ্য করেই বলে নাঈম। রেবেকা বললেন,’তুমি চেনো মেয়েটাকে?’

-‘হ্যা চিনি! কিন্ত হয়েছে কি বলুন?’

-‘আসলে নাঈম,মেয়েটার মুখ অর্ধেক পুড়ে গেছে কোনভাবে। চিকিৎসা

করলে পুরোপুরি ঠিক না হলেও কিছুটা ঠিক হবে। হাত,পা এবং শরীরে অসংখ্য ধারালো অস্ত্রের দাগ। এর মধ্যে মেয়েটা গর্ভবতী। জানি না এখন আমার কি করা উচিত?’শায়ের যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। পরী মা হতে চলেছে!! এর আগে তো কত চেষ্টাই না ওরা করেছে তবুও কোন লাভ হয়নি। ভাগ্য ওদের সাথে কোন

খেলা খেলছে? এবার শায়ের নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। কথা না বলেই সে ছুটে গেল পরীর কাছে। মুখে তার ব্যান্ডেজ করা। ঘুমের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে বিধায় ঘুমাচ্ছে পরী। শায়ের প্রিয়তমার ক্ষ*ত বি*ক্ষ*ত হাতটা ধরে। যত্নে চুম্বন করে। হাতটা বুকে চেপে ধরে বলে,'আমি পাথরের ন্যায়

হয়ে গেছি পরীজান। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসুক আমি নিশ্চুপ থাকব। কিন্তু আপনি হীনা কেউ যেন না আসে। তাহলে আমি ভেঙে চুরমার হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যাবো। আপনাকে ছাড়া আমি অসহায় ভিশন অসহায়। আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আপনি যে মাতৃত্ব চেয়েছিলেন তা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন কিন্তু

এখন এই মাতৃত্ব নিয়েও আপনাকে যু*দ্ধ করতে হবে।’পরী ঘুমন্ত বিধায় জানতে পারল না তার স্বামী তাকে এখনও কতখানি ভালোবাসে। তার স্বামীর বুকের জমানো ভালোবাসা রত্ন দিয়ে বাঁধানো শুধু তারই জন্য। ভালোবাসার শেষ নেই যদি সেই ভালোবাসা প্রকৃত হয়। সেই ভালোবাসা কখনও শেষ হয় না শুধু

পরিবর্তন হয় নতুন কিছুতে। পৃথিবীতে যেমন ঋতু পরিবর্তন হয় ঠিক তেমনি। গ্রীষ্ম,বর্ষা,শরৎ,হেমন্ত, শীত ও বসন্তের মতো ভালোবাসার ও ঋতু পরিবর্তন হয়। ভালোবাসা বিয়ে সংসারের মতো পরিবর্তন হয় যুগ যুগ ধরে। শায়ের জানে না তার প্রিয়তমার সাথে কি তার আদৌ এক যুগ থাকতে পারবে কি না?

নাঈম রেবেকার সাথে কথা বলছিল পরীর বিষয়ে। বাচ্চাটা কি পরী জন্ম দিতে পারবে কি না? নাকি পরীর জীবনের ঝুঁকি থাকবে? রেবেকা বললেন, ‘দেখো নাঈম পরীর শরীর এখন ঠিক না। তিন মাস লাগবে ওর মুখ ঠিক হতে। তবে তার বেশিও লাগতে পারে আমি নিশ্চিত নই। ওর শরীরের ক্ষ*ত গুলো

সারতে মাসখানেক তো লাগবেই। তখন ওর শরীরের কতটা উন্নতি হবে তা আমি এখন বলতে পারব না। যদি ওর শরীর খারাপ থাকে তাহলে তখন এবরেশন

করা যাবে। পরীর অনুমতিও তো নিতে হবে। আগে পরী সুস্থ হোক তারপর দেখা যাবে। তার আগে পরী সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে সে

ভালোভাবে থাকতেন পারবে।’দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনল শায়ের। এই মুহূর্তে পরীকে কিছুতেই নূরনগর নেওয়া যাবে না। একটু সুস্থ হলেই পরী আবার হ*ত্যা খেলায় মেতে উঠবে। এতে পরীর জীবনের আশঙ্কা আছে। সেজন্য শায়ের নাঈমের কাছে গিয়ে বলে,’আপনি পারবেন আমার

পরীজানকে আপনার কাছে রাখতে? বেশিদিন নয় পরীজান একটু সুস্থ হলেই আমি তাকে নিয়ে যাব।'

-'কেন বলুন তো? পরীকে বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে ওর পরিবার আছে। পরী সেখানে থাকলে আরও তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে।'

-'আপনাকে আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলছি যে

নূরনগর এখন পরীজানের জন্য নিরাপদ নয়। সেখানে তার জন্য মৃ*ত্যু অপেক্ষা করছে। আপনি কি আমার কথা রাখবেন?’

নাঈম বুঝতে পারে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। নাহলে পরীর এই অবস্থা কীভাবে হলো? তাই সে কথা বাড়ায় না। পরীকে নিজের কাছে রাখতে রাজী হয়।এক সপ্তাহ পর

পরীকে হাসপাতাল থেকে নাঈমের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরী থাকবে বলে নাঈম বাসা পরিবর্তন করেছে। দুটো রুম আর রান্না ঘর। পরী নাঈমের বাসায় গিয়ে বিব্রতবোধ করে। সে চায় নূরনগর ফিরে যেতে। এখন সে একটুও আধটু কথা বলতে সক্ষম। তাই সে শায়ের কে বলে,'আমি ফিরে যাব

মালি সাহেব। আমাকে গ্রামে নিয়ে চলুন।'

শায়ের পরীর হাত দুটো চেপে ধরে বলে,'আপনি সেখানেই থাকবেন যেখানে আমি বলব। স্বামী হয়ে কখনোই কোন আদেশ করিনি আপনাকে। তবে আজ করছি। আপনি এখানেই থাকবেন। আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

তাই আপনার কিছু আমি হতে দিব না।’পরী আহত গলায় বলে,’তাহলে ওরা যে আমার আপা আর আম্মাকে মেরে ফেলবে। আর জুম্মান কে তো আমি নবীনগর পাঠিয়েছি পিকুল কে দিয়ে। ওর কি হবে?’

-‘আপনার সব কাজ আমি করে দেব। আমি যাব জমিদার বাড়িতে। আপনার পরিবার রক্ষা করার দায়িত্ব

আমার। আপনি চিন্তা করবেন না।’পরীর কাঁদতে খুব ইচ্ছা করছে কিন্ত এখন কাঁদা যাবে না। তাহলে ওর যন্ত্রণা বাড়বে। শায়ের চলে যাবে ভেবে পরীর ভেতরটা চুরমার হচ্ছে। কিন্ত স্বামীকে এখন তার বিদায় দিতে হবে। শায়ের নিজেও আর দেরি করে না। আবার সে পরীর কাছে ফিরে আসবে বলে গভীর

স্পর্শ এঁকে দিয়ে চলে যায় সে। নাঈমের কাছে তার সবচেয়ে প্রিয় আমানত রেখে সে দূরে পাড়ি জমায়।নারীর সৌন্দর্য থাকা যেন কোন পা*প। যেমনটা ফুলের থাকে। ফুলের অতিরিক্ত সৌন্দর্য আকর্ষণ করে মানবকে। কিন্ত তারা আকর্ষিত হলেও ফুলকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। যতক্ষণ ফুলটা সতেজ

থাকে ততক্ষণ এটা হাতে শোভা পায় কিন্ত যখন ফুলের সতেজতা শেষ হয়ে যায় তখন তার স্থান হয় চরণ তলে। মেয়েদের সৌন্দর্যের পরিণতি টাও ঠিক পরিষ্ফুটিত পুষ্পের ন্যায়। সব পুরুষ সৌন্দর্য তেই বেশি আটকায়। মনটা সবাই দেখতে চায় না। আর না মায়ায় জড়ায়।নাঈম সেই মায়ায় বোধহয়

জড়াতে পারেনি। কারণ না দেখে কোন মেয়ের মায়ায় জড়ানো যায় কি না তা নাঈমের জানা নেই। আগে এই পরীকে স্বচোখে দেখার তীব্র আকাঙ্খা ছিল তার। কতই না ফন্দি এটেছিল সে। কিন্ত আজ সেই পরী তারই ঘরে অবস্থান করছে কিন্ত তার ইচ্ছা করছে না পরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কারণ টা কি পরীর

সৌন্দর্য? নাঈমের কেন জানি অস্বস্তিকর লাগছে সবকিছু। হাসপাতালেও পরীর পরীর সামনে সে যায়নি বাসায় আনার সময় ও থাকেনি। মোট কথা সে কিছুতেই পরীর সামনে যাবে না। অদৃশ্য এক দেওয়াল তাকে বাঁধা দিচ্ছে পরীর কাছে যেতে। তাই এই মুহূর্তে সে নিজ ঘরে অবস্থান করছে। একটা

বুয়া রেখেছে সবসময় পরীকে দেখাশোনা করার জন্য।

নিজ ঘরে বসে ছটফট করছে পরী। শায়েরের জন্য তার চিন্তা হচ্ছে। নূরনগর গেলে আফতাব যদি শায়েরের কোন ক্ষতি করে দেয়? আফতাব তো চেয়েছিল শায়ের কে হ*ত্যা করতে। একথা ভেবে পরী অস্বস্তি অনুভব করছে।

বুয়া ঘরে আসতেই পাতলা কাপড় দিয়ে মুখটা আড়াল করে সে। তার বিভৎস চেহারা দেখলে এখন যে কেউ ভয় পাবে তাই এই চেহারা আড়াল করাই শ্রেয়। বুয়া পরীর এইরকম অবস্থা দেখে বলে,'কি হইছে আপা? আপনের কিছু লাগব?'পরী বিড়বিড় করে বলতে লাগল,'আমি থাকব না এখানে।

আমি নূরনগর যাব। মালি সাহেব কে বাঁচাতে হবে।’

বুয়া দ্রুত পদে গিয়ে খবরটা নাঈম কে জানাতেই সে ছুটে এল। নাঈম পরীর মুখোমুখি দাঁড়াতে সংকচ বোধ করছে তাই অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াল বলল,’কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন পরী? আপনার শরীর এখন ভাল নয়।’

-'আমি থাকব না এখানে। আমাকে যেতে হবে। ওনার খুব বিপদ।'

পরীর মুখে উনি শব্দ টা বেশ লাগল নাঈমের। সে হাসল,'কিছু হবে না। শায়ের খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আপনি কথা কম বলুন। নাহলে আপনারই ক্ষতি হবে।'

মৃদু চিৎকার করে পরী,'নাহ!! আমাকে যেতেই হবে। নাহলে আব্বা

খুব বড় ক্ষতি করে দেবে ওনার। আপনি দয়া করে আমাকে নূরনগর নিয়ে চলুন।'

-'পরী আপনি হয়ত ভুলে গেছেন এখন আপনি একা নন। আপনার শরীরে আরেকটি অস্তিত্ব আছে। তার দায়িত্ব শায়ের আমাকে দিয়ে গেছেন। আমাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

-‘আপনি কি আমার স্বামী? তাহলে আপনি কেন আমার দায়িত্ব নিচ্ছেন? আমি আপনাকে আমার দায়িত্ব নিতে দেব না। আমাকে ফিরে যেতে দিন।’নাঈম অপমানিত বোধ করল পরীর কথায়। কিন্ত পরী কথাটা তো ঠিকই বলেছে। সে তো পরীর স্বামী নয়। তাহলে এত দায়িত্ব সে কেন নিচ্ছে? শায়েরের কথায়? শায়ের

তো ওর কেউ হয় না। তাহলে শায়েরের কথা শোনার কোন মানেই হয় না। নাঈম বলে উঠল,'আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেব না আপনার দায়িত্ব। তবে আপনি এখন কোথাও যেতে পারবেন না। দরকার পড়লে আমি নিজে গিয়ে শায়ের কে নিয়ে আসব। কথা দিলাম শায়েরের কোন ক্ষতি আমি হতে দিব না।'

চাপা রাগ নিয়ে চলে গেল নাঈম। পরী খাটের উপর বসে পড়ল। শায়ের কে যাওয়ার সময় কেন বাঁধা দিল না! নাহলে এতোটা চিন্তা হতো না। আফতাব আখির ভ*য়া*নক। ওরা যেকোন সময় শায়ের কে হ*ত্যা করতে পারে। সারা শরীরে ব্যথা করছে কিন্তু মনের ব্যথাটা আরও তীব্র। নাঈম কি সত্যিই

শায়ের কে আনতে গিয়েছে? পরী মুখটা ভাল করে ঢেকে আস্তে ধীরে ঘর থেকে বের হলো। বুয়াকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানায় নাঈম নূরনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।শায়ের মাত্র জমিদার বাড়িতে পা রাখল। এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে বৈঠকে ঢোকে সে। আখির শায়ের কে দেখে চমকে গেল এবং

প্রচন্ড রেগে গেল। সে শায়ের কে রাগন্বিত হয়ে বলে,’নবাবজাদা এসে গেছেন। ভাই আমি আগেই বলেছিলাম কুকুর কে মাথায় তুলবেন না। দেখছেন এখন হলো কি? এই কুকুরের বাচ্চা কুকুর আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।’

আখিরের কথায় শায়ের জবাব দিল না। সে এগিয়ে গেল আফতাবের

কাছে। তারপর বলে,’অন্দরের সবাই ঠিক আছে তো? নাকি তাদের উপর অত্যাচার করেছেন আবারও?’

-‘পরীকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?’

-‘পরীজান আমার কাছেই আছে। এতে লুকানোর কি আছে?’

-‘তুমি আর পরী মিলে সিরাজ কে মেরেছো তাই না?এখন তোমাকে কি করা উচিত?’

-‘সিরাজ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে ওকে নিঃসন্দেহে

ভ*য়ংক*র মৃ*ত্যু দিতাম আমি। কিন্ত সে তার আগেই ম*রে গেছে।’

-‘তুমি বিশ্বাস ঘাতক শায়ের। আর বিশ্বাস ঘাতকের মৃ*ত্যুই শ্রেয়।’

শায়ের শব্দ করে হেসে উঠল,'ঠিক আপনাদের মতো।আপনারা যেমন স্বার্থ হাসিল হওয়ার পর বিশ্বাস ঘাতকতা করেন তেমনি আমিও করলাম। পরীজান কে আপনাদের থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছি আমি। চাইলেও আর খুঁজে পাবেন না তাকে। আমি শেষ বারের মত বলছি এইসব র*ক্তা*র*ক্তির ইতি

টানুন।আমাকে আমার মতো করে থাকতে দিন।’

-‘কি ভেবেছ তুমি এত কিছুর পরও পরীকে ছেড়ে দেব আমরা?’

-‘আপনার মত পিতা হাজারে একটা হয় জমিদার সাহেব। আর আপনি পিতা নামের ক*ল*ঙ্ক।’

শায়ের অন্দরে চলে গেল। আফতাব রাগে গজগজ করতে করতে

বললেন,’শায়ের যেন জীবন্ত বের হতে না পারে। সেই ব্যবস্থা কর আখির।’

বারান্দায় উদাস হয়ে বসে আছে রুপালি। সেদিনের পর থেকে পিকুল আর জুম্মানের কোন খবর নেই। রুপালি চেয়েও পারেনি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে। পরী শায়ের কে বিদায় জানিয়ে ওই রাতেই ফিরে

আসে রুপালি। তার কিছুক্ষণ বাদে আফতাব তার দলসহ হাজির হয় অন্দরে। রুপালিকে জিজ্ঞেস করে পরী কোথায়? রুপালি চতুরতার সাথে নিজেকে আড়াল করে। এমন ভাব করে যেন সে কিছুই জানে না। সবাই সারা অন্দর খুঁজে কোথাও শায়ের পরীকে পায় না। রুপালিকে

তেমন সন্দেহ কেউ করে না। কারণ সবাই তাকে ভিতু মনে করে।

তারপর থেকে পিকুলের জন্য ওর মন আকুপাকু করে। ওইটুকু ছেলেকে নিয়ে কোথায় গেছে জুম্মান কেমন আছে কে জানে?শায়ের কে অন্দরে দেখে খুশিতে দৌড়ে গেল সে। পরীর জন্যও ভিশন চিন্তিত সে। তাই শায়ের কে দেখা মাত্রই

জিজ্ঞেস করে,’পরী কেমন আছে? ও সুস্থ আছে তো? ভাল আছে পরী?’

-‘হ্যা ভাল আছে। আপনারা কি ঠিক আছেন? আপনার বাবা কি কোন প্রকার জুলুম করেছে আপনাদের উপর?’

-‘নাহ। আব্বা জানে এর পিছনে শুধু পরীর হাত রয়েছে কিন্ত সে এটা জানে না আমিও আছি।’

-‘আপনার বাবা যেন জানতে না পারে। সাবধান থাকবেন।’

-‘কিন্তু শায়ের আমার পিকুল? কতদিন ধরে ওকে দেখি না।’

রুপালির চোখে জল দেখা দিল ছেলের কথা আনতেই। শায়ের বলল,’চিন্তা করবেন না আপনার ছেলে ভাল আছে। আপনি চিঠি লিখে দেন আমি পৌঁছে দেব।’

জেসমিন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মালার সাথে সে উঠোনে আসতেই শায়ের কে দেখতে পেল। দুজনেই ছুটে গেল শায়েরের কাছে। মালা কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করে,’আমার মাইয়াডা কেমন আছে শায়ের?’

-‘ভাল আছে।’

-‘ওরে তুমি আর এইহানে আইতে দিও না। তাইলে ওর বাপে ওরে

বাঁচতে দিব না। তুমি ওরে তোমার কাছেই রাইখা দিও।’জেসমিন বললেন,’আমার একটা কথা রাখো শায়ের। জুম্মান রে ও কোনদিন জমিদার বাড়িতে আইনো না। ওরে ভুইলা যাইতে কইবা ও একজন জমিদারদের পোলা। ওরে সব ভুলাইয়া দিবা তুমি।’

শায়ের কথা বলে না। এত কিছুর পরেও পরীর মত ওনারা শায়ের কে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করছে। শায়ের আশ্চর্য হয়ে সবার দিকে তাকিয়ে আছে। রুপালি নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এলো হাতে তার একটা কাপড়ের ব্যাগ। সেটা শায়েরের হাতে দিয়ে বলে,'এতে আমার সমস্ত গয়না আছে। এগুলো

দিয়ে ওরা অনেক দিন ভাল ভাবে চলতে পারবে।’

শায়ের বিনয়ের সুরে বলে,’আপনিও চলুন আমার সাথে। আপনাকে আপনার ছেলের কাছে রেখে আসব। মা ছাড়া অতটুকু বাচ্চা থাকবে কীভাবে?’রুপালি সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেল। মালাও তাতে সায় দিলেন এবং তার সব গয়না

শায়েরের হাতে তুলে দিলেন। ছেলের ভালোর জন্য জেসমিন ও নিজের জমানো সবকিছু দিয়ে দিলেন। শায়ের মনে মনে হাসল। সুখে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন তা আজ আবারও প্রমাণ হয়ে গেল। ওর কাছে এখন যত গয়না আছে তা দিয়ে জুম্মান সারাজীবন ভাল ভাবে

কাটাতে পারবে। রুপালির ছেলেও ভাল ভাবে বড় হতে পারবে।

রুপালি নিজের ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিল শায়েরের সাথে যাবে বলে। বৈঠকে আসতেই আফতাবের লোকেরা ওদের আটকে দিল। আফতাব বললেন, 'তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় শায়ের। অনেক করেছো তুমি আমাদের জন্য

এবার নাহয় তোমার জন্য আমরা কিছু করি।'আফতাব ইশারা করে শায়ের কে বেঁধে ফেলার জন্য। শায়ের সবাইকে থামিয়ে বলে,'আচ্ছা মানলাম আজকে আপনারা আমাকে মেরে ফেললেন। তারপর কি হবে? আপনাদের সব সত্য সবার সামনে চলে আসবে। সেই ব্যবস্থা তো আমি করেই রেখেছি। জমিদার এবং তার

ভাই অর্থের জোরে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্ত বাকি সবাই? আপনাদের কি হবে? আর জমিদার আফতাব কতটা স্বার্থ পাগল সেটা তো কারো অজানা নয় তাই না?’

শায়েরের কথায় সব রক্ষিরা থেমে গেল। সবার মাঝেই ভয় দেখা দিলো। এটা সত্য যে আফতাব স্বার্থ পাগল। সেটা সবাই জানে। কারণ

যে রক্ষিরা পরীর কাছে পরাজিত হয়েছিল, যাদের পরী বাগান বাড়িতে বেঁধে রেখেছিল তাদের আফতাব হ*ত্যা করেছে। এখন বাকিদের মধ্যে কেউ ভুল করলে তাদের পরিণাম ও ওদের মতোই হবে। হিং*স্র পশুদের মিত্ররাও তাদের অবিশ্বাস করে। আফতাবের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কোন রক্ষিরা শায়েরের

কাছে আসতে সাহস পেল না। সবাই আফতাবের দিকে তাকিয়ে রইল। আফতাব নিজেও কোন কথা বলছে না। শায়ের বলল,'অন্দরের কোন মহিলার উপর যেন ফুলের টোকাও না পড়ে।'এক প্রকার শাসিয়ে গেল সে। রুপালিকে সাথে নিয়ে শায়ের জমিদার বাড়ি ত্যাগ করে। গায়ের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে থাকে

দুজনে। পথেই নাঈমের সাথে দেখা হয় ওদের। শায়ের বিচলিত হয়ে বলে,’আপনি এখানে?’

-‘কি করব বলুন? আপনার স্ত্রী আপনার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমাকে সে বিশ্বাস করছে না। তাই আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসলাম।’

-‘পরীজান এখন একা আছে? আপনি শুধু শুধু কেন আসতে গেলেন?’

-‘আপনার স্ত্রী নিজেই চলে আসতো আপনার কাছে। তাকে আটকাতেই আমার আসা। ভালোই হলো আপনাকে পেয়ে গেলাম। চলুন যাওয়া যাক?’

-‘আমাকে আগে নবীনগর যেতে হবে। আপনি ফিরে যান আমি রাতের মধ্যেই চলে আসব।’

-‘আপনাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে আপনার স্ত্রী আমাকে ছাড়বে না। চলুন আমিও আপনার সাথে যাব।’

শায়ের আর দ্বিমত করে না। নাঈম কে সাথে নিয়েই নবীনগর যায়।

সেখানে জুম্মান পিকুল কে নিয়ে খুসিনার কাছে ছিল। ছেলেকে কাছে পেয়ে তখনি তাকে বুকে জড়িয়ে নিল রুপালি। অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিল ছেলেকে। পিকুল যে ওর প্রাণ। এই প্রাণকে বাঁচাতে সে সবকিছুই করতে পারে। শায়ের খুসিনার হাতে তুলে দিল রুপালি আর জুম্মান কে। সাথে ওর সব গয়না গুলো দিয়ে

দিল। কিন্ত রুপালি কিছু গয়না শায়ের কে দিয়ে বলে,’এগুলো নিয়ে যাও তোমার কাজে লাগবে।’-‘আমি এসব নেব না। যার জন্য জীবন দিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত তার ভাল থাকার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজী আছি। এসব আমার লাগবে না। পরীজানের জন্য আমি আছি

আর আপনাদের জন্য এই গয়না গুলো। তাই এগুলো আপনার থাক।'

নাঈম কে সঙ্গে করে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় শায়ের। নাঈমের মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। নাহলে সবাই এমন আলাদা কেন হচ্ছে? তবে ওর মনে জমে থাকা প্রশ্ন গুলো বাসায় ফিরে গিয়ে করবে বলে ভেবে নিয়েছে। তবে সেই

সুযোগ সে পেল না। শায়ের ফিরে গিয়েই পরীর ঘরে চলে গেল। পরী তখনও শায়েরের জন্য ছটফট করছিল। শায়ের কে দেখা মাত্রই তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। কিন্ত শায়ের আলতো করে ধরে। শরীরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও পরী শান্তি অনুভব করছে এখন।

সে রুঢ় কণ্ঠে বলে,'আপনি কেন গেলেন? যদি আপনার কোন ক্ষতি হয়ে যেতো?'শায়ের জবাব দেয় না পরীর কথায়। পুড়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। পরী শায়েরের চাহনিতে কোন বিরক্ততা দেখে না। দেখে একরাশ মুগ্ধতা যা সে আগেও দেখেছিল। তবে সে মুখে বলে উঠল,'এখন আর সুন্দর লাগে

না আমাকে তাই না? এই ঝলসে যাওয়া মুখটা দেখতে খুবই বিরক্তিকর?’

ঠোঁটে চওড়া হাসি টানে শায়ের,’আপনার ভালোবাসায় আমি বহুবার ঝলসেছি। ছাই হয়ে গিয়েছি তবুও আপনি এই ছাই কে ভালোবেসে বুকে টেনেছেন। তাহলে আমি কেন পারব না? আমি এখনও

ঝলসে যাচ্ছি আপনার ভালোবাসাতে। এই জ্বলন বুঝি থামার নয়।’স্বামী স্ত্রীর একান্ত সময়ে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। সেকথা ভেবে নাঈম ও গেল না। তবে সে খুব করে চাইছে সত্য জানতে। পরী আর শায়েরের তো সুখে সংসার করার কথা তাহলে ওদের পরিণতি এমন কেন হলো?

প্রশ্নগুলো মাথায় জট পাকিয়ে দিচ্ছে যার ফলে অস্থির লাগছে নাঈমের। পরী আর শায়েরের ঘরের কাছে গিয়েও সে ফিরে আসে। তার কোন অধিকার নেই। তবুও একটা টান অনুভব করছে সে।

পরী শায়েরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বসে আছে। শায়ের চুপচাপ জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে

ব্যস্ত শহরটাকে দেখে যাচ্ছে এক মনে। বাইরের মানুষ গুলোর কত ব্যস্ততা!! বহু লোকজনের সমাগম রাস্তায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য একেকজন একেক দিকে ছুটছে। শায়ের ভাবছে তারও তো কিছু করতে হবে তার পরীজানের জন্য। শহরে তার বেশ পরিচিত লোক আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ

করলে সে ভাল একটা কাজ পেয়ে যাবে। এসব চিন্তাই করছে সে।

-‘আপনি কি এতো চিন্তা করছেন?’শায়ের ফিরে তাকাল পরীর দিকে,’আমার সব চিন্তাতে শুধু আপনি পরীজান। কীভাবে আপনার সাথে আমি থাকতে পারব এসব নিয়েই আমার সব ভাবনা।’

পরী হাসল ওর এই হাসিটা দেখতে কুৎসিত হলেও শায়েরের মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল যেন,'আমাদের দূরত্ব বোধহয় খুব শীঘ্রই বাড়বে মালি সাহেব। আল্লাহ আপনাকে আমাকে তাড়াতাড়ি আলাদা করে দেবেন।'

শায়ের পরীর পাশে গিয়ে বসল,'যদি কখনো আমাদের শরীর আলাদা হয়ে যায় আমাদের মন কিন্তু আলাদা হবে

না পরীজান। রাখাল পাগল হয়েও তার ভালোবাসা ভোলেনি। আর আমি তো সুস্থ মানুষ।’একটু চুপ থেকে কিছু ভেবে শায়ের বলল,’যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় থাকে তাদের পরকাল সুন্দর হয়। আপনার পরকাল ও সুন্দর হবে। কিন্ত আমার পরকাল সুন্দর হবে না পরীজান। সেখানেও

তিনি আমাদের আলাদা করে রাখবেন।’

পরী শায়েরের চোখে চোখ রাখে। পরীর সান্নিধ্য চায় শায়ের তা ওই চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। শায়ের শুধুমাত্র একটা জিনিস চায় কিন্তু মনে হয় সে সারা দুনিয়ার থেকেও বেশি কিছু চাইছে যা পাওয়া দুষ্কর।

পরী কিছু বলছে না। তাই শায়ের বলে উঠল,'আমি এখনও বলছি আমি আপনার যোগ্য নই তবুও আমি বিনা আপনি কারো নন। আপনার শেষ ঠিকানা আমার বক্ষস্থল।'

-'আমার জন্য আপনি তো কত কিছুই করলেন। শেষ একটা কাজ করবেন। যেটা করলে স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালা আমাকে আপনার হাতে তুলে দিবেন।’

শায়ের চমকালো,’শত যুগ অপেক্ষার বিনিময়ে আল্লাহ যদি আপনাকে আমাকে দিয়ে দেন তো আমি আপনার জন্য শত যুগ অপেক্ষা করতে রাজি আছি।’-‘শত যুগ অপেক্ষা করতে হবে না আপনাকে। আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান। আল্লাহ

বলেছেন তার বান্দা তার কাছে চোখের জল ফেলে ক্ষমা চাইলে তিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না। খারাপ মানুষদেরও ক্ষমা করে দেন। আমার জন্য আপনি ক্ষমা চাইতে পারবেন না?'

জবাব না দিয়ে হাসল শায়ের। সে তার পরীজান কে পাওয়ার উপায় পেয়ে গেছে। এখন সে আর পিছু

ফিরে তাকাবে না। শায়ের ভেবে নিয়েছে সে আর নূরনগর কিছুতেই ফিরে যাবে না। সেখানে পরীর জীবন সংকট রয়েছে। বাকি জীবনটুকু সন্তান আর স্ত্রীকে নিয়ে থাকবে।

শায়ের তার এক বন্ধুর কাছে কাজের উদ্দেশ্যে গেছে। আর নাঈম বাসায় রয়েছে। সে জানে শায়ের

তাকে কিছুই বলবে নাহ। তাই নাঈম পরীকেই সব জিজ্ঞেস করবে। দ্বিধাবোধ হলেও পরীর ঘরের দরজার কড়া নাড়ে নাঈম,’আমি কি আসতে পারি?’অপ্রস্তুত ছিল পরী। ওড়া দ্বারা মুখ মণ্ডল ঢেকে প্রস্তুত হয়ে নাঈম কে ভেতরে আসতে দিল সে। নাঈম চেয়ার টেনে বেশ দূরত্বে বসে। পরীকে বলে,’এখন কেমন

লাগছে আপনার? খুব বেশি খারাপ লাগলে বলবেন।'

-'আমি ঠিক আছি। একটুও খারাপ লাগছে না আমার।'

-'আপনার এরকম অবস্থা হল কি করে? কোন মিথ্যা আমি শুনতে চাই না। আশা করি সত্য টাই বলবেন।'

-'আমি নিজ হাতে তিনটা খু*ন করেছি ডাক্তারবাবু। আরও দুটো

খু*ন আমি করব। ওদেরকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। সব বলব আপনাকে। তার আগে আপনি বলুন আপনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন কীভাবে?’

কিছুক্ষণের জন্য বাক শক্তি লোপ পেল নাঈমের। পরীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তিনটা খু*ন

করেছে পরী! আর তা এত স্থির ভাবে বলছে যেন হ*ত্যা করা পুতুল খেলার মত! নাঈম কে চুপ থাকতে দেখে পরী বলে,’আমি সব বলব তার আগে আপনি বলুন আপনি কীভাবে ছাড়া পেলেন?’

-‘আমাকে শেখর ছাড়িয়ে ছিল। পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পর শেখর আমার সাথে দেখা করতে যায়।

আমি ওকে সব বুঝিয়ে বলি। বন্ধু তো,বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে ওকে। শেখর ই সব বলে আমাকে ছাড়ায়।'-'তাহলে সে যখন আমাদের গ্রামে গেল তখন আপনার নাম বলল কেন?'

-'এরপর বোধহয় সেখান থেকে এসে ও আমার সাথে দেখা করে।'

-‘ভুল শেখর সেদিন জীবিত ফেরেনি নূরনগর থেকে।

তার মানে শেখর আগেই আপনাকে ছাড়িয়েছে। সত্যি বলুন।’

-‘আপনি কীভাবে জানলেন শেখর মা*রা গেছে?’

-‘তাকে হ*ত্যা করা হয়েছে।’

নাঈম আরও চমকালো,'কি বলছেন আপনি এসব? শেখর তো এক্সিডেন্ট করে মা*রা গেছে।'

-'ভুল! আপনার কথা শুনে এটা বুঝলাম যে শেখর আগেই জানত আপনি নির্দোষ তবুও সে নূরনগর গিয়ে মিথ্যা বলেছিল। কারণ টা হলো সে আগেই আন্দাজ করেছিল যে আমার আব্বাই কিছু করেছে।

কিন্তু তাতেও কোন লাভ হলো না।'-'শেখর কে আপনার বাবা হ*ত্যা করেছিল! কিন্তু কেন?'

-'জমিদার বাড়ি সম্পর্কে আপনি কতটুকু সত্য জানেন? যা দেখেছেন তা আপনার চোখের ভ্রম মাত্র। আপনি কি জানেন পালক কেও হত্যা করা হয়েছে!'

নাঈম এবার অস্থির হয়ে গেল। পরীর মাথা ঠিক আছে তো? শেখর কে হ*ত্যা করা হয়েছে এটা মানা যায় কিন্ত পালককে হ*ত্যা!! এটা সে মানতে পারছে না। কৌতুহল হয়ে পরীর ঢেকে রাখা মুখের পানে তাকিয়ে রইল সে। পরী এখনও স্থির হয়ে বসে আছে।

তবে পরী শায়েরের কথাটা গোপন রেখেছে। পালক আর শেখর কে যে শায়ের মে*রেছে সেটা জানতে পারলে নাঈম চুপ করে বসে থাকবে না তাই পরী সেসব তথ্য গোপন রেখেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই নাঈম কে পরী বলে দিল। ওর জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার

স্বাক্ষী হিসেবে সে নাঈম কে রাখতে চায়। তাই সব সত্য একমাত্র নাঈম কে জানিয়ে দিল পরী। সব শুনে নাঈম বলল,’শায়ের আপনাকে অনেক ভালোবাসে তাই না?’-‘তার ভালোবাসার গভীরতা আজও আমি মাপতে পারিনি।’

-‘আমি আপনাদের সাথে থাকব সবসময়। আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন।’

-‘আমার একটা কথা রাখবেন?’

-‘বলুন।’

-‘আমার সন্তান কে আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি ফিরে

আসব। ততদিন আপনি ওকে মানুষ করবেন।’

-‘শায়ের কি আপনাকে আবার নূরনগর যেতে দিবে? আমার মনে হয় না?’

-‘আমার সোনা আপা আর বিন্দুর হ*ত্যা*কারীদের শাস্তি আমি দেবোই। ওরা শুধু মানুষ হ*ত্যা করেনি হ*ত্যা করেছে আমার সুন্দর

জীবন,আমার আম্মার মন। তাহলে ওদের ছাড়ি কীভাবে?'

-'পুলিশ কে সব বলি আমি? আইন ওদের শা*স্তি দেবে।'-'তাতে আমার মন ভরবে না। আপনি সাহায্য না করলে কোন সমস্যা নেই। আমি অন্য পথ খুঁজে নেব।'

নাঈম ওখানে আর বসল না। বাইরে বের হয়ে এলো।

অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে সব!! তাহলে তো খুবই খারাপ লোক পরীর বাবা। কিন্তু পরীকে একবার যখন নূরনগর থেকে এখানে আনা হয়েছে তাই পরীকে আটকে রাখতে হবে। নাহলে বিপদ শুধু পরীর নয়। রুপালি,পিকুল আর জুম্মানের ও ঘোর বিপদ।

নাঈম পায়চারি করছে। সে শায়েরের অপেক্ষা করছে। পরীর বিষয়ে কথা শায়েরের সাথে বলতে হবে। শায়েরের ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দরজা নাঈম ই খুলে দিল। শায়ের কে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস নিলো সে। শায়ের জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি আমার জন্যই

অপেক্ষা করছিলেন?’-‘কিছু বলার ছিল আপনাকে।’

-‘বলুন!!’

-‘পরীকে যথাসম্ভব আটকে রাখুন। ওকে নূরনগর যেতে দিয়েন না।’

-‘পরীজান আপনাকে সব বলেছে তাই না?’

নাঈম মাথা নিচু করে সায় দিল,’হুম বলেছে।’

-'আমাদের এখন এসব বলার সময় নয়। আমি জানি পরীজান আপনাকে সমস্ত সত্য বলেনি। নাহলে এতক্ষণ আপনি স্বাভাবিক ভাবে আমার সাথে কথা বলতেন না। এসব ব্যাপারে পরে কথা বলব।'

শায়েরের কথায় নাঈম ও সায় দিল। শায়ের চলে গেল নিজ ঘরে। পরী তখন ঘুমাচ্ছিল। বেশ দূর্বল এখন

পরীর শরীর। তার উপর এখন বমি হয়। তবে খুব বেশি বমি হয় না। অসুস্থ শরীরে সামান্য বমি হতেই পরী আরও দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই শায়ের চায় পরীকে একটু বেশি সময় দিতে। পরীকে ঘুমাতে দেখে শায়ের নিঃশব্দে পরীর পাশে গিয়ে বসে। হাত,পা, গলার ক্ষতগুলো কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। ফর্সা

শরীরে চন্দ্রকলঙ্কের ন্যায় ফুটে উঠেছে দাগ গুলো। শায়ের হাত বুলায় পরীর গলায়।-‘আমি ভাগ্যবান আপনাকে পেয়ে। আপনার ভালোবাসা পেয়ে।’

-‘আপনি ভালোবাসেন বলেই আমি ভাগ্যবতী।’

পরী জেগে গেছে। পূর্ণ দৃষ্টিতে সে শায়েরের দিকে তাকিয়ে

আছে,’আপনি যদি ভাল কাজ করতেন তাহলে আমাদের জীবনটা অন্যরকম হতো।’

পরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল শায়ের,’এরপর থেকে আমাদের জীবন সুন্দর করে গড়ার চেষ্টা করব। আপনি শুধু কথা দিন,নূরনগরে যাওয়ার চেষ্টা কখনোই করবেন না?’

কিছুক্ষণ শায়েরের দিকে চেয়ে থাকে পরী। তবে জবাব টা সে দিল না। পরীকে খাবার খাইয়ে দিলো শায়ের। গর্ভবতী থাকায় ওষুধ খেতে পারবে না পরী। যে ওষুধ গুলো খেতে পারবে সেগুলোই খেলো সে। এজন্য সেরে উঠতে বেশ দেরি হচ্ছে। তবে শায়েরের ধৈর্য দেখে নাঈম বিষ্মিত। ইশশ সে যদি এভাবে কাউকে

ভালোবাসতে পারত কতই না ভাল হতো! প্রতিনিয়ত সে পরী আর শায়েরের ভালোবাসার সম্মুখীন হয়। নাঈমের তখন মনে হয় শায়েরের জন্যই বুঝি পরীর জন্ম। ভালোবাসতে অট্টালিকার প্রয়োজন হয়না তার প্রমাণ একমাত্র শায়ের। বাইরের দিক সামলে কীভাবে পরীকে সময় দেওয়া যায় সেটাই

সবসময় শায়ের ভেবে চলে।পাঁচমাস পার হয়ে গেছে। তবুও শায়ের একটুও ধৈর্যহীন হয়ে পড়েনি। সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে পরীকে সুস্থ করার। শায়েরের প্রতিটি মোনাজাতে কেবল পরী ছিল। আল্লাহ বোধহয় ওর কথা শুনেছে। আগের থেকে অনেক সুস্থ পরী। মুখের পোড়া চামড়া উঠে গেছে সব। কিন্তু ওর

চেহারায় আগের মত মাধুর্য নেই। শায়ের বিনা আর কেউ বোধহয় কেউ পরীর দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকাবে না।

তবে এতদিনে পরীকে নূরনগরের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রথম কয়েকদিন পরী শায়ের কে মালা, রুপালি,জুম্মানের কথা জিজ্ঞেস করলেও এখন আর করে না।

নিজের শরীর আর অনাগত সন্তানের কথা ভেবেই দিন পার করেছে সে। কিন্ত এতদিন পর একটা চিঠিই পরীকে অস্থির করে তুলল। চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল পরী।শুভ্র মেঘ সরে গিয়ে গগনে কালো আধার নেমে এসেছে। তপ্ত গরমের প্রকৃতি মুহূর্তেই বাতাসে ভরে গেছে। রাস্তায়

পড়ে থাকা কাগজ আর ধুলো বালি উড়ছে। এই নির্মল বায়ু তাদের কোথায় নিয়ে থামাবে তা তাদের জানা নেই। তারা শুধু ছুটছে। পরী জানালা দিয়ে তা অনেকক্ষণ যাবত দেখে চলছে। ওর জীবনটাও বোধহয় এরকম গন্তব্যহীন। ভালোবাসার পিছন পিছন সেই থেকে ছুটে আসছে সে। কিন্ত এর

গন্তব্য কোথায় তা জানে না পরী। তার এসব ভাবনার মাঝেই আকাশ ভেঙে বারিধারা নেমে এল ধরণীতে। স্যাঁতস্যাঁতে রাস্তাটা ভিজিয়ে দিতে লাগল। মানুষ গুলো ছুটোছুটি করে একটুখানি আশ্রয়ের জন্য। যাতে তারা এই বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচতে পারে।জানালার পাশেই দাঁড়ানো পরী। বৃষ্টির ছিটা তাকে ভিজিয়ে

দিচ্ছে। তবুও সরে দাঁড়াচ্ছে না পরী। তার বড্ড ভাল লাগছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। পরী যদি নিজ ইচ্ছাতে না সরে দাঁড়ায় তাহলে ওকে সরানোর কেউ নেই। শায়ের ব্যতীত এই ঘরে কেউ আসে না। এমনকি নাঈম ও নয়। পরীর মুখে তার অতীত শুনেছিল যেদিন সেদিনই নাঈমের সাথে পরীর শেষ

দেখা ছিল। এর পরে ওদের সাথে দেখা হয়নি। নাঈম ই সরে এসেছে। পরীর হাতের পত্র খানা ভিজে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে একটা হাত ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। হতবাক হয় না পরী। শুধু ভেজা নয়ন জোড়া মেলে ধরে শায়েরের পানে। ঠান্ডায় ভেজা ঠোঁট জোড়াও কাপছে ওর। শায়ের দ্রুত গামছা

এনে পরীর শরীর মুছে দিতে দিতে বলতে লাগল,’নিজের অযত্ন কেন করছেন পরীজান? এভাবে ভিজলে আপনার শরীর খারাপ করবে। এই সময়ে একটু সাবধানে থাকবেন তো!’শান্ত চোখে শায়ের কে দেখতে লাগল। একটা মানুষের ঠিক কত রূপ থাকতে পারে তা দেখছেন

পরী। সে বলে ওঠে,’সাতাশ নাম্বার চিঠিটা আমি পেয়েছি।’

শায়েরের হাত আপনাআপনি থেমে যায়। ক্ষীণ নজড়ে পরীকে সে দেখতে লাগল। খুব গোপনে সে আর নাঈম মিলে চিঠি গুলো লুকিয়ে রেখেছিল যাতে পরীর হাতে না পড়ে। আজকে অসাবধানতার বসে পরীর হাতে তা পড়েই গেছে। দু

মাস যাবত ছাব্বিশটা চিঠি পাঠিয়েছে রুপালি। যা শায়ের আড়াল করে রেখেছিল। আর আজ তাকে জবাব দিতে হবে। পরী শায়েরের বাহু আকড়ে ধরে বলল,'আমাকে কেন মেরে ফেললেন না আপনি? তাহলে তো আমাকে এত কিছু দেখতে হত না। নিজের বাবার বিকৃত রূপ টাও

দেখতাম না। কিছু না জেনেই ম*রে যেতাম। খুব ভাল হত তাহলে।’ শায়ের পুনরায় পরীর শরীর গামছা দিয়ে মুছে দিতে লাগল,’আপনি মৃ*ত্যুকে সহজ ভাবলেও মৃ*ত্যু কিন্ত এত সহজ নয়।’-‘আমাকে মারা তো সহজ ছিল। তাহলে আমাকে কেন মারতে পারল না কেউ?’

শায়ের মৃদু হাসে,'আপনাকে হত্যা করা ততটা সহজ ছিল না যতটা আপনি ভাবছেন। আপনার বাবা অন্দরে আপনাকে মা*রতে পারত না। কেননা আপনার অনুমান প্রখর ছিল। অন্দরে কোন পুরুষ পা রাখলেই আপনি তা অনায়াসে ধরে ফেলতেন। চার পাঁচ জনের সাথে লড়াই করা আপনার কাছে কিছুই

না। তার চেয়ে বড় কথা হল আপনার বাবা চায়নি আপনি সব জানুন। তবে আমি সবসময় পেছন থেকে আপনাকে রক্ষা করে গেছি। সেজন্য আপনাকে মা*রাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'-'কেন রক্ষা করেছেন আমাকে? আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই আমার।'

-‘কিন্তু আমার আপনার সাথে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আছে।’

-‘এতগুলো চিঠি আপনার কাছে এসেছিল অথচ আপনি একটাবার আমাকে জানালেন না?’

-‘আপনার কষ্ট হবে ভেবেই জানাইনি।’

-‘এখন বুঝি আমার খুব ভাল লাগছে? আমি কি সুখে আছি খুব?’

শায়ের জবাব দিল না। আলমারি থেকে শাড়ি এনে পরীর হাতে দিয়ে বলে,'শাড়িটা বদলে ফেলুন নাহলে ঠান্ডা লাগবে আপনার।'

-'রুপা আপা যে নূরনগর ফিরে এসেছে সেটা তো বলতে পারতেন? আমার আম্মা যে সেখানে ভাল নেই সেটা তো বলতে পারতেন? এতটা স্বার্থপর কেন হলেন?'

এবার বিন্দু বিন্দু রাগ দেখা দিল শায়েরের চোখে। কিন্তু পরীর সামনে সে প্রকাশ করল না। কেননা পরীজানের জন্য শুধু ভালোবাসা আছে। তাই সে বলে,'দুনিয়াটা এমনই,একজনের কাছে ভাল হতে গেলে অন্যজনের কাছে বেঈমান স্বার্থপর হতে হয়। আমি স্বার্থপর হয়েছি। আপনার ভালোর জন্য আমি

পুরো পৃথিবীর কাছে স্বার্থপর হতে প্রস্তুত।'

রাগ বেড়ে গেল পরীর। দুহাতে চেপে ধরল শায়েরের পাঞ্জাবির কলার,'আপনার ভালোবাসা আমার কাছে এখন বিষাক্ত ধোঁয়া মনে হচ্ছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি না। আমি তো একা ভাল থাকতে চাই না। আমি সবার সাথে ভাল থাকতে

চাই।’-‘কিন্তু আমি শুধু আপনার সাথে থাকতে চাই। আপনার আর আমার মাঝে কাউকে চাইনা।’

শায়ের পরীকে জড়িয়ে ধরতে গেলে পরী ধাক্কা দিল শায়ের কে,’ভালোবাসা আপনাকে অন্ধ করে দিয়েছে। পাগল হয়ে গেছেন আপনি।’

-‘পরীজান আপনি শান্ত হন।’

-'কি শান্ত হব আমি? ওখানে আমার পরিবার বিপদে আছে আর আমি শান্তিতে আপনার সাথে সংসার করব? আপনি ভাবলেন কীভাবে?'

-'আপনার বাবা ওদের কোন ক্ষতি করবে না। ওদের ক্ষতি করে আপনার বাবার কোন লাভ হবে না।'

-'আপনি বের হয়ে যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

পরীকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক ভাবে দেখে বের হয়ে গেল শায়ের। বের হতেই নাঈমদের মুখোমুখি হয় সে। নাঈম এতক্ষণ সবই শুনছিল। সে শায়ের কে বলে, ‘চিন্তা করবেন না সব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।’বিপরীতে কথা বলে না শায়ের। নাঈম আবার বলে, ‘পরীর মতো আমারও একটা প্রশ্ন? পরীর বাবা তো ক্ষমতাশীল।

এক্ষেত্রে পরীকে হ*ত্যা করা আমার মতে সহজ ছিল। আপনি পরীকে সবসময় রক্ষা করেছেন। কিন্তু বিয়ের আগে??’

নাঈম সম্পূর্ণ কথাটা বলার আগেই বুঝে গেল শায়ের। সে বলে উঠল,’আমার পরীজান সে। তার গায়ে কোন আঘাত পেতে আমি এত সহজে দেব? আপনি হয়ত জানেন

পরীজানের ব্যাপারে। তবে জমিদারের পূর্ব পুরুষদের নিয়ম ছিল অন্দরে যেন কোনরকম রক্তারক্তি না হয়। কিন্তু পরীর বাবা সেই নিয়ম ভঙ্গ করে নিজ মেয়েকে হ*ত্যা করতে লোক পাঠায়। কিন্তু তার জানা ছিল না যে পরীজান আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নয়। লড়াই করার সাহস আর শক্তি

দুটোই আছে। প্রতিটা পদে পদে আড়ালে আমি পরীজানের ঢাল হয়ে ছিলাম। আর এখন প্রকাশ্যে ঢাল হয়ে দাঁড়াব।’

-‘ভাগ্যের জোরে এতদিন পরীকে বাঁচিয়েছেন আপনি। আর কতদিন বাঁচাতে পারবেন জানি না। তবে আমি আপনার আর পরীর সাথে আছি।’-‘আমাদের সাথে থেকে

নিজেকে জীবন বিপদে ফেলবেন না। আপনি যতটুকু করেছেন ততটুকুই যথেষ্ট।'

-'তাহলে আপনি এখন কি করবেন? নূরনগরের যাবেন কি?'

-'নাহ।'

-'দেখুন রুপালি অনেকবার করে বলেছে আপনি যেন একটাবার সেখানে যান। নিজের জন্য ডাকেনি

সে। তার ছেলে পিকুলের ভাল একটা ভবিষ্যতের জন্য ডেকেছে। জমিদারের অত্যাচার ওনারা সবাই সহ্য করতে পারবেন কিন্ত ছোট ছেলেটার তো ভবিষ্যত আছে নাকি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শায়ের,'আমার সন্তান পৃথিবীর আলো না দেখা পর্যন্ত আমি এক চুল ও নড়ব না। আমার কাছে সবার আগে আমার

পরীজান।’সকালে হতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে শায়ের। গত কাল রাতে সে নাঈমের সাথে ঘুমিয়েছে। পরী বারণ করেছে বিধায় আর ওর ঘরে যায়নি। তবে সকাল হতেই পরীর ঘরে উঁকি দিতে ভোলে না সে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে পরী ঘরে নেই। ভয়ে শায়ের কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে দ্রুত নাঈম কে ডেকে তুলল। দুজন

মিলে রাস্তায় বেরিয়ে গেল তখনই। অলি গলি

খুঁজতে থাকে ওরা। পরী কখন বের হয়েছে কতক্ষণ ধরে বের হয়েছে তা অজানা। শায়ের এদিক ওদিক দৌড়াতে দৌড়াতে পাগল প্রায়। লোকজনের ভিড় ঠেলে সে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আর একেকজন কে

জিজ্ঞেস করছে পরীর ব্যাপারে। নাঈম অন্যদিকে খুঁজছে।

তবে বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না পরীকে। রাস্তার একপাশে বেঞ্চিতে বসে আছে পরী। কোন টাকা পয়সার নেই ওর কাছে। তাই এখান থেকে বেশি দূর

যেতে পারেনি। তাছাড়া পরীর পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্লান্ত

দেহটা আর টেনে নিতে পারল না। ধপ করে বেঞ্চের উপর বসে পড়ল। তার কিছুক্ষণ বাদেই শায়ের হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এল সেখানে। অবাক হল না পরী। সে জানত এম কিছুই হবে। শায়েরের দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল সে। শায়ের পরীর পাশে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। অনেক দৌড়েছে সে।

পরীর পাশে বসে সে বলে ওঠে,'চলুন।'বলেই পরীর হাত ধরে শায়ের। কিন্ত পরী হাত টা ছাড়িয়ে নেয়। বলে,'আমার বড় বোন মারা যাওয়ার অনেক গুলো বছর পর জানতে পারি তাকে হ*ত্যা করা হয়েছিল। তারপর আমার বিন্দু খু*ন হল। সাথে সম্পান মাঝিও। কিন্ত তাদের কারো বিচার হল না। আমার

রুপা আপার জীবনটাও যাতাকলে পড়ে গেছে। আর আম্মা!! ওদের সবার শান্তির নীড় একমাত্র আমি। আর আমার শান্তি আপনি। আপনি কেন বুঝতেছেন না তাহলে? আমি কেন একটু শান্তি চাই!!’

-‘কেমন শান্তি চান আপনি? আপনার শত্রুদের হত্যা করে শান্তি পেতে চান? কিন্ত এখন তা সম্ভব নয়।

পরীজান আমাদের সন্তানের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আপনি মা হবেন আর আমি বাবা। এই সুখের জন্য আপনি কম চোখের জল ফেলেন নি। আপনার কথা আল্লাহ শুনেছেন। এই সুখকে ফিরিয়ে দেবেন না পরীজান ফিরে চলুন আমার সাথে।’এই পুরুষটির সামনে নিজের কঠোরতা বেশিক্ষণ ধরে

রাখতে পারে না পরী। অশ্রুজলে ভাসে কপোলদ্বয়। যে পুরুষ ঠকায় তাদের চোখে অদ্ভুত মায়া আছে যা নারীরা সহজে কাটাতে পারে না। শায়েরের চোখে ঠিক তেমনি মায়া আছে যা পরীর কঠোরতা ভাঙার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু শায়ের তো ঠকানোর পরেও পরীকে সমানতালে ভালোবেসেছে।

আজকে দ্বিতীয়বারের মতো ওর অনাগত সন্তানের কাছে হেরে গেছে পরী।

তাই তো সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সে শায়েরের সব কথা মেনে নিয়েছে। সব কিছু মেনে সে নাঈমের বাসায় থেকেছে। মনের সব কষ্ট চেপে সে হাসিমুখে জন্ম দিল এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের।

অবিকল মায়ের মতোই হয়েছে সে। শায়েরের ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান তুলে দিল ওর হাতে। পুত্রের কানে আযান দিল শায়ের। খুশিতে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল তার। পদ্ম পাতার জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হলো সে খুশি। শোভনের বয়স চার মাস হওয়ার পরই বুয়ার কাছে শোভন কে রেখে পরী আবারও হারিয়ে গেল

অজানায়। বুয়ার কাছে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সে যেন চিঠিটা শায়ের কে দেয়।বহুদিন পর নূরনগরে পা রাখে পরী। কিন্ত এখনও আগের মতোই আছে গ্রামটা। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। পথে রাস্তার ধারের কদম গাছের দিকে তাকাল সে। সুখান এখনও সেখানেই বসে আছে। সোনালীর কবরের দিকে তাকিয়ে

অশ্রু বিসর্জন দিয়ে পরী সামনের দিকে এগোয়। প্রতিটা পদে পদে পরীর অতীত মনে পড়ছে। পশ্চিম জঙ্গলের দিকে তাকাতেই সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা মনে পড়ল। বিন্দুকে পরী কোনদিন ভুলবে না। সম্পান মাঝি খারাপ ছিল কিন্তু সেও ভালোবেসেছিল বিন্দুকে। ভালোবাসা খারাপ মানুষকেও ভাল পথে নিয়ে

আসে। কিন্ত মালা?? মালা ব্যর্থ হয়েছে নিজ ভালোবাসায় স্বামীকে আটকাতে।পরী ভাবছে আর হাটছে। না জানি কোন অবস্থাতে বাড়ির সবাই রয়েছে? পথে যেতে যেতে অনেক পরিচিত মুখ ভেসে আসে। সম্পানের মা রাঁখি কেও দেখল। কেমন পাগলের মত চেহারা খানা হয়েছে তার। ক্ষেতের ভেতর থেকে

শাকপাতা তুলছে সে। ইন্দু কেও দেখল মহেশের হাত ধরে বাজার থেকে ফিরছে। লখা পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলা করছিল।বাবা আর দিদিকে দেখে সেও ছুটল। পরী ভাবল সবাই কি পেছনের কথা ভুলে গেছে? মনে থাকলে এত হাসিখুশি সবাই থাকতে পারত কি? কিন্তু পরী তো কিছু ভুলতে পারছে না! ভাবতে

ভাবতে পরী পৌঁছে যায় জমিদার বাড়ির সামনে। ভেতরে ঢুকতে বুক কাঁপে না পরীর। একটুও মৃত্যুর ভয় সে না করে বিনা বাক্যে প্রবেশ করে সে।সিমেন্টে আবৃত সোনালীর খাতাটায় কলম চালাচ্ছে পরী। গতকাল থেকে এসেই সে লিখছে। চার দেয়ালের ভেতর থেকে সে প্রয়োজন ব্যতীত একবারের জন্যও

বের হয়নি। তার আর শায়েরের ভালোবাসার প্রতিটা মুহূর্ত তুলে ধরছে সে। যেমনটা সোনালী তার রাখালের প্রতি অনুভূতি তুলে ধরেছিল। পরী খাতাটায় কিছু লিখত না যদি রুপালির লেখা দেখত। সিরাজের প্রতি ভালবাসা যে এখনও ওর রয়ে গেছে। যা দেখে ঘৃণা হল পরীর। তবুও তা ভালবাসা। পৃথিবীর

সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিটাও কারো না কারো প্রিয়। তাকেও কোন নারী নিঃসন্দেহে ভালবাসে। রুপালি সিরাজ কেও সে তালিকায় রেখেছে বলেই এখনও ভালবাসে। তবে ভালবাসা সত্ত্বেও রুপালি সিরাজকে শাস্তি দিয়েছে।

রুপালি ওই খারাপ মানুষটিকে সত্যিই খুব ভালোবেসেছিল। কিন্তু কপালে ওর সুখ ছিল না।

পরী বেশি কিছু লিখল না। তার লেখা শেষ করে বই খাতার মাঝে চাপা দিল খাতাটা।কালকে জমিদার বাড়ির আঙিনায় আসতেই সবার পরিবর্তন পরীর চোখে পড়ল। তবে আফতাব আর আখির কে সে দেখল

না। বাড়িতে এসে সে জানতে পেরেছে চিঠি গুলো রুপালি ইচ্ছাকৃত ভাবে লেখেনি তাকে জোর করে লিখিয়েছে আখির। নাহলে মালার ক্ষতি করে দেবে সে। পরী বুঝল যে শায়ের এসব বুঝতে পেরেই কোন প্রতিক্রিয়া করেনি। পরী বুঝতে পারেনা কেন এতো মিথ্যার পর্দা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে? কেন এই

সুন্দর প্রকৃতিও সত্য বলে না? এসব ভাবতে লাগল পরী। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না সে ভাবনা। মালার ডাকে বের হয়ে এল সে। উঠোনে আসতেই বাকি সবাই কে একসাথে দেখতে পেল সে। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে এগিয়ে গেল সে। বলল,'সব গুছিয়ে নিয়েছো সবাই?'মালা নিজের হাতের ব্যাগটা

মাটিতে রেখে বলে,’সব গোছাইছি। আর দেরি করিস না পরী। চল যাই।’

পরী সবাইকে নিয়ে অন্দর পেরিয়ে বৈঠকে গেল। কিন্ত সেখানে পৌঁছাতেই রক্ষিরা ওদের পথ আটকাল। পরী তাদের কিছু না বলে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পরীও চাইছিল আফতাবের মুখোমুখি হতে।

তাই ওরা অন্দরে ফিরে এল। সারাদিন অন্দরের উঠোনে বসেই কাটিয়ে দিল সবাই। কুসুমের চোখে মুখে আতঙ্ক। সে বলে ওঠে,'আপা আমার ডর করতাছে। আপনের বাপে আমাগো যাইতে দিব না।'

-'তুই চুপ থাক করে থাক কুসুম। আজকে ওই লোকটার সাথে আমার শেষ বোঝা পোড়া।'জেসমিন কাচুমাচু

হয়ে এক কোণে বসে আছে। পরীর সাথে সেও জমিদার বাড়ি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে গৃহে শান্তি নেই সে গৃহ বসবাসের অযোগ্য। তাই পরীর এক কথায় মালা,জেসমিন, কুসুম শেফালি ও রুপালি বাড়ি ছাড়তে রাজি হয়। তারা সবাই অতিষ্ঠ। মালা বুঝতে পারে না হঠাৎই পরী এই সিদ্ধান্ত নিল কেন?

হয়তো পরীর পরিকল্পনায় ভ*য়া*বহ কিছু আছে। যা সম্পূর্ণ করার আগে ওদের সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে চাইছে। মালা নিজেও ধৈর্যহীন হয়ে গেছে। তাই পরীর ভরসায় সব ছাড়তে চাইছে। কিন্তু আফতাব কি বলবে? আদৌ কি ওদের যেতে দিবে? নাকি পরীর উপর আবার হামলা করবে? এসব

চিন্তাতে সারাদিন গেল সবার। বিকেলের দিকে আফতাব আখির দুজনেই এলো। তারা আগেই খবর পেয়েছে যে পরী জমিদার বাড়িতে ফিরেছে। দূর গ্রামে একটা কাজে গিয়েছিল তারা তাই আসতে দেরি হয়েছে। দুই ভাই তৈরি হয়েই এসেছে। পরী স্বাভাবিক ভাবেই উঠে দাঁড়াল। আফতাব বলল, ‘তাহলে

আবার ফিরলে তুমি!! তো এবার কাকে মা*রতে এসেছো?’

-‘আমি কাউকে মা*রতে আসিনি। আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাব আমরা।’আফতাবের পরিবর্তে আখির জবাব দিল,’তাহলে গ্রামের লোকজন কি বলবে? কি বলব সবাইকে?’

মুহূর্তেই পরীর চোখে রাগ দেখা দিল,’আপনি চুপ থাকবেন নাহলে আমার পরিকল্পনা বদলে যেতে পারে। আপনার উপর আমার নজর পড়লে আপনারই বিপদ।’

অতঃপর আফতাবের দিকে তাকিয়ে বলে,’আমি কোন শ*ত্রুতা করতে আসিনি। একজন পিতা তার কন্যাদের হ*ত্যা করতে চায় তা

আমি এই প্রথম আপনাকে দেখলাম। যাই হোক আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি চাই আপনি আমাদের যেতে দিন। আর কখনো এই গ্রামে আমরা পা দেব না।’-‘ভাই পরীর কথা শুনবেন না। ও এখন সবাইকে সারিয়ে নিচ্ছে যাতে পরে আমাদের উপর আ*ক্র*মণ করতে পারে। আমি সব

বুঝতে পারছি। পরী তুই একবার যখন আমাদের জালে এসে পড়েছিস তাহলে তোকে আমরা যেতে দিব না। দিনের বেলা দিবা স্বপ্ন দেখিস না তুই।'

পরী হেসে গিয়ে বারান্দায় বসল। আফতাব আখির কিছুই বুজল না পরীর এহেম কান্ডে। আফতাব দেখল পরী ব্যতীত সবাই যার যার

ঘরে চলে গেছে। এতেও আফতাব অবাক হল তবে তা আমলে নিল না। সে পরীকে বলে উঠল,’তুমি যদি এখানে না আসতে তাহলে তোমাকে খুঁজে বের করতাম। এখন দেখি তুমি সহজেই ধরা দিয়েছো?’

আফতাবের কথায় পরী চোখ তুলে তাকাল বলল, ‘আমি কি সত্যিই আপনার মেয়ে? নাকি আপনিও

আপনার ভাইয়ের মতো!!’হুঙ্কার ছাড়ে আফতাব,’মুখ সামলে কথা বলো পরী?

তোমার ভয় হচ্ছে না। আজ তোমাকে কঠিন মৃত্যু দেব আমি!’

-‘আপনার ভাইকে তো আমি অকেজো বানিয়েছি কিন্ত আপনার এই অবস্থা কে করল?’

আফতাব তেড়ে এল পরীর দিকে। তখনই একটা নারী কণ্ঠ ভেসে আসে,’পরীর গায়ে হাত দিলে তোমার হাত ঠিক থাকব না কইয়া দিলাম।’

আফতাবের চোখ গেল জেসমিনের দিকে। এতটা উন্মাদ হতে জেসমিন কে সে প্রথম দেখল। কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা তে তেজি ভাবটা ফুটে

উঠেছে। তার চেয়ে বড় কথা জেসমিনের হাতে রয়েছে বড় ত*লো*য়া*র খানা। শুধু জেসমিন নয়। মালা রুপালি কুসুম আর শেফালিও রয়েছে। জেসমিন বলে ওঠে,’অনেক তো দাপট দেখাইলেন। এইবার আমরা মাইয়াগো দাপট দেখেন। বড় আপা আর আমি কম সহ্য করি নাই। আইজ হয় আমাগো

যাইতে দেবেন নাইলে আপনার জা*ন আমি নিমু। ভাবছিলাম স্বামী হ*ত্যা মহাপাপ। এখন বুঝতে পারছি আপনের মত স্বামী হ*ত্যা সবচাইতে বড় পূর্ণ।'জেসমিনের এই রূপ সবাইকে অবাক করে দিয়েছে শুধু পরী হাসছে। আখির আফতাবের কানে ফিসফিস করে বলে,'পরিস্থিতি ভাল না ভাই। সবাইকে পরী এসব

বুঝিয়েছে। ওদের আজ ছেড়ে দিলে পরে আবার আমাদের উপর হামলা করবে। পুলিশ কেও বলতে পারে। তাই ওদের এখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত।'

-'তাহলে গ্রামের লোকদের কি বলব? সবাই যখন জানতে চাইবে কি বলব? গ্রামের সবার সাথে তো আমরা পারব না।'

-‘ওসব পরে ভাবা যাবে। আপনি এক কাজ করুন। এখন সবাইকে বেঁধে ফেলুন। রাতের আঁধারে সবাইকে বাগান বাড়িতে নিয়ে শেষ করে দিব।’

আফতাব সব রক্ষিদের ইশারা করতেই তারা প্রথমে পরীর দিকে এগোলো। জেসমিন সামনে এসে সবাইকে বারণ করতে লাগল কিন্ত

কেউই তার কথা শুনছে না। শেষে সে ত*লো*য়ার চালিয়ে দেয়। পরীর মত দক্ষ নয় জেসমিন। তাই তার হাতটা একজন রক্ষি বন্দি করে নিল তার হাত দ্বারা। পরী এক মুহূর্ত দেরি না করে লাথি মারে রক্ষির বুক বরাবর। এবং মালার থেকে ছিনিয়ে নেয় ত*লো*য়ার। সাথে সাথেই একজনের বুক ভেদ করে পরীর

সেটা। তাজা র*ক্ত গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সেও লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বাকি সবাই পিছিয়ে গেল। আখির দ্রুত বাইরে গিয়ে বাকি সবাই কে ডেকে আনে। যাতে পরীর বিরুদ্ধে ল*ড়াই করা সহজ হয়। ঘটনার সবকিছু দ্রুত ঘটতে লাগল। আশেপাশের সবকিছুই বুঝে ওঠা মুশকিল। এসব দেখে ভয় পেল

মালা। ভ*য়ংক*র কিছুর আভাস পাচ্ছে সে। বাপ মেয়ের যু*দ্ধ শেষে কোন দিকে মোড় নেবে? ওরা তো চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্ত আফতাব তাতে বাঁধা দিয়ে সব গন্ডগোল পাকিয়ে দিল।

পরীর সাথে মালা বাদে বাকি সবাই যোগ দিল। তবে এত গুলো লোকের সাথে পেরে ওঠা কষ্টকর। বাইরে

থেকে লোকজন আরো আসার আগেই কুসুম অন্দরের লোহার দরজাটা আটকে দিল। রক্ষিদের হাতে শুধু লাঠি ছিল। অ*স্ত্র থাকে বাগান বাড়িতে। কিন্তু পরী যে অন্দরে অ*স্ত্র রেখেছে তা জানা ছিল না কারো। অ*স্ত্র থাকার কারণে আফতাবের লোকেদের কাবু করা খুব বেশি কঠিন হল না।

র*ক্ত*স্রো*তে ভেসে গেল অন্দরের উঠোন। তবে সবার দেহেই প্রাণ আছে কিন্ত যখম হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে দাঁড়াতে পারছে না বিধায় মেঝেতে শুয়ে রইল। আর কিছুক্ষণ পর বোধহয় তাদের প্রাণপাখি উড়াল দিবে।

পরিস্থিতি খারাপ দেখে আখির দরজা খুলে পালিয়ে যাচ্ছিল। রুপালি পেছন

থেকে টেনে ধরে। আখিরকে উদ্দেশ্য করে বলে,'কু*ত্তা*র বাচ্চা। এখন পালাচ্ছিস কেন? আমাদের মা*রবি না? নারী শক্তি কখনো দেখেছিস? তবে আজ দেখ।'

রুপালি আখিরকে মারতেই যাবে তখনই ভারি কিছুর আঘাতে ওর দেহ শান্ত হয়ে গেল। সবাই স্তব্ধ হয়ে তাকাল আফতাবের দিকে।

রক্ষিরা সব এক দিকে সরে দাঁড়াল। রান্না ঘর থেকে পাথর এনে রুপালিকে আঘাত করেছে আফতাব। পরী বোনের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেশ।তখনই পরিচিত কন্ঠস্বরে চোখ তুলে তাকাল। শায়ের আর নাঈম এসে পৌঁছে গেছে। চোখাচোখি হল শায়েরের সাথে

পরীর। কিন্ত সে দৃষ্টিও সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল। রুপালির ত*লো*য়ার খানা পরীর পিঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে আখির। কিন্ত পরী নির্জীব। শান্ত দৃষ্টিতে সে তার স্বামীকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। শায়ের “পরীজান” বলে চিৎকার দিয়ে এগিয়ে গেল। কারো ভাবনাতে আসেনি আখির পরীকে আঘাত করে

বসবে। আফতাব কাউকেই হ*ত্যা করার হুকুম করেনি। সবাইকে বাগান বাড়িতে নিয়ে শান্ত ভাবে হ*ত্যা করে ওদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বিক্রি করে দিত। কিন্ত রুপালি আখির কে মা*রতে গিয়েছিল বিধায় একাজ করতে হল তাকে। তবে আখিরের যে শেষমেশ পরীকে

আ*ঘাত করবে তা আফতাব ও ভেবে বসেনি।

পরীকে আ*ঘাত করে আখিরও বেশিক্ষণ শ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারল না। জেসমিনের আ*ঘাতে খন্ডিত হল আখিরের দেহখানা। পরীকে আ*ঘাত করার সাথে সাথেই জেসমিন আখিরের পিঠ ত*লো*য়ার চালিয়ে দেয়। যার ফলে সেও

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।পরী মাটিতে পড়ার আগেই শায়ের তাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে। বেশিক্ষণ শায়ের কে দেখতে পারল না পরী। এমনকি কিছু বলতেও পারল না। কিন্ত ওই খোলা চোখদুটো যেন অনেক কিছুই বলতে চাইছিল শায়ের কে। তা আর বলা হল না। পরী শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিল। তা

হল,'আমার পরিবারের দায়িত্ব আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। আপনি সবাইকে রক্ষা করবেন।'

পরীকে বুকে জড়িয়ে ধরে শায়ের। খুব শক্ত করে ধরে। ওর চোখ থেকে জল গড়ায় না। তার অর্ধাঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরে সে যেন শান্তি অনুভব করে। কিন্ত আজকের পর থেকে এই শান্তি শায়ের আর

পাবে না। সে আস্তে করে বলে ওঠে,’আমার দায়িত্ব কে নেবে পরীজান? আপনি হিনা আমি কীভাবে থাকব? আরেকটু থেকে গেলে হত না?’

শান্ত অন্দরের দেয়ালে বারি খাচ্ছে শায়েরের কথা গুলো। প্রিয়তমাকে সে অনেক কথাই বলছে। তার সাথে আর কটাদিন থাকার অনুরোধ

করছে খুব করে। কিন্ত প্রকৃতি যে বড়ই নিষ্ঠুর। চোখের জলে যদি প্রিয় মানুষটা ফিরে আসত তাহলে পৃথিবীর কেউ সঙ্গিহীন হত না। শায়েরের আসতে যে খুব দেরি হয়ে গেছে। নাহলে পরীকে সে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা সে করত।মুসকান তার চোখের পানি আটকাতে পারেনি। শায়ের পরীর

ভালোবাসার কাছে সে মাথা নত করে ফেলেছে। শায়েরের বলা প্রতিটা কথাই বেদনা দায়ক। নিজেকে তাই ধরে রাখা অসম্ভব। সে বেদনাত্মক কণ্ঠে বলে,'পরী তাহলে জীবিত নেই!! আর ওই খু*ন গুলো আপনি করেননি। তাহলে নিজের ঘাড়ে কেন সব দোষ নিলেন?'

-‘আমার পরীজান তার পরিবারকে রক্ষা করতে বলেছিল। আমি তাই করেছি। এর বিনিময়ে আমি আমার পরীজানের কাছে চলে যাব। এর থেকে সুখকর আর কি আছে?’-‘জমিদার আফতাব তো বেঁচে ছিল। ওনাকে কে মা*রল?’

-‘পরীজানকে নিয়ে চলে আসার পর ওনার দুই স্ত্রী তাকে খু*ন করেছে?’

-‘ওনারা এখন কোথায়? আর পরীকে নিয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?’

শায়ের বেশ বিরক্ত হল মুসকানের কথায়,’আপনি অনেক বেশি প্রশ্ন করেন!! বিরক্ত লাগলেও আমাকে বলতে হবে। আমি আমার পরীজান কে নিয়ে নবীনগর ফিরে যাই। সেখানেই তাকে কবর দেই। এবং

তিন বছর সেখানেই ছিলাম। তারপর পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।’

-‘বুজলাম না আপনার কথা। আপনি যদি তিনবছর নবীনগর থাকেন তাহলে পরীর মা মালা ও জেসমিন কোথায়? আর জুম্মান পিকুল ই বা কোথায়?’-‘জানি না ওনারা কোথায়!! কিন্ত ওইদিন আমি সবাইকে

বলেছিলাম ওনারা যেন দূরে কোথাও চলে যায়।’

মুসকান আর শায়েরের সামনে বসে থাকল না। উঠে চলে গেল। নুরুজ্জামান ও এতক্ষণ সব শুনছিল। সে বুঝতে পারে শায়ের নির্দোষ হয়েও নিজের ঘাড়ে সব দোষ কবুল করে নিয়েছে। মুসকান নুরুজ্জামানের সাথে তার কেবিনে

গিয়ে বসল। তারপর রেকর্ডারটা নুরুজ্জামানের কাছে দিল। গোপনে সে শায়েরের সব কথাই রেকর্ড করে ফেলেছে। নুরুজ্জামান সেটা হাতে নিয়ে বলল,'এই কেস এবার ঘুরবে। সবার আগে প্রধান আসামীদের গ্রেফতার করতে হবে। আমার মনে হয় আপনার স্বামী মানে ডক্টর নাঈম সব জানে। আগে তাকেই প্রশ্ন

করতে হবে।’বাদল দিনের মতো করে বৃষ্টি ঝরছে শহর জুড়ে। হঠাৎ বৃষ্টিতে এলোমেলো হয়ে গেল মানুষ জন। অনাকাঙ্খিত কোন কিছুই ভাল না। যেটা এই বৃষ্টি প্রমাণ করে দিচ্ছে। ফল ফলাদির দোকানিরা তাদের জিনিস পত্র ঢাকতে ব্যস্ত। হাসপাতালের সামনেই সারিবদ্ধ ভাবে ফলের দোকান রয়েছে।

কেননা রোগীর জন্য ফলের বিশেষ প্রয়োজন। আত্মীয়রা দেখতে আসলে ফল নিয়েই আসে। দোকানিরা কুল হারালো বৃষ্টির জন্য। ফলমূল বৃষ্টি থেকে আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। এমনি সময় পুলিশের জিপ টা থামল। নুরুজ্জামান বৃষ্টি মাথায় তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালের ভেতরে চলে গেল। ওনার সাথে

মুসকান ও এসেছে। নাঈম তার চেম্বারে বসে রোগী দেখছে। এসময়ে পুলিশ দেখে সবাই স্বাভাবিক ভাবেই নিল। কারণ দেশে খু*ন খা*রাবি অহরহ ঘটছে। হাসপাতালে পুলিশের আসাটা স্বাভাবিক।নাঈমের ডাক এলো তাকে নুরুজ্জামান জরুরী তলব করেছেন। তবে এতে তার ভাবান্তর নেই। সামনের রোগীকে

প্রেসক্রিপশন লিখে বিদায় করে দিয়ে নুরুজ্জামান কে ভেতরে ডাকে। নাঈম হেসে তাকে বসার জন্য বলে। সাথে মুসকান কে দেখে অবাক হল না সে। নাঈম বলল,'আমি জানতাম আপনি আসবেন।'

কথাটা সে নুরুজ্জামান কে উদ্দেশ্য করেই বলে। নুরুজ্জামান কথার পিঠে জবাব দেয়,'কীভাবে জানলেন

যে আমি আসব?’-‘আমার মনে হয় আপনি যে জন্য এসেছেন সেই বিষয়ে কথা বলাই ভাল।’

নুরুজ্জামান ঝেরে কাশলেন,’সেহরান শায়ের, যার ফাঁ*সি আগামীকাল রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে হওয়ারকথা ছিল। কিন্তু আজ জানতে পারলাম যে খু*ন গুলোর দায়ে তাকে ফাঁ*সি দেওয়া হচ্ছে সেই খু*ন গুলো সে

করেনি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি সবটাই জানতেন। তাহলে কেন বলেননি আমাদের? আর পরীও যে মারা গেছে সেটাও বলেননি। কেন? আর কি কি লুকানো আছে সেটা আপনি বলুন।’

নাঈম এক পলক মুসকানের দিকে তাকিয়ে আবার নুরুজ্জামানের দিকে তাকাল,’আজকে দেখছি আমাকে

বাকিটুকু বলতে হবে। দেখুন আমি চেয়েছিলাম শায়ের নিজের মুখেই সব বলুক। সে যে কতটুকু বলবে সেটাও আমি জানি। হ্যা আমি জানি শায়ের ওই খু*ন গুলো করেনি। পরীর দুই মা আর কাজের মেয়ে দুজনকে বাঁচানোর জন্য শায়ের নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়েছে। পরী শায়েরের সম্পর্কে আপনি যতটুকু

জানেন আমি তার থেকেও বেশি জানি। ওরা একে অপরের পরিপূরক। ভালোবাসার প্রতিযোগিতা সর্বক্ষণ দুজনের মধ্যে চলে। তাই পরীর কথাটা শায়ের ফেলতে পারেনি। আর আমিও তাই চুপ ছিলাম।’নুরুজ্জামান রুষ্ঠচিত্ত কণ্ঠে বলে,’এতে আপনিও অন্যায় করেছেন জানেন কি?’

-'তাহলে অন্যায় আমি করেছি। যদি আপনি শাস্তি দিতে চান তো পারেন।'

-'আপনি এটা বলুন যে পরীর দুই মা ভাই আর কাজের মেয়ে দুটো এখন কোথায় আছে? আমি নিশ্চিত আপনি জানেন ওরা এখন কোথায়?'

মৃদু হাসে নাঈম,'শায়ের বোধহয় জানত যে এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি

আমাকে হতে হবে। সেজন্য ওদের দায়িত্ব টা প্রথমে আমাকে দিলেও পরে সে নিজে ওদের সরিয়ে দেয় অন্য কোথাও। তবে এই মুহূর্তে আমি সত্যিই কিছু জানি না।'

মুসকান কে সাথে করে নুরুজ্জামান আবার থানার উদ্দেশ্যে রওনা হল। নাঈমের কাছে আর কোন প্রশ্ন আপাতত তার কাছে নেই। পরে

মনে পড়লে আবার আসা যাবে। ইতিমধ্যে শায়েরের ফাঁ*সি বাতিল হয়েও গেছে। উপরমহলে শায়েরের বলা কথাগুলোর রেকর্ড পাঠানো হয়েছে। আবার নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উপর থেকে।
গাড়িতে বসে মুসকান বলল,’ওই হ*ত্যা*কান্ডের তিনবছর পর শায়ের কে গ্রেফতার করেন আপনারা। আর

বাকি তিনবছর শায়ের কারাবন্দি হয়ে ছিল। তারপর ফাঁ*সির হুকুম আসে। হিসেব টা কেমন জানি অন্যরকম হয়ে গেল না?'-'শার কে ধরার পর দুইবছর ধরে ওর তদন্ত চলে। আইন এতই সহজ নাকি? শায়েরের ফাঁ*সির দিন আরো আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু

শায়েরের ইচ্ছা অনুযায়ী কালকের দিন ঠিক করা হয়।’

-‘শায়েরের ইচ্ছা অনুযায়ী!!’

-‘এটাই তার শেষ ইচ্ছা ছিল। আর মৃ*ত্যুর আগে আসামীদের শেষ ইচ্ছা পূরণের নির্দেশ আদালত দিয়ে থাকে। শায়েরের ইচ্ছাটা অদ্ভুত ছিল। তবুও এক বছর পিছিয়ে যায় ওর ফাঁ*সির। আর এখন ওর

ফাঁ*সিই বাতিল। সময় বড়ই অদ্ভুত। সময়ের সাথে কেউ মৃ*ত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তো কেউ বেঁচে যায়।'

থানায় এসে ওনারা দুজনে আবারও শায়েরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। শায়ের এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে যে মুসকান সব সত্য বলে দিয়েছে। সে বলে উঠল, 'আপনি কাজটা ঠিক করলেন না।'

-‘আপনিও কাজটা ঠিক করেননি। কেন নির্দোষ হয়েও দোষী হলেন? এখন আপনার এই খবর সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যাবে।’-‘এমনটা করবেন না। পৃথিবীর কেউ যেন এই খবর না জানে।’

শায়েরের কথায় বিষ্মিত হল মুসকান,’আপনি এখনও এসব বলছেন? আত্মত্যাগ করা যায় কিন্তু

আপনার মত আত্মত্যাগ ক’জন করে। সেটাই এবার বিশ্ব জানবে।’

-‘বিশ্ব আমার আত্মত্যাগ দেখবে না তারা দেখবে বিশ্বাসঘাতকতা। আপনি এই খবর কাগজে ছাপালে সবাই জেনে যাবে পরীজানের বাবা কাকার হিং*স্র*তার কথা। মেয়েরা তাদের বাবাকে বিশ্বাস করতে পারবে না। কাকা ভাইকেও অবিশ্বাস

করবে। আশেপাশের কাউকেও ভরসা করবে না। তাহলে এসব গোপন থাকাই শ্রেয়। দো*ষীরা তো শাস্তি পেয়েছেই।'মুসকান ভেবে দেখল শায়েরের কথা গুলো চিরন্তন সত্য। এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় কিন্তু বদনাম হতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না। এখন সবাই যদি জানে

আফতাব পিতা হয়েও তার কন্যাদের হ*ত্যা করেছে তাহলে কোন মেয়েই তার বাবাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবে না। সব বাবা তো আফতাবের মত হয় না। কিছু বাবা মেয়েকে রাজকন্যা করে রাখেন। শায়েরের কথায় ফের মুগ্ধ হল মুসকান।

নুরুজ্জামান এবার শায়ের কে প্রশ্ন করল,’তোমার শ্বাশুড়ি এখন কোথায় আছে? কোথায় রেখে এসেছো তাদের?’

-‘আমি জানি না তারা এখন কোথায় আছে। জানলেও বলতাম না।’

-‘তুমিই তো ওদের সরিয়ে নিয়েছিলে। এখন সত্য বলো।’

-‘তিন বছর ধরে আমি জেলে বন্দি। আমি কীভাবে জানব তারা কোথায় আছে? আমি তাদের সিলেটের গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে তারা কোথায় আছেন তা জানা নেই। আর আপনারা ওনাদের সারা পৃথিবী ওলট পালট করে খুঁজলেও পাবেন না।’নুরুজ্জামানের রাগ হল শায়েরের উপর। তিনি

রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। ওনার কাছে কোন ছবি নেই যা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিবেন। কারণ তিনবছর আগে শায়েরের শ্বশুড়িই শায়েরের নামে কেস লিখিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। শায়ের কে ধরতেই তিনবছর লেগে গেছে। কোন খোঁজ নিতে পারেনি নুরুজ্জামান। তখন শুধু শায়ের কে

ধরার চিন্তাই ওনার মাথাতে ছিল। শায়ের যখন পুলিশের হাতে এল তখনই পরীর পরিবারের খোঁজ শুরু হল। কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নুরুজ্জামান ভেবেছিলেন শায়ের বুঝি সাক্ষীর অভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু শেষমেষ শায়ের নিজের মুখেই তার দোষ স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এখন এই কেসের

মোড় ঘুরে গেছে। অতি শীঘ্রই শায়ের ছাড়াও পেয়ে যাবে। শায়েরের মুখ থেকে আশানুরূপ আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আর না গেল নাঈমের থেকে। নুরুজ্জামানের সন্দেহ শায়েরের উপর থেকেই গেল। সে শায়ের কে ছাড়ল না। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রত্যক্ষ আসামী ধরা পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত

শায়ের কে কারাবন্দি হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই উপর মহল থেকে চাপ দিচ্ছে শায়ের কে মুক্তি দেওয়ার। কেননা বিনা দোষে শায়ের তিনবছর জেলে থেকেছে। আর এখন তাকে আটকে রাখার কোন মানেই হয় না। বাধ্য হয়েই শায়ের কে মুক্তি দেওয়া হল।ছাড়া পেয়ে শায়ের সর্বপ্রথম

নাঈমের বাসায় গেল। নাঈম ও তার অপেক্ষাতেই ছিল। শোভন কে কোলে নিয়ে বসে আছে মুসকান। এই ছোট্ট ছেলেটাকে আদর দিয়ে বড় করেছে সে। মা না হয়েও মায়ের আদর স্নেহ দিয়েছে। আজ সে কীভাবে শোভনকে শায়েরের কাছে দিয়ে দেবে? বুক ভেঙে কান্না আসছে ওর। চোখ থেকে পানি

গড়িয়ে পড়ছে। শোভন অনেক বার জিজ্ঞেস করছে মুসকান কাঁদছে কেন? কোন উত্তর দিতে পারেনি সে। শুধু অশ্রুসিক্ত নয়নে শোভনের দিকে তাকিয়ে রইল।

দরজা খুলে শায়ের কে ভেতরে আনল নাঈম। শায়ের কে দেখেই কেঁপে উঠল মুসকান। দুহাতে আঁকড়ে ধরল শোভন কে। অচেনা

মানুষের আগমন ঘটতেই শোভন প্রশ্ন করে বসে,’ইনি কে আম্মু?’

সবার দৃষ্টি ঠেকল শোভনের মুখপানে। নাঈম কোন ভনিতা না করেই জবাব দিল,’তোমার আব্বু।’

ছোট্ট শোভন অবাক চোখে দেখল শায়ের কে!! শুভ্র পাঞ্জাবিতে আবৃত পুরুষটির মুখভর্তি দাঁড়ি। চুল গুলো এলোমেলো। কিন্ত চোখের দিকে

তাকাতেই স্থির হল শোভনের দৃষ্টি। হিসেব মিলাতে পারছে না শোভন। মুসকানের কোল থেকে নেমে সে নাঈমের হাত ধরে বলল,'আমার আব্বু তো তুমি!! তাহলে এই লোকটা আমার আব্বু হল কীভাবে?'নাঈম হাটু গেড়ে শোভনের সামনে বসে পড়ে। দুহাতে শোভনের গাল দুটো ধরে বলে,'দেখো বাবাই

আমরা সবসময় চোখে যা দেখি আর কানে যা শুনি তা সত্য হয় না। সেরকমই তুমি এতদিন যাদের মা বাবা বলে জেনে এসেছো তারা তোমার বাবা মা নয়। তোমার বাবা ওই যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে উনি। আর আজ ওনার সাথে তুমি চলে যাবে। একদম মন খারাপ করবে না।’

শোভন কি বুঝল তা জানে না নাঈম তবে শোভন বলে উঠল,'তাহলে আমার আসল মা কোথায়? আমাকে তোমাদের কাছে কেন দিয়ে গেছে?'

-'তোমার সব প্রশ্নের জবাব তোমার আব্বুই দিতে পারবে। যাও তোমার আব্বুর কাছে।'নাঈম আর মুসকান কে করুন চোখে দেখে সে শায়েরের কাছে গেল। শায়ের এতক্ষণ চুপ

থেকে ছেলেকে দেখছিল। কতটা সহজে সব মেনে নিল। ছেলেটা পরীর স্বভাব পেয়েছে বটে। কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। শোভন কে কোলে তুলে নিল শায়ের। গালে হাত রেখে কপালে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিল ছেলেকে। বাবার গলা ধরে কাঁধে মাথা রাখল শোভন। বাবা বাবা গন্ধ পাচ্ছে তাই শক্ত করে বাবার গলা

ধরে রেখেছে সে। শায়ের চলে যাওয়ার আগে নাঈম মুসকান কে উদ্দেশ্য করে বলে,’আমি জেল থেকে ছাড়া পেতে চাইনি। কিন্তু যখন পেয়েই গেছি তখন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আলাদা দুনিয়ায় চলে যাব। আপনাদের ধন্যবাদ এতদিন আমার সম্পদ কে আগলে রাখার জন্য। আপনাদের এই ঋণ আমি

কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না।’শায়ের চলে যেতেই নাঈম বসে পড়ল মেঝেতে। এতক্ষণ বহু কষ্টে নিজেকে সামলেছে সে। কিন্তু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। এতদিন যাকে নিজ সন্তানের স্থানে রেখেছিল তাকেই আজ দূরে সরিয়ে দিল। মুসকান নাঈমের পাশে বসে কাঁদতে লাগল। মুসকানের কষ্ট যেন

একটু বেশিই হচ্ছে। নাঈম একহাতে মুসকান কে বুকে টেনে নিল। কষ্টের মাঝেও একটু খানি শান্তি অনুভব করল মুসকান। মানুষের একদিক দিয়ে কষ্ট আসলে অন্যদিক থেকে সুখ আসে যেন। আজ শোভন চলে গেল কিন্তু নাঈম কাছে টেনে নিল মুসকান কে।

সেদিনের পর আরও পাঁচ মাস কেটে গেছে। নুরুজ্জামান সবসময় শায়ের কে চোখে চোখে রাখত আড়াল থেকে। যদি কোন খবর পাওয়া যায়। কিন্তু নাহ,কোন খবর পাওয়া গেল না। শায়ের ছেলেকে নিয়ে দিব্যি দিন কাটাচ্ছে। এতে বিরক্ত নুরুজ্জামান। কেসটা এতদূর এসে থেমে গেল যেন। আর কোন তথ্যই

পাচ্ছেন না তিনি। শুধুমাত্র একটা খবর তিনি পেয়েছেন শুধু। সেটা হল জুম্মান ওর বাবার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাও বছর খানেক আগে। আর কিছুই জানা যায়নি। তাই এই কেস আপাতত বন্ধ।নতুন বাড়িতে বাবার সাথে বেশ কাটাচ্ছে শোভন। মুসকান আর নাঈম প্রায়শই দেখা

করতে আসে শোভনের সাথে। এভাবেই ওদের দিন কাটছে। একদিন সকাল বেলা হলুদ খামের চিঠি হাতে শায়েরের কাছে গেল শোভন। চিঠিটা শায়েরের দিকে এগিয়ে দিল শোভন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চিঠিটা খুলল সে।

“সাত বছরের অপেক্ষা শেষ হতে চলছে। আপনার শাস্তির মেয়াদ

শেষ। বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে কিন্তু মালির অভাবে তা খুব তাড়াতাড়ি ঝরে পড়তে চলছে। ভ্রমর গুলোও অভিমান করে ফিরে যাচ্ছে।সৌন্দর্য শূন্য হতে চলছে মন বাগান। শূন্যতা খুব শীঘ্রই পূর্ণতা পেতে চাইছে। এ দূরত্ব কি ঘুচবে না??"চিঠিটা পড়ে মৃদু হাসে শায়ের।

বাবার হাসি দেখে শোভন জিজ্ঞেস করে,'কার চিঠি ছিল আব্বু?'

শোভন কে কাছে টেনে নিল শায়ের। বুকে জড়িয়ে ধরে শুধালো,'নতুন দিনের সূচনা হতে চলছে আমার রাজকুমার। আমাদের গন্তব্য এখনও শেষ হয়নি। নতুন সফরের জন্য তৈরি হও।'এলোকেশী রাঁখি শাক তুলতে রাস্তার ধারে এসেছে। রাস্তার

পাশে পাট খড়ির তৈরি জানালা গুলো বাঁশের সাহায্যে দাঁড় করানো। পুঁই শাক গাছের লতাগুলো ছড়িয়ে আছে চারিদিক। বেশ দেখতে হয়েছে। ভাইয়ের ঘাড়ে বসে আর কতদিন খাবে সে? ভাইয়ের বউ কথা শোনাতে পারলেই বাঁচে। তাই শাক সবজি চাষ করে দুটো টাকা রোজগার করে। সম্পান থাকলে কি

এই দূর্দিন দেখতে হতো? ছেলেটা অভিমান করে তাকে ছেড়ে চলে গেল। সেই সময়ে লখা যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। হাতে তার গাঁধা ফুলের মালা। রাঁখির মনে পড়ে গেল আজ ইন্দুর ছোট ছেলের অন্নপ্রাসণ। মহা ধুমধামে তা পালন করা হচ্ছে। রাঁখি মনে মনে ভাবে যদি বিন্দু সম্পান থাকত তাহলে ওদের ঘরেও

সন্তান থাকতো। লখা রাঁখিকে দেখে জিজ্ঞেস করে,’কি’বা আছো মাসি? শরীর ভালা তো?’রাঁখি মলিন হাসিতে জবাব দিল,’ভালা রে লখা। ইন্দুর পোলা কি ভালা আছে?’

-‘ভালাই আছে। তুমি একটু পরে যাইও কিন্তু। আমার খারানের সময় নাই।’

লখা দ্রুত পায়ে প্রস্থান করে। লখার চলে যাওয়ার পর পরই চুল দাড়ি ভর্তি একটা পাগলের আবির্ভাব হলো। চুল দাঁড়ি এতই ঘন যে তাকে চেনার উপায় নেই। চেহারার ও বিচ্ছিরি অবস্থা। গ্রামের কিছু ছেলে মেয়ে পাগলটাকে উত্যক্ত করছে আর তার পিছু পিছু আসছে। রাঁখি আবার মুখ ফেরাল। এই পাগলটাকে

দেখে ঘৃণা হচ্ছে তার। কি নোংরা!! সুখানের পর আরো দুজন পাগল নূরনগরে দেখা গিয়েছে। তারা কোথা থেকে এসেছে নাম কি তা কেউই জানে না। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় ও নেই। এতে গ্রামের কোন ব্যক্তি মাথা ঘামায় না। পাগলের আবার কিসের পরিচয়? রাঁখি শাক তুলে নিয়ে চলে গেল।

পিছন ফিরে ছেলে মেয়ে গুলোকে হাসি ঠাট্টা করতে দেখে হাসল সে। আস্তে করে বলে উঠল,'যেমন কর্ম তেমন ফল। যে রাজ্য চায় সে হয় ভিখারি।'চোখের জল মুছে রাঁখি নিজ গন্তব্যে চলে গেল।

শোভন আজকেও একটা হলুদ খামের চিঠি পেলো। পিয়ন চিঠিটা দিতেই ওলট পালট করে দেখল

সে। চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে তা দেখতে চাইল। কিন্তু প্রেরকের কোন ঠিকানা নেই। বিরক্ত হল শোভন। নাকের ডগা ক্রমশ লাল হতে লাগল তার। সামনের দোকানে চিনি কিনতে গিয়েছিল সে। শায়ের বারণ করা সত্ত্বেও সে চিনি কিনে বাসায় ফিরছিল। বাসার গেইটের সামনে এসে দাঁড়াতেই পিয়ন চিঠিটা ধরিয়ে

দিয়ে গেল। শোভন ধীর পায়ে ঘরে ঢুকতেই চেয়ারে বসা নুরুজ্জামানের দিকে চোখ গেল ওর। শায়েরের সাথে হাত নাড়িয়ে কথা বলছেন তিনি। চিঠিটা মুড়িয়ে মুঠোবন্দি করে নিল সে। যথা স্থানে চিনি রেখে শায়েরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। নুরুজ্জামান এতক্ষণে শোভন কে খেয়াল করে। শোভন পকেট থেকে

চিঠিটা বের করে শায়েরের দিকে তুলে ধরে বলে,'আব্বু তোমার চিঠি এসেছে।'

শায়ের থমকালো!! নুরুজ্জামানের সামনেই দিতে হল চিঠিটা!! বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল শায়েরের কপালে। ছোঁ মেরে চিঠিটা নুরুজ্জামান কেড়ে নিলেন। খাম খুলে চিঠি বের করে পড়তে লাগলেন।

তবে লেখাগুলো পড়ে তার ভাব ভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর শায়েরের দিকে সেটা এগিয়ে দিল। শায়ের ভেবাচেকা খেয়ে গেল। সে নিজেও পড়া শুরু করল,“আমি তোমাকে খুব ভালবাসি আব্বু। তুমি পৃথিবীর সেরা আব্বু। আমাকে কত আদর করো!! আমি তোমার সাহসী রাজকুমার।”

চোখ তুলে শায়ের ছেলের দিকে তাকাল। শোভন খিলখিল করে হেসে উঠল। তাজ্জব বনে গেল নুরুজ্জামান। তিনি এসেছিলেন শায়েরের সাথে কেস নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু আশানুরূপ কিছুই পেল না। উল্টে বোকা বনে গেল। সে ভেবেছিল এই চিঠিতে বোধহয় কিছু আছে। কিন্তু তার

ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। নুরুজ্জামান চলে যেতেই শোভন পকেট থেকে আসল চিঠিটা বের করে দিল। শায়ের বেশ অবাক হল ছেলের কান্ডে। এতটা চতুরতার সাথে কাজটা করল কীভাবে সে? ভয় পাইয়ে দিয়েছিল!! মায়ের মতোই হয়েছে একদম। শায়ের

হাসল আবার। শোভন জিজ্ঞেস করে,’আমরা কবে যাচ্ছি আব্বু??’

-‘খুব শীঘ্রই যাব আমার রাজকুমার। তোমার জন্য অনেক বড় উপহার আছে সেখানে।’

-‘উপহারটা কি তা আমি জানি!!’

-‘তুমি জানো? কীভাবে?’শোভন কিছু বলল না। চুপ করে নিজের ঘরে চলে গেল। স্কুল ব্যাগটা খুলে একটা

খাতা সে বের করল। সিমেন্টের মলাটের খাতাটা শোভনের অনেক বার পড়া হয়ে গেছে। বাংলা রিডিং সে খুব ভাল করেই পড়তে পারে। শোভন এই খাতাটা মুসকান কে অনেক বার পড়তে দেখেছে। তাই নিজের ব্যাগে করে খাতাটা সে নিয়ে এসেছে। এই খাতাটা অনেক বার তারও পড়া হয়ে গেছে। শেষে কিছু

বাক্য পরী শোভনের জন্য লিখে গেছে,”আমার রাজকুমার আল্লাহর অনুমতি তে আমাদের আবার মুলাকাত (দেখা) হবে।”

সেই লেখাটায় হাত বুলিয়ে খাতাটা বুকে চেপে ধরল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল,’আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন আম্মিজান।’

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শায়ের ছেলের কথা শোনে। এতটা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এই ছেলে!! যা শায়ের কে প্রতি পদে পদে বিষ্মিত করে দিচ্ছে। নুরুজ্জামান কে যেভাবে ঘোল খাওয়ালো!! ভাবতেই হাসি পেল ওর।মুসকান কে তাড়া দিচ্ছে নাঈম। তৈরি হতে সময় লাগছে বলে মৃদু ধমকাচ্ছে। আপাতত

নাঈমের কথায় পাত্তা দিচ্ছে না মুসকান। সবুজ রঙের শাড়িটি পরিপাটি করে পড়ে তারপর বের হল সে। আজকে দুজনেই কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে। কিন্তু মুসকান জানে না নাঈম তাকে এখন কোথায় নিয়ে যাবে? অনেক বার জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর মেলেনি স্বামীর কাছ থেকে। তাই হতাশ হয়ে

নাঈমের পিছু ধরে সে। মুসকানের একটা হাত চেপে ধরে নাঈম। এতে মৃদু হাসি ফুটল মুসকানের ওষ্ঠাধরে। নাঈম রিক্সা ডেকে তাতে উঠে পড়ে। মুসকানের এতদিনে মনে হচ্ছে ওরা স্বামী স্ত্রী। এতগুলো বছর শোভন ছাড়া নাঈম কিছুই বোঝেনি কিন্তু আজ নাঈম মুসকানের এত কাছে এসেছে। ভালোই লাগছে

মুসকানের। এতদিনে অন্তত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক টা গাঢ় হয়েছে।

রিকশা থেকে নেমে ট্যাক্সি নিল ওরা। নাঈম এখনও মুখ খোলেনি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ট্যাক্সি থামে। মুসকান অবাক হয়ে চারিদিক দেখে। সাংবাদিক হওয়ার দরুন দেশের সব জায়গাতেই সে গিয়েছে। এই স্টেশন থেকে ঢাকা টু

কলকাতার ট্রেন ছাড়ে। মানে ভারত যাওয়ার ট্রেন। মুসকান অবাক হল এই ভেবে যে নাঈম এখানে কেন আসল? মুসকান কে সাথে নিয়ে আসার কারণ কি? নাঈমের তো কোন আত্মীয় ভারত থাকে না। তাহলে এখানে আসার কারণ টা কি? এসব ভাবতে ভাবতেই হাতে টান পড়ল। নাঈম ওর হাত ধরে

স্টেশনের ভেতর নিয়ে গেল। মুসকান ও পা চালায় নাঈমের পিছু পিছু। কিছুদূর গিয়ে শায়ের কে দেখেই থমকে যায় সে।সাদা রঙের পাঞ্জাবি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে শায়ের। হাতা কনুই পর্যন্ত গোছানো। চোখে সুরমা দেওয়া। ঠোঁটে সুন্দর হাসি। পরীর বলা মালির সৌন্দর্য চোখের সামনে দেখছে সে। পরীর বর্ণনা

হুবহু মিলে গেছে। তবে মুসকান আরও অবাক হল শোভন কে দেখে। অবিকল বাবার বেশ ধারণ করেছে সে। টানা টানা চোখে সুরমা পড়েছে বাবার মতো। সাদা পাঞ্জাবি গায়ে জড়ানো। মুসকান কে চোখে পড়তেই শোভন দৌড়ে গিয়ে ওর কোলে উঠে পড়ল। মুসকান শোভন কে বুকে জড়িয়ে ধরে নাঈমের

দিকে তাকাল সে। নাঈম বুঝল এবার তার চুপ থাকলে চলবে না,’শায়ের শোভন কে নিয়ে কলকাতা চলে যাচ্ছে। ওখানেই থাকবে ওরা।’

বিষ্ময়বিমূঢ় মুসকান!! তাহলে তো আর ওর দেখা হবে না শোভনের সাথে। ওর চোখের পানি আটকাতে পারেনি শায়ের আর শোভনকে।

ট্রেন ছাড়ার সময় আসতেই নিজ কামরায় গিয়ে বসে ওরা। শোভন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে শেষবারের মতো নাঈম মুসকান কে বিদায় জানায়। অতঃপর শায়ের কে বলে,’কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ করতে হয় তাই না আব্বু?’ছেলের কথায় মুচকি হাসল শায়ের,’অবশ্যই!! সবকিছু একসাথে

পাওয়া অসম্ভব। দুনিয়া কে তুমি যা দেবে দুনিয়াও তোমাকে তাই দেবে।'

-'তুমি দুনিয়াকে কি দিয়েছিল আব্বু? যার জন্য এতদিন কষ্টে ছিলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শায়ের জবাব দিল,'কিছু সময় আমি দুনিয়াকে কষ্ট দিয়েছিলাম তাই আমিও কষ্ট পেয়েছি। তবে আমি ভালোবাসাও দিয়েছি। তাই তো এখন বাকি

জীবনে দুনিয়াও আমাকে ভালোবাসা দেবে।’

-‘কিন্তু আমি সবসময় এই দুনিয়া কে ভালোবাসা দেব।’ছেলের কথায় হাসল শায়ের। লম্বা ভ্রমণ শেষে ট্রেনটি ভারত পৌঁছাল। তবে কলকাতা স্টেশনে নামল না শায়ের। আবার নতুন গন্তব্য ধরল ট্রেনটি। এবার গিয়ে থামল জলপাইগুড়ি

স্টেশনে। ব্যাগ থেকে গরম কাপড় বের করে দুজনেই পড়ে নিল। শীত শীত ভাবটা আরো এগোলে আস্তে আস্তে তীব্র হবে। যদিও এখন অনেক কম শীত করছে। স্টেশন থেকে নেমে দার্জিলিং এর বাস ধরে শায়ের। নিউ জলপাইগুড়ি গুড়ি থেকে দার্জিলিং এর কার্শিয়াং শহর ৫৩ কিলোমিটার দূরের পথ। মধ্য

প্রহরের শেষের দিকে কার্শিয়াং এর বাসে ওঠে ওরা। বাকি রাত টুকু বাসেই কাটে বাবা ছেলের। পাহাড়ি রাস্তা তার উপর প্রচন্ড শীত। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে শায়ের। গরম কাপড় পড়া সত্ত্বেও উষ্ণতা দিতে চাইছে সে। শোভন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বাবার বুকে। গন্তব্যে পৌঁছেও শোভনের ঘুম

ভাঙল না। তখন ফজরের আযান পড়েছে। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আরেক হাতে ব্যাগ ধরে বাস থেকে নেমে পড়ল সে। গাড়ি নিয়ে হাজির হল ছোট্ট একটা বাড়ির সামনে। ততক্ষণে শোভনের ঘুম ভেঙে গেছে। দরজায় টোকা দিতেই একটা যুবক এসে দরজা খুলে দিল। শোভনের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা সেই

যুবকের চেহারা। তবে যুবক টা যেন শায়ের কে চেনে। কারণ শায়ের হাসছে সামনের যুবককে দেখে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অচেনা পুরুষটি কোলে তুলে নিল শোভন কে। কিছু বলছে না শোভন। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল সবকিছু। ঘরের ভেতরে ঢুকতেই আরো কয়েকজন নতুন মুখের সম্মুখীন হল সে।

কাউকেই চিনতে পারছে না শোভন। এই ভোর বেলা কি তার জন্যই এই মানুষ গুলো জেগে ছিল? কিন্ত কেন? এরা কারা? একমনে এসব ভেবে চলছে সে। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল ওর বাবাও অস্থির নয়নে আশেপাশে চোখ বুলাচ্ছে। শায়েরের অস্থিরতা দেখে অচেনা যুবকটি বলে উঠল,'সে ঘরে নেই সে পাহাড়ে।'

বাক্যটা শেষের সাথে সাথে শায়েরের অস্তিত্ব যেন মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। শায়ের ছুটল পাহাড়ের দিকে।তবে তাকে কেউ বাঁধা দিল না। বাঁধা দেওয়ার সাহস যেন কারো নেই। প্রকৃতিও চায় শায়েরের পদচরণ পাহাড়ে পড়ুক। শীতের কুয়াশা গুলো যেন স্বাক্ষী থাকলে চায় উতলা পুরুষটির ভালোবাসার। তাই তারাও

শায়েরের সাথে ধেয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে। গন্তব্য যখন শেষ হল দূরে একটা নারী অবয়ব ভেসে উঠল। এই শীতের মধ্যেও নারীটির শরীরে নেই শীত নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র। পাতলা শাড়ি পড়ে সে খোলা চুলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে। কোমল হাতে সে স্পর্শ করছে চা পাতা গুলোতে। কচি পাতা ছিঁড়ে

রাখছে হাতে থাকা ছোট্ট ঝুরিতে। কিছু পল থেমে গিয়ে ধীমি পায়ে সামনে এগোচ্ছে শায়ের। ঠোঁটজোড়া প্রসারিত করে সে একটা শব্দ উচ্চারিত করতেই নারী অবয়বটির হাত থেমে গেল।সূর্য এখনও দিগন্তে দেখা দেয়নি। সহজে দেখা দিবে বলে মনে হয়না। কুয়াশাচ্ছন্ন চারিদিক,দূর দূরান্তের কিছুই দেখা

যাচ্ছে না। যদিও কার্শিয়াং এর শীত দার্জিলিং এর মতো তীব্র নয়। এখানকার আবহাওয়া সারাবছরই আরাম দায়ক। তবুও আজ যেন কুয়াশা আর শীত অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশিই। কাছের কিছুও স্পষ্ট দেখা যায় না। ধোয়াশা লাগছে সব, প্রকৃতিও যেন অপরূপ সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে ধরণিতে।

সেজন্যই বোধহয় কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীটা মোহনীয় লাগছে। ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে শায়ের। নারী অবয়বটির মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কুয়াশার জন্য। তাই সে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কুয়াশা ভেদ করে সে এলোকেশী তনয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। সাত বছর পর মধুরতম কণ্ঠস্বর শায়েরের

কানে পৌঁছাল,‘আসসালামুআলাইকুম মালি সাহেব!!!’

বহুদিনের তৃষ্ণা যেন নিবারণ হতে চলেছে শায়েরের। তবুও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। শুষ্ক গলায় সালামের উত্তর দিল সে,’ওয়ালাইকুম আসসালাম পরীজান!!!’

-‘কেমন আছেন?’

পরীর এই প্রশ্নের জবাব দিল না শায়ের। উল্টে নিজেই প্রশ্ন করে বসল,'আমি কি আপনাকে জড়িয়ে ধরতে পারি? তৃষ্ণায় বুকটা খাঁ খাঁ করছে!! শীতকালকেও আমার কাছে তেজস্ক্রিয় চৈত্রের মত মনে হচ্ছে।'

দুকদম এগিয়ে এল পরী। পায়ে তার জুতো নেই। শীতল কার্শিয়াং কে সে পরিপূর্ণ ভাবে আজ উপলব্ধি করতে

চাইছে সে। শায়েরের এই প্রশ্নের পরিবর্তিতে সেও প্রশ্ন করে,’আমি কি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি?’পরী মুচকি হাসল কথাটা বলে। বিপরীতে শায়ের ও মুচকি হাসল। তবে সে খেয়াল করল তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। পরীর চোখেও অশ্রুকণা সে দেখতে পেল। শায়ের কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরী নিজেই এগিয়ে

এসে জড়িয়ে ধরে শায়ের কে। স্বামীর গলায় মুখ ডুবিয়ে দিয়ে তার শরীরের ঘ্রাণ চুম্বকের মতো টেনে নিল নাকে। শক্ত করে শায়েরের গলা আঁকড়ে ধরে রইল সে। নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে ধরে সাত বছরের তৃষ্ণা মেটাতে লাগল শায়ের। এত কাছে আসার জন্যই তো এত দূরত্ব ছিল তাদের মধ্যে। এরকম সুন্দর সমাপ্তি

পাওয়ার জন্য সাত বছর কেন সাত যুগ দূরে থাকতে শায়ের রাজি। তবুও যেন ওর সমাপ্তিটা তার পরীজানের সাথেই হয়। পরীকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে ওর সারা মুখে চুমু খেয়ে আবার জড়িয়ে নিল নিজ বক্ষে। পরী শুধু স্বামীর পাগলামো দেখতে লাগল। আর অশ্রু বিসর্জন দিতে লাগল। পরীকে বুক থেকে

সরিয়ে সোজা করে দাঁড় করাল শায়ের। তারপর বলল,’আপনি শীতের কাপড় পড়েননি কেন? ঠান্ডা লাগবে তো!’তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের চাদরখানা পরীকে পড়িয়ে দিল সে।

-‘শীত আপনার লাগবে না? ঠান্ডা তো আপনারও লাগবে।’

-‘পাথরের অশ্রু আসে না,তেমনি ছেলেদের কষ্টও কষ্ট মনে হয় না।’

পরী মৃদু হাসল,’অনেক কথা জমে আছে মালি সাহেব। পাহাড় সমান কথা। আপনি শুনবেন??’

-‘আল্লাহ আপনার জন্যই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনি সবসময়ই একে অপরের কথা শুনব। দূরে থাকলে একে অপরের কথা ভাববো। আপনি বলুন। আমি

আজ আর কিছুই বলব না আপনার সব কথা শুনে যাব শুধু।’

-‘আমাদের দূরত্ব তাহলে ঘুচলো!!’

-‘আপনার আমার মাঝে দূরত্ব কখনোই ছিল না। এই সাত বছর আমি আপনার মধ্যেই ছিলাম। আর আপনি আমার ভেতর।’-‘অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাকে আমি। ক্ষমা করুন আমাকে!!’

পরীর ঠোঁটে আঙুল চেপে ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে শায়ের বলে উঠল,'আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন? আপনি আপনার স্থানে সঠিক ছিলেন আর সর্বদা থাকবেন। আমি সেই আগের পরীজান কে সবসময় দেখতে চাই!!'

-'কথা দিচ্ছি আর কখনোই আপনাকে দূরে ঠেলে দিব না। শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় ও আপনাকে আমার চোখ দুটো খুঁজবে।’

-‘আমি যতটা নিঃশ্বাস নেব তা আপনার সাথেই নেব। যত দূর্গম রাস্তাই হোক না কেন তা আপনার সাথেই হাটব। আল্লাহ যদি তার ইবাদত ব্যতীত কারো ইবাদত করার

হুকুম দিত তাহলে আমি একমাত্র আপনার ইবাদত করতাম পরীজান।'

টলমল চোখে পরী বলে,'এত সুখ আমি কোথায় রাখি

মালি সাহেব? আপনার ভালোবাসার গভীরতা যে আমি মাপতে পারছি না!'

-'আমার ভালোবাসা অনেক গভীর পরীজান। এই গভীরতা মাপতে

গেলে আপনি তল খুঁজে পাবেন না। তলে হারিয়ে যাবেন।’প্রকৃতিকে চমকে দিয়ে কুয়াশা সরে যাচ্ছে। হয়তো সূয্যিমামা শীঘ্রই উঁকি দিবে। তার যেন হিংসে হচ্ছে এই মুহূর্তে। সে ব্যতীত প্রকৃতি স্বাক্ষী হয়েছে শায়ের পরীর ভালোবাসার। শায়ের পরীকে আবার বুকে টেনে নিয়ে সুধায়,’অবাধ্য মন শুধু আপনাকে

পাওয়ার জন্য আরাধনা করে। আমার হৃদস্পন্দন শুনে বুঝতে পারছেন কি?’

পরী জবাব দেওয়ার সময় পেল না। তার আগেই নিজের সন্তানের মুখে ‘আম্মিজান’ ডাকটা তার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল। শায়েরের বুক থেকে মাথা তুলে শোভনের দিকে তাকাল। দৌড়ে আসছে শোভন। পরী এগোল

না,শোভন কাছে আসতেই হাটু মুড়ে বসে সে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে। খুশিতে আত্মহারা মাকে পেয়ে শোভন। পরী ছেলের কপালে বার কয়েক চুমু খেল। এর থেকে সুন্দরতম দৃশ্য বোধহয় প্রকৃতিতে আর হতেই পারে না। সূর্য ধরণিতে উঁকি দিতেই শায়ের,পরী,শোভন সেদিকে তাকাল। এক নতুন দিনের

সামিল হল তিনজন। সাথে নতুন জীবন শুরু করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হল ওরা। শোভন দুহাতে মায়ের গাল ধরে দেখতে লাগল মাকে। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলল,'আমার আম্মিজানের থেকে সুন্দর নারী এই পৃথিবীতে কেউ নেই।'ছেলের কথায় হাসল পরী। মা ছেলেকে দেখে শায়ের ও হাসল। পরী আর ওর

দূরত্ব শায়ের মেনে নিতে পেরেছে কিন্তু মা ছেলের দূরত্ব মানতে শায়েরের অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। তবে এছাড়া তখন কোন উপায় ছিল না। নাঈম তখন পরীর সাথে শোভনকে দিতে রাজি হয়নি। ওতটুকু বয়সে শোভনের কষ্ট হতো। পরীরা তখন পালিয়ে এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। নৌকা করে পাড়ি

দিতে হয়েছিল নদী। বর্ডার পার হতে অনেক কসরত করতে হয়েছে। নাঈম তা ভেবেই শোভনকে পরীর সাথে শোভন কে যেতে দেয়নি। সেদিন পরী বারবার অশ্রুসিক্ত নয়নে ছেলেকে দেখছিল। বেশিক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারেনি। সময় খুব কম তাই জীবন সঙ্গী আর সন্তান কে বিদায় দিয়ে পরী পাড়ি

জমায় ভারতের কার্শিয়াং শহরে। সাথে ওর পরিবার ও। তবে সবাই আলাদা আলাদা ভাবে বর্ডার পার হয়ে এসেছে। পরবর্তীতে সবাই এক হয়েছে। জুম্মান পিকুল কে নিয়ে আগেই সেখানে ছিল। রুপালিকে জমিদার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগেই জুম্মান আর পিকুল কে সে পাঠিয়ে দেয় কার্শিয়াং এ।পরবর্তীতে

পরীরাও জুম্মানের কাছে চলে আসে। তার পর জুম্মান ই পরীর চিকিৎসা করায়। ভারতের চিকিৎসা পরিস্থিতি অনেক ভাল। ডাক্তার দেখানোর পর তারা পরীকে প্লাস্টিক সার্জারির কথা বলে। এতে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। কিন্তু পরী জানত এতে ওর চেহারায় বেশ পরিবর্তন আসবে। সেজন্য পরী

নিজেই নাকচ করে দেয়। থাক না তার পোড়া মুখ। সে তার মালির পরীজান হয়েই বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্ত বোনের সিদ্ধান্ত মেনে নিল না জুম্মান। প্লাস্টিক সার্জারি না করলেও চিকিৎসা চালিয়ে গেল সে। পরী শুধু বিষ্মিত নয়নে জুম্মান কে দেখেছিল সেদিন। এই কি সেই ছোট্ট জুম্মান?

যাকে কোলে পিঠে করে বড় করেছে ও? সেই ছোট্ট জুম্মান আজ পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত। সবার ভালোবাসায় পরীর চিকিৎসা বিফলে যায়নি। দ্রুতই সুস্থ হয়েছে পরী।আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে পরী। তার একহাত শায়েরের হাত ধরে আছে। শোভন শায়েরের কোলে। নতুন দিনের

নতুন সূচনা। জীবনে সবকিছুই আজকে নতুন লাগছে পরীর কাছে। পথ পেরিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছাল ওরা। দরজা খুলল জুম্মান। শায়ের পরী ভেতরে প্রবেশ করতেই জুম্মান বলে উঠল,'পরী আপা তোমার ছেলে ভিশন চতুর। সুন্দর ভাই বাইরে যেতেই সেও ইচ্ছা পোষন করে তোমার কাছে যাবে। আটকাতে

পারলাম কই? ওকে পাহাড়ে নিয়ে যেতেই আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল!!’

শোভন ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ দেখিয়ে বলে,’মা বাবা আর ছেলের মাঝে অন্য কাউকে আসতে নেই তা জানো না বুঝি মামা?’

জুম্মান ভড়কে গেল শোভনের কথায়,’জানলে কীভাবে আমি তোমার

মামা?’শোভন হাসল জুম্মানের কথায়। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে পরী জিজ্ঞেস করে,’চিনলে কীভাবে মামাকে? বলে দাও!’

-‘সেটা বলা যাবে না। বাকি সবাই আসুক দেখি চিনতে পারি কি না?’

শায়েরের কোল থেকে নেমে হট্টগোল শুরু করে দিল শোভন। একে একে সবাই এসে হাজির।

শোভন প্রথমে মালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ অবলোকন করল মালাকে। গায়ে শাল জড়ানো সুন্দর নারীটিকে চিনতে অসুবিধা হল না শোভনের। ওই খাতার বর্ণনা অনুযায়ী শোভন মালা আর জেসমিন কে চিনে ফেলল। কুসুম আর শেফালির নাম বললেও কোনটা কুসুম আর কোনটা শেফালি তা

বলতে পারল না। মায়ের মতো সুন্দর আরেকটি নারীকে দেখে শোভন বলে উঠল,'তুমি মেজ আম্মু তাই না? কিন্তু তুমি তো মারা গিয়েছো? তাহলে?'দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পুড়ছে কাগজগুলো। চেয়ারে বসে এক দৃষ্টিতে তা দেখছে নাঈম। পরীর পাঠানো সমস্ত চিঠি সে আজ পুড়িয়ে দিয়েছে। আর

কোন বিন্দুমাত্র প্রমাণ সে রাখবে না। রুমি নাঈমের পাশে বসে বলল,'আমি এখন সব সত্য জানতে চাই নাঈম। এই চিঠিগুলো পরী আমার কাছে পাঠাত। কিন্ত পরী আর শায়ের এতদিন আলাদা ছিল কেন? পরীর বাবা কাকাকে যদি শায়ের খু*ন না'ই করে থাকে তাহলে কে করল? পরী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাঈম,’কে বলেছে পরীর বাবা আর কাকা মারা গেছে?’-‘মানে? এই বিষয়টা নিয়ে এতকিছু। আর তুই বলছিস ওনারা বেঁচে আছে? কীভাবে? তাহলে এত সব নাটকের প্রয়োজন ছিল কি? আরেকটু হলেই তো শায়েরের ফাঁ*সি কার্যকর হয়ে যেত!!’

নাঈম হেসে উঠল বলল,’শায়ের কে এতটাই বোকা মনে করিস তুই? তোর কি মনে হয়? ছোট্ট ছেলেকে ফেলে কি পরী এত সহজেই জমিদার বাড়িতে চলে গেল? আর কতগুলো মানুষ কে খু*ন করে চলে এল? সবকিছু কি এতই সহজ? আর শায়ের কে কি পুলিশ গ্রেফতার করেছে? নাহ শায়ের নিজেই ধরা

দিয়েছে।’শহরে ফেরার পর সব বন্ধুরা এক প্রকার আলাদা হয়ে যায়। শেখরের বেঈমানি করার জন্য প্রথমত শেখরের সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সবাই। নাঈম সে সময় জেলে ছিল। ছাড়া পাওয়ার পর ওদের কিয়ৎক্ষণের সাক্ষাৎ ছিল। নাঈম বাদে আসিফ মিষ্টি আর রুমি পাড়ি জমায় বিদেশে। নাঈম ই

একমাত্র দেশে রয়ে যায়। ডাক্তারি পড়া শেষ করে সেখানে বছর দুয়েক কাটিয়ে রুমি সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশে আসার। এসেই সে নাঈমের সাথে যোগাযোগ করে। তখন নাঈম আর মুসকানের সদ্য বিয়ে হয়েছে। পরী আর শায়েরের ঘটনাটা তখন রুমি জানতে পারেনি। মুসকানের কোলে ছোট্ট শোভন কে

দেখে হতবাক রুমি।প্রশ্নের তীর ছুড়ে দেয় নাইমের দিকে। নাঈম একে একে পরীর সাথে ঘটে যাওয়া সব কিছুই বলে শুধু এটা বলে না যে পরী কেন শায়েরের থেকে আলাদা হল আর শোভন কেই বা কেন নাঈম নিজের কাছে রেখেছে? এসব হাজারো প্রশ্ন থাকলেও উত্তর নাঈম দেয়নি। সে শুধু রুমিকে

বলেছিল যাতে ও পরীর সাথে যোগাযোগ রাখে। কেননা পুলিশ কেসে একসময় নাঈম নিজেও জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্ত রুমিকে কেউ সন্দেহ করবে না। এই জন্যই পরীর পাঠানো সব চিঠি প্রথমে রুমির কাছে আসতো। আর রুমি সেই চিঠি পুনরায় লিখে তা নাঈমের কাছে পাঠাত। কোনদিন যদি এই

চিঠি পুলিশের হাতে পড়েও যায় তবুও যেন হাতের লেখা শনাক্ত করতে না পারে। রুমি সামনে এলেও পরী যাতে কোনোভাবেই সকলের সামনে না আসে। শুধুমাত্র পরীকে আগলে রাখার জন্য সুরক্ষার জাল সব দিকে বিছিয়ে দিয়েছে শায়ের। যাতে তার পরীজান সুরক্ষিত থাকে। সেজন্য সে নিজে

পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে। আর আজ নাঈম রুমির বাড়িতে এসেছে। পরীর লেখা সব চিঠিগুলো রুমির কাছেই ছিল। সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে এসেছে। সব চিঠি একসাথে জড় করে জ্বালিয়ে দিল সে। আর তখনই অনাকাঙ্খিত প্রশ্ন করে বসে রুমি যা ওর অজানা। নাঈমের কথাগুলোও বেশ অবাক করে

রুমিকে। হিসেব টা সে মেলাতে পারছে না কিছুতেই। যদি আফতাব আর আখির জীবিত থাকেন তাহলে ওনারা এখন কোথায়? রুমি এবার বেশ কঠোর ভাবেই জিজ্ঞেস করে,'নাঈম এবার তো সত্যি বল? এতো ধোঁয়াশায় রাখিস না?'সোজা হয়ে বসে নাঈম তারপর অতীতের ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে,'এই

জমিদার আফতাব মোটেও সুবিধার লোক ছিল না। ভ*য়ংক*র লোক তিনি। পূর্ব পুরুষদের সূত্র ধরেই ওনারা অ*ত্যা*চা*র চালিয়ে আসছে। আমি সবসময়ই ভাবতাম গ্রামের মানুষ এত ভয় পায় কেন ওই জমিদার মহল কে? কিন্ত এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। মানুষের ভাল তিনি দেখতে পারতেন না।

অত্যাচার করে অনেকের জমিজমা নিজের করেও নিয়েছেন। পুলিশ প্রধান ছিল ওনার হাতের মুঠোয় যে জন্য তার কাজ আরও সহজলভ্য ছিল। নিজের মেয়েকে পর্যন্ত খু*ন করে। বাকি দুজন কে হ*ত্যা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কতটা বিকৃত মানসিকতার মানুষ!! পরীরা তিনবোন আফতাবের বিপরীত।

কিন্তু জুম্মানের প্রতি তার কোন হিং*স্র*তা ছিল না। হয়তো ছেলে হয়ে জন্মই তার কারণ। পিকুল কে নিয়ে জুম্মান ভারতে পাড়ি জমায়। একথা আফতাবের কানে পৌঁছাতে আরো ক্ষিপ্ত হন তিনি। পরীর উপর তার রাগটা আরও বাড়তে থাকে। শহরে সে লোক পাঠায় পরীর খোঁজে।শায়েরের কানে সব খবর

পৌঁছে যায়। কিন্তু শায়ের ঠান্ডা মাথার মানুষ। ঠান্ডা মাথায় সে শতজনকে মে*রে ফেললেও কেউ টের পাবে না। আফতাব কোন বুদ্ধি না পেয়ে রুপালিকে ব্যবহার করে। পরী তখন জানত না যে পিকুল কে নিয়ে জুম্মান নিরুদ্দেশ। রুপালির চিঠি হাতে পেয়ে পরী পাগল প্রায়। আমি শায়ের কেউই তাকে

আটকাতে পারছিলাম না। তার পর শায়ের আর আমি বুদ্ধি করলাম। আমরা ইচ্ছা করেই পরীকে জমিদার বাড়িতে পাঠালাম। আফতাব ভেবেছিল শিকার তার জালে পড়ে গেছে। কিন্ত সে নিজেই শিকার হয়ে গেছে তা জানতেও পারেনি। গভীর রাতে পরীকে তিনি হত্যা করার জন্য বাগান বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্ত

সেখানে আগে থেকেই আমরা উপস্থিত ছিলাম। শায়ের শহর থেকে লোক ভাড়া করে এনেছিল। তাও আফতাবের অগোচরে। পরীকে পেয়ে আফতাবের মাথায় খু*নের নেশা চাপে। সেই খুশিতে সে একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে। সেটার সুযোগ আমরা নেই। ওখানে আফতাব আর আখির গুরতরভাবে

আহত হয়। আফতাবের লোকজন তখন কম ছিল। মূলত আফতাব ভাবতে পারেনি শায়ের তার বিপক্ষে এভাবে রুখে দাঁড়াবে!!কয়েকজন রক্ষিরা মারাও যায়। বাকিগুলো প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু বিপত্তি তখনই ঘটে। যখন আফতাবের পোষা পুলিশ সেখানে চলে আসে। কিন্তু বুদ্ধিমান শায়ের সব সামলে

নেয়। সে পুলিশ কে জানায় দুপক্ষের সংঘর্ষে আফতাব আর আখির আহত। তাদের দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। আর আমি যেহেতু ডাক্তার তাই আমাকে চিকিৎসা করতে বলা হল। শহর থেকে ওষুধ আনলাম আর ওখানেই ওনাদের চিকিৎসা করলাম। কিন্ত আফতাব আর আখিরের সুস্থতার জন্য আমি

কোন চিকিৎসা করিনি। আমি ওনাদের দিনদিন পাগল হওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছি। এমন ওষুধ দিয়েছি যাতে আস্তে আস্তে ওনাদের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আর ওনারা পাগল হয়ে যান। ওনাদের সম্পূর্ণ পাগল করতে আমাকে অনেক কসরত করতে হয়েছে। একসাথে সব ওষুধ প্রয়োগ

করলে মৃ*ত্যুর ঝুঁ*কি থাকত। তাই আস্তে আস্তে সব করতে হয়েছে। ওই মৃ*ত রক্ষি গুলোকে কবর দেওয়া হয় বাগান বাড়িতে।এবং পরবর্তীতে পরীর মা'কে দিয়ে শায়েরের বিরুদ্ধে কেস লেখাই যাতে সবাই জানে শায়ের দোষী। পুলিশ শায়ের কে খুঁজবে আর অন্যদিক দিয়ে পরীরা দেশ ছাড়বে। তখন

এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ যদি কোন পর্যায়ে পুলিশ সত্য জেনে যায় তাহলে পরীসহ সবাই বাংলাদেশে আটকে পড়বে। সবার সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শায়ের নিজেকে বিপদের মধ্যে রেখে সবাইকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। সেদিন পরী আর শায়েরের চোখের ভাষার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী আমি ছিলাম।

আমার সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল ওদের কে এভাবে আলাদা হতে দেখে। তবুও ওই মুহূর্তে কিছু করার ছিল না। শোভনকে আমি নিয়ে যেতে দেইনি কেননা ভারতে যাওয়ার পথটা ছিল দূর্গম। সবাইকে ভারত পাঠিয়ে রয়ে গেলাম আমি শায়ের আর শোভন। পুলিশ বাগান বাড়ির কবর খুড়ে কিছু লা*শ পায়।

এবং সেসব লা*শের ময়নাতদন্ত করে জানা যায় যে ওখানে আফতাব,আখির,রুপালিসহ কয়েকজন রক্ষিদের লা*শ ছিল। যেহেতু লা*শগুলো কঙ্কাল ছিল তাদের চেহারা বোঝার কোন উপায় নেই। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট গুলো আমি নিজেই বদলে ফেলেছিলাম। এখানে আফতাবের পোষা পুলিশ

টাও আমাদের সাহায্য করেছিল। সে ভেবেছিল আমরা আখির আর আফতাব কে বাঁচানোর জন্য এতকিছু করছি কিন্ত সে ভাবতেও পারেনি যে তার ভাবনা যেখানে শেষ শায়েরের ভাবনা সেখানে শুরু। উল্টো সে নিজেই বিপদে পড়ে গেল। তবে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে গ্রামের লোকজন।

সবাই না জানলেও কিছু কিছু লোক জানতো। তারা আগে যেমন চুপ ছিল এখনও সেরকমই চুপ। পুলিশের কাছে কেউ মুখ খোলেনি। তারাও চেয়েছিল আফতাবের শাস্তি হোক।’

লম্বা শ্বাস নিল নাঈম। রুমি মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিল। মনে মনে সে আরো কিছু প্রশ্ন

গুছিয়ে রেখেছে। নাঈমের কথা শেষ হতেই রুমি তার প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে মারল,'বুঝলাম, কিন্ত শোভন কে কেন মায়ের থেকে আলাদা রাখলি? পরে তো পরীর কাছে পাঠাতে পারতি! আর শায়ের এই পদক্ষেপ আরও আগেও নিতে পারত! এতো দেরি করার কারণ টা কি?'

নাঈম এবার বেশ বিরক্ত হল,’গাধি একটা,ওতটুকু ছেলেকে কীভাবে ভারতে পাঠাতাম? কোন কারণ তো দেখাতেই হত। মা বাবা ছাড়া একটা ছেলেকে ভারত নিয়ে যেতে হলে আবার না জানি পুলিশ কেসে পড়তে হত। তাছাড়া ততদিনে শায়েরের পরিকল্পনায় শোভন এসে যুক্ত হয়। পরীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে

নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি।’-‘আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর?’

-‘শায়ের কেন এত দেরি করল তাই তো? শায়ের ইচ্ছা করলে আফতাব আর আখির কে আরও আগে সরিয়ে দিতে পারত কিন্তু শায়েরের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কিছু প্রমাণ ওই পুলিশ টির কাছে ছিল। আফতাবও কম চালাক

ছিল না। ওই প্রমাণের জন্য শায়ের চুপ করে থাকত। আর শায়েরের কাছেও আফতাবের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছিল। এই কারণেই শায়ের আর আফতাব দুজন দুজনকে মারার ইচ্ছা পোষণ করেও মারতে পারত না। ওই পুলিশের কাছ থেকে সব প্রমাণ আনা মুখের কথা ছিল না। সেজন্য ধীরে ধীরে সব করতে হয়েছে। সব

কাজ শেষে শায়ের গোপনে ভারত চলে যেতে পারত কিন্তু তা হল না। সব গোপনে থাকলে জমিদারের সব সম্পত্তি সরকারের কাছে চলে যেত। সেখানেই বিপদ বাঁধে। পরিকল্পনা পরিবর্তন হয় আবারও। তিনবছর পার হয়ে গেছে। তখন শায়ের ধরা দিল পুলিশের হাতে। তদন্তে সময় লাগল প্রায় দুবছর। শায়েরের

ফাঁ*সির হুকুম দেওয়া হল। শায়ের আবেদন করে তার ফাঁ*সির দিন দশ মাস পিছিয়ে দিল। শায়েরের শেষ ইচ্ছা পূরণ করল কোর্ট। ওই দশ মাসে জুম্মান ছেলে হিসেবে সব সম্পত্তি এসে বিক্রি করে আবার চলে গেল। জুম্মান চলে যাওয়ার পর এগিয়ে গেল সময়। শায়েরের ফাঁ*সির দিন ঘনিয়ে আসছিল। আমি

খুব ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু শায়ের উল্টে আমাকে সাহস দিচ্ছিল। মাঝেমধ্যে শায়েরের সাথে ছদ্মবেশে দেখা করতাম। মুসকানের অফিসের বসের সাথে কথা বলে ওদের টিমকে নূরনগর পাঠাই। সেখানেও আমার একজন লোক ছিল যে পরীর ওই খাতাটা মুসকানের নজরে আনে। তারপর বাকি সব মুসকানই

করে দেয়। আমার আর কিছু করা লাগে না। তারপরের ঘটনা তোর জানা।'কথা বলার কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না রুমি। শায়েরের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। এতকিছু শুধুমাত্র পরীর জন্য!! একটা মানুষ ঠিক কতটা ভালবাসলে এতকিছু করতে পারে!!! নিজের জীবন সংকটে ফেলতে পারে!! শায়ের কে

না দেখলে হয়তো কোনদিন জানতে পারত না।

-‘ভালোবাসা কাউকে পরিপূর্ণভাবে গড়তে পারে আবার কাউকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়। এমন ভালোবাসার সৃষ্টি হওয়ার দরকার ছিল কি?’

রুমির কণ্ঠে প্রকাশ পাচ্ছে ব্যকুলতা। যদি কোন নারী দেখে একটা পুরুষ কোন এক নারীর প্রতি ভিশন আকৃষ্ট

হয়ে আছে তাহলে সেটা সে সহ্য করতে পারে না। রুমির কাছেও সেরকম মনে হচ্ছে। এমন ভালোবাসা তো সবার জীবনে আসে না। যদি মুসকান জানতে পারে তাহলে কি হবে? মুসকানের কথা ভেবেই রুমি জিজ্ঞেস করে,’আর মুসকানের কি হবে?

ওকে ঠকালি কেন?’

-‘কে বলেছে আমি মুসকান কে ঠকিয়েছি? সে আমার স্ত্রী! সব অধিকার আমি ওকে দেব।’

-‘তাহলে তুই কেন পরীর জন্য এতকিছু করলি? শায়ের তো ভালোবেসে করেছে! তুই এখনও পরীকে ভালোবাসিস তাই না?’নাঈম হাসল,’শায়েরের মতো করে পরীকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না রুমি।

আমি যা করেছি তা সামান্য। আমি শত চেয়েও পরীকে পাব না। হাশরে ও পরী শায়ের দুজন দুজনকে চাইবে আমি চাইলেও পাব না। আমি তখন নাহয় মুগ্ধ চোখে তা দেখে নেব!! দিন শেষে আমার ভালোবাসা সুখে থাকুক তার ভালোবাসার মানুষের সাথে।’

-‘এই গল্পে তোর মত চরিত্র থাকা খুব কঠিন নাঈম। ভালোবাসা কেউ ছাড়তে চায় না আর তুই হাসিমুখে ছেড়ে দিলি।’

-‘একটা গল্পে সব চরিত্রের সুখ লেখা অসম্ভব। এজন্যই আল্লাহ আমার চরিত্রে সুখ লেখেনি। তবে একজন দায়িত্ব বান স্বামী হব।’

রুমির বাসা নির্বিঘ্নে ত্যাগ করে নাঈম। সে আজ সব পিছু টান থেকে মুক্ত। শায়ের ভাল থাকুক পরীকে নিয়ে। বাকি জীবনটা ওদের আনন্দময় কাটুক। সাত বছরের কষ্ট, না পাওয়ার তৃষ্ণা মিটুক। শায়েরের মত ভালোবেসে কেউ আগলে রাখতে পারে না আবার নাঈমের মত ভালোবেসে কেউ ত্যাগ করতেও

পারে না। ভালোবাসার এই দুটি রূপ ভিশন ভ*য়ংক*র। কারণ ভালোবেসে আগলে রাখা যেমন কঠিন তেমনি ভালোবাসার মানুষ কে ত্যাগ করাও কঠিন। তবে পরীর সন্তান যে কিছু সময়ের জন্য নাঈম কে পিতা হিসেবে জেনে এসেছে এটাই ওর কাছে অনেক। অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে না'ই বা পেল। এই জীবনে

তাই নাঈমের আর কোন আফসোস নেই। সে নতুন করে মুসকানের হাত ধরে অগ্রসর হতে চায়। সবশেষে বলা যায় পৃথিবীর সকলের গন্তব্য একটাই। তা হলো প্রকৃত ভালোবাসা।শুভ্র রঙের শাড়িটি যেন পরীর দেহেই শোভা পায়। লাল পাড়ের সাদা রঙের শাড়ির পড়ে খাটের উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে

পরী। খাটের অপর প্রান্তে হেলান দিয়ে বসে আছে শায়ের। গভীর রাত তখন। ঘরের সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শোভন মালা আর জেসমিনের কাছে ঘুমিয়েছে। পরীর চোখে ঘুম নেই। একে অপরের দিকে নির্জীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শায়ের পরী। ঘরের জানালা টা খোলা। শনশন করে ঠান্ডা বাতাস

ঘরে এসে ঢুকছে। যদিও বাতাস সামান্য,শীতকাল বলেই বাতাস টা বেশ গায়ে লাগছে। শীত নিয়ন্ত্রণ বস্ত্র নেই দুজনের কারো শরীরে। শীতটা যেন দুজনেই খুব করে উপভোগ করছে। পরী খেয়াল করল তার কপোলদ্বয় এই ঠান্ডার ভেতরও গরম হয়ে আসছে। পরে বুঝল এগুলো অশ্রুকণার গরম আভা। বেশ

কিছুক্ষণ যাবত ধরেই অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে সে আর তার স্বামী যেন এতে ভীষন আনন্দ পাচ্ছে!! পরীর খোলা ঘন চুলগুলো হালকা দুলছে। সেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে শায়েরের চোখে। অনেক সময় পার হওয়ার পর শায়ের মুখ খুলল,'জানালাটা বন্ধ করে দেই? অনেক তো শীত উপভোগ করলেন। এর বেশি নিলে

শরীর খারাপ করবে।’-‘এতদিন তো শরীর আমার খারাপই ছিল। আচানক ওষুধ মিলে গেল। আর খারাপ করবে না।’

শায়ের উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর পরীর সামনে বসে ওর এক পা কোলের উপর রাখল। মসৃণ ফর্সা পায়ে হাত বুলালো

বলল,’আমি হীনা খুব কষ্টে ছিলেন কি?’

-‘উত্তরটা আপনি জানেন তবুও জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

জবাব না দিয়ে কেবল হাসল শায়ের। পরী পুনরায় বলে উঠল,’ঘুমাবেন না? নাকি সারারাত আমাকে দেখবেন শুধু?’

-‘আপনি কি চান?’

-‘আমি আপনার ইচ্ছা জানতে চেয়েছি। আমার থেকে কষ্ট বেশি আপনি পেয়েছেন। জানেন আমি ভীষণ ভাগ্যবতী। পিতার স্নেহ আমি পাইনি। কতশত মেয়ের কাছে তার পিতা কোন এক রাজ্যের রাজা আর সে রাজকুমারী। কিন্তু আমার কাছে তা শুধু গল্প মাত্র। তবুও আমার আফসোস হয়না। আপনি আছেন

বলে। কি এমন জাদু করলেন আমাকে? আমার তো এত ভালোবাসা সহ্য হচ্ছে না।'

পরীর বাহু শক্ত করে চেপে ধরে কাছে টেনে আনে শায়ের। শক্ত চোখে তাকিয়ে বলে,'সত্যিকারের ভালোবাসা সব পরিস্থিতিতেও পাশে থাকে। যেমন আমি ছিলাম আর সারাজীবন থাকব। এজন্যই আমার

ভালোবাসা আপনাকে সহ্য করতে হবে।'-'আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই মালি সাহেব। আপনি আমার স্বামী। যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা দেওয়ার হুকুম থাকত তাহলে আপনার পায়ে সিজদা দিতাম। তাহলে কি করে আপনাকে দূরে ঠেলে দেই বলুন তো? শুধু আমি কেন মনের মত

পুরুষ পেলে পৃথিবীর কোন নারীর ক্ষমতা নেই সেই পুরুষ কে ছেড়ে যাওয়া।'

দম ফেলে ভাল করে শায়েরের মুখে চোখ বুলায় পরী,'শখের শাড়িটি নারীরা ছাড়ে না তাহলে শখের পুরুষ কে ছাড়ে কীভাবে? শাড়ির মতোই শখের পুরুষ টিকে গায়ে জড়িয়ে রাখে।'

-‘শুনেছি সময়ের সাথে সাথে নাকি সব পাল্টে যায় অভ্যাস,ভাল লাগা এমনকি অপেক্ষার রঙ ও পাল্টে যায়। কিন্ত আমার তো কোন কিছুই বদলায়নি। আমি আজও সেই পরীজানে আসক্ত। তাহলে কি ভেবে নিব সত্যি ভালবাসলে কিছুই বদলায় না?’জবাব না দিয়ে পরী শরীর এলিয়ে দিল বিছানায়। শায়ের ও

এক মুহূর্ত দেরি না করে তার ভর ছেড়ে দিল পরীজানের শরীরে। তার পরীজানের গলায় মুখ গুঁজে দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। পরী অনুভব করল সাত বছরে ফেলা আসা অনুভূতি। সেই অনুভূতির দল আবার ফিরে এসেছে। তার মালি সাহেবের প্রতিটি নিঃশ্বাস তাকে অতীত মনে করিয়ে দিচ্ছে। পরী

আবারও সেই গরম আভা টের পাচ্ছে। তবে এই চোখের জল পরীর নয় স্বয়ং শায়েরের। পরীকে শক্ত করে সে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ‘আপনাকে ভিশন ভালোবাসি পরীজান।’

-‘আমিও আপনাকে খুব ভালবাসি।’

-‘তাজমহল দেখতে যাবেন?’

-‘কেন? কী আছে ওই তাজমহলে?’

-‘ভালবাসা।’

-‘আমার না প্রয়োজন ধনরত্ন আর না দেখার প্রয়োজন। আমার আপনিই সব।’

-‘ভালোবাসা আছে বলেই বলছি। কিছু তো আছে ভালোবাসায় নাহলে একটা লা*শের জন্য কেউ তো আর তাজমহল বানায় না।’পরী মৃদু হেসে শায়েরের ঘন চুলে হাত বুলিয়ে

দিল। শায়ের আবার ওকে বুঝিয়ে দিল ভালোবাসার আরেক নাম চোখের জল। শায়েরের কথাটাই ঠিক ছিল। শায়ের বলেছিল ওর ভালোবাসায় কাঁদবে পরী। তাই আজও চোখের জল পড়ছে পরীর। বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলেও মনমিলন হয়েছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। শুধু চোখের দেখাটাই যে হয়নি। চক্ষু

তৃষ্ণা যে বড় তৃষ্ণা। শায়েরের বুকের যে সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছিল আজ সে সমুদ্রে নোনাজল থৈ থৈ করছে। এইতো ভালোবাসা। শায়েরের পরীজানের ভালোবাসা।

পরীর তখন খুব ভাল লাগে যখন সে চোখের সামনে ছেলে স্বামীকে একসাথে আসতে দেখে। যা সে চেয়েছিল। একটা ছোট্ট সুন্দর

সংসার। যা ভালোবাসায় ভরপুর। ছেলের মুখের আম্মিজান ডাকটা পরীকে ফের মাতৃত্বের অনুভূতির সাথে সাক্ষাৎ করায়। তখন সে ছেলের গালে মাতৃ স্নেহ দিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। হেসে বলে,'আমার রাজকুমার।'শোভন ও পাল্টা জবাব দেয়,'আমি তোমার সিংহ শাবক আম্মিজান।'

পরী কপালে ভাঁজ ফেলে ছেলের কথার মানে বোঝার চেষ্টা চালায় কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। শোভন তখন হেসে বলে,'আম্মিজান আপনি তো শেরনি। আপনার ছেলে তো শের হবেই।'

শোভনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসে পরী। পরী বোঝে তার অভিরূপ এই ছেলে। মা যেমন

তে*জী হিং*স্র ছিল। ছেলেও ঠিক সেরকম।রাতে যখন কোন খারাপ স্বপ্নে পরীর ঘুম ভাঙে। আগের মতোই শায়ের তখন পরীকে বুকে টেনে নেয়। আদরে ভুলিয়ে দেয় খারাপ সময় গুলো। অতীতের সমস্ত রশিগুলো ছিড়ে ফেলে দিয়ে ভবিষ্যতের রশি টেনে সামনে এগোয় দুজনে।

কার্শিয়াং এ এভাবেই কাটিয়ে দিচ্ছে পরী শায়ের। সূর্যদ্বয়ের আগ মুহূর্তে পরী ছুটে যায় পাহাড়ে। তার প্রিয় শীতের সাথে মনমিলন ঘটাতে। কুয়াশার চাদর গায়ে মেখে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। শিশিরের ঘর ভাঙে তার চরণ তলে। সূর্য কে টেনে আনে ধরায়। ঠিক তখনই পেছন থেকে সেই মধুমাখা কন্ঠটি

শুনতে পায়। সে গলা ছেড়ে ডাকছে,”পরীজান” বলে।